শরৎকুমারী চৌধুরাণীর

রচনাবলী

সম্পাদক

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা-৬

শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী

শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী

সম্পাদক
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

শ্রাবণ ১৩৫৭
মূল্য সাড়ে ছয় টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭
৭.৫—১.৮.১৯৫০

ভূমিকা

যে-সকল মহার্ঘ রত্ন বিস্মৃতির অতল গর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া আমরা লোকলোচনের গোচরে আনিতেছি, তাহার অধিকাংশেরই বহিঃসৌষ্ঠব এ-কালের লোকের চোখে মনোহর ঠেকিবে না, অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন রসগ্রাহী বিদ্বজ্জন-সমাজে সেগুলির সমাদর হইবে। কিন্তু সুখের বিষয়, আজ যে বঙ্গমহিলার লুপ্তপ্রায় রচনাবলী বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ ও একত্র করিয়া আমরা প্রকাশ করিতেছি, তাঁহার ভাষা ভঙ্গি ও স্টাইল সম্পূর্ণ এ-যুগের উপযোগী, একেবারে আধুনিক বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না। প্রশ্ন উঠিবে, তাহা হইলে তিনি বিস্মৃত হইলেন কেন? ইহার জবাব আছে। এই মহিলা এবং ইঁহার স্বামী কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর তুল্য আত্মগোপনকামী যশোলাভে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নির্লোভী লেখক বাংলা দেশে অধিক জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইঁহারা অজ্ঞাতনামা থাকিয়াই সাময়িক-পত্রে লেখা প্রকাশ করিতেন, গ্রন্থমধ্যেও নাম ছাপিতেন না এবং মুদ্রণ-সৌষ্ঠব ও পুনঃপ্রচারের দিকে বিন্দুমাত্র আগ্রহশীল ছিলেন না। নিজেদের বিলোপ ইঁহারা নিজেরাই সাধন করিয়া গিয়াছেন, পাঠক-সমাজের অবহেলা তাহার কারণ নহে। 'আধুনিক সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথের উচ্চ প্রশংসাও কার্য্যকরী হয় নাই; কারণ, রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু প্রশংসার পাত্রীর পরিচয় দেন নাই। আজ দীর্ঘকাল পরে আমরা শরৎকুমারী চৌধুরাণীর যাবতীয় রচনা সংগ্রহ করিয়া সাধারণের দরবারে পেশ করিলাম; এগুলি পড়িলেই সকলে উপলব্ধি করিবেন যে, ঘটনাচক্রে জীবিতকে আমরা গলা টিপিয়া হত্যা করিতে বসিয়াছিলাম, শরৎকুমারীর এখনও বাঁচিবার অধিকার আছে।

এই সংগ্রহ-কার্য্যে শরৎকুমারীর দৌহিত্রী—শিল্পী অতুল বসুর সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা দেবযানী বসুর সাহায্য আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি। এক কথায় তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় এই রচনাবলী প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। শিল্পী অতুল বসুও কবি-দম্পতির চিত্রটি প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, "রচনাবলী"র স্বত্বাধিকার শ্রীযুক্তা বসু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

মোটেই যশাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না বলিয়া লেখিকার জীবনীর উপকরণও স্বভাবতই অল্প, এবং তাহা সংক্ষেপে এই :—

শরৎকুমারীর জন্ম হয় মাতুলালয় চানকে (ব্যারাকপুরে)—১২৬৮ সালের ১লা শ্রাবণ (১৮৬১, ১৫ই জুলাই) তারিখে। তাঁহার পিতা—চোরবাগানের বসু-বংশের শশিভূষণ বসু, অবস্থাবিপর্য্যয়ে ভাগ্যপরীক্ষার্থ প্রবাস-জীবন বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; তাঁহার কর্ম্মস্থল ছিল লাহোর। শরৎকুমারী দুই বৎসর বয়সে পিতার নিকট লাহোরে যান; সেইখানেই তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হয়। তিন

বৎসর বয়সে তিনি স্থানীয় বঙ্গবিদ্যালয়ে এবং ছয় বৎসর বয়সে ইউরোপীয়ান স্কুলে প্রবেশ করেন।

১২৭৭ সালের ২৯এ ফাল্গুন (১৮৭১, ১২ই মার্চ) জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সদ্য এম. এ. পাস-করা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি পুনরায় পিতার সহিত লাহোরে চলিয়া যান। ইহার বছর-পাঁচেক পরে তিনি কলিকাতায় স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসেন। অক্ষয়চন্দ্র তখন অ্যাটর্নী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই ঠাকুর-পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্বামীর ন্যায় শরৎকুমারীও মাতৃভাষাব পরম অনুরাগিণী ছিলেন। 'ভারতী'র সম্পাদকীয় চক্রে উভয়েই উৎসাহী সভ্য ছিলেন। বন্ধু-সমাজে, বিশেষ ঠাকুরবাড়ীতে শরৎকুমারী "লাহোরিণী" নামে পরিচিত ছিলেন বা বর্ণিত হইতেন। ১৮৯৮, ৭ই সেপ্টেম্বর অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যু হয়। একুশ বৎসর বৈধব্য জীবন যাপন করিয়া ১৩২৬ সালের ২৯এ চৈত্র (১৯২০, ১১ই এপ্রিল) শরৎকুমারী পরলোকগমন করিয়াছেন।

দুই-একটি উল্লেখযোগ্য খবর এই : 'শুভ বিবাহ' যখন লিখিত হয়, কবি-দম্পতির সহিত রবীন্দ্রনাথের তখন খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তিনি নিয়মিত তাঁহাদের কাছে যাতায়াত করিতেন। লেখাটির গুণে মুগ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ তৎপরিচালিত নব পর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করিবার জন্য পেন্সিলে লেখা পাণ্ডুলিপি ধরিয়াই টানাটানি করিয়াছেন, কিন্তু শরৎকুমারীকে রাজী করাইতে পারেন নাই। ইহা পরে নাম-গোত্রহীন অবস্থায় সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে ১৩১২ সালে (২৬ মার্চ ১৯০৬) প্রকাশিত হয় ; এবং ১৩১৩ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ উহার সমালোচনা প্রকাশ করেন।

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ "যৌতুক" গল্পের প্লটটি শরৎকুমারীকে দেন এবং উহা লইয়া তাঁহাকে একটি গল্প রচনা করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ-মত পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই শরৎকুমাবী 'যৌতুক' গল্পটি লিখিয়া ফেলেন। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ ইহা জানিতেন না ; কারণ, পরবর্ত্তী কালে তিনি এই প্লটটি আবার চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন এবং তিনি "চাঁদির জুতা" গল্পটি লেখেন। গল্পটি চারুবাবুর 'বরণডালা' নামক পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

শরৎকুমারীর লেখার শিল্পসুষমার নিদর্শন তাঁহার রচনাবলীতেই মিলিবে, তথাপি রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য আমরা লিপিবদ্ধ করিতেছি—

> "মেয়ের কথা মেয়েতে যেমন করিয়া লিখিয়াছে এমন কোনো পুরুষ গ্রন্থকার লিখিতে পারিত না।...এমন সজীব সত্য চিত্র বাংলা কোন গল্পের বইয়ে আমরা দেখি নাই।...এই গ্রন্থকে আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিলাম।"

সূচী

শুভ বিবাহ	...	১
কলিকাতার স্ত্রী-সমাজ	...	৯৫
শাশুড়ী-বৌ	...	১০৯
এ-কাল ও এ-কালের মেয়ে	...	১২১
আদরের, না অনাদরের ?	...	১৩৫
আমাদের পুতুলের বিয়ে	...	১৪৮
কন্যাদায়	...	১৫৮
শৈশবে ধর্ম্ম-শিক্ষা	...	১৬৭
স্বায়ত্ত সুখ	...	১৭৫
হিন্দু বালিকাগণের শিক্ষা	...	১৮৪
প্রবাসের পাঠশালা	...	১৮৯
শ্রীপঞ্চমী	...	২০৩
মেয়ে-যজ্ঞি	...	২১০
মেয়ে-যজ্ঞির বিশৃঙ্খলা	...	২১৫
স্বর্গীয় ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য	...	২২৭
ত্রিপুরার গল্প	...	২৩১
দিদিমা	...	২৩৩
লক্ষ্মীর শ্রী	...	২৫১
দোষ পরিহার	..	২৫৬
জীবজন্তুর প্রতি অনুরাগ	...	২৬০
নারীশিক্ষা ও মহিলা-শিল্পাশ্রম	..	২৬৯
শিশুশিক্ষার মূলমন্ত্র	..	২৭৪
যৌতুক	.	২৭৮
সোনার ঝিনুক	...	৩১৭
ভারতীর ভিটা	...	৩৭৩
সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ও আশ্রয়াকাঙ্ক্ষা লইয়া স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের বিশেষত্ব	...	৩৭৬

কবি-দম্পতি

শুভ বিবাহ

[১৯০৬ সনের মার্চ মাসে প্রকাশিত]

বালিকাবয়সে শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীর সহিত বিদেশে গিয়াছিলাম, ২৫ বৎসর পরে দেশে আসিয়াছি। আমার শ্বশুর ধন উপার্জ্জনের চেষ্টায় পদব্রজে সুদূর পঞ্জাবে চলিয়া যান। সে অনেক দিনের কথা, বোধ হয় ৪৫ বৎসর হইবে, তখন রেলপথ হয় নাই। তিনি সেই দেশেই বাড়ী করিয়াছিলেন। ১৫ বৎসর পরে একবার দেশে আসিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়া স্ত্রী-পুত্র পুত্রবধূ লইয়া ফিরিয়া যান। আর তাঁহাকে দেশে আসিতে হয় নাই—আমার শ্বশুর বা শাশুড়ী কেহই আর নাই।

আমার শ্বশুরবাড়ী পল্লীগ্রামে:—শুনিয়াছি, জ্ঞাতিরা আমাদের অংশের ভিটাটুকু ফেলিয়া রাখিয়া, যে যাহার ইচ্ছামত আপন আপন ঘর দ্বার প্রস্তুত করিয়া লইয়া বসবাস করিতেছেন। সেখানে দাঁড়াবার স্থান পাইব কি না সন্দেহে, দিদির অতিথি হইয়া আজ কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছি। দিদিকে পত্রের দ্বারায় সংবাদ দিয়াছিলাম, তাঁহার গাড়ী ও সরকার আমাদের জন্য হাবড়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল। আমার এক সন্তান;—গবর্মেণ্ট-আপিসে কাজ করে, দুই শত টাকা বেতন পায়, বয়স ২৩৷২৪, আজও বিবাহ হয় নাই। ইচ্ছা আছে, এইবার বিবাহ দিয়া বধূ ঘরে আনিব। সেই উদ্দেশ্যেই দেশে আসিয়াছি। দিদি পতিপুত্রবতী সৌভাগ্যশালিনী। পুত্রগুলি সুশিক্ষিত, উপার্জ্জনশীল। যখন বিদেশে যাই, আমার বয়স তখন ১২৷১৩ বৎসর, দিদি আমার চেয়ে ১৪৷১৫ বছরের বড়। তখন তাঁহার চার-পাঁচটি সন্তান। ভগ্নীপতির সামান্য আয়ে কোন মতে দিনযাপন হইত। ক্রমে ক্রমে দিদির ছেলেগুলির মধ্যে কেহ মুচ্ছুদ্দী, কেহ ডাক্তার, কেহ ডেপুটি, কেহ উকিল হইয়া ভাঙা ঘর অট্টালিকায় পরিণত হইয়াছে। দাস দাসী, পাচক ব্রাহ্মণ, মাষ্টার, সরকার, পণ্ডিত, পুত্র পুত্রবধূ, মেয়ে, জামাই, নাতি, নাতনী, নাতজামাই, নাতবৌ প্রভৃতিতে দিদির অট্টালিকা পরিপূর্ণ। দিদির ফটকে গাড়ী দাঁড়াইবা মাত্র দরওয়ান "আরে, খিড়কি দরজায় যাও" বলিয়া পথ রোধ করিল। তখন গাড়ী ফিরাইয়া খিড়কিতে হাজির করিয়া সহিস কড়া নাড়িতে লাগিল—"ও ঝি, দরজা খোল, ও ঝি, দরজা খোল।" কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না। সরকার ফটকে নামিয়া গিয়াছিল, কাহারও সাড়া না পাইয়া কোচম্যানের উপদেশে সহিস ফটকের দিকে দৌড়িয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "চাবি খুলিতে বলা হইয়াছে।" কত ক্ষণ বসিয়া আছি,

কোথাও কেহ নাই, মধ্যে মধ্যে সহিস কড়া নাড়িতেছে ও "ঝি, ও ঝি" করিতেছে। বিধবা স্ত্রীলোক, রেলের গাড়ীতে তিন দিন প্রায় অনাহারে গিয়াছে, বসিয়া বসিয়া গাড়ীর গরমে শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। ছেলে বলিল, "মা, কমলপুরে গেলে হ'ত, জ্ঞাতিরা কি স্থান দিত না! এ বড় মানুষের বাড়ী, আমার বড় বাধ-বাধ ঠেকছে।" আমি বলিলাম, "এখন আর কি হবে, তুই চুপ কর্ বাছা।" এমন সময় খিড়কির দরজার পাশের একটা জানলা খুলিয়া গিয়া একখানা সুন্দর মুখ দেখা গেল। "কে রে, কে এসেছে, ওঃ, মাসীমারা বুঝি এসেছেন—ও ঝি, দরজা খুলে দে।" আশা হইল, এবার দরজা খুলিবে। ছেলে বলিল, "খিড়কিতে একজন দরওয়ান কেন রাখেন না মা? বিশেষতঃ আজ আমরা আসিব, তা ত জানেন।" বলিতে বলিতে কটাস্ করিয়া চাবি খোলার শব্দ হইয়া দরজা খুলিল। এক অপ্রসন্নমুখী বৃদ্ধা দাসী গাড়ীর কাছে আসিয়া আমাকে বলিল, "নেমে আস।" কোচম্যানকে বলিল, "জিনিসপত্র সব দপ্তরখানায় নিয়ে রাখ গা।" বলিয়া ঝি আমাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়া আবার চাবি বন্ধ করিয়া দিল। গাড়ী জিনিসপত্র, ছেলে, সব বাহিরে রহিল—বুঝিলাম, গাড়ী চলিয়া গেল। যেখানে আমি দাঁড়াইয়াছি, সেটি খিড়কির বাগান। বাগানের মধ্যে একটি ঘাটবাঁধান পুকুর, ঘাটে অনেকগুলি বৌ ঝি স্নান করিতেছে দেখিলাম। কতকগুলি ছুটিয়া আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। চেনা মুখ কাহারও নহে। আমি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। ঝি গম্ভীরমুখে বলিল, "চল না গো, ঘরে চল না, কত ক্ষণ দেড়্যে থাক্‌বা, পোঁট্‌লা নিয়া আমার হাত ভাঙে যাবার জো হল।" একটি ছোট পুঁট্‌লি ঝিএর হাতে দিয়াছিলাম। ভাবিতেছিলাম, "ছেলেকে কিছু বলা হইল না, তোরঙ্গ বাক্সে টাকাকড়ি গহনাপত্র আছে।" ঝিয়ের কথায় চমক ভাঙ্গিল, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। দালানে উঠিয়া দেখিলাম, একটি বিধবা রমণী তুলসীগাছে জল দিয়া সূর্য্যপ্রণাম করিতেছে। তাহার পরনে শাদা গরদ, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, মাথায় নির্ম্মাল্যের ফুল। বুঝিলাম, সদ্য পূজা শেষ করিয়া উঠিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "দিদি কোথায়।" সেই রমণী আমার কাছে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আসুন মাসিমা, মা এই ঘরে পূজা করছেন, আসুন।" মুখখানি কিছু পরিচিত; বলিলাম, "তুমি কি রাণী?" "হ্যাঁ মাসিমা, ছেলেবেলা আপনার সঙ্গে কত খেলা করেছি—মামার

বাড়ী গিয়ে দাদার কাছে যখনি মার খেতুম, আপনি তখনি আমাকে আগ্‌লে রাখতেন।" সে কথা আমার বেশ মনে পড়ে। একটি পরিচিত মুখ পাইয়া বড় আরাম বোধ করিলাম।

ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, দিদি পূজার আসনে বসিয়া আছেন। সম্মুখে রূপার কোষাকুষি, পুষ্পপাত্র, রৌপ্যাসনে শ্বেত মহাদেব। দিদির হাতে মোটা মোটা অনেকগুলি সোনার চুড়ি, বালা, তাগা, গলায় হার, কোমরে মোটা গোট। দিদি ইঙ্গিতে বসিতে বলিলেন,—বধূরা ২।৩খানি আসন লইয়া আসিল, আমি বলিলাম, "আসন থাক্ মা, অমনিই বসিতেছি"—বসিলাম। ভাবিতেছি, ছেলের কি রকমে পরিচয়াদি হইল, কে জানে! মাসতুত ভাইরা যদি সাদরে গ্রহণ না করে, ছেলে অভিমানে ফুলিবে। দিদির পূজা সাঙ্গ হইল, দিদি উঠিয়া আসিলেন। প্রণাম করিতেছি, দিদি বলিলেন, "গাড়ীর কাপড়ে আমায় ছুঁস্‌নে।" আমি আর তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিতে পাইলাম না। যেন দিশাহারা হইয়াছি—যেমন আগ্রহে দিদির কাছে ছুটিয়া আসিতেছিলাম, যেন তাহাতে সহসা বাধা পাইয়াছি। কই, দিদির ত তেমন আগ্রহ দেখিতেছি না। আমার বৈধব্যবেশ দেখিয়া দিদি একটু কাঁদিলেন, চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "তুই ত আমার বোনের মত নস্, আমার পেটের সন্তানের মতন, বুকের দুধ দিয়ে তোকেও মানুষ করেছি, তোর এ দশাও আমাকে দেখতে হ'ল। তা এসেছিস্, বেশ করেছিস্, যা হবার হয়ে গেছে, এখন ছেলেটির বিয়ে-থা দে, দিয়ে সংসারী হ। কলকাতায় একখানি যেমন-তেমন কুঁড়ে ক'রে বাস কর্, আর বিদেশে যাস্ নি।"

আমি। দিদি, কলকাতায় যে বাস করব, খাব কি? বিদেশে হ'ল ছেলের কাজ, সে যদি এখানে না রইল, বারো মাস বিদেশে রইল, তবে কাকে নিয়ে সংসারী হব। তবে ছেলের ইচ্ছা, পৈতৃক ভিটেটুকু বজায় রাখে—তাই দেশে একটু ঘরদ্বার করবার ইচ্ছা আছে।

দিদি। মরণ, দেশে ঘর ক'রে মিছে কেন পয়সা নষ্ট করবি, কলকাতায় কর্, বিদেশে কি চিরকাল থাকা ভাল দেখায়। আমার চন্দ্রকান্ত এই যে ডাক্তার, সূর্য্যকান্ত ডেপুটি, বারো মাসই বিদেশে থাকে, পূজার সময় সবগুলি জড় হয়—তা ব'লে আমি কি দেশ ছেড়ে যেতে পারি!

আমি। বলতে নেই দিদি, বেঁচেবর্ত্তে থাক্,—তোমার হ'ল পাঁচটি, দুটি বা এখানে, দুটি বা বিদেশে, তোমার সঙ্গে কি আমার তুলনা! আমি কি নিয়ে থাকবো?

দিদি। তা বোন, যা বল, তোমার আর বিদেশে থাকা ভাল দেখায় না। আমার কালীকান্তের এখানে খুব নামডাক, মস্ত বড় হৌসের মুচ্ছুদ্দি, সে কি আর তোর ছেলের একটু চাকরী ক'রে দিতে পারবে না। তার সদাগরী আপিসেই কত লোক খাটছে।

আমি। তা দিদি, এই ত তোমাদের কাছে এসেছি, যা ভাল বিবেচনা হয়, তোমরা করবে, তার আর কি। এখন এই চাবিটা যদি কাউকে দিয়ে ছেলের কাছে পাঠিয়ে দাও, সে স্নান ক'রে কাপড় বের করতে পাবে না।

দিদি। তোর ছেলে কি আর আমার বাড়ী একখানা কাপড় পাবে না যে, বাসী কাপড় ছাড়ে? বিন্দি, ও বিন্দি, যা—সরকারকে বলে আয়, আমার বোন্‌পোকে একখানা ভাল ঢাকাই কাপড় বার ক'রে দিগ্, আর কলের ঘর দেখিয়ে দিতে বলিস্।

আমি। দিদি, আর এই চাবিটেও নিয়ে যেতে বল, তার জামাটামা সবই বন্ধ আছে ত।

দিদি। থাক্ থাক্, চাবি থাক্; ওরে, জামা বার ক'রে দিতেও বলিস। জানিস্ ভুব্‌নি, আমাদের ঘরে জামাকাপড় সকল রকম মজুত রাখতে হয়। দিনরাত কুটুমসাক্ষাৎ যাওয়া-আসা করছেই। আইবুড় ভাত, সাধ, ছেলের বে, মেয়ের বে, নানান কাজে বারো মাস কাপড়চোপড় দরকার। ছেলেরা আমার যা রোজকার করে, মেয়ে পার করতে আর লোকলৌকতা করতে তার অৰ্দ্ধেক যায়। কালীকান্ত হ'ল সদাগরী আপিসের বড়বাবু, লালপেড়ে শাড়ী দিয়ে ত আইবুড় ভাত সারতে পারে না। ঢাকাই আর বেনারসী বই কথাটি কইবার জো নেই।

আমি। দিদি, আমার ছোট তোরঙ্গটা কাউকে এনে দিতে বল না, আমি স্নান ক'রে ফেলি, কাপড় বার করব।

দিদি। তুই অমন পর হয়েছিস কেন লো? পুঁটি, দে ত আমার ভাল গরদখানা এনে, ভুব্‌নি কাপড় ছাড়ুক—দে, আমার গামছাখানা দে—

পুঁটি। ঠাকুরমার আপনার বোন কি না, তাই—নইলে ঠাকুরমা এমন নন, সাত জন্মে নিজের গামছা কাকেও ছুঁতে দেন না।

দিদি। ওলো, কত ভাগ্যি করলে তবে বোনের দেখা পাওয়া যায়, কথায় বলে যে, রাজায় রাজায় দেখা হয় ত বোনে বোনে দেখা হয় না।

আমি। দিদি, ছেলেটার যদি স্নান হয়ে থাকে, তবে তাকে একটু সরবৎ যদি পাঠিয়ে দাও।

দিদি। কি, সরবৎ? তাই ত, সরবৎ, তা দে ত রে, সরবৎ দে না। সরবৎ কি লা?

আমি। অন্য কিছুর সরবৎ নয়, মিছরি যদি ভিজোন থাকে, তাই দাও, না থাকে ত দোবরাচিনি ভিজিয়ে দিতে বল।

দিদি। ওঃ, তাই বল্, মিছরির পানা! হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ—ভুব্নি, তুই একেবারে খোট্টা হয়ে গেছিস, মিছরির পানাকে কি বল্লি, সবেৎ না কি! হাঃ হাঃ!

বিন্দি। কি মাঠাকরুণ, কি গা, কি হয়েছে?

দিদি। এই তোর মাসিমা লো, মিছরির পানাকে বলে সবেৎ। আমি ও খোট্টামোট্টা কথা বুঝতে পারি না, বলি সে আবার কি সামগ্রী যে, আমার ঘরে নাই। জানিস ভুব্নি, রোজ আমার পাঁচ সের ক'রে মিছরির খরচ—কেউ পানা খাচ্ছেন, কেউ মাখম দিয়ে খাচ্ছেন, কেউ দুধে খাচ্ছেন, ছেলেগুলোর হাতে এক ডেলা ক'রে আছেই; মিছরির পানার ভাবনা কি। বিন্দি, আমার বোনপোর নাওয়া হ'লে মিছরি-ভিজে দিস।

এমন সময় "স্কুলের বেলা হ'ল, ভাত দাও, ভাত দাও" বলিতে বলিতে ৮।১০ বৎসরের বালক হইতে ২০।২৫ বৎসরের যুবক পর্য্যন্ত এদিক্ ওদিক্ হইতে দালানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন দিদি তাহাদের কাহাকেও "তোর মাসিমাকে প্রণাম কর্," কাহাকেও "তোর ছোট-ঠাকুরমাকে প্রণাম কর্," কাহাকে "ছোট দিদিমাকে প্রণাম কর্" বলিতে লাগিলেন। তাহারা সকলে একে একে প্রণাম করিল। দিদি তখন "এই আমার ন ছেলে শ্যামকান্ত, এইটি আমার ছোট ছেলে হরকান্ত, এর বে হয় নি, ঢের বড় বড় ঘরে সম্বন্ধ আসছে, তা ওর এখন এক্‌জামিনের পড়া, তাই আমি বলেছি, পাস না হ'লে বে দেব না। এইটি বড় নাতি, বরানগরে ঘোষেদের বাড়ী এই ও-বছর বে হয়েছে, তারা খুব বড় মানুষ, তত্ত্ব যে করে, বাড়ী পুরে যায়। ওটি মেজ মেয়ের ছেলে, খুব লেখাপড়া শিখেছে" ইত্যাদি সকলের পরিচয় দিলেন। এমন সময় আস্তেব্যস্তে একটি চাকরের প্রবেশ—"ওগো, বাবু

আসছেন, ভাত দাও, ভাত দাও।” যত বৌ ঝি এতক্ষণ আমাকে ঘিরিয়া ছিল, শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। কেহ বলিল, “ও মা, পান সাজা হয় নি যে।” কেহ কহিল, “বৌ, শীঘ্র যাও, বাবার ফল ছাড়ান হয় নি।” নিমেষের মধ্যে কে কোথায় সরিয়া গেল। এমন সময় দিদির বড় ছেলে কালীকান্ত আসিলেন, আসিয়া “মা, বেলা হয়েছে, ভাত দাও, ইনি মাসিমা বুঝি,” নত হইয়া প্রণাম করিয়া “তা পথে কোন কষ্ট হয় নি ত, গণেশ কোথায়, জলটল্ খাওয়া হয়েছে ত” বলিতে বলিতে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি দোতলায় উঠিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন, “রামা, রামা, আজ আমি আপিস থেকে অমনি ঢাকায় যাব। তুই আমার চার দিনের মতন কাপড়চোপড় সব গুছিয়ে নিয়ে ষ্টেশনে যাস।” দিদিও দোতলায় চলিয়া গেলেন। রাণী একখানি শাদা পাথরের রেকাবিতে নানাবিধ ফল লইয়া এবং একটি ঘোমটা-দেওয়া বধূ একখানি রূপার রেকাবিতে মিষ্টান্ন ও রূপার বাটীতে দুগ্ধ লইয়া দোতলায় যাইতেছিল—যাইতে যাইতে রাণী বলিল, “বসুন মাসিমা, আমি আসছি, এই সময়, স্কুল-আপিসের বেলায় আমাদের বড় ঝঞ্ঝাট পড়ে, দাদার খাওয়া হ'লেই আমরা এ বেলার মত নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। কান্থ, তুই ভাই ছোট ছেলেদের খাইয়ে দে। বড় বৌ, তুমি ভাই শ্যামকান্ত হরকান্তদের খাওয়াটা দেখো।” রাণী দিদির জ্যেষ্ঠা কন্যা, নিঃসন্তান ও বিধবা, অধিক সময় পিত্রালয়েই বাস করে, ভ্রাতাদের লইয়াই তাহার ঘরসংসার, তাহাদের সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী। দেখিলাম, রূপার থালায় ভাত লইয়া ব্রাহ্মণ দোতলায় গেল। বুঝিলাম—কালীকান্তের। দেখিলাম, বড় ছেলেরা একটি ঘরে ভাত খাইতে বসিয়াছে। তাহারা বড় বড় পীড়িতে বসিয়া কাঁসার থালায় ভাত খাইতেছে, বড় বৌ তাহাদের সম্মুখে বসিয়া গল্প করিতেছে, আমাকে দেখিয়া তাহাদের হাসিগল্প থামিয়া গেল, বড় বৌ একটু ঘোমটা টানিয়া দিল। সকলকে একটু সঙ্কুচিত দেখিয়া আমি পাশের ঘরে গেলাম। সে ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা আহার করিতেছে, কান্থ এক পাশে দাঁড়াইয়া বকাবকি করিতেছে, ব্রাহ্মণ পরিবেষণ করিতেছে, তাহাদের ভোজনপাত্র কলার পাতা—মাটিতে যে যাহার ইচ্ছামত কেহ আধশোয়া ভাবে, কেহ পা ছড়াইয়া, কেহ উপুড় হইয়া ভাত খাইতেছে। পরিবেষণটা এই রকম—

পাচক। হাত সরাও না বাবু, ভাত দিই।

একটি বালক। (দুই হাত কলাপাতায় রাখিয়া) দাও না।

পাচক। দেখ দেখি, গরম ভাত কি হাতের উপর দিব, হাত সরাও না।

বালক। তুমি দা—আ—আ—আ—ও—না।

পাচক। কি জ্বালা, থাক তুমি, আমি যামিনীবাবুকে দিই।

যামিনীবাবু কাত হইয়া শুইয়া মাছভাজা খাইতেছিলেন, যেমন ভাত দিতে গেল, অমনি উচ্ছিষ্ট হাতখানা বাড়াইয়া দিল। পাচক "বাপ রে" বলিয়া সরিয়া আর একটির পাতে ভাত দিল। সে বালকটি "আমি আর ভাত খাব না, লুচি খাব, তুমি কেন আমার পাতে ভাত দিলে" বলিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

কানু। বামনঠাকুর, তুমি যা দেবার, তা দিয়ে যাও, ওরা খেতে হয় খাগ্, না খেতে হয় না খাগ্। স্কুলের বেলা হয়েছে, আসছে নদাদা, কান ছিঁড়ে দেবে এখন।

ইতিমধ্যে বালকেরা আমাকে দেখিতে পাইয়া আর গোলযোগ করিল না, শিষ্ট শান্ত হইয়া ভাত খাইতে লাগিল। কানু আমার সহিত দুই একটি কথা কহিতে লাগিল। পাচক কহিল, "আর বাবুদের কি চাই গো"—কেহ উত্তর দিল না।

পাচক। ওগো রাধুবাবু, তুমি আজ খাবে না?

রাধুবাবু। আমি বাবার পাতে খাব।

পাচক। রাধুবাবু সেয়ানা আছে। বাবুমশায়ের পাতে ভাল ভাল খাবার আছে কি না জানে, তাই এখানে খাবে না।

বড় বড় ছেলেদের আহার শেষ হইল। শ্যামকান্ত আসিয়া "কি রে, তোদের খাওয়া হয়েছে?" সকলে একবাক্যে "হ্যাঁ হয়েছে" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখনও তাহাদের সম্পূর্ণ আহার হয় নাই। কেহ চিংড়িমাছের মাথাটা চিবাইতেছে, কাহারও হাতে এক গ্রাস ভাত, কেহ লুচিতে কামড় দিতেছে, কেহ দুধের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে চলিয়াছে, পেটময় দুধ গড়াইতেছে। রাণী আসিয়া ডাকিল, "মাসিমা, দাদা আপনাকে ডাকছেন।" আমি তাহার সহিত দোতলায় গেলাম, কালীকান্তের আহার প্রায় শেষ হইয়াছে, তিনি রূপার ডাবরটিতে হাত ধুইয়া ফল খাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পাশে একটি ছোট ডাবর ও রূপার ঘটিতে জল ও একখানি গামছাও রহিয়াছে। সম্মুখে দিদি, সেই বিন্দি দাসী পিছনে পাখা হাতে দাঁড়াইয়া

আশপাশে মেয়েরা এবং কালীকান্তের পুত্রবধূ। তাহাদের প্রত্যেকেরই কোলে একটি করিয়া শিশু। কালীকান্ত বলিলেন, "মাসিমা, আজ আপনার সঙ্গে ভাল ক'রে দেখাসাক্ষাৎ হ'ল না, আমায় এখনি আপিসে বাহির হ'তে হবে, সেখান থেকে অম্‌নি অম্‌নি ঢাকায় চ'লে যাব, তিন চার দিন পরেই ফিরবো। তা মাসিমা, কত দিনের জন্য এসেছ গা?" আমি বলিলাম, "গণেশের ছ মাসের ছুটি, তা হ'লে ছ মাস আমিও আছি।" শুনিয়া কালীকান্ত বলিলেন, "মা, গণেশের জলটল খাওয়া হয়েছে ত?"

দিদি। হ্যাঁ, তা—তা—হয়েছে বই কি—ও রাণি, জলখাবার দিয়েছিস?

রাণী। আমি ত সব গুছিয়ে রেখে এসেছি, দেখি গিয়ে, পাঠানো হ'ল কি না!

কালীকান্ত। ওরে, বিজয়কে ডেকে দে ত।

বলিতে বলিতে তিনি উঠিলেন। রাধু ছিল পাশে দাঁড়াইয়া, কত ক্ষণে বাবা উঠিবে, বাবা উঠিতেই ছেলে একেবারে চিলের মত ছোঁ মারিয়া বাবার উচ্ছিষ্টের উপর পড়িল; আর একটি তাহারই সমবয়স্ক বালক, সেও অপেক্ষা করিতেছিল, যথাসময়ে ছোঁ মারিতে ভুলিল না। তখন এক হাতে চুলোচুলি, এক হাতে আহার চলিতে লাগিল। রাণী কিছু অপ্রতিভভাবে বলিল, "ছেলেগুলো যেন বাঁদর, কি করে দেখ—যেন খেতে পায় না।" আচমনশেষে কালীকান্ত হাত মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "ছোট মাসি, আমিও ছেলেবেলা বড় দুরন্ত ছিলাম, না? তোমাকেও দু-চার ঘা যে না মেরেছি, তা নয়—কিন্তু মেরে মেরে রাণীর হাড় ভেঙে দিতুম। মনে পড়ে ছোট মাসি, সেই আমরা যখন পূজার সময় মামার বাড়ী যেতুম, আঃ, কি আমোদই হ'ত!

দিদি। তা এখনও যাস্ না কেন? দাদা দুঃখে হোক্, সুখে হোক্, পালপার্ব্বণগুলি সব বজায় রেখেছে, পূজার সময় বাপের ভিটেতে না গেলে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। বেশী দিন থাকতে পাই নে, ছেলেরা সব সেই সময় বাড়ী আসে।

আমি। দিদি, তুমি কেন পূজা কর না?

দিদি। কই, তা আর হয় কই, ছেলেদের মত হয় কই! তবে মানসিক ক'রে ব্রত নিয়েছিলুম, চার বছর মা অন্নপূর্ণাকে এনেছি, আমার উদ্‌যাপন হ'য়ে গেছে, এবার রাণীর নামে সঙ্কল্প ক'রে হবে, তার উদ্‌যাপন হ'লে বড় বৌমার

নামে হবে, এমনি ক'রে পর পর সবার নামে সঙ্কল্প ক'রে অন্নপূর্ণাপূজাটি বজায় রাখবো।

কালীকান্ত। ওহো, মা, তোমার বুঝি এই মতলব! আমি বলি, চার বৎসর হ'লেই হয়ে গেল বুঝি, বটে; এ একেবারে মৌরসী পাট্টা নিয়ে ঠাকরুণ এসেছেন।

দিদি। (উদ্দেশে প্রণাম করিয়া) অমন কথা বল্‌তে নেই, অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়েছেন, দশ জনকে দিয়ে খাবি নে! অন্নের জন্য যে কষ্ট পেয়েছি বাবা, তোরা কিছু কিছু তো জানিস। ভুবন ত দেখেছে, এই ভিটেতে দুটুকু ভাঙা ঘর ছিল। বাপের বাড়ী গিয়ে হাত পা মেলে বাঁচতুম। আঁবের সময় যেতুম, আর প্রায় পূজার পর আসতুম। এদানী বড় আর তত দিন একটানা থাকা হ'ত না, ছেলেদের পড়া, তবু দাদা আঁবের সময় গরমীর ছুটিতে একবার, আর পূজার সময় একবার নিয়ে যেতেনই। এখনো ওরা সবাই যায়। কালীকান্তের যাওয়া হয় না।

বিজয় আসিয়া বলিল, "দাদা ডাকছেন।"

কালীকান্ত। হ্যাঁ, দেখ তোমার ছোট পিসিমা এসেছেন, গণেশ এসেছে, তুমি ত আজকাল কলেজে যাচ্ছ না, তুমি সর্ব্বদা তার সঙ্গে থাকবে, একত্রে আহার করবে, কলকাতার সব দেখাবে, শাদা ঘোড়ার গাড়ীখানা তোমাদের ব্যবহারের জন্য রাখবে, অন্য কাজে খাটাবে না—দেখ, যেন কোন বিষয়ে তার কোন কষ্ট না হয়।

বিজয় "যে আজ্ঞে" বলিয়া আমাকে প্রণাম করিল। বিজয় দাদার বড় ছেলে, বড় পিসির বাড়ী থাকিয়া পড়াশুনা করে। কালীকান্ত চলিয়া গেলেন। একে একে ছেলেরা স্কুলে আপিসে যাইতে লাগিল। কেহ হ্যাট্ কোট্ পরিয়াছে, কেহ বা কোট্‌প্যাণ্ট্ পরিয়াছে, কিন্তু মাথা খালি, কেহ বা ধুতির উপর কোট্ পরিয়াছে, কেহ ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়াছে, কেহ চাপকান্ পরিয়াছে। তখন রাণী আমাকে বলিল, "চলুন মাসিমা, ঢের বেলা হয়েছে, স্নান করুন।" রাণী তেল গামছা কাপড় দিল, স্নান আহ্নিকের স্থান দেখাইয়া দিল, দিয়া তাহার মাতা হইতে কন্যা বধূ প্রভৃতি সকলকে জল খাইতে দিল। কেহ ফল, কেহ লুচি, কেহ মিষ্টান্ন, কেহ দুগ্ধ, যাহার যাহা বরাদ্দ দেওয়া হইল। আমাকেও প্রচুর ফল ও মিষ্টান্ন

দেওয়া হইল। আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম, "এত বেলায় এ সকল আর খাব না, তা হ'লে ভাত খেতে পারবো না।"

দিদি। খা খা, ভাত এখন কোথায়, সেই যার নাম তিনটা, আমার পাঁচটার সংসার, এত সকালে ভাত কোথা!

রাণী। বৌমা, তুমি ছেলেদের থালায় থালায় কুচো ছেলেদের খাইয়ে দাও ত মা।

তখন কালীকান্তের পুত্রবধূ সুন্দরী ফুট্‌ফুটে কচি মেয়ে, কুচো ছেলেগুলির অনুসন্ধান করিতে উঠিল। সে একে বৌমানুষ, ঘোমটায় মুখ ঢাকা; ননদিনী ও ছোট দেবরদের যাহাকে পায়, কুচো ধরিতে বলে। তাহারা দাস দাসীদের বলে—ক্রমে একে একে কুচো ধরা পড়িতে লাগিল। কুচো অর্থে ২ বৎসর হইতে ৫।৬ বৎসরের বালক-বালিকা, তাহাদের কাহারও মাথায় টুপি, আর সারা অঙ্গে কোথাও কিছু নাই। যখন ধৃত হইয়া মাতৃ-সন্নিধানে আনীত হইল, তার মা জিজ্ঞাসা করিল, "তোর জামা জুতো মোজা কই?" সে ক্ষণেক মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উত্তর দিল—একটি দাসী আর একটির হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া দিল। "এই নাও গো সেজদিদি তোমার মেয়ে, রকমখানা দেখ একবার—" মেয়েটির মাথায় টুপি হইতে পায়ে জুতা পর্য্যন্ত যেখানে যা আছে, সমস্তই আছে—কেবল সমস্তই ভিজা। শোনা গেল, তিনি জলের কলের নীচে মাথা পাতিয়া বসিয়া জলখেলা করিতেছিলেন। তাহার মা আসিয়া প্রথমে তাহাকে কয়েকটা চড় দিল, পরে ভিজা কাপড় খুলিয়া গা মুছাইয়া ঘাড় ধরিয়া লইয়া গিয়া সেই উচ্ছিষ্ট থালার একটায় বসাইয়া দিল। সে মেয়ে তখন হাঁ করিয়া বিপরীত সুর তুলিয়াছে। আর একটি কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল, কি সমাচার, না দাদা মেরেছে। আর একটি পরিধানের ধুতি হাতে করিয়া পঞ্চম স্বর তুলিয়া আসিল—"কাপড় খুলে গেছে," কেহ বা সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া আসিল। তাহাদের মাতারা মর্ মর্ বলিতেছে, চড় কিল মারিতেছে, পিসি মাসিরা সান্ত্বনা করিয়া কোলে তুলিয়া লইতেছে, একেবারে হৈ হৈ ব্যাপার।

দিদি। তোদের ত বড় স্পর্দ্ধা দেখছি, অমন সব চাঁদপানা ছেলে মেয়ে, মর্ মর্ করিস। ষাট ষাট, ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস।

২।৩টি মেয়ে একত্রে। বাপ্‌ রে, এমন সব বেয়াড়া ছেলে নিয়ে কি কেউ পারে, এই সাজিয়ে গুজিয়ে দিলুম, সব নষ্ট ক'রে এনেছে।

একটি দাসী একটি ছোট ছেলের হাত ধরিয়া আসিতেছে ও বলিতেছে— "ওগো, এই দেখ, রামবাবু সেই মোড়ের উপর খাবারের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, ভাগ্যি আমি মুড়ি কিনতে গেছলুম, তাই দেখতে পেলুম, না হ'লে আজ গাড়ী চাপাই পড়তো, কি, কি হ'ত কে জানে।" তত ক্ষণে রামবাবুর মা কানমলা কিল চড় দিতেছে ও বলিতেছে যে, আর রাস্তায় যাবি—বল্ আর যাবি নে? ছেলে হাঁ করিয়া চক্ষু বুজিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।

দিদি। "যা যা, আর ছেলে শাসাতে হবে না। কান ঝালাপালা ক'রে দিলে। এই নে রামচন্দ্র, এই নে, শশা খা" বলিয়া নিজের ভুক্ত শশা হইতে একখানা শশা ছুঁড়িয়া দিলেন। ছেলে শশা পাইয়া চক্ষু মুছিয়া একখানা কলা চাহিল।

দিদি। "যা যা, ভাত গিলিয়ে দিগে যা, পেটে ভাত পড়লেই সব শান্ত হবে।" কুচো ছেলে ধরার পালা এ-বেলার মত সায় হইল, সকলে ভাত খাইতে গেল।

আমি। দিদি, এই সব ছোট ছোট ছেলেদের কেন দু-একজন দাসীর জিম্মা ক'রে দাও না, তা হ'লে এখানে একজন, ওখানে একজন ক'রে ছুট্‌কে বেড়ায় না। ওরা খেলবে, দাসী চাকরে একটু আগ্‌লাবে, তোমার ত দাসদাসীর অভাব নাই।

দিদি। দাসীগুলো যে বজ্জাত, কথা শোনে না, দাস দাসী ত বিস্তর রয়েছে, সব ঝিউড়ীদের আলাদা একটা ক'রে, সব বৌয়েদের একটা ক'রে, বড় বৌমার দুটো দাসী, সংসারে চার জন দাসী; বাইরে ছয় জন চাকর, দেউড়ীতে তিন জন দরওয়ান, দাস দাসীর অভাব কি? তা বোন, আমি কাউকে দুঃখু দিই নে।

আমি। দাস দাসী আছে ব'লেই বলছি, ছোট ছোট ছেলেগুলি একেলা একেলা ঘোরে, নিতান্ত শিশু, অবুঝ ব'লে অকর্ম্ম করে, আর প্রতি দিন এমন চোরের মার খায়—ওতে যে ওদের স্বভাব ক্রমে মন্দ হয়ে উঠবে।

দিদি। ঈষ্—স্বভাব মন্দ আর হ'তে হয় না। আমার বাড়ীর এমন শাসন না—দেখেছিস তো আমার ছেলেগুলি, এ কলকাতা শহরে আজকের বাজারে এমন হীরের টুক্‌রো ছেলে কার আছে বল্ দেখি।

আমি। (বৃথা তর্ক বুঝিয়া রাণীকে বলিলাম) মা, তুমি জল খেলে না?

রাণী। এই যে খাব এখন, আমার আহ্নিকের একটু বাকি আছে।

আমি। তুমি সবাইকে খাওয়ালে মা, নিজের এখনো আহ্নিক শেষ হয় নি?

রাণী। আমার জন্যে ভাবনা কি, বিধবা মানুষ, যখন হয় একবার খাওয়া।

দিদি। ওর জ্বালায় কি আমার একটু সুখ আছে—ওর জন্যে আমার বুকের ভিতর সদাই মোমবাতির আলো জ্বলছে—এমন দশা হয়ে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্যাগী হয়েছে।

আমি। যাও মা, আহ্নিক করগে।

রাণী পূজায় বসিল—এমন সময় বিজয় আসিয়া বলিল, "ছোট পিসিমা, দাদার তোরঙ্গের চাবিটা দিন তো, দাদা স্নান করতে যাচ্ছেন।" আমি তাহাকে চাবি দিলাম। বাছার এখনো স্নান হয় নাই, বেলা বারোটা হবে, আমার জল খাওয়া পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। আজ জীবনের প্রথম দিন, যে দিন গণেশের স্নানাহারের পূর্ব্বে আমি তৃপ্ত হইয়া বসিয়া আছি।

দিদি। ওরে, গণেশকে ভাত দিতে বল্ না।

বিজয়। তাঁর এখনো স্নান হয় নাই।

দিদি। কেন, এত বেলা পর্য্যন্ত ব'সে আছে কেন? আমার ছেলেরা সবাই ভোরে স্নান করে, ভোরে নাইলে শরীর ভাল থাকে।

বিজয়। ছোট পিসিমার কাছে তোরঙ্গের চাবি, কাপড় বাহির করতে পারেন নাই, ব'সে ব'সে গল্প করছিলেন, স্নান হয় নাই—এখন আমি জানতে পেরে চাবি চাইতে এসেছি।

দিদি। সে কি, আমি তো বিন্দিকে কোন্ সকালে বলেছি সরকারকে কাপড় দিতে ব'লে আসতে? হ্যাঁলো বিন্দি, বলিস্ নি বুঝি?

বিন্দি। ও মা, কেমন কথা কও গা? আমি ত তখনি যায়ে সরকার মশায়কে কয়ে এলাম যে, মায়ের বুনপোরি ঢ্যাকাই কাপড় দাও, তিনি কইল—ঢ্যাকাই কাপড় নাই, আমি কইনু—তা হবেক না, আপুনি দকান থেকে আনা করায়ে দাও। সরকার কইল—বাবুরি পুছ্ করি।

বিজয় চলিয়া গিয়াছে, রাণী আসিয়া একটি সন্দেশ খাইয়া একটু জল খাইল—শুনিল যে, গণেশের স্নানাহার হয় নাই।

রাণী। বিন্দি, তোকে কখন বলেছি যে, গণেশের স্নান হ'ল কি না দেখে এই জলখাবারটি দিয়ে আয়, তা সে যেখানকার সেখানে আছে—তো হ'তে কি কোন কাজ হবে না ?

বিন্দি। না, আমা হ'তে কোন কাজ হবেক কেনে, তোমরা সব এত বড় হ'লে কোথা থেকেক গা ? এত বড়টা করলেক কেটা ? এই বিন্দি না হলি আর হ'ত না।

রাণী। যা যা, তোর মুখখানি খুব আছে, তা জানি ; এখন থাম্, যা—দেখ্, গণেশের স্নান হয়ে থাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আয়। এইখানে জল খাবে।

বিন্দি গজ্ গজ্ করিয়া বকিতে বকিতে চলিল।

তখন রাণী দুইখানি পিঁড়ি পাতিয়া ঠাঁই করিল ও ফল ও মিষ্টান্নসজ্জিত একখানি পাথর পিঁড়ির সম্মুখে রাখিল। বিজয় গণেশকে সঙ্গে করিয়া আসিল।

আমি। গণেশ, এই তোমার দিদি, যার নাম রাণী।

গণেশ প্রণাম করিল।

রাণী। (গণেশের হাত ধরিয়া) এস ভাই, জল খাবে এস, নানা ঝঞ্ঝাটে বেলা হয়ে গেল, কিছু মনে ক'রো না, ছেলেবেলা আমরা সবাই একত্রে মানুষ হয়েছি, মাসিমাও যেন আমাদের ভাই-বোনদেরই একজন। তোমাকে আজ দেখে কি আহ্লাদ হ'ল যে, আহা রূপ দেখ, যেন মহাদেব, বেঁচে থাক ভাই। বিন্দি, বামন ঠাকুরকে বল্—ভাত দিয়ে যাক।

দিদি আসিলেন, গণেশ তখন একটু আধটু ফল খাইতেছে ও কিছু বিজয়কে খাইতে অনুরোধ করিতেছে।

দিদি। ও-সব তুমি খাও। রাণি, বিজয়কে আর একখানা পাথর দে না —ভুবন, তোর ছেলের নাম গণেশ রেখেছিস্ কেন ? কার্ত্তিক রাখতে হয়—আহা, বাছার কি রূপ, যেন ময়ূর-চড়া কার্ত্তিক, বেঁচে থাক্।

রাণী। বিজয়, তোমাকে ফল দেব কি ?

বিজয়। কেন দিদি, আমাকে কেন, আমি কি রোজ খাই, আমি সকালে চা খেয়েছি—এখন ভাত দাও।

গণেশ। আমিই কি রোজ এ-সব খাই ? আমিও সকালে চা খাই—দু-একখানা টোষ্ট রুটি আর ডিম মধ্যে মধ্যে খাই।

দিদি। এখনকার ছেলেদের ঐ সব যে কি মিষ্টি, তা বলতে পারি নে। ফলফুলুরি খাবে, তা না। তবে কি না, সবাই পাবে কোথা? যে মাগ্‌গী ফল—ঐ একটি কমলালেবু ২ পয়সা, ঐ পেঁপেটি ৵০—সব দারুণ মাগ্‌গী!

বিজয়। বুঝেছ পিসিমা, দাদা মুরগির ডিম খান, তা বুঝেছ?

দিদি। উঃ হুঃ হুঃ, ছিঃ ছিঃ! একেবারে যে মোছলমানের ব্যাটা, মা গো, তোরা হলি কি? জাত জন্ম আর রইল না।

বিন্দি। এ বাড়ীতি ও-সব হবেক না বাবা, এ পুণ্যের সংসার, ও-সব ম্লেচ্ছপানা এখানে হবার জো-টি নেই।

দিদি। বিজয়, রুটিওয়ালা বামনকে বলিস্—রোজ একখানা ক'রে রুটি দেবে, আর হাঁসের ডিম এনে দিতে সরকারকে ব'লে দেব এখন।

গণেশ। না না, আমার জন্য ব্যস্ত হবার কিছু মাত্র আবশ্যক নেই, প্রাতে একটু চা পেলেই যথেষ্ট। বিজয়, তুমি ত চা খাও? তবে আর কি, সেই সঙ্গে আমারও হবে।

বিজয়। (হাসিতে হাসিতে মৃদুস্বরে) ভয় কি দাদা? বাহিরে আমাদের সব আসে, কিছুই বাদ যায় না। আমি কাল থেকে আপনার জন্য বন্দোবস্ত ক'রে দিব।

দিদি। বিজে, কি বলছিস্ রে? তুইও তো একটা ম্লেচ্ছ, ঐ সব ছাই-পাঁশ খাস্।

বিজয়। খায় সবাই, ধরা পড়েছে বিজে। কেন না, সে স্বীকার করে কি না, মিথ্যা বলে না, খেয়ে বলে না যে, খাই নাই।

দিদি। বামন ঠাকুর, বড় মুড়োটা আমার বোনপোকে দাও।

গণেশ। আমাকে আর কিছু দেবেন না, এই সব যথেষ্ট আছে, আমি এত খেতে পারবো না।

বামন ঠাকুর। বড় মুড়োটা বড় দাদাবাবুকে যে দিয়েছি—একটি চিংড়ি মাছের মুড়ো আছে, আনবো?

গণেশ। না না, আর কিছু চাই নে।

বিজয়। পিসে মশাই কবে আসবেন পিসিমা?

আমি। সত্যি দিদি, সকলকে দেখছি, জামাইবাবুকে দেখছি নে যে?

দিদি। মিন্‌সের কথা আর বলিস্ নে, রাত দিন মস্করা নিয়েই আছেন। মরতে গেছেন, শ্রীক্ষেত্রে গেছেন—নতুন রেল খুলেছে কি না, তাই পাড়ার

কে কে গেল, তিনিও ছুটলেন। আমায় আবার বলেন কি না যে, তুমিও চল। আমার যাওয়া কি গা সহজ কথা? আমার খরচ কত! গাড়ী রিজাভ হবে, সরকার লোকজন যাবে, পাড়ার মেয়েরা কত জন যেতে চাইবে, তাদের নিয়ে যেতে হবে, সেখান থেকে পেসাদ আনতে হবে, পেসাদ সব কুটুমবাড়ী দিতে হবে, জগন্নাথের থালাই চাই ১০০ খানা, রেকাব চাই ২০০ খানা, চুড়ি চাই এক ঝাঁকা—আমি কাকে ফেলে কাকে দেব? যাকে না দেব, সেই বলবে যে, ওদের গিন্নি শ্রীক্ষেত্রে গেল, একটু পেসাদ দিলে না। আমার বাপের বাড়ীই দশ ঘরকে দিতে হবে। সে বার সাগরে গেলুম, (বলতে নেই) হাজার টাকার কেবল বাসনই এনেছিলুম, তাতেই কি কুলোয়? এত লোককে পেসাদ দিয়েছিলুম যে, তাতে এত কাপড় পেয়েছিলুম—একটা ঘর ভোরে গেছলো, কুটুমরা সবাই চেলি গরদ তসর দিছলো।

বিজয়। তবে ত হাতে হাতেই বাসনের শোধ উঠে গিয়েছিল—তুমি পিসিমা জগন্নাথের বাসন কত চাও বল না—আমি এইখান থেকেই এনে দিচ্ছি—দাও, টাকা দাও। তোমার সে দেশ থেকে ব'য়ে আনবার দরকার কি? যাবে তীর্থ করতে, এত সংসারের ভাবনা ভাব কেন? সেখানে গিয়ে ঘর-সংসার, আত্মপর, ধনি-দরিদ্র, জাতিভেদ ভুলে যাবে, মনকে পবিত্র করবে, বুঝবে যে জগন্নাথের কাছে তুমি আমি, ইতর-ভদ্র, ধনি-দরিদ্র, সবাই সমান, তবে ত পুণ্য হবে। সেখানে গিয়েও যদি বাসন আর কোসন, কুটুম আর সাক্ষাৎ কর, তবে তোমার না যাওয়াই উচিত।

দিদি। তা মান রাখতে হবে ত। ভগবান্ যখন দিয়েছেন, মানুষকে দু হাত তুলে দেব না?

বিজয়। সে ত মনে করলেই দিতে পার। তীর্থ ক'রে এলুম ব'লে ঢাক বাজিয়ে লোক জানিয়ে দেবার দরকার কি?

আমি। দিদি, শ্রীক্ষেত্রেও ত তুমি একবার গিয়েছিলে?

দিদি। হ্যাঁ বলতে নেই—একবার নয়, দু বার দর্শন হয়েছে, আর একটিবার হ'লেই ইহজন্মের কাজ হয়।

আমি। তুমি সবার ছোঁয়া পেসাদ খেলে?

দিদি। না বোন, আমি সকলকে বারণ ক'রে দিয়েছিলুম যে, আমার মুখে কেহ পেসাদ দিতে এস না। দিতে এলে ত না বলবার জো নেই, তাই

আগে থাকতে বারণ ক'রে রেখেছিলুম—ভয়ে আর কেহ আমার মুখে দিতে আসে নাই।

রাণী। মাসিমা, সেখানে গেলে মন এমন পবিত্র হয় যে, ঘৃণা চ'লে যায়। আমি মাসিমা, সকলের হাতে খেয়েছি। তাঁর স্থানে গিয়েও যদি এঁটোর বিচার করবো, তবে আর এ জন্মের কাজ হ'ল কি? আহা, পেসাদ মুখে দিতে যে আমোদ, শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। সকলে এক পাত্রে খাচ্ছি, তুমি আমার মুখে দিলে, আমি তোমার মুখে দিলুম, ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভেদ নাই, এই ত সেখানকার আমোদ—সবাই বিশ্বজননীর সন্তান, আপনার ভাই বোন।

বিজয়। দিদির মনটা ভাল কি না—তাই শ্রীক্ষেত্রের যথার্থ সুখ লাভ ক'রে এসেছেন।

তাহাদের আহার শেষ হইল। গণেশ দিদিকে প্রণাম করিল, দিদি "বেঁচে থাক, রাজা হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহারা বাহিরে চলিয়া গেল।

দিদি। বিজের যেমন বুদ্ধিশুদ্ধি, তেমনি লেখাপড়ায় বেশ—বাপের বংশধর বেঁচে থাকুক, কিন্তু বড় জেটা হয়েছে, আর ঐ সব ছাই ভস্ম খেতে শিখে সাহেবি মেজাজ হয়েছে, ঠাকুর দেবতায় ভক্তি ছেদ্ধা নেই।

বিন্দি। তোমার ভাইপো, কিছু তো কবার জো নাই—নইলে আমি কইয়ে দেতাম, ও-সব এ-বাড়ীতে হবেক নি। কোন দিন উওর সাথে বাড়ীর ছেলেগুলিও খেতে শিখবে।

দিদি। তুই চুপ কর্, তোর সবতাতে কথা কওয়া কেন? ওলো নবদুর্গা, ওলো সুহাসিনী, তোরা এই দু পাতে বোস্ না লো। বেলা ১টা হয়ে গেল, এই বেলা খেয়ে নে, তোদের কোলে কচি ছেলে, যা—নিয়ে যা, ও-ঘরে গিয়ে খা।

আমি। গণেশের খাওয়া বড় অপরিষ্কার, ও-পাতে আর কারো ব'সে কাজ নাই, অপরিষ্কার থালায় খেতে ওদের ঘৃণা করিবে।

দিদি। মেয়েমানুষ, পাতের হাতের কুড়িয়ে খেয়ে মানুষ হবে—তাতে আবার ঘৃণা কি? আশীর্ব্বাদ কর, হাতের নোয়াগাছটা বজায় থাক্, পাঁচ পাতের কুড়িয়েই খায়। ও নতুন ঝি, শকৃড়ি পেড়ে দে যা, ও-বেলার কুটনো হবে।

তখন শক্ড়ি লওয়া হইলে কুটনোর সাজ সেখানে বিস্তার করা হইল। তিন চারিখানি বঁটি পাতিয়া কয়েক জন বসিল। কেহ আলু ছাড়ায়, কেহ বেগুন কোটে, কেহ শাক বাছে—হাতে কাজ, মুখে গল্প।

রাণী। বৌ, এতগুলা চাল্‌তা রয়েছে, এ যে শুকিয়ে যাচ্ছে—অম্বল করতে দাও নাই কেন?

বৌ। (মৃদুস্বরে) কি করব ঠাকুরঝি, চাল্‌তা ভাই কেউ কুটে দিতে চায় না—আমার অবসর হয় না, ছেলেটা কয় দিন বালসেছে—তাই প'ড়ে আছে।

রাণী। কানু, তুই কুটে দিতে পারিস নে?

কানু। রক্ষা কর দিদি, বেগুন যত কুটতে বল কুটবো—চাল্‌তা, কি মোচা, ও-সব আমার দ্বারায় হবে না।

এইরূপে তরকারি কোটা চলিতেছে, উঠানে চার পাঁচ জন ঝি জড় হইয়াছে, রাশীকৃত বাসন, এঁটো কলার পাত, মাছের আঁশ, উনানের ছাই স্তূপাকৃতি হইয়াছে। ঝিদিগের কলরবে কান পাতা যায় না। কেহ ঘস্ ঘস্ করিয়া কড়া মাজিতেছে ও বকিতেছে—বাবা, এত ক'রে কড়া পোড়ান, আমি মাজতেও পারবো না, এ চাকরিও করবো না—গতর থাকলে ঢের চাকরি মিলবে। কালই চ'লে যাব। কেহ ফটাস্ ফটাস্ করিয়া কাপড় কাচিতেছে ও বলিতেছে—বেলা একটা বেজে গেল, এখনো বাসী মুখে জল দিতে পেলাম না। এমন চাকরিতে কাজ নাই, গড় করি বাবা, ইত্যাদি।

এদিকে তরকারি কোটা, পান সাজা, বৈকালে জলযোগের লুচি বেলা প্রভৃতি শেষ হইতে দুইটা বাজিয়া গেল। তখন বধূরা মেয়েরা কেহ শিশুকে দুধ খাওয়াইতে, কেহ ঘুম পাড়াইতে গেল। কেহ পুনরায় ছেলের সন্ধান পাইয়া ঠেঙ্গাইতে লাগিল, কাহাকেও নিজের সহিত ভাত খাওয়াইতে আমন্ত্রণ করিয়া কান্না থামাইল, কেহ নিজেদের জন্য ঠাঁই করিতে গেল, কেহ জলের ঘটি, ঘি, দুধ, নুন, লেবু ইত্যাদির যোগাড়ে ব্যস্ত হইল। কেহ ছেলেদের জলখাবার গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। সমস্ত গুছাইয়া তবে ভাত খাইবে, ভাত খাইয়া কেহ কেহ দু-তিন ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে পাইবে, কেহ তাহাও পাইবে না। দিদি, আমি ও রাণী এবং বড় বৌমা এক ঘরে বসিলাম। আয়োজন প্রচুর, ভাত, তরকারি, লুচি, দই, সন্দেশ, ঘন দুগ্ধ, কলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি। দিদি, এ যে আমার তিন বেলার খাবার। সেখানে আমি আর গণেশ। এক তরকারি ভাত রাঁধি, কিছু ভাতে-টাতে দিই, তাই কে খায়। গণেশ আবার সব দিন মাছ খায় না, আর সব দিন পাওয়াও যায় না। মাংস রোজ পাওয়া যায়, কিন্তু মাছ রোজ পাওয়া যায় না।

দিদি। আহ্নিক করিস কখন ?

আমি। আমি খুব ভোরে উঠে মুখ হাত ধুয়ে, গঙ্গাজল পরশ ক'রে আহ্নিক ক'রে রান্না চড়াই। মা আর পো বই ত নয়, তাই এদানী বামন ছাড়িয়ে দিয়েছি।

দিদি। তুই রাত্রে কি খাস্ ?

আমি। লুচি খাই। গরম গরম ভাজি, মায়ে পোয়ে খাই। গণেশ বড় মাছমাংসভক্ত নয়; যদি কোন দিন খেতে চায়, বিকেলে রেঁধে আগুনের উপর বসিয়ে রাখি। তার পর কাপড় চোপড় ছেড়ে খাবার করি।

দিদি। তবে সকালে ঐ ডিমগুলো খায় কেন ?

আমি। আগে ও-সব খেতো না। একজন নূতন ব্যারিষ্টার বিলেত থেকে এসেছে, তার বাসা আমাদের বাসার কাছে। আমার ছেলের অনেক পঞ্জাবীর সঙ্গে ভাব-সাব আছে, তার মক্কেল-টক্কেল জুটিয়ে দেয়, রোজ সেইখানে চা খেতে যায়, রাত্রেও কোনো দিন খানা-টানা খায়, সেই তার সঙ্গে মিশে হালে খেতে শিখেছে।

দিদি। দেখিস্ যেন মদ খেতে শেখে না, দেখতে পারি নে বিলেত গিয়ে সাহেব হওয়া। আপনারা গোল্লায় গিয়ে আসে, আবার এখানে এসে পরের ছেলে মজায়। আমার ন-ছেলেটা উকীল হয়েছে, আর যত ব্যারিষ্টারের সঙ্গে ভাব। ঐ সব খেতে শিখেছে, লুকিয়ে লুকিয়ে খায়। আর ছোটটা বিলেত যাব ব'লে নেচে বেড়াচ্ছে, বলে—বি. এ.-টা পাস হইলেই একদিন পালিয়ে যাব। জানি নে বোন, কপালে কি আছে বোন্! বলে কি—'মা, যদি আমার বিয়ে দিবি, ইংরাজী-জানা মেয়ে যদি দিস্, তবে কোরব, নইলে তুই যে বড়-বৌ মেজ-বৌয়ের মত গরু ধ'রে বিয়ে দিবি, তা করছি নে।' আমি বলি, 'ইংরাজীওয়ালা মেয়ে আমি কোথা পাব!' তা বলে—তবে 'আমি বিলেত যাব, আর বিবি বিয়ে ক'রে আসবো। শুনে বোন্, গা শিউরে উঠে। এখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে মরতে পারলে বাঁচি। আরে, বোলবো কি ভাই তোকে দুঃখের কথা, ভাইঝিগুনো, ভাগ্নীগুনোকে ধ'রে ধ'রে পড়ায়। সেজ বৌমাকে

ইংরাজী শেখায়। আমি আগে বকতুম, এখন কিছু বলি না। কত্তা বলেন যে, অত হিঁদুয়ানী হিঁদুয়ানী ক'রে মোরো না, ওদের মতে ওদের চলতে যদি না দাও, তবে একেবারে যখন দড়ি ছিঁড়বে, তখন কি করবে? একটি ইংরিজী লেখাপড়া মেয়ে খুঁজছি, তা পাচ্ছি নে। এই সকল ভেবে ভেবেই আমার শরীর আধখানা হয়ে গেছে।

আমি। তা দিদি, ছেলেরা হ'ল বিদ্বান্, বৌ মূর্খ হ'লে মনে ধরবে কেন? তুমি বুঝি মেয়েদের স্কুলে পাঠাও না?

দিদি। না বোন্, ছি—মেয়েগুলো স্কুলে যাওয়া আমার দু চক্ষের বিষ। এখনকার যে দিনকাল পড়েছে, একটু পড়াশুনা জানা না থাকলে বিয়ে হবার জো নেই, তাই বাড়ীতে পণ্ডিত রেখে দিয়েছি, লেখাপড়া করে। ক'নে দেখতে এসেই মিন্সেরা পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করে, যেমন আপনারা সাহেব হচ্ছে, তেমনি ঘরের মেয়েছেলেদের মেম করতে চায়।

আমি। তোমার জামাইরা কি সবাই বিদ্বান্?

দিদি। ও মা, তা আবার নয়? কলকাতার সব সেরা ছেলে খুঁজে খুঁজে জামাই নাত্‌জামাই করেছি, এক এক জন চার পাঁচটা ক'রে পাস।

আমি। তবে দিদি, মেয়ে বিদ্বান্ না হ'লে তাদের মনে ধরবে কেন?

দিদি। তা ব'লে বোন্, মেয়েছেলেদের পড়ার জন্য আর পয়সা খরচ করতে পারি নে, সে পয়সায় তাদের বিয়ের সময় দুখানা গয়না বেশী দিলে বড়মানুষের ঘরে বিয়ে হবে।

আমি। এখনকার বর যদি লেখাপড়া-জানা মেয়ে পসন্দই করে, তবে মেয়েকে লেখাপড়া শেখালে ত কম খরচে হতেও পারে।

দিদি। সে গুড়ে বালি রে ভাই! তুমিও যেমন, পয়সার কাছে কেউ নয়। আজকালের বাজারে মেয়ে রূপসীই হোন্ আর গুণবতীই হোন্, বাপ একছালা টাকা না ঢালতে পারলে তার আর পারাপার নেই। থাক্ থাক্, দশ দিন থাক্, সব জানবি।

এমন সময় 'মা-ঠাকরুণরা কোথায় গো, নিমন্ত্রণ করতে এসেছি,' শুনিয়া সকলেই আগ্রহভরে উঠানের দিকে চাহিলাম। দাসীদের কলরব থামিয়া গেল। দেখিলাম—একটি দাসীর কোলে অলঙ্কারে ও জরির পোষাকে সজ্জিত একটি দুই তিন বৎসরের বালক। একটি বালিকার বয়স অনুমান তের

চৌদ্দ, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার ঝলমল করিতেছে। একটি অবগুণ্ঠনবতী বধূ ঝম্‌ঝম্ করিতে করিতে দাসীর পশ্চাতে আসিতেছে।

একজন দাসী। কোথা থেকে আস্‌ছ গা ?—

দাসী। ওগো, ভবানীপুরেব দাসেদের বাড়ী থেকে আসছি, বড় বাবুর মেজ মেয়ের বিয়ে।

দিদি। ওহো! আমার মেজ দেওরপোর মেয়ের বে। এস এস, এই ঘরে এস।

একজন কয়েকখানি আসন আনিয়া তাহাদের বসিতে দিল।

দিদি। কোথায় বিয়ে হ'ল ?

বালিকা। আমাদেরই কাছাকাছি ঘোষেদের বাড়ী।

দিদি। কি দিতে হবে ?

বালিকা। এক-শ ভরি সোনা, আর নগদ আড়াই হাজার টাকা, (পরে বধূর উপদেশে) খাট, বিছানা, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরার আংটি, ফুলশয্যার রূপার বাসন, এই সব।

দিদি। ছেলেটি কি করে ?

বালিকা। এইবার বি. এ. দিবে।

দিদি। বাপ মা আছে ?

বালিকা। আছে, বাপ উকীল।

দিদি। তা ভাল, বিয়ে কবে ?

দাসী। এই ২৯শে বিয়ে, ২৭শে গায়ে হলুদ। মা-ঠাকরুণ আপনাদের সবাইকে যেতে ব'লে দিয়েছেন। আপনাদের কাজ, কদিনই সেখানে গিয়ে থাকতে হবে, মা-ঠাকরুণ বিস্তর বিস্তর ক'রে ব'লে দিয়েছেন। মা-ঠাকরুণের জ্বর হয়েছে, তাই তিনি আসতে পারলেন না, আপনারা অতি অবিশ্যি ক'রে যাবেন।

দিদি। হ্যাঁ, যাবে বই কি, বৌ ঝি সব যাবে।

দাসী। আপনি যাবেন না ? আপনাকে অনেক ক'রে ব'লে দিয়েছেন, কাল বেলা দশটার মধ্যে গায়ে হলুদ, আপনি গিয়ে হলুদ দিবেন।

দিদি। আমার জ্বর হয়, কিছু খেতে পারি নে, আমি নাই বা গেলুম, তার আর কি, আমার বোন এসেছে বিদেশ থেকে, আমার কি নড়বার জো আছে ?

বালিকা। তাঁরও নেমন্তন্ন, ঠাকুর-মা যে ঢের ক'রে আপনাকে ব'লে দিয়েছেন, আপনি না গেলে কাজকর্ম্ম করবে কে? ঠাকুর-মায়ের জ্বর, আর সবে কাল রাত্তিরে কথা ঠিক হ'ল। আর দিন নেই, কাল ভোরেই গায়ে হলুদ, তাই মাও নিমন্ত্রণ করতে বাহির হ'তে পারলেন না। মেজ কাকী ও আমি এসেছি। বেশী কাউকে বলাও হবে না, কেবল খুব আপনার যাঁরা, তাঁদেরই দু-চার ঘর বলা হচ্ছে।

দাসী। বলবে কোথা থেকে মা, তাঁদের দিতেই বাবুর সব যাবে, তা কুটুমসাক্ষাৎ আনবেই বা কোথা থেকে, আর লোকজনাকেই বা দিবে কি? এই ও-বছর বড়টির দিলেন, এই মেজটির হচ্ছে, আবার আর একটি ঘরে তৈরি, দিলেই হয়। তা মা, বাবুর কি আহার নিদ্রা আছে? যা রোজগার করছেন, মেয়ে পার করতেই যাচ্ছে। ছেলের কি যে হবে, তা ভগবান্ জানেন।

দিদি। ছেলের শ্বশুর ছেলের খোঁজ নেবে, এখন মেয়ের বিয়েতে যেমন দিচ্ছে, তখন ছেলের বিয়েতে তেমনি গুণে নেবে। ছেলেটি না বি. এ. পড়ছে?

দাসী। হ্যাঁ, মা-ঠাকরুণ বলেন যে, ছেলের বিয়ে দাও। দাদাবাবু বলেন যে, আমি এখন বিয়ে দিব না—আর ছেলের বিয়েতে এক পয়সা নেব না। যাই মা, এই প্রথম তোমার বাড়ী এসেছি, এখনো চার পাঁচ বাড়ী যেতে হবে। আপনারা তা হ'লে কাল সকালে এখান থেকে গাড়ী ক'রে যাবেন। পেন্নাম হই, আসি।

দিদি। ওরে, জল খাবার দে, জল খাবার দে।

বালিকা। আমরা ভাত খেয়েই আসছি, আর ঘুরতে হবে, আমরা খেতে পারব না।

দিদি। তা কি হয়, তা হবে না, একটু মিষ্টিমুখ কর। দে, এইখানেই খাবার দে।

তিনটি পাত্রে মিষ্টান্ন আসিল, দাসীকেও বাহিরে দালানে দেওয়া হইল।

বধূ। (বালিকার প্রতি মৃদুস্বরে) এত কি হবে, এক পাত্র হ'তে আমরা একটু একটু তুলে নিয়ে খাই।

দিদি। তা হবে না, ভাল ক'রে খাও।

বালিকা। আমরা খেতে পারব না।

দিদি। কেন লো, বড়মানুষের স্ত্রী ব'লে কি এত গুমর।

বালিকা ও বধূ কিছু খাইল—ছেলেও ছাড়িল না, রসগোল্লা হাতে করিয়া প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া মুখে পুরিল। রস গড়াইয়া হাতে ও জরির পোষাকে পড়িল, ঝি "হাঁ হাঁ, পোষাক গেল" করিয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল, ছেলে কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতে কাশি উঠিল, কাশিতে কাশিতে দুধ তুলিয়া পোষাক ভাসাইয়া দিল। ঝি তখন বকিতে বকিতে পোষাক খুলিয়া দিল। ছেলের মা ছেলেকে এক চড় বসাইয়া দিল। ভেলভেটের ইজের কারচোপের কাজ-করা কোট, জরির টুপি খুলিয়া যথাসাধ্য পরিষ্কার ও শিশুর কচি নধর দেহখানি অনাবৃত করিয়া সকলে প্রস্থান করিল। ঝিয়ের খাবার দালানেই পড়িয়া রহিল।

আমাদের আহার শেষ হইয়াছে, কাপড় ছাড়িয়া সকলে একটি ঘরে জমায়েৎ হইলাম। কেহ আঁচল পাতিয়া শুইল, কেহ পা ছড়াইয়া বসিল, কেহ চুল বাঁধিতে লাগিল, কেহ বাঁধিয়া দিতে লাগিল। কেহ অপেক্ষা করিতে লাগিল, উহার বাঁধা হইলে সে বাঁধিবে। দিদি পাকা চুল তুলাইতে তুলাইতে বলিলেন—দেখেছিস রাণি, বৌয়ের শিকলি-চুড়ির গড়ন দেখেছিস, ঢ্যাপা ঢ্যাপা—

রাণী। কিন্তু মা, বেলওয়ারি ক-গাছির চমৎকার গড়ন।

আমি। দিদি, বাড়ীর বৌ কেন নিমন্ত্রণ করিতে আসিল?

দিদি। আজকাল ঐ রকমই নিয়ম হয়েছে। রাণি, আমার মেজ জায়ের আক্কেল দেখেছিস, একটা পুঁটে বৌ দিয়ে কি না আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। আমি ত যাব না, তুই কাল সেজ বৌমাকে নিয়ে যাস। কালই চ'লে আসিস।

রাণী। মেজ কাকীর যে জ্বর হয়েছে মা, তাই জন্য আসতে পারেন নাই—দেখলে না, কত ক'রে ব'লে দিয়েছেন।

দিদি। বড় বৌকে ত পাঠাতে পারতো, বেটার বড় চাকরি হয়েছে কি না, তাই বড় গুমর হয়েছে।

রাণী। না মা, মেজ কাকী তেমন মানুষই নন—বিশেষ আমাদের কত ভালবাসেন—কি করবেন, দায়ে পড়েছেন। তা মা, তুমি যাবে না কেন? ও ত তোমার কুটুমবাড়ী নয়, এ বাড়ী ও সে বাড়ী আমাদের তো একই

বলতে হবে। আমিই বা কেমন ক'রে কাল নিমন্ত্রিতের মত যাব, আর চ'লে আসব, তাই ভাবছি।

দিদি। তা দেখি, সে তখন যা হয় কাল হবে।

আমি। দিদি, গণেশের একটি বিয়ের সম্বন্ধ কর না। মেয়েটি সুশ্রী হয়, একটু লেখাপড়াও জানে, আর ভদ্রঘরের মেয়ে হয়। তোমার জানাশুনা মেয়ে হ'লেই ভাল হয়, শিষ্ট শান্ত হবে। আমার সব গহনাই আছে, সেই সব থেকে কতক রং করিয়ে, কতক ভেঙ্গে চুরে গড়িয়ে দিলেই হবে।

দিদি। মরণ! তুই কেন গহনা দিতে যাবি, তারাই সব গহনা দিবে, তুই কেবল বালাজোড়াটি দিবি। তারা মেয়েকে গা সাজিয়ে গহনা দেবে, আর নগদ টাকা যা দেবে, তাতেই বিয়ের খরচ হবে, তোর কিছু লাগবে না। তোর চাক্‌রে ছেলেও গুণে পাঁচ হাজার আনবে। তবে কি না, আমার পরামর্শ শোন্, কলকাতায় একখানি বাড়ী কর্—কলকাতার পয়সাওয়ালা লোকে বিদেশে মেয়ে দিতে চায় না।

আমি। আমি এই ২৫ বৎসর দেশে ছিলুম না, এর মধ্যে এত পরিবর্ত্তন হয়েছে যে, আমি যা দেখছি, সবই নতুন লাগছে। আমার বৌকে সাজাবার ভার ত আমার; তাবা কন্যাদান করবে, পারলে দু-চারখানা দেবে, না পারলে নোলক মাকড়ি আর মল দিয়ে দান করবে—সোনা রূপা কিছু দিতে হয়, তাই ঐ নিয়ম ছিল। আর ছেলেকে নগদ টাকা কেন দেবে! দিতে পারে—খাট বিছানা রূপার বাসন দান দিবে, না পারে—কাঁসা পিতলের দান দিবে। কি জানি, আজকালের কি নিয়ম হয়েছে! আবার দেখ, সেকালে ত বাড়ীর বৌ কখনও কারও বাড়ী নিমন্ত্রণ করতে যেত না, গিন্নির যাওয়া ত দূরেব কথা। মেয়েদের নিমন্ত্রণ করতে ছোট মেয়েরা যেত। তার পর কাজের দিন বাড়ী বাড়ী পালকি গিয়ে তাদের নিয়ে আসতো, দিয়ে আসতো।

দিদি। সে সব এখন উঠে গেছে, এখন বাড়ীর গিন্নি, বড় বড় বৌ ঝি, এরাই নিমন্ত্রণ করতে বেরোয়। তার পর নেমন্তন্নেবা আপনারা গাড়ী পালকি ক'রে আনে, যজ্ঞিবাড়ী থেকে যাবার আসবাব ভাড়া দিয়ে দেয়।

আমি। এক হিসেবে সুবিধা বটে, যে যার সুবিধামত সময়ে আসে আর চ'লে যায়—পালকি ধ'রে টানাটানি করতে হয় না। কিন্তু এদিকে

তেমনি কর্ম্মকর্ত্তার গাড়ী পালকি নগদ টাকা দিতে হয়। ভাড়া দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।

বিজয় আসিয়া বলিল—পিসিমা, দাদা আপনার সঙ্গে দেখা করবেন, একবার উঠে আস্থন।

আমি। দিদিকে তুমি তুমি ব'লে কথা কও আর আমাকে যে বড় আপনি বলছ ?

বিজয় হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ নতুন, তা তা—

বিজয়ের সহিত বাহির-বাড়ীর দিকের একটি ঘরে গিয়া গণেশের দেখা পাইলাম।

রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই—গণেশ এখনও আমার কাছে শোয়, তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে গল্প করিতে করিতে ও বাতাস করিতে করিতে আমি ঘুমাইয়া পড়ি। বাতাস করিতে করিতে এক একবার পাখাখানা তাহার মুখের উপর পড়িয়া যায়, সে আস্তে আস্তে আমার হাত হইতে পাখাটি লইয়া আমাকে বাতাস করে; তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া আমি আবার তাহার হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লই। আজ সে আমার কাছে শোয় নাই—আমি দিদির কাছে শুইয়াছি, অনভ্যাস—কাজেই ভাল ঘুম হয় নাই। ভোরে তন্দ্রা আসিয়াছে—এমন সময় নহবতের বাঁশীর স্বরে জাগিয়া উঠিলাম। দিদির বাড়ীর নিকটে একটি কালীর মন্দির আছে, সেখানে চারি প্রহরে নহবৎ বাজে। মঙ্গল আরতি, পূজা, ভোগ, সন্ধ্যা আরতি, শীতল প্রভৃতির শাঁখ-ঘণ্টার বাদ্য সর্ব্বদাই দিদির বাড়ী হইতে শুনা যায়। এমন কি, ধূপ ধুনা ও ফুলের গন্ধটি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। পালপার্ব্বণে যাত্রা, গান ও সমারোহ হয়, তাও দিদিরা দেখিতে শুনিতে পান। বিখ্যাত চাটুয্যেদের কালীপূজা অর্চ্চনা ও উৎসব প্রভৃতির খরচ-পত্রের জন্য বিস্তর টাকা আয়ের সম্পত্তি দেবোত্তর আছে। দেবী অনেক দিনের প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু যিনি এখনকার কর্ত্তা, তিনি বড় ভক্ত। তাঁর আমলে অতিথিসেবা, যাত্রা, গান প্রভৃতি সমারোহ বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি খুব ধনী, তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি স্বোপার্জ্জিত, আজকাল বিষয়কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া ভগবানে মন নিবিষ্ট করিয়াছেন; তিনি প্রতি দিন প্রাতে আর সন্ধ্যায় কালীমন্দিরের রকে তিন চার ঘণ্টা বসিয়া থাকেন, সেইখানেই

সন্ধ্যাবন্দনাদি করেন, গান শোনেন। তিনি যখন "মা গো কালী" বলিয়া জোড়হাতে প্রণাম করেন, তখন তাঁহার গদগদ ভাব দেখিয়া চোখে জল আসে।—

দিদি। (জাগিয়া উঠিয়া হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া) কালী কালী, তারা তারা, দুর্গা দুর্গা, হরি, পার কর।—কই রে ভুবন, কই দিদি, আয় কাছে আয়। রাত্রে সারা রাত তোর সঙ্গে গল্প করবো ব'লে তোকে নিয়ে কাছে ক'রে শুলুম, কথা কইতে কইতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি ভাই, তা জানতেও পারি নি। সারা দিন খাটুনি, ছেলেপিলের ধকল, তাই যেমন রাত্রে শুই, অমনি ঘুম আসে। এখনও ফরসা হয় নি, আয় কাছে আয়।

তখন একটি পাখীর অস্ফুট স্বর শোনা যাইতেছিল, মৃদু মৃদু শীতল বাতাস বহিতেছিল; আমি কাছে সরিয়া গেলাম, দিদি সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন।

দিদি। এমন কপাল করেছিলি দাদা, সংসারের কিছু ভোগে এল না। আহা, কি নরম তোর গা, ঠিক তেমনি আছে। ছেলেবেলা তুই ননির পুতুলের মত ছিলি, শত্রু ফিরে চাইত, ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধের সময় সাত গাঁয়ের পণ্ডিত জড় হয়েছিলেন; যিনি তোকে দেখেছিলেন, তিনি বলেছিলেন—এমন সুলক্ষণা কন্যা কখনও দেখি নি। তোর এমন দশা হ'তে আমাদের দেশের টোলের বড় পণ্ডিত মশাই বলেছিলেন যে—কলিকালে শাস্ত্র মিথ্যা, নইলে ভুবনেশ্বরীর মতন সুলক্ষণা মেয়ে বিধবা হয়? তাঁর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়তে লাগলো।

আমি। আমি যে বড় পণ্ডিত মশাইয়ের জন্য নিত্য নিয়মিত সকালে তুলসীপাতা, ফুল, বিল্বপত্র সংগ্রহ ক'রে গিয়ে দিয়ে আসতুম। তিনি প্রতি দিন আশীর্ব্বাদ করতেন—মহাদেবের মত পতি লাভ কর।

দিদি। তিনি মাশয় ব্যক্তি, তাঁর আশীর্ব্বাদ ত সফল হয়েছিল বোন—রূপে গুণে এমন সোয়ামী কি কেউ পায়। তা তোমার কপালে রইল না, তা কি হবে। ছেলেও হয়েছে তেমনি সোনার চাঁদ—প্রাতঃবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, বেঁচে থাক, সকল দুঃখু নিবারণ হোক, মনেব আগুন নিবন্ত থাক্।

(আমার হাত ধরিয়া টিপিতে টিপিতে) কি নরম হাত—কে বলবে যে, এ হাতে হাতা বেড়ি ধ'রে কাজ করে। দেখ্ দাদা, তোদের ভাবনায় আমার চার কালটাই দুঃখে কাটলো। ছেলেবেলা পয়সার কষ্ট, ছেলেগুলিকে

পেট ভ'রে খেতে দিতে পারি নি, তার পর যদি বা সুসন্তান গর্ভে ধ'রে সে কষ্ট দূর হ'ল, তা মেয়েগুলোর জন্যে বুড়ো বয়সে জ্বলে মলুম।

আমি। কেন দিদি, তোমার জামাইরা ত সবাই বিদ্বান্, আর খুব বড় ঘরে না মেয়েদের বিয়ে দিয়েছ ?

দিদি। আর বোন্, অশুভ ক্ষণে তাদের গর্ভে ধরেছি। বড় ঘরে দিলেই বা কি হবে, আর বিদ্বান্ দেখে দিলেই বা কি হবে, কপালের ভিতর যা লেখা আছে, তাই ত হবে। মেয়েটার দশা ত ঐ দেখছিস্, পেটে একটা মেয়েও নেই যে, তাই নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে প্রাণ ধারণ করবে। মেজ মেয়ে শুধু—অমন বড় মানুষের বাড়ী বিয়ে দিলুম—হতভাগা জামাই এমনি মাতাল, সর্ব্বস্ব উড়িয়েছে, ইন্দ্রপুরীর মত বাড়ী ঘুচিয়ে এখন আমাদের একখানা ভাড়াটে বাড়ীতে রয়েছে, সত্ত্ব তাকে গায়ের গহনা বিক্রি ক'রে ক'রে খাওয়ায়,—তাই কি এখনও চৈতন্য হয়েছে—এখনও মাঝে মাঝে তিন চার দিন ধ'রে কোন্ চুলোয় গিয়ে যে ম'রে থাকে, কেউ খোঁজ পায় না। মেয়েটার স্বামিভক্তি দেখলে অবাক্ হবি—একদিন এখানে রাত কাটায় না—তার কষ্ট হবে। হতভাগার মনে কি একটু দয়াও হয় না। কপালে ছিল, তাই ঐ একটি ছেলে হয়েছে, ছেলেটি এইখানেই থাকে, পড়াশুনা করে। সত্ত্ব বলে—মা, ও এইখানেই থাক্, সেখানকার হাওয়া যেন না পায়। ভগবান্ সকল দুঃখু দেন না, তাই বুঝি ছেলে হয়েছে সোনার চাঁদ—বাপের রকম দেখে শুনে বাছা হাসে না, মুখ তুলে কারও সঙ্গে কথা কয় না; এই কচি বয়সে সদাই মলিন মুখ। আমি বিয়ের জন্যে যদি বড় পেড়াপেড়ি করি, তবে বলে—তোমার সব কথা শুনবো দিদিমা, ঐটি ছাড়া—ঘর নেই, বাড়ী নেই, পরের মেয়ে এনে অসুখী করবো কেন ? যদি কখনও মাকে সুখী করতে পারি, তবে ওসব বিষয় ভাববো। অলপ্পেয়ে জামাইটা ম'রে যায় ত আপদ্ যায় !

আমি। আহা থাক্ থাক্, হাতের নোয়াগাছটা থাক্ তবু।

দিদি। ভুবন, তুই জানিস্ না যে সে কি পোড়া, নইলে মা হয়ে কেউ মেয়ে বিধবা হোক, এমন কথা মুখে আনতে পারে ! বড় জ্বালায় বলি রে দিদি ! মেজর ঐ রকম পোড়া—সেজর দশা শোন্—সেজ জামাই মস্ত ডাক্তার। গাড়ী ঘোড়া সুখ ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই। আপনি মস্ত সাহেব, কিন্তু আমার মেয়ের জামাটি গায়ে দেবার হুকুম নেই, গাড়ী

চড়বার হুকুম নেই, কালে ভদ্রে যদি আমার কাছে আসবে ত এক ঘেরাটোপ মোড়া পালকি ক'রে তুই দরোয়ান তুই দাসী দিয়ে পাঠাবে। তারা যমদূতের মত ব'সে থাকবে—"চল চল" ক'রে হাড় জ্বালিয়ে খাবে—একটা যে মনের কথা কইবে, তার পর্য্যন্ত জো নেই। কত্তার কাছে যাবে, দাসীরা সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে আছে। মরুক, আমি না হয় চোখে না দেখলুম, সুখে আছে শুনলেই ত সুখী হই। তা সুখ কোথায়—গলায় বড় বড় মুক্তার মালা পরলেই ত সুখ হয় না, মেয়েমানুষের আসল ভাল হ'লে তবে ত সুখ! তা জামাই মেয়ের দিকে ফিরেও দেখে না—শুনতে পাই নাকি মেম বে করেছে, তার ছেলেপিলেও আছে, রাত্রে সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া, রাত ১।২টার সময় বাড়ী আসে, বাইরেই শোয়, সকালে এক বার ভাত খেতে বাড়ীর ভিতর আসে, তা সে মা গিয়ে ভাত খাওয়ার কাছে বসে; কাজেই বিধু সেখানে যেতেও পায় না। আর যাবেই বা কি করতে? মুখ তুলে ত কথাও কইবে না। শুনেছি, জায়েরা একদিন একদিন বাহিরে বিধুকে শুতে পাঠিয়ে দেয়—তারা সবাই যুক্তি ক'রে বাহিরের ঘরে ব'সে থাকে, দেওর এলে বিধুকে রেখে চ'লে আসে, তা কোন দিন বাছাকে শুতে বলে, কোন দিন তাও বলে না। মনের তুঃখে সে আর এদানী যায়ও না। কত বলবো বোন, আবার কাতুর শাশুড়ী এমন বৌ-কাঁট্‌কি, বৌটাকে পেট ভ'বে খেতে দেয় না—এমন শুচিবাই যে, রোজ কাতুকে দিয়ে বিছানা মশারি পর্য্যন্ত কাচাবে, কড়িকাঠ শুদ্ধ ধোয়াবে—দাসীদের কাজ মনে ধরবে না—জল ঘেঁটে ঘেঁটে মেয়েটার হাতে হাজা ধ'রে গেল। জামাইটি ভাল মানুষ, কিন্তু বড় মুখচোরা, মাকে কিছু বলে না। মাগী না ম'লে আর সুখ নেই; পাঁচ ছেলের মা হ'ল, এখনও শ্বশুরবাড়ী যেতে হ'লে ডাক ছেড়ে কাঁদবে। আমি কত্তার কাছে বকুনি খেয়ে মরি; বলেন,—কেমন, বড় ঘরে কুটুম কর গে!—আপনি পয়সার কষ্ট পেয়েছিলুম, তাই বলি যে, মেয়েদের ধন দেখে দিই, সুখে থাকবে। এখন দেখছি, সুখ কপালে না থাকলে হয় না—মানুষের সাধ্যিতে কিছু হয় না। কোলের মেয়ে তুটোর গৃহস্থঘরে বিয়ে দিয়েছি, চার চার বার ঠেকে আর বড় ঘরে যাই নি ভাই, তা এ জামাই তুটি বশতাপন্ন, কুটুমও ভাল। কালীকান্তর নামডাক শুনে কত বড় বড় ঘরে সম্বন্ধ এসেছিল। তা কত্তা

একেবারে খড়্গহস্ত—ঘটকীরা যদি বড় ঘরের সম্বন্ধের কথা আর বলে, অমনি দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেন। তাঁর এমনি জ্ঞান হয়েছে যে, বড় ঘরে সুখ নেই। আমি বরং বলি—কেন, সবাইকে কি মন্দ হ'তেই হবে? তিনি বলেন,—হোক না হোক, আমার আর খোঁজ কববার দরকার কি? কত্তা আর কিছুতেই কথা কন না—কিন্তু আজকাল মেয়েছেলের বিয়ে নিজের মতে দেন, কারও কথা শোনেন না।

রাণী। মা, আজ উঠবে না? বেলা হয়েছে যে। আবার মেজকাকীমার বাড়ী যেতে হবে—১০টার মধ্যে গায়ে হলুদ, তুমি গিয়ে হলুদ দিবে—ওঠ। আহ্নিক পূজো সেরে নাও।

দিদি। হ্যাঁ উঠি, এই ভুবনের সঙ্গে কথা কইছি; তোর স্নান হয়েছে?

রাণী। হ্যাঁ মা—আমার পূজো আহ্নিক সব সারা হয়ে গেছে। আমি রাত তিনটের সময় উঠেছি, মেজকাকীমার অসুখ—সকাল সকাল সেখানে যাওয়া উচিত। বৌয়েরা ছেলে মানুষ—ছেলেপিলে নিয়ে নাটাপাটা খাবে। মাসিমা ওঠ—মা, মাসিমা যাবেন ত?

দিদি। হ্যাঁ, যাবে বই কি! সে আমার পরের বাড়ী নয়। জানিস্ ভুবন, আমার জা বেশ মানুষ, পর ভাবে না। তাদেরও এই ভিটে, তা এতে সংকুলান হবে না ব'লে তারা বেরিয়ে গিয়ে বাড়ী করেছে; মস্ত বাড়ী। তার ছেলেগুলিও এক একজন এক একটি রত্ন। অহঙ্কার নেই, কেবল মেজাজটা সাহেবি রকমের। চল্ না দেখবি, বাড়ীঘর সব কেমন সাহেবি ধরণে সাজানো। তোকে চুপি চুপি বলি, কাউকে বলিস্ নি। শুনেছি, বৌয়েরা পশ্চিমে কি পাহাড়ে যখন হাওয়া-টাওয়া খেতে যায়, তখন নাকি জুতো মোজা পায়ে দেয়!

রাণী। মা, ওঠ না গা, গল্প এর পর হবে।

দিদি। হ্যাঁ মা, উঠি—আজ আর জপ-টপ কিছুই হয় নাই। কত দিন পরে ভুবনকে পেয়েছি, পেটের কথা ক'য়ে বাঁচলুম। মা বোন নইলে ব্যথা বোঝে কে বাছা? মা ত আর হবে না, জা বোনেরা যত দিন আছে।

আমি। দিদি, তুমি স্নান কর গে যাও, আমি একবার গণেশকে দেখে আসি।

দিদি। যা যা, আহা, ঐ তোর সর্ব্বস্ব ধন, ঐ তোর তপ জপ—যা—যা।

গণেশের ঘরে গিয়া দেখি যে, গণেশ ঘরে নাই, বিছানায় মশারি এখনও ফেলা রহিয়াছে—মশারিটা নেটের, কিন্তু ময়লা ; দরজাটা ফাঁক হইয়া আছে, ভিতরে পাঁচ-সাতটা মশা ঢুকিয়া রহিয়াছে। দেখি, দক্ষিণের ছোট বারান্দাটিতে একখানি চেয়ারে গণেশ বসিয়া গোঁপ পাকাইতেছে, পাশে একটি টি-পাইতে চায়ের পেয়ালা। আমি বুঝিলাম, গণেশ বিলক্ষণ অন্যমনস্ক—জানি, যখন অন্যমনস্ক হয়, তখনই সে তাহার নবীন গোঁপ জোড়াটির উপর আক্রমণ করে। আমি আস্তে আস্তে তাহার চৌকির পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া মস্তক চুম্বন করিলাম।

গণেশ। মা--

আমি। বাবা—

গণেশ। রাত্রে তোমার ঘুম হয়েছিল ?

আমি। না বাবা, তোমাকে ফেলে কি আমার ঘুম হয়!

গণেশ। আমার কাল সারা রাত ঘুম হয় নি। ব'স মা—ব'স, আর একখানা চৌকি আনি।

গণেশ তাড়াতাড়ি উঠিল।

আমি। আরে থাম্ থাম্, আমার জন্য চৌকি আনতে হবে না, আমি এই যে মাটিতে বসছি।

গণেশ। তবে আমিও তোমার কাছে বসি।

গণেশ আসিয়া আমার কোলের কাছে বসিল। বাগানে অসংখ্য চামেলি ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহার সুগন্ধ ঝিরঝিরে বাতাসে বহিয়া আসিয়া বারান্দা ভরিয়া রহিয়াছে।

গণেশ। কাল মা, সারা রাত এই বারান্দায় ব'সে কাটিয়েছি, কিন্তু তখন এমন বাতাসও ছিল না, এমন ফুলের গন্ধও ছিল না, দে না মা—একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দে না।

আমি। (পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে) কেন, কাল ঘুমুস্ নি কেন ? মশা ঢুকেছিল ব'লে বুঝি ? মশারির দরজা হাঁ ক'রে রেখেছিস্, পাঁচ গণ্ডা মশা ঢুকেছে, তা ঘুম হবে কি ?

গণেশ। না মা, মশার জন্যে নয় ; বোধ হয়, তুমি কাছে শোও নি, তাই ঘুম হয় নি। শোবা মাত্রেই ত আর মশা ঢোকে নি।

আমি। আজ যেন আমি তোর কাছে শুই নি ব'লে তোর ঘুম হ'ল না—কাল যখন বৌ আসবে, তখন বৌকে একেলা রেখে তুই কি আমার কাছে ঘুমুতে আস্‌বি না কি ?

গণেশ। (হাসিয়া) বুঝছ না, সে যে বৌ, তখন বৌয়ের কাছে শুয়েই ঘুম আসবে।

আমি। তোর কেবল এখান থেকে পালাবার পন্থা—চা প'ড়ে রয়েছে, খাস্ নি যে ? চা-টুকু খা।

গণেশ। চা, হ্যাঁ প'ড়ে রয়েছে, তাই ত—তুমি এসে পড়লে, আর বাকিটা খেতে ভুলে গেছি—খেয়েছি খানিকটা—থাক্, আর খাব না। হ্যাঁ মা, সেই যে ছেলেবেলা একদিন তুমি কোথা গিয়েছিলে, আর রাত্রে আস নি—সেই আমার ঘুম হয় নি, বাবা কত ঠাট্টা করলেন।

আমি। সে দিন আমি সেই তোর ঠাকুরমার সঙ্গে পূজার সময় কালীবাড়ীতে যাত্রা শুনতে গিয়েছিলুম—তুইও গেছলি, তা উনি তোকে নিয়ে রাত ১২টার সময় চ'লে এলেন, সারা রাত জাগলে তোর অসুখ করবে ব'লে তাঁরও যাত্রা শোনা হ'ল না, আমাতে আর তোর ঠাকুরমাতে সারা রাত রইলুম। আর ভোরের বেলা যেই আমি এসে দাঁড়িয়েছি—আর, "সারা রাত আমার ঘুম হয় নি" ব'লে হাউ হাউ ক'রে ছেলের যে কান্না! আমি আবার তখন কাছে শুই—শুয়ে দুধ দিই, তবে কান্না থামে—তখন ছেলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে বসলো।

গণেশ। তখন আমার বয়স কত মা ?

আমি। তা বিলক্ষণ, ১১ বছর বয়স।

গণেশ। আর কখনও সে দেশে যাত্রা হয় নাই মা ?

আমি। কেন হবে না! কিন্তু আর যেতে পেলুম কই! তার পরের বছর পূজার সময় তিনি গেলেন—তোমার ঠাকুরমা সেই যে শয্যা গ্রহণ করলেন, আর ত উঠলেন না—বছরের ভিতর তিনিও গেলেন—আমাদের সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল। তোমারও খুব অসুখ হয়েছিল—এত বড় ঝড় যে আমার উপর দিয়ে ব'য়ে গেল, আমার কিন্তু এক্ দিন চোখের জল ফেলবার অবসর ছিল না; কি ক'রে তোমাদের বাঁচাব, তাই ভাবতুম। তোমাদের ঠাকুরমাকে রাখতে পারলুম না, তিনি ছেলের কাছে চ'লে গেলেন—ঠাকুরদাদা কত দিন ছিলেন। তোমার

মুখ চেয়েই আমরা দিন যাপন করতুম, আর কোন আনন্দ উৎসব কি নিমন্ত্রণাদিতে যোগ দিতুম কি? আমার যেমন শ্বশুর, তেমনি শাশুড়ী, তেমনি স্বামী, সকলেই সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন; একাদিক্রমে পনর বছর খুব সুখে কাটিয়েছিলুম বাপ—তা এত সুখ সহিবে কেন—পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ সংসারের নিয়ম, আমার অদৃষ্টেই বা কেবল সুখই ঘটবে কেন! এখন সব জ্বালা ভুলে তোকে নিয়ে আছি—জানি নে অদৃষ্টে আরও কি আছে।

বিজয় ও হরকান্ত আসিল, তাহারা পরিষ্কার কাপড় পরিয়াছে, গলায় চাদর, হাতে ছড়ি, মস্ মস্ করিয়া আসিয়া বিজয় বলিল—গণেশদা, বেশ যা হোক—আমি না তোমাকে শীঘ্র স্নান ক'রে নিতে ব'লে গেলুম। মিউনিসিপাল মার্কেটে বাজার করতে যাব—আচ্ছা যা হোক।

গণেশ। (সলজ্জভাবে হাসিয়া) এই যে, মা এলেন কি না তাই একটু গল্প করছিলুম; স্নান করতে আমার পাঁচ মিনিট সময় লাগবে।

বিজয়। চা'টাও যে প'ড়ে রয়েছে দেখছি—তা খাবে কি, ওটা আজ অখাদ্য হয়েছে। হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছিরেকে হাজার বার ব'লে রেখেছি যে, চা ফুরোবার দু-এক দিন আগে আমাকে বলিস্ আমি চা এনে দিব—বেটা ঠিক আজ সকালে চা দেবার সময় এসে বলছে—"চা ত নেই, কি হবে?" ইচ্ছা হ'ল, এক চড় বসিয়ে দিই—ভোরের বেলা সাম্‌লে গেলুম, বললুম, আমি জানি নে কি হবে, তুই শীঘ্র আমার সামনে থেকে স'রে যা। দেখি না হতভাগাটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসছে। তার পর ফের ধমক দিতে এই অপরূপ চা তৈরি ক'রে দিয়ে গেল। যেমন তেত, তেমনি ধোঁয়া গন্ধ—গণেশদা, তোমার পিত্ত জ্বলে গেছে তা বুঝতে পারছি—তা হোক আমরা কলকাতার ছেলে, আমরা শীঘ্রই তোমাকে বশ ক'রে নেব, সে ভরসা আমাদের আছে। এখন ওঠ শীঘ্র, এত বেলায় কি ভাল মাংস পাওয়া যাবে—তোমার জন্যে আজ সব মাটি হ'ল দেখছি!

আমি। (গণেশের চাবি লইয়া) গণেশ, আমি তোর কাপড় বার ক'রে দিচ্ছি, তুই তেল মাখ্।

বিজয়। পিসিমা, গণেশ কি এখনও তোমার দুধের গোপাল আছে না কি? তোমার কাপড় বাহির করতে হবে না, উনি নিজেই সব করবেন এখন।

রাণী। (আসিয়া) মাসিমা, বেলা হয়ে গেল শীঘ্র স্নান করতে যান—আহ্নিক পূজা সারতে হবে—

আমি। বিজয়, তোমরা কখন ফিরবে?

বিজয়। আমাদের ঢের বেলা হবে, আমরা বাজার ক'রে গঙ্গার ধার বেড়িয়ে বাড়ী ফিরবো। দিদি, আজ আমাদের বিকেলের দিকের জল-খাবার রাত্রের ভাত-টাত কিছু করতে দিয়ো না—আমরা আজ নিজেরা বাহিরে রেঁধে বেড়ে খাব। তোমার জগন্নাথের পাণ্ডাঠাকুরের রান্না খেয়ে খেয়ে আমাদের জিব অসার হয়ে গেছে।

রাণী। বাঁচা গেল, তোরা খাবি নে—আমরা আজ ভবানীপুরে যাব। বৌগুলিকে জ্বালিয়ে মারতিস্। আমরা এখন ক'দিনই সেখানে থাকবো।

গণেশ। (করুণ নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া) মা, তুমিও কি সেখানে থাকবে?

আমি। না বাবা।

বিজয়। যদি থাকেন—তোমার কি? তুমি ত জলে পড় নি! পিসিমা, তুমি সচ্ছন্দে সেখানে থাক গে, আমরা তোমার গোপালকে ভুলিয়ে রাখবো এখন, কাঁদবে না।

হরকান্ত। বিজয়দা, আজ আমাদের প্রগ্র্যামটা কি?

বিজয়। এখন বাজারে যাওয়া—মাছ মাংস তরকারি চা রুটি প্রভৃতি কেনা—লেমনেড্ আদি খাওয়া—তার পর একটু ঘুরে বাড়ী এসে ভাত খেয়ে রাঁধতে লেগে যাওয়া যাবে। বিকেলে চপ্ আর কাট্‌লেট ভেজে জলযোগ করা যাবে—রাত্রে পোলাও, রামপাখীর কারি, ইলিসমাছ ভাজা, চাট্‌নি; এই সব হবে।

হরকান্ত। আর কেউ আসবে?

বিজয়। পিসিমার ছোট জামাই দুইটিকে বলেছি, তারা বেশ ভদ্রলোক, গণেশদার সঙ্গে আলাপ হ'লে খুসি হবেন এখন—না, আজ আর কিছু হবে না—চল গণেশদা, তোমার আর স্নান করতে হবে না—এত বেলায় কি আর মাংস পাওয়া যাবে? সব নষ্ট করলে দেখছি।

গণেশ। (তোয়ালে হাতে লইয়া) পাঁচ মিনিট মাত্র সময়, ঘড়ি ধ'রে থাক।

গণেশ ছুটিয়া চলিয়া গেল, মৃদুস্বরে আমাকে বলিয়া গেল—"রাত্রে থাকিস্ নে মা।" আমিও স্নান করতে গেলাম। স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া দেখিলাম, রাণী আমার জন্য জলযোগের আয়োজন করিয়া বসিয়া আছে। আমি এবং রাণী কিছু জলযোগ করিলাম, দিদি সাজসজ্জা করিতে গেলেন।

আমি। রাণী, দিদিকে কিছু খাওয়ালে না যে?

রাণী। মা যে গায়ে হলুদ ছোঁয়াবেন—জল খেয়ে কি হলুদ দিতে আছে?

আমি। তাও সত্যি—আমি ওসব ভুলে গেছি। আজ দশ বৎসর কোন নিমন্ত্রণে যাই নাই, তবে এদানী দুপুর বেলা আলাপী বন্ধুদের বাড়ী কখনও কখনও বেড়াতে যেতুম। তা তাঁরাই বেশী আসতেন।

দিদি আসিলেন—একখানি গরদের শাড়ী পরিয়াছেন, অলঙ্কারের মধ্যে নাকে একটি নথ এবং গলায় একছড়া বড় বড় মুক্তার মালা অতিরিক্ত পরিয়াছেন—বাকি আটপৌরি সবগুলি আছে। কাদুও প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে—সে তাহার ছেলেটি লইয়া যাইবে; তাহার আর আর সন্তানদের সবাইকে বাড়ীতে থাকিতে হইবে জানিতে পারিয়া তাহারা "ও রে, আমি যাব রে" বলিয়া আছাড়-পিছাড় করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বড় মেয়েটি চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে কাদুর কাছে গিয়া বলিল, "মা, আমি যাব।" কাদু বলিল, "তুই ও-বেলায় মামিমার সঙ্গে যাস্।" তা কি সে শোনে—তবু কাঁদিতে লাগিল, কাদু এক চড় বসাইয়া দিল, সে মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। দাসীরা ও বধূরা যত সান্ত্বনা করিতে, কোলে লইতে চেষ্টা করে, তাহারা ততই ধূলায় গড়াগড়ি দেয়।

দিদি। নিয়ে চল না ওদের।

কাদু। একখানা গাড়ীতে ক'জন ধরবে? ভবানীপুর ত হেথা নয়।

দিদি। একখানা সেকেন্ কেলাসের গাড়ী আনতে বল, তা হ'লে ঢের হবে। কেঁদে ম'ল যে।

কাদু মরুক—গাড়ী এসে গেছে, তা ছাড়া আমি ওদের নিয়ে যাব না—মা, তুমি ওদের আদর দিও না, মরুক না কেঁদে। দিন রাত্রি বিরক্ত করছে—এক দণ্ড কারও বাড়ী যাব তাও সুস্থির হয়ে দুটো কথা কইতে পাব

না। তাই কি ঝি-চাকরের কাছে থাকবে? কোথাও গেলে আরও আমাকে জড়াবে। ইনি চোদ্দ বার খাবেন, উনি ঘুমুবেন, উনি বলবেন বাড়ী চল—এসব বেয়াড়া ছেলে মাসিমা, এদের নিয়ে কি লোকালয়ে যাবার জো আছে।

আমি। ওরা ছেলেমানুষ, ওদের দোষ কি, যেমন শেখাবে তেমনি শিখবে। তুমি যদি একেবারেই ওদের একরকম নিমন্ত্রণে না নিয়ে যাও, তা হ'লে কি ওরা যেতে চায়? একদিন নিয়ে যাবে হয়ত, আবার একদিন তোমার খেয়াল হবে নিয়ে যেতে চাইবে না। ওরা ভাবে, বায়না করলেই যেতে পাব।

কাহু। আমার দোষ নয় মাসিমা, সে দোষ আমার শাশুড়ীর—ছেলে যদি একটু কাঁদলো, অমনি "ছেলে কাঁদাচ্ছে" ব'লে অজস্র ব'কে যাবেন, ছেলেরাও মজা পায়। কোথাও যদি যাব, অমনি আগাগোড়া সবগুলিকে সাজিয়ে গুজিয়ে দিবেন, আমি সেখানে ঐ জন্যে নিমন্ত্রণ যেতে চাই নে—তাই কি নিস্তার আছে? যেতেও হবে, এক গা গহনাও পরতে হবে, ছেলেগুলোকেও নিয়ে যেতে হবে। হীরে, মুক্ত, সোনায় তাদের গা ভরিয়ে দিবেন—আর যদি ভেঙ্গে যায়, কি হারিয়ে যায় ত আমার লাঞ্ছনার একশেষ হবে। তিনি গুরুজন, গুরুনিন্দায় অধোগতি হয়, কিন্তু বলবো কি, আমাকে এমন বলা বলেন যে, কাঁদিয়ে ছাড়েন। একটু বিচার ক'রে দেখেন না যে, আমি এত সোনা রূপা হীরে মুক্ত সামলাই কেমন ক'রে! নিজেই ত গহনা কাপড় প'রে ঘোমটা দিয়ে জড়ভরত হয়ে যাই, ওদের কি ক'রে সামলাব? দেখুন না, বারো মাস এক একটার গায়ে না হবে ত হাজার টাকার সোনা পরানো আছে। আপনার জামাই বারণ করেন যে, অত গহনা পরিয়ে রেখো না, কোন্ দিন গহনার জন্যে ছেলে শুদ্ধ যাবে—তা কি তিনি শোনেন?

দিদি। আচ্ছা, না নিস্ না নিবি, তুই ত যাবি, গয়না-টয়না প'রে আয়।

কাহু। এই ত আমার হয়ে গেছে, চল না—আমি ঘরের মেয়ে ঘরে যাব, গহনা আবার কি পরবো—?

দিদি। দু-এক ছড়া মুক্ত গলায় দিয়ে আয়, পাঁচ জন আসবে, অমনি যাবি কি?

কাছু। আজ আ'র নয় মা। আমার আছে সবাই জানে, তখন বিয়ের দিন যদি যাই ত পরবো। দিদি, চল ত ভাই, আমরা না গেলে বাঁদরদের কিচিমিচি থামবে না। বিন্দি, ওদের দেখিস্।

বিন্দি। ও মা, আমি যাব না বুঝি?

কাছু। তুই গেলে ওদের দেখবে কে? তুই আজ থাক্।

রাণী। বিন্দি, তুই তখন বিয়ের দিন যাস্, দিদি। আজ কাছুর ছেলেদের শান্ত ক'রে রাখ্, আহা, তা নইলে ওর যাওয়া হয় না।

বিন্দি অপ্রসন্ন মুখে গজ্ গজ্ করিতে লাগিল, আমরা গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীখানা ছোট—চারি জনেই ঠাসিয়া গেল। কাছুর কোলের ছেলে চার পাঁচ মাসের, তাহার জন্য ঘটিতে করিয়া খানিকটা দুধ ও বাটি ঝিনুক কাঁথা লইয়া এক দাসী চলিয়াছে।

দাসী। আমি কোথা বসবো?

কাছু। তুই পিছনে ব'স্।

দাসী। আমি যেতে চাই নে, পিছনে কি মানুষ ব'সে ছ-কোশ পথ যেতে পারে? মনিবের এমনি বিচারই বটে!

রাণী। আয় আয়, তুই আমার পায়ের কাছে ব'স্। আয় আয়।

দাসী। ওখেনেই বা ব'সি কি ক'রে?

বলিয়া গজ্ গজ্ করিতে করিতে আসিয়া আমাদের পায়ের কাছে বসিল—আমরা পা রাখিতে স্থান পাই না, ঠেসাঠেসিতে গরমে ছেলে কাঁদিতে লাগিল।

দিদি। কাছু, দুধ দে, দুধ দে।

ছেলের গরম লাগিয়াছে, সে দুধ ধরিবে কেন? সে আরও কাঁদিতে লাগিল।

দিদি। গাড়ী চললে থামবে। ওরে, গাড়োয়ানকে হাঁকাতে বল্ না।

গাড়োয়ান। কোথা যেতে হবে?

দিদি। ওলো আহ্লাদি, দরোয়ানকে ডাকিস্ নি?

দাসী। আমি কি জানি? দরোয়ান সঙ্গে যাবে কি চাকর সঙ্গে যাবে, আমি কি জানি—আপনি মরছি—

দিদি। মরণ, রেগেই আছেন। যা না, দেউড়ি থেকে একজন দরোয়ান ডেকে নিয়ে আয় না।

দাসী। আপুনি ত বললেন মা, ঠাসেতে আমার যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতেছে, আমি আবার বার হই কেমন ক'রে ?

দিদি। যা, তোর যেতে হবে না! তুই যা, ছেলেদের দেখিস্, বিন্দিকে পাঠিয়ে দি গে, আর একজন দরোয়ান পাঠিয়ে দি গে। গিয়ে জাবকুটো ক'রে গিলবেন, হাওয়া খেয়ে বেড়াবেন, তা যেন আমার মাথা কিনবেন। যা, তোর যেতে হবে না!

দাসী। না মা, আমি কি যাব না বলছি ? তোমাদেরই কষ্ট হচ্ছে, তাই বলছি। রাখ মা রাখ, আমার কোলে পা রাখ। গাড়োয়ান, অ গাড়োয়ান, যাও ত দাদা, দেউড়ি থেকে একজন দরোয়ান ডেকে আন ত ?

গাড়োয়ান। ভাল সোয়ারী পেয়েছি। ভবানীপুর যেতে বারো গণ্ডা পয়সা ভাড়া পাব, এক ঘণ্টা ত এখানেই সোয়ারী ওঠাতেই গেল—এখন আবার দরোয়ানের তল্লাসে যাই।

দিদির একটি নাতনী ছুটিয়া আসিয়া খিড়কির দরজা হইতে বলিল, "ঠাকুরমা, মা জিজ্ঞাসা করলে—আর কেউ আমরা যাব কি ?"

দিদি। হ্যাঁ, যাবি বই কি! আজ অর্দ্ধেক যাস্, আর বিয়ের দিন অর্দ্ধেক যাবি। আজ যারা যাবে, বিয়ের দিন তারা থাকবে—ওরা যাবে।

নাতনী। আজ কে কে যাবে তুমি বল, তা নইলে সবাই বিয়ের দিন যাব ব'লে ব'সে থাকবে।

দিদি। যা যা, ভাল যন্ত্রণা, পিছু ডাকতে এল। বড় বৌমা যাকে বলবে, সেই আজ যাবে।

দাসী। খুদি মাসিমা, একজন দরোয়ানকে পাঠায়ে দাও না গা, আমার কোলে মাঠাকরুণের পা রয়েছে, আমি উঠতে পারতেছি না। হেই মা, দাও মা, দরোয়ান ডেকে দাও মা।

ইতিমধ্যে গাড়োয়ান দরোয়ান ডাকিয়া লইয়া বকিতে বকিতে আসিল। 'বারো আনায় হবে না দরোয়ানজী, পান সিকি লেব, এত দেরি সোয়ারী তুলতে—বাপ রে!

দরোয়ান। আরে ভাই, লিবি লিবি তাতে কি—পান সিকি লে, দেড় টাকা লে, পয়সার জন্য ভাওনা কি, সোয়ারী ত পৌছা। কি দিদি, ডাকিয়েছেন ?

এক বুড়া দরোয়ান গাড়ীর কাছে আসিল। দিদি একটু ঘোমটা টানিয়া দিলেন।

রাণী। জমাদার, একজন দরোয়ান সঙ্গে দাও না।

জমাদার। কোথা যেতে হোবে দিদি ?

রাণী। ভবানীপুরে মেজকাকীমার বাড়ী।

জমাদার। সেখানে তো সাদী আছে, তবে ত পোষাক-ওষাক প'রে যেতে হোবে ? আচ্ছা, আমি দরোয়ান পেঠিয়ে দিচ্ছি।

জমাদার গেল। কাত্নুর ছেলে কাঁদে আবার চুপ করে, আবার কাঁদে।

কাত্নু। দেখুন মাসিমা, এই একটার যন্ত্রণা দেখুন, আবার যদি আর কটাকে আনতুম ত আমার কি হ'ত ? একটা দেড় বছরের, একটা তিন বছরের, একটা পাঁচ বছরের, বড় মেয়েটা ছয় বছরের—যা সেইটের একটু জ্ঞান হয়েছে, আর সবগুলোই ত কচি।

দরোয়ান আসিল ; এত ক্ষণে গাড়ী চলিতে লাগিল।

আমি। দিদি, ঘরের গাড়ীতে গেলে ত হ'ত ?

দিদি। ঘরের গাড়ী আর কই ? ছেলেরা স্কুল-আপিসে যাবে—হ্যাঁ রে, বড় ভুল হয়ে গেছে—কালীকান্ত এখানে নেই, তার আপিসের গাড়ীখানা আছে রে।

রাণী। না মা, সে গাড়ী পাবার জো নেই, আমি বুঝি খোঁজ করি নি মনে করছো ? জান না কোচমানগুলো কি দুষ্টু, বাবু বাড়ী নেই, অমনি ধিঙ্গি হয়েছে—ব'লে দিলে, ঘোড়ার পায়ে ব্যথা হয়েছে—কোচমান শ্বশুর-বাড়ী গেছে। আমি খানিক বকাবকি করলুম, তার পর চুপ ক'রে গেলুম—বিজয় শুনলে মারতে ধরতে যাবে !

মস্ত একটা বাগানের মধ্যে গাড়ী ঢুকিল। লাল সুরকীর রাস্তাটা খুব চওড়া, দুই পাশে বকুলগাছের সারি, ফুলে ফুলে তলাটি বিছাইয়া রহিয়াছে, ফটকের ভিতর ঢুকিয়াই দেখি, দুই পাশে দুইটি পুকুর, জল তক্‌তক্ করিতেছে ও কতকগুলি হাঁস ভাসিতেছে। শাদা ধবধবে প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ী ফটক হইতে দেখা যায়। গাড়ীবারান্দা ছাড়াইয়া খিড়কির দুয়ারে গাড়ী দাঁড়াইল। নহবৎ বাজিতেছে, গোলাপী রঙের কাপড়-পরা দু-চার জন দাস দাসী বাগানে ঘুরিতেছে। বড় বড় মোটা মোটা সোনার চেন-হার গলায় নীল লাল সবুজ রঙের রেশমের কোট অথবা পাঞ্জাবি গায়ে

ফরসা ধুতি-পরা ছোট ছোট ছেলেরা ও জরি দিয়া খোঁপা-বাঁধা, নোলক নাকে, কানে এয়ারিং, পায়ে মল, ঘাগরার মত করিয়া নানা রঙের কাপড় পরা, কোমরে লাল সবুজ অথবা কালো রঙের এক একটা ফিতা বাঁধা—৫।৭।১০ বছরের মেয়েরাও দু-চার জন বাগানে ঘুরিতেছিল। এমন সময় শাঁক বাজিয়া উঠিল, অমনি সকলে "এইবার গায়ে হলুদ হবে" বলিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। আমাদের গাড়ী দাঁড়াইতেই—"ঐ জেঠাইমা এসেছেন, বাঁচা গেল, এস এস" বলিয়া দিদির জায়ের বড় ছেলে নীরদকান্ত (কনের বাপ) আসিয়া কাদুর কোল হইতে ছেলে লইল।

নীরদ। শীঘ্র নামো জেঠাইমা, আর পাঁচ মিনিট মাত্র সময় আছে, এর মধ্যে হলুদ দিতে হবে, তার পর বারবেলা পড়বে—মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

একটি বৌ ছুটিয়া আসিয়া একে একে সকলের হাত ধরিয়া নামাইয়া প্রণাম করিল।

নীরদ। ও সব থাক্ প্রণাম-ট্রণাম পরে হবে—জেঠাইমা, হলুদটা ছুঁইয়ে নাও।

দিদি। (যাইতে যাইতে) গায়ে হলুদ এসেছে ?

বৌ। (মৃদুস্বরে) হলুদ কাজল-লতা মাছ গামছা মাদুর আর লালপেড়ে শাড়ী এসেছে, আর এখনও কিছু আসে নি, ঘটক বললেন যে সে সব পরে আসছে। সবাই জড় হয়েছে, মেয়ে মাদুরে ব'সে আছে, কেবল আপনাদের অপেক্ষায় হলুদ দেওয়া হয় নি—ঐ যে, ঐ ঘরে মেয়ে।

নীরদ। কাদি একটা বুঁচ্‌কি এনেছিস, বেশ করেছিস, দুধের ঘটি বাটি ঝিনুক এসব কেন ? সংসারে কি কচি ছেলে কারও নেই, যা হয়েছে তোর ? দিদি, এত বেলায় নিমন্ত্রণ খেতে এলে—আচ্ছা আচ্ছা আড়ি—জেনে রাখো আড়ি !

বৌ। (মৃদুস্বরে) বাঁচলুম ভাই বড় ঠাকুরঝি এলে—কি ক'রে কি যে হবে, তাই ভেবে মরছি। নাও ভাই তোমার ভাঁড়ার বুঝে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। ন-ঠাকুরঝির এবারকার খোকাটি ত দিব্যি হয়েছে"—বলিয়া নীরদের কোল হইতে বৌ ছেলে কোলে লইল।

এটি রান্নাবাড়ী—দু-দিকে একতলা ঘর, এক দিকে বড় বাড়ী, এক দিকে প্রাচীর—প্রাচীরের দিকে খিড়কি দরজা। মধ্যে মস্ত বড় উঠান, উঠানে

দুইটা বড় বড় মাছ পড়িয়া আছে, আরও অনেকগুলি মাছ কোটা হইতেছে, পাঁচ ছয়খানা বঁটি পাতিয়া ঝিগুলা বসিয়া কলরব করিতেছে ও মাছ কুটিতেছে। দু-তিনটি বালক এক একগাছা বাঁখারি হাতে করিয়া কাক চিল তাড়াইতেছে। রান্নাঘর হইতে ধোঁয়া উড়িতেছে ও ছ্যাঁক ছোঁক করিয়া রান্নার শব্দ শোনা যাইতেছে—মাছ ভাজার গন্ধ বাহির হইয়াছে।

একজন বামন। ওগো, মাছ নিয়ে এস না, খোলা যে কামাই যায়।

একজন দাসী। কোটা হবে তবে ত দেব। বামুন যেন ঘোড়ায় চেপে এসেছে—মাছ কুটতে হ'ত ত জানতে পারতে।

বামন। বাবুদের কাছে গিয়ে জবাব দিস্, তখন জানতে পারবি, ঘোড়ায় চেপে এসেছি, কি হাতী চেপে এসেছি।

দাসী। আঃ মোলো, কে রে দুর্ম্মুখ বামুন তুই মুই করে—যাই দেখি বড় বাবুর কাছে।

দাসীর হাতে সোনার তাগা, গলায় সোনার হার।

অন্য দাসী। এখন মাছগুলো দাও ভাই, রাগ ক'রো না, ওরা ছোটলোক, তাই ছোটলোকের মত কথা কয়; আর বকাবকিতে কাজ নেই, মনিবের কাজ ক্ষেতি হবে—দিচ্ছি গো, মাছ দিচ্ছি।

একটি বড় ঘরে ক'নে নূতন মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে, একখানি লাল-পেড়ে ঢাকাই শাড়ী মাত্র পরা, চুলগুলি এলো-খোঁপা বাঁধা। চারি দিকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে বৌ-ঝি তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একজন শাঁখ বাজাইতেছে, একজনের হাতে সোনার বাটিতে তেল-হলুদ ও সোনার কাজল-লতা; একজন একটি পাত্রে কতকগুলি সন্দেশ ও অন্য পাত্রে কতকগুলি বোঁটাশুদ্ধ পান ও আস্ত সুপারি হাতে করিয়া আছে। একটি জানালায় একজন বিধবা স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন; যৌবনে তিনি যে সুন্দরী ছিলেন, তাহা বোঝা যায়; রং গৌরবর্ণ, লম্বা, রোগা, এখনও গড়নটি পরিপাটি মোলায়েম, বেশ প্রশান্ত মূর্ত্তিখানি। আমাদের দেখিয়া উঠিয়া আসিয়া "এই যে দিদি, এস, এস, অন্নপূর্ণা এসেছেন, এখন সব কাজ সুপ্রতুল হবে, এত ক্ষণে বে-বাড়ী ব'লে মনে হচ্ছে—(প্রণাম করিয়া) হলুদটা ছুঁইয়ে নাও ভাই, তার পর বলছি সব। (আমাকে দেখিয়া) এই যে ছোট দিদি, কত ভাগ্যি আমার ভাই, তোমার দেখা পেলুম—দিদির বোন যে, তা দেখেই চেনা যায়, মুখের বেশ আদল আসে, তবে দিদির চেয়ে

রং ঢের ফরসা আর অমন মোটাও নন। ব'স ভাই ব'স। হলুদটা হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত হয়ে কথাবাত্রা কই।"

দিদি, কাদু, ক'নের দিদিমা, ক'নের কাকী ও ক'নের বড় বোন, এই পাঁচ জনে হলুদ হাতে লইয়া একত্রে ক'নের কপালে তিন বার হলুদ ছোঁয়াইবা মাত্র শাঁখ বাজিয়া উঠিল, হুলুধ্বনি হইতে লাগিল, জোরে ঢাক ঢোল, জগঝম্প ও নহবৎ বাজিয়া উঠিল; হলুদের পর চন্দন ও সিঁদুরের ফোঁটা দিয়া ক'নের হাতে কাজল-লতাখানি দেওয়া হইল। বাজনার বিষম শব্দে রাণীর কোলে কাদুর ঘুমন্ত ছেলে জাগিয়া উঠিয়া আর এক বাজনা সুরু করিয়া দিল।

রাণী। আহ্লাদি, বুঁচকিটা আর দুধের ঘটি ঐ জানলায় রেখে ছেলে নিয়ে একটু বাহিরে হাওয়ায় দাঁড়া গে—ভিড়ে ছেলে ভয় পেয়েছে, বড্ড কাঁদছে।

আহ্লাদি। রোস না, গায়ে-হলুদ দেখি।

রাণী। ঐ ত হলুদ হয়ে গেল, আর কি দেখবি বল্—নে যা না, ছেলে যে ককিয়ে রইল।

আহ্লাদি। কোথায় ঘটি রাখি, কে চুরি করবে, তখন আহ্লাদির দোষ হবে।

রাণী। চুরি যায় আমার যাবে, রাখ্ ঘটি ঐ জানলায়—নে, ছেলে নিয়ে বাহিরে ফাঁকে যা—ভাল আপদ্!

আহ্লাদি ঠক করিয়া ঘটি রাখিয়া ছেলে লইয়া বাহিরে গেল।

দিদির জা। মেজ বৌমা, সব এয়োদের হাতে পান সুপারি আর মিষ্টি দাও। কাদু, দাও সবাইকে সিঁদুর পরিয়ে দাও।

এয়োস্ত্রীরা পরস্পরে পরস্পরকে সিঁদুর পরাইয়া সম্বন্ধ অনুসারে প্রণাম করিতে লাগিল। ক'নের মা আসিয়া ক'নেকে তুলিয়া লইয়া এক গেলাস সরবৎ খাইতে দিল; আর সকলকে জল খাইবার জন্য বার বার ডাকিতে লাগিল।

দিদি। ও মেজবৌ, এই দেখ আমার ছোট বোন, সেই যে বিদেশে ওরা থাকে। একটি গুঁড়ো হরি দিয়েছেন, তাই নিয়ে নিবৃত্তি হয়ে আছে। ছেলের বিয়ে দিতে দেশে এসেছে। তুই কি ওকে কখনও দেখিস্ নি?

মেজ বৌ। একবার যেন দেখেছি, তখন খুব ছোট ছিলেন। ও নীরু, নীরু শোন্—

নীরু। কি মা—

মেজ বৌ। হ্যাঁ রে, তোর ছোট মাসিমার ছেলের নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিস—

নীরু। (আমাকে প্রণাম করিয়া) আমি ত তাঁর নাম জানি না মা। জেঠাইমা, তাঁর নাম কি গা?

দিদি। তার নাম গণেশ।

নীরু। গণেশচন্দ্র, গণেশচন্দ্র কি?

আমি। তাকে আমরা গণেশ ব'লে ডাকি, তার আসল নাম ললিতকুমার; ছেলেবেলা বড্ড মোটা ছিল, তাই আমার শ্বশুর আদর ক'রে গণেশ গণেশ ডাকতেন।

দিদি। দেখেছ, নাম খারাপ করা—বেশ নামটি ললিতকুমার। ওরা মিত্তির। ললিতকুমার মিত্তির ব'লে পত্র দিয়ো। মেজ বৌ, কেমন আছিস্—জ্বর সেরেছে? তোর কি আক্কেল, আমাকে নিতে গেলি নে!

মেজ বৌ। রাগ ক'রো না দিদি, কাল জ্বরে অচৈতন্য হয়েছিলুম, এই সবে ভোর বেলা জ্বর ছেড়েছে—উঠে এসে জানলাটিতে ব'সে আছি—ভাবছি, কখন তোমরা আসবে। এ তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, তোমার দোর, তোমার ছেলে, তোমার বৌ, তোমার নাতনী, তুমি আগে, তার পর আমি, আমি আবার তোমাকে নিতে যাব কি দিদি? তুমি কার উপর অভিমান করবে বল। চল দিদি, জল খাবে, জল খেয়ে সব দেখো শুনো।

দিদি। তোর বোনেরা আসে নি?

নীরুর মা। এখনও কেউ আসে নি, তারা আসবে—বড় বৌমাব বোনেরা আসবে—আমার ভাজ আসবে—ছোট বৌ আসবে। আর বড় বেশী কেউ আজ আসবে না, তাড়াতাড়ি ঠিক হ'ল, আয়োজন করবার অবসর পাওয়া গেল না; সবাইকে বিয়ের দিন বলা হবে, সেই দিন ঢের মেয়ে জড় হবে, আলাপী বন্ধু সবাই আসবে। কাল আবার বোয়েরা নিমন্ত্রণ করতে যাবে; কতক চিঠি দিয়েও নিমন্ত্রণ হবে।

নীরুব স্ত্রী। ও মা, চল মা, তোমার জন্যে একটু সাবু ক'রে রেখেছি, এই বেলা খেয়ে নাও—এর পর গায়ে হলুদের সামগ্রী এসে পড়লে ভারি

ভিড় হবে, আর তোমার খাওয়া হবে না—আজ চার দিন উপবাসী রয়েছ যে মা! জেঠাইমা, আপনি চলুন; এই বেলা কিছু মুখে দিয়ে নিন, ভাত খেতে ঢের বেলা হবে।

দিদি। আমাদের আবার বেলার ভয় কি মা—জান না, আমাদের জল খেতে ১২টা বাজে, ভাত খেতে ৩টে—আজ না হয় ৫টা হবে। তার জন্যে কি, তবে মেজ বৌ এই বেলা কিছু মুখে দিক। চল মেজ বৌ, আয় ভুবন, ঘর দোর সব দেখবি আয়।

আমরা একটি ঘরে জল খাইতে গেলাম। এই ঘরের এক পাশে ভাঁড়ারঘর, আর এক পাশে আর একটি ঘর—সে ঘরে যত ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, এয়োস্ত্রী, বৌ-ঝিদের জলখাবার দেওয়া হইয়াছে। সারি সারি কুশাসন পাতা, সারি সারি কলাপাতায় ফল মিষ্টান্ন। তাহারা খাইতে বসিলে নীরুর মা বলিলেন, "গরম গরম লুচি কচুরি ভাজা হইতেছে, বৌমা-সকলকে কিছু কিছু দিতে বল।"

লুচি, কচুরি, পটল ও বেগুন ভাজা দেওয়া হইল। এ-ঘরে যত বিধবাদের জলযোগের আয়োজন হইয়াছে, কলাপাতায় ফল ও মিষ্টান্ন। আমি এবং রাণী খাইয়া আসিয়াছি বলিয়া আপত্তি করিলাম। দিদি তাঁহার মেজ জায়ের কাছেই এক পাতায় বসিলেন।

দিদি। আমি এই ঘরেই বসি—মেজ বৌ, তোর সাবু কই?

সাবু, কিছু বেদানা, পানফল, মুগের ডাল ভিজে, দু-চারখানি আদার কুচি তাঁহাকে দিয়া গেল, দুই জায়ে কথা কহিতে কহিতে খাইতে লাগিলেন। আমি একটি জানালার ধারে বসিয়া উঠান ও ঘরের মধ্যে দুই-ই দেখিতে লাগিলাম; রাণী গৃহিণীপনায় নিযুক্ত হইল।

নীরু। (উঠানে দাঁড়াইয়া) দিদি, আমাদের দুটি ভাতের কি হবে বল? দুটি ভাত পেলে আমরা নিমন্ত্রণ করতে সবাই বেরিয়ে পড়ি। ভাগ্যি আজ শনিবার পড়েছে—শনি রবি দুটো দিন পাওয়া গেল।

রাণী। এই যে পোলাওটা চড়েছে, নামলেই হয়—ঠাঁই করতে করতে পোলাও নাববে। দক্ষিণের ঘরের সবাইয়ের জল খাওয়া হ'ল ব'লে, হলেই ঠাঁই ক'রে দিচ্ছি।

রাণী গোটা দুই দাসীকে আঁশবঁটি হইতে উঠাইয়া আনিয়া দক্ষিণের ঘর পরিষ্কার করাইল। নিজে জল নুন সব দিল, ব্রাহ্মণকে তাড়া দিয়া

রান্নাঘর হইতে ভাত বাহির করিল, এবং সকলকে আহারে বসাইয়া দিল। তাহার কার্য্যকুশলতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। আহারের সময় প্রত্যেকের কাহার কি চাই জানিয়া আনাইয়া দিতে লাগিল। পুরুষ পনর ষোল জন হইবে আহার করিল, সকলেই রাণীর স্বসম্পর্কীয়। এমন সময় "গায়ে হলুদের সামগ্রী এল গো, শাঁখ বাজাও," শুনিয়া একটি মেয়ে জোরে শাঁখ বাজাইয়া দিল। দিদি ও নীরুর মা নীরুদের আহারের নিকট বসিয়া গল্প করিতেছিলেন—বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যে ঘরে ক'নের গায়ে হলুদ হইয়াছিল, সেই ঘরে জিনিস রাখানো হইতে লাগিল।

নীরু। (আস্তে আস্তে রাণীকে) দিদি, একে একে লোক ঢুকলো ত কমগুলি নয়, এক শত জন হবে। এক শত জনের বিদায় ১০০৲ টাকা, আর ঘটক সরকার প্রভৃতিদেরও কোন্ না ২৫৲ টাকা দিতে হবে—বাপ রে গেছি যে!

রাণী। আবার ফুলশয্যায় তোমাকেও এমনি ক'রে সামগ্রীপত্র দিতে হবে। খুব সামগ্রী দিয়েছে দেখছি—সোনার বাটিতে হলুদ, সোনার কাজললতা—খুব দিয়েছে।

নীরু। আরে, ও দিয়ে আমার কি লাভ বল? আমার কাছে থেকে নগদ টাকা নিয়ে এই সব দিয়েছেন—এর অধিকাংশই আবার তাঁর ঘরে ফিরে যাবে। সকালে উঠে নগদ ২৫০০৲ হাজারের মধ্যে হাজার টাকা পাঠিয়ে দিই, তবে হলুদ আসে। আমার বেহাই মশায়ের টাকা আছে বটে, কিন্তু ব্যবহারটা তেমন ভদ্রোচিত দেখছি নে। আমি ত এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছিলুম, পরশু দিন আবার মামা এসে পীড়াপীড়ি ক'রে ধরলেন, বললেন,—ছেলেটি বড় ভাল, পয়সাকড়িও আছে, দিয়ে ফেল—তাতেই হয়ে পড়ল। কিন্তু এই নগদ টাকা দিতে আমার বড় বিরক্ত বোধ হচ্ছে; আবার শুনছি, খুব ঘটা ক'রে বর আসবে—খরচ না কি তিনি ঢের করবেন, তবুও আমার এই গোটাকতক টাকা কেন যে নগদে নেওয়া, তা বুঝি নে।

রাণী। আর খুঁৎ খুঁৎ করিস নে ভাই, মা সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল করুন, ভালয় ভালয় শুভ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হোক।

নীরু। মাসিমা ছেলের বিয়ে দিতে এসেছেন না? আপনার ছেলের দর কত হেঁকেছেন মাসিমা? সস্তায় হ'লে আমি তুই একটি মেয়ে দেখে দিতে পারি।

আমি। দাও না বাছা ভাল মেয়ে একটি দেখে। টাকাকড়ি আমি কিছুই চাহি নে—আমাদের বিয়ে ত এমন টাকাকড়ি দিয়ে হয় নি, কিন্তু তবু বিয়ে ত হয়েছিল। তুমি বাছা ভাল মেয়ের সন্ধান ক'র।

নীরু। দিদি, শ্যামদার মেয়ের সঙ্গে দিলে হয় না? মেয়ে ত নয়, যেন পরী—শ্যামদা যেমন ভদ্রলোক, বৌদিদিও তেমনি লক্ষ্মী, মেয়েরাও তেমনি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তবে মাসিমা, শ্যামদার পয়সাকড়ি নেই।

রাণী। আরে তুই ত সম্বন্ধ ক'রে চুকলি ভাই, সে ঘরে যে হবে না—তারা মৌলিক—গণেশের যে কুল হবে—একটি ছেলে। মাসিমা সে মেয়ে দেখতে পাবে, আমাদেরই পাড়ায় বাড়ী, তার ঠাকুরমার সঙ্গে মায়ের সই পাতানো, তারা খিড়কি দিয়ে সর্ব্বদাই আমাদের বাড়ী আসে, আমরাও যাই। সইমার ছেলেদের দাদা বলি। তা সে যে হবার নয়, তোরাও যে ভাই মৌলিক, নইলে ঘরে ঘরে কাজ হ'ত; তোর সেজ মেয়েটির সঙ্গে, নীরু, এখনি হয়ে যেত। যাই আমি, কুটুমবাড়ীর ঝিয়েদের বসাই। তুই ভাই, চাকরদের খোঁজ তল্লাস নিস, খাবার জায়গা-টায়গা হ'ল কি না দেখ্ গে, আমি লুচি-টুচি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নীরু। হ্যাঁ, মহামান্য মহামহিম রাজা পেঁচো, রাজা হরে, রাজা রামা, রাজা শ্যামাদের অব্যর্থনার ত্রুটি না হয় দেখি গে, আবার নইলে বেহাই মশায় ফোঁস ক'রে উঠবেন।

রাণী। আহা, হোক না গরীব মানুষ, যত্ন ক'রে খাওয়াবি নে? ওদের খাইয়েই ত সুখ। বড়লোকেরা ত ঠোকরাবে, খাবে ত ওরাই। ওদের খাওয়াতে আমি বড় ভালবাসি।

রাণীর সহিত আমরাও গায়ে হলুদের সামগ্রী দেখিতে গেলাম। সেখানে বিষম ভিড়। রাণী আমাকে একটু স্থান দিয়া সব ঝিয়েদের পা ধুইয়া আসিতে বলিল। একটা ঘরে শতরঞ্চ পাতিয়া তাহাদের বসিবার স্থান করা হইয়াছে। জিনিসপত্র দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতেছেন।

নীরুর শাশুড়ী। দেখ বেয়ান, যেমন জিনিসপত্র দিয়েছেন, ঘড়াটি তেমনি হয় নি।

দিদি। ঘড়াটা কিসের—পিতলের?

নীরুর শাশুড়ী। পিতলের একটাতে তেল দিয়েছেন, সেটা ডাগর আছে—আর ঐ যে দেখ না রূপার বাসনের সুটের ঘড়াটা, ঐটে বড় ছোট।

দিদি। কার্পেটখানাও ছোট। আমার নাতিকে যে কার্পেট দিয়েছিল—একেবারে ঘরজোড়া কার্পেট। আর আমার মেজ মেয়ে সতুর শ্বশুর যেমন জিনিসপত্তর দিয়েছিল—এত গায়ে হলুদ দেখেছি, তেমন কখনও দেখি নি।

নীরুর শাশুড়ী। মেজ মেয়ের কাদের ঘরে বিয়ে দেছেন?

দিদি। সিমলের মিত্তিরদের বাড়ী।

নীরুর শাশুড়ী। তাদের ত এখন আর কিছু নেই। তাদের একঘররা আমাদের পাড়ায় বাড়ী ভাড়া ক'রে আছে, তাদের কিছু নেই। কত দিন আপনার মেয়ের বিয়ে হয়েছে?

দিদি। ভুবন, দেখি দেখি, কি গহনা দিয়েছে দেখি—জড়োয়া ফুল, চিরুনি আর হীরের চিক? বেশ দিয়েছে। এ কি রকম, চিক্-নেকলেস্ বুঝি? ক' হাঁড়ি ক্ষীর, ক' হাঁড়ি দই দিয়েছে?

রাণী। কুড়ি হাঁড়ি ক্ষীর, পঁচিশ হাঁড়ি দই। কুড়ি চেঙ্গারি সন্দেশ, ঘি, ময়দা, তরকারি, ফল, মেওয়া, ক্ষীরের জিনিস, যা যা এখনকার দেয় তা সব খুঁটিয়ে দিয়েছেন; গন্ধদ্রব্য, পাঁচ এয়োর সাজ, রূপার আতরদান, গোলাবপাশ, চান করবার জন্যে শাদা পাথরের জলচৌকি। এই দেখ মা, কাপড় দেখ—এই বেনারসী একখানা, বোম্বাই একখানা, ঢাকাই একখানা, মান্দ্রাজী একখানা, আর রং-করা চারখানা, রঙ্গীন ডুরে চারখানা —সবশুদ্ধ ক'নের এই বারোখানা শাড়ী, বারোটা জ্যাকেট, বারোটা শেমিজ, বারোটা পেটিকোট, বারোটা বডি—খুব দিয়েছেন। এই যে পাঁচ এয়োর সাজ—বেনারসী একখানা ক'রে, আর লালপেড়ে একখানা ক'রে, আর জলখাবারের রূপার বাসন, রূপার সিঁদুরচুপড়ি, এই যে গামলাগুলিও রূপার—এইগুলিই ত এক একটা ভাল গায়ে হলুদের সাজ। বৌ গেল কোথায়, এসে দেখুক না। (একটি বালককে) যা ত, তোর মাকে ডেকে আন্ ত।

বালক। (ফিরিয়া আসিয়া) মা দিদিকে গয়না পরাচ্ছে, পরিয়ে আসবে।

একজন কুটুমবাড়ীর দাসী, গলায় মোটা সোনার হার, হাতে তাগা, পরনে গরদ, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, আমাদের বৌমা কই? এইখানে একবার আনেন, সবাই দেখে চক্ষু সার্থক করুক। আমাদের কত আদরের বৌমা। মা ব'লে দিলেন, জিনিসপত্র সব তাঁরই মনে ধরে নি, তা আপনাদের মনে ধরবে কি, আপনারা যেন অপরাধ না নেন্।"

নীরুর মা। সে কি বাছা, এমন কথা বলতে আছে? এত দিয়েছেন, তবু মনে ধরবে না? খুব মনে ধরেছে। বর ক'নে সুখে থাক্, ভোগ করুক, এই তোমরা দশ জনে বল।

দিদি। হ্যাঁগা বাছা, এ কি তোমাদের প্রথম ছেলে? না না, তা কেমন ক'রে হবে, আমরা যে মৌলিক, তা হ'লে যে কুল হ'ত।

দাসী। না মা, কর্ত্তার আর-পক্ষের বড় বড় ছেলেরা আছে, বৌ আছে। বড় নাতিটিই বিয়ের যুগ্যি হয়েছে—এটি এ-পক্ষের ছেলে। এ-পক্ষের এই ছেলেটি, আর চার মেয়ে। গিন্নিমা বড় সৌখীন, তাঁর ত এই সবে ধন নীলমণি। তিনি বলেছেন যে, সাধ মিটিয়ে ভাল ভাল সামগ্রী দেব। গিন্নিমা বড় মিশুনে মানুষ—এই দেখবেন, কুটুম্বিতা হোক আগে, তাঁর পরিচয় পাবেন। সতীনপো-বৌদের নিয়েই এত আদর, এত যত্ন করেন, যে দেখে সে-ই অবাক্ হয়ে থাকে।

দিদি। তুমি বুঝি অনেক দিন ওঁদের বাড়ী আছ?

দাসী। আমি আগে তাঁর বাপের বাড়ী ছিলুম। গিন্নিমার অম্বলের ব্যারাম, তাই আমায় বললেন, সরি মাসি, তুই এসে আমার কাছে থাক্, নইলে আমার ছেলেপিলে মানুষ হয় না—তাই এই ক'বছর রয়েছি।

ক'নেকে লইয়া নীরুর স্ত্রী আসিল।

দাসী। এস এস, আমাদের ঘরের লক্ষ্মী এস—দেখি দিদিমণি, ব'স দেখি, ভাল ক'রে দেখি। ওলো ও হরি ও শামী, এই দেখ্, ভাল ক'রে দেখ্। ছোটদাদাবাবুর বৌ কত খুঁজে খুঁজে করেছি। মা, বলবো কি, ঘট্‌কীরা গিন্নিমাকে না হবে ত হাজার মেয়ে দেখিয়েছে। এবার এই মেয়ে দেখে আমি বলেছি যে, না—তুমি দেখতে যেতে পাবে না, আমি ঐ মেয়ে

করবোই। কিন্তু দেখ, শ্যামী, ক'নের মা কি সুন্দরী, যেন ছবিখানি, যেন উনিই ক'নে। ক'নেটি রূপসী বটে, কিন্তু মার মত অত রং নয়, অমন গড়নও নয়।

শ্যামী। অ বৌদিদি, আমাদের দিকে চেয়ে দেখ—আমাদের সঙ্গেই ঘর করতে হবে। কথা কও; দাদাবাবুকে গিয়ে কি বলবো, ব'লে ক'য়ে দাও।

সরি। মরণ! চুপ কর্, রকম দেখ!

নীরুর মামী। হ্যাঁ গা, কত্তার আর-পক্ষের ছেলেরা না ভিন্ন? তাদের বাড়ীও না ভিন্ন?

সরি। সে আর ভিন্ন নয় মা, সে একই। বাড়ী দুখানা, মাঝে দোর। সর্বদা যাওয়া আসা সকলই আছে; তবে কি না কত্তা মশায় বড় সেয়ানা মানুষ—কি জানি, এর পর যদি মা, বনিবন্তা না হয়—আপনি থাকতে থাকতে সবাইকে গুছিয়ে দিয়েছেন। কত্তাবাবুর আর-পক্ষের ছেলেরা একেবারে মা-অন্ত প্রাণ। এই সব গায়ে হলুদের সামগ্রী কি গিন্নিমার মনে ধরে? কত্তাবাবু এক আনলেন, তাঁর মনে ধরলো না—তিনি সে সব ঘরে রেখে নিজের কড়ি দিয়ে সব দোকর ক'রে আনালেন; বড় বাবুই ত সে সব বাজার ক'রে দিলেন। গিন্নিমার মতন বৌপালুনি এ ভবানীপুরে আর নেই। ঐ যে বললুম, সতীনপো-বৌদের নিয়ে কি করা। এ ত নিজের বৌ। মা-ঠাকরুণের ত পাওনার দিকে নজর নেই, যে সব গয়না বৌয়ের জন্য গড়িয়েছেন, এ সব তার কাছে কোথা লাগে।

নীরুর মা। রাণী, মা তুমি কুটুমবাড়ীর ঝিদের বসিয়ে দাও। পাতা হয়েছে।

রাণী প্রত্যেক ঝিয়ের কাছে গিয়া "এস মা, উঠে এস, বেলা হয়ে গেছে, খাবে এস" বলিয়া তুলিয়া লইয়া সকলকে আহারে বসাইল। ব্রাহ্মণ পরিবেশন করিতে লাগিল। পাতা সাজানো ছিল। লুচি, কচুরি, পাঁপর-ভাজা, পটলভাজা, বেগুনভাজা, ছোকা, ছোলার ডাল ও চাট্‌নি, এই সব কলার পাতায়, আর খুরিতে খুরিতে মাছের কালিয়া, ক্ষীর, দই, মিষ্টান্ন দেওয়া হইয়াছে। তাহারা খাইতেছে, আর গিন্নিরা সকলে "কি চাই, আরও খাও, লুচি দাও" বলিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

এদিকে নিমন্ত্রিতারা গাড়ী গাড়ী আসিতে লাগিলেন—সকলেই একবার করিয়া গায়ে হলুদের জিনিসপত্র দেখিতে লাগিলেন। কালী-কান্তের স্ত্রী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে প্রভৃতিতে ছুইখানি গাড়ী ঠাসিয়া আসিল। নীরুর মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর সকলে কই ?"

কালীর স্ত্রী। সবাই এলে চলবে কেন কাকীমা—তারা সব বিয়ের দিন আসবে। ঘটার বিয়ে ব'লে, তারা সব বর দেখতে আসবে ব'লে আজ আরও এল না। যাদের কোলে কচি ছেলে, তাদের আজ এনেছি। ঐ দেখ না কতগুলি।

নীরুর মা। আমি কাউকে যেতে দেব না—ছুটো ঘরে ঢালা বিছানা ক'রে রেখেছি, তোমরা সব শোবে।

কালীর স্ত্রী। আমাদের ত ইচ্ছে করে কাকীমা যে তোমার বাড়ী দশ দিন কাটাই—কি করবো, হাত পা বাঁধা যে।

একটি বৌ। মা, ক'নের আইবুড়ভাত খাবার জায়গা হয়েছে, সবাইকে নিয়ে আস্থন।

নীরুর মা। চল দিদি, চল বেয়ান, বসবে চল—কাহু, আয় মা।

প্রত্যেকের হাত ধরিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে ঘণ্টাখানেক লাগিল। সধবা স্ত্রীলোকেরা ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ক'নেকে লইয়া আহারে বসিল। ঘরের এক কোণে একটি প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে, শাঁখ বাজিয়া উঠিল, বাহিরেও বাজনা ও নহবৎ বাজিতে লাগিল।

দিদি। টুনি, আগে মাছ আর পরমান্ন মুখে দে।

টুনি তাহাই করিল। ব্যঞ্জন ও ক্ষীর, দই, পরমান্ন, মিষ্টান্ন প্রভৃতির খুরি পঞ্চাশখানি হইবে সাজানো হইয়াছে। কলাপাতে প্রথমে ভাত দিয়া আহার আরম্ভ, পরে পোলাও, লুচি কচুরি ক্রমে ক্রমে পরিবেশন করা হইল। ক'নেকে রূপার থালা, বাটি, গেলাস প্রভৃতিতে সমস্ত একেবারে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহাকে আর পরিবেশন করা হইবে না। যাহা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাই প্রচুর—সে কত খাইবে! রান্নার সমালোচনা হইতে হইতে আহার চলিতে লাগিল।

দিদি। মেজ বৌমা, খানিকটা ছ্যাঁচড়া আনতে বল ত। যজ্ঞির ছ্যাঁচড়া আমি বড্ড ভালবাসি।

নীরুর শাশুড়ী। হ্যাঁ দিদি, আমিও। দেখ না, কতখানি খেয়েছি।

দিদি। আর একটু নাও। ও ঠাকুর, এ পাতে, এ পাতে—

নীরুর শাশুড়ী। (হাত নাড়িয়া) না না, আর নয়, এ সব ত খেতে হবে, এ সব তা হ'লে কোন্ পেটে ধরবে! শুধু ছঁ্যাছড়া খেয়েই কি পেট ভরাবো? নাতনীর বিয়েতে খালি মেঠাই মোণ্ডা খেতে হয়।

দিদি। তা বেয়ান, তুমি খুব মেঠাই মোণ্ডা খাও, আমি ও-সব ভালবাসি নে। (পোলাওগুলি পাতের এক পাশে সরাইয়া) রাণি, খানকতক লুচি আনতে বল্ ত, আমি আবার পোলাও খেতে পারি নে।

নীরুর মা। ঠাকুর, মুড়গুলো কি সবই বুটের ডালে দিয়েছ?

ঠাকুর। আজ্ঞে না, ছোট ছোট কয়েকটা ঝোলে দেওয়া হয়েছে।

নীরুর মা। নিয়ে এস ত গোটাকতক—আর কালিয়ার মাছও খানকতক আন।

দিদি। (লুচি দেওয়ার পর) ঠাকুর, তুখানা গরম দেখে কচুরি দাও ত। ওলো সুহাসিনি, তুই যেন দই খাস্ নি, কোলে কচি ছেলে।

সুহাসিনী। কেন মা, ঐ দেখ নবতুর্গা খাচ্ছে, ওরও ত কোলে কচি।

দিদি। ওর যে মেয়েটা—মেয়েনাড়ীতে সব সয়; তোর যে খোকাটি—বেটা ছেলে, সুখী শরীর, সর্দ্দি হবে যে।

নীরুর মায়ের নির্দ্দেশমতে পরিবেশক দিদির পাতে কয়েকখানি মাছ ও একটা বড় মুড়া দিল—পরে বেয়ান, কাতু, কালীকান্তের স্ত্রী, নীরুর মামী প্রভৃতির পাতেও এক একটি মুড়া দেওয়া হইল। শেষে অনেকের পাতে মুড়া অভাবে বড় ন্যাজাও আনাইয়া দেওয়া হইল। আয়োজন প্রচুর, আহারও হইল প্রচুরতর, ফেলাও গেল প্রচুরতম।

দিদি। বেশ রান্না হয়েছে—খুব খেলুম—নাতনীর বিয়ে বটে। রাণি, দে ত, দই দে আর একটু—চিনিপাতা দই আমি খুব ভালবাসি। (দই খাইতে খাইতে) আঃ, বেশ দইটুকু হয়েছে—এ কি কুটুমবাড়ীর দই?

নীরুর মা। না, এ আমাদের ঘরের। দিদি, আর একটু ক্ষীর নাও, ক্ষীরও নাকি ভাল হয়েছে।

দিদি। (হাত নাড়িয়া) উঁহুঁহুঁ না—না না, করিস্ কি, করিস্ কি, আর কি পেটে স্থান আছে? দই সামগ্রী, তাই একটু চেয়ে খেলুম, দেখ দেখি, আবার ক্ষীর দিলে!

নীরুর মা। আমার মাথা খাও, ঐ ক্ষীরটুকু খাও দিদি।

দিদি। (পরনের কাপড় শিথিল করিয়া দিয়া) আমি আবার ফেলা দেখতে পারি নে—মাথার দিব্যি দিস্ কেন, এই খাচ্ছি।

নীরুর শাশুড়ী। আর একটু ক্ষীর নাও বেয়ান।

দিদি। না ভাই, আর ব'লো না। বেন্, তুমি কি খেলে? এই যে পাতে সব প'ড়ে আছে। মোণ্ডা মেঠাই সকলি প'ড়ে আছে যে! খাও ভাই, সন্দেশটি খাও। নীরু খাবার করেছে বড় সরেস।

নীরুর শাশুড়ী। না বেয়ান, আর পেটে ধরবে না, খুব খাওয়া হয়েছে, ধ'রে তুলতে হবে—নাতজামাই ত এখনও আসে নি, কে ধ'রে তুলবে, তাই ভাবছি।

নীরুর মা। কেন, কমলার বর ত এসেছে, ডেকে দেব না কি?

সকলে হাসিতে লাগিল। তখন সকলে একে একে আচমনের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কতকগুলি ছোট ছোট বৌ ও মেয়েরা মিশিয়া "আমরা ঘাটে আঁচিয়া আসি" বলিয়া খিড়কির পুকুরে গেল।

কালীর স্ত্রী। মাসিমা, আস্থন—খিড়কির বাগান দেখবেন, বড় সুন্দর।

রান্নাঘরের পাশে একটি ছোট দরজা আছে, তাহা দিয়া খিড়কির বাগানে যাইতে হয়, অনেকে সেই দিকে ছুটিল। এ দিকে দাসীরা পাতা কুড়াইতে আসিয়া ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

দাসী। হ্যাঁলা কামিনী, সব পাতাগুলোর মিষ্টি তুই নিবি না কি? আর কারুকে নিতে নেই—না?

কামিনী। ঐ যে অত রয়েছে, তুমি নাও না—এই খান-আষ্টেক পাতা আমি নিচ্ছি বই ত নয়।

শুনিতে শুনিতে আমি খিড়কির বাগানে গেলাম। বাহিরে অনেক কাঙ্গালী আঁচল পাতিয়া বসিয়া আছে—ভুক্তাবশিষ্ট লইবে। কাক, কুকুর, চিল ও কাঙ্গালী মিলিয়া বেশ একটি কলরব তুলিয়াছে।

বাস্তবিক খিড়কির বাগানটি ভারি সুন্দর। একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর, পুকুরের জল স্বচ্ছ, যেন তলাটি পর্য্যন্ত দেখা যায়; ঘাটে চাতাল ও বসিবার জন্য দুই দিকে উঁচু পৈঠা। দুটো বড় বড় বকুলগাছের ছায়ায় ঘাটটি যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি মনোরম। বাগানে অসংখ্য গোলাপ গাছ, এখনও বেশী ফুল ফুটে নাই, দু-দশটি যাহা ফুটিয়াছে, তাহাতেই বাগান আলো করিয়া রহিয়াছে—শরৎকালে যখন ফুল ফোটার সময় হইবে, তখন না

জানি কি শোভাই হইবে। সকলে ঘাটে হাত মুখ ধুইতে ও গল্প করিতে লাগিল। বুঝিলাম, একটু ফাঁকা স্থান পাইয়া তাহাদের বড় আনন্দ হইয়াছে। তার পর গোলাপ তুলিতে গিয়া কেহ কাপড় ছিঁড়িয়া বকুনি খাইল, কেহ হাতে কাঁটা বিঁধাইল, কেহ বকুলফুল কুড়াইতে লাগিল। কিছু ক্ষণ বাগানে বেড়াইয়া আবার সকলে ফিরিয়া আসিল। বাড়ীতে আসিয়া একটি ঘরে সকলে বসিয়া পান খাইতে খাইতে গল্প করিতে লাগিল। একটি রমণী নিজের মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল,—"আরে, তোর কানের এয়ারিং কই? যাঃ, সর্ব্বনাশ করলি! ও মা, কি হবে! সর্ব্বনাশী, সর্ব্বনাশ করলি, কোথা ফেলে দিলি? এত ক'রে শাসিয়ে আনলুম—'গয়না যেন হারায় না—' আলবড্ডে মেয়ে এসেই গয়না হারালে! হায় হায়, কি হবে গো—কোথায় পড়লো—সে—

মেয়ে। (অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে) আমি ত মা তখনি বলেছিলুম যে কান পরবো না, ওর এয়ারিংগুলো বড্ড প'ড়ে যায়।

মেয়ের মা। (মুখ খিঁচাইয়া) কান এখন পরবে না ত পরবে কবে? কান পরলেই হারাতে হবে, সাবধান করতে নেই? (সকলের দিকে চাহিয়া) দেখ ভাই, এমন হতভাগা দুরন্ত মেয়ে যদি আর দুটি আছে! এই এক বছর বে হয়েছে, সৃষ্টির গয়না ভেঙ্গে ছিঁড়ে হারিয়ে ত ছ-নয়-ছয় ক'রে দিলে। কি করবো মা, এই আবার এক ভরি সোনা গুনগার দিতে হবে! আঃ হতভাগি, করলি কি?

ভর্ৎসনায় মেয়ে কাঁদিতে লাগিল। বাড়ীর সকলে গহনার সন্ধান করিতে লাগিল এবং "মেয়েকে ব'কলে আর কি হবে, চুপ কর, আহা, কাঁদছে" বলিয়া মেয়েকে ও মাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "দেখ, হয়ত ঘাটে আঁচাতে গিয়ে ফেলে আসতে পারে, সেইখানে একবার দেখে এস ত!" বাস্তবিক সেইখানেই পাওয়া গেল। মেয়েটি যখন গোলাপ ফুল তুলিবার জন্য টানাটানি করিতেছিল, সেই সময় পড়িয়া গিয়াছে। এয়ারিং পাইয়া মেয়ে ও তাহার মা শান্ত হইতে না হইতে ঘরের আর এক পাশে গোলযোগ উঠিল—"ছেলের হাতের বালা কই?" একটি এক বৎসরের শিশুকে দাসীর কোলে দিয়া তাহার মা আহারে বসিয়াছিল—দাসী ছেলে লইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, দাসীর পিছন হইতে এক হাতের বালা কে ছেলের হাত হইতে খুলিয়া লইয়াছে। আপসোষ,

হা-হুতাশ, দাসীকে তিরস্কার, ছেলের মায়ের প্রতি ভৎর্সনা চূড়ান্ত রকম হইলে পর গোলমাল থামিল—কিন্তু সকলেরই মনে একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়া রহিল।

রাণী। আসুন মাসিমা, আমাদের পাতা হয়েছে। আপনার সকাল সকাল খাওয়া অভ্যাস, আমাদের পাল্লায় প'ড়ে কেবল কষ্ট পাচ্ছেন। গহনা হারানো নিয়ে আরও দু-ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল।

নীরুর মা। আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের ছোট নেই, বড় নেই, গহনা পরতেই হবে। সাহেবদের বেশ, পোষাকেরই জাঁকজমক, অত গহনা পরার ঘটা নেই। কচি ছেলেদের গহনা পরানো ত একেবারেই নেই।

রাণী। তারা দিন রাত্তির দাস দাসীর কাছে থাকে, কত চাকর দাসী নিত্যি আসছে, নিত্যি যাচ্ছে—এক গা গয়না পরানো থাকলে কোন্ দিন কার গলা টিপে দিত, তার ঠিক কি। আহা, এই মাসখানেক হবে, আমাদের পাড়ার একটি ছেলের গলায় একটু ভরি দুয়েকের হারের জন্যে ছেলেটাকে একটা চাকরে মেরে ফেলে পুকুরে গুঁজ্‌ড়ে রেখেছিল। কত থানা পুলিস হ'ল, শেষে কি হ'ল বলতে পারি নে। আহা, ছেলে ত গেল! কানুর ছেলেরা এক গা গহনা প'রে থাকে, আমি ভয়ে মরি!

আমরা আহারে বসিলাম। নীরুর মা বেদানা ও একটু দুধ খাইলেন—বেচারীকে অত্যন্ত শ্রান্ত দেখাইতেছিল—কোন কাজ করিতে হইতেছে না বটে, কিন্তু এই যে একটু আধটু ঘোরাঘুরি, তাহাও তাহার পক্ষে অন্যায় হইতেছে। কি করিবেন—শুইয়া থাকিলে সকলে নিন্দা করিবে!

নীরুর মা। ছোট দিদি আজ থাকবে ত?

আমি। না দিদি, আজ যাই, আবার বিয়ের দিন আসবো—কিছু মনে ক'রো না ভাই! আর কিছুর জন্য নয়—ছেলেটা বড় মা মা করে। ওর জ্ঞানে আমাকেই চেনে, আমার কাছছাড়া কখনও হয় নি; যা স্কুল আপিসে আমায় ছেড়ে থাকে, নইলে বাড়ীতে যত ক্ষণ থাকে, মায়ে পোয়ে একত্রেই থাকি। আমি রাঁধি, সে গল্প করে, আমি আমসত্ত্ব দিই, সে কাগ তাড়ায়, সে ব'সে পড়ে, আমি তাকে বাতাস করি বা না হয় সেই ঘরে বসেই সুপুরি কাটি, ডাল বাছি—এমনি ক'রেই কাটাই।

নীরুর মা। আহা, তা বই কি! ঐটুকু যে সব। ওর মুখ চেয়েই যে জীবনধারণ। তা এস দিদি বিয়ের দিন, সে দিন কলকাতার অর্দ্ধেক

মেয়েছেলে জড় হবে। রাণি, হ্যাঁ রে, ছেলেরা কই এল না? সেই যা সকালে শ্যামাকান্ত এসেছে, আর সব কই?

রাণী। ও মেজকাকীমা, তারা আজ খুব ঠকেছে—নীরু যখন পাকা দেখতে যাবার জন্যে তাদের নিতে গেল, তখন কি কেউ বাড়ী ছিল? তারা আপনারা রেঁধে বেড়ে খাবে ব'লে বাজার করতে গেছে, কেবল শ্যামাকান্ত ছিল, সে-ই এসেছে!

নীরুর মা। এ বে যে ছরকোটের হচ্ছে, ভালয় ভালয় হয়ে গেলে হয়। নগদ টাকা দিতে হবে ব'লে নীরু ত সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছিল; সে বলে, 'ও প্রথা ভাল নয়, আমি ওতে প্রশ্রয় দিব না। আমার মেয়ে পছন্দ হয়ে থাকে, আমি যা দেব, তাইতে সন্তুষ্ট হয়ে আমার মেয়েটি নিয়ে যান, আমি নগদ টাকা দেব না।' বুড়ো ত রেগে গেল, তার পর আবার বুঝি গিন্নি তাড়া দিয়েছে, তাই আমার ভাইয়ের কাছে ঘটক পাঠিয়ে কত মিনতি করেছে; দাদা এসে নীরুর হাতে ধ'রে গায়ে হাত বুলিয়ে রাজি করিয়েছেন। তবুও নীরু বলেছে—সভায় নগদ টাকা ঢেলে দেবে না, আগে পাঠিয়ে দেবে। তারা বলে, সে ত ভাল কথা। বুড়োর টাকা আছে, কিন্তু কিছু কৃপণ—এ-পক্ষের স্ত্রী কিন্তু তেমনি দু হাতে খরচ করছে—টাকার শোকে বুড়ো বাঁচলে হয়!

রাণী। আহা দেখ কাকীমা, তাঁর হ'ল উপার্জ্জনের পয়সা, কত কষ্ট ক'রে তবে হয়েছে, তাঁর ত মায়া হবেই—এ-পক্ষের স্ত্রীর কি বল! বাপ মায়ে ধনের লোভে বুড়োর হাতে দিয়েছে, উনিও কাজেই ধনের সুখ মনের সাধে মিটিয়ে নিচ্ছেন। সময়কালের স্ত্রী যেমন স্বামীর দরদ বোঝে, দোজবরেতে বলে না কি তেমন হয় না।

আহারান্তে রাণী বলিলেন—"ঝি চাকররা খেতে বসেছে, চলুন তাদের একবার দেখে আপনাকে মেজকাকীমার বাড়ীঘর দেখাই।"

উঠানে, রকে, দালানে, চাকর, দাসী, মালী, বাজন্দর, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি আশ্রিত ভৃত্যাদি সকলে আহারে বসিয়াছে। সেখানে দিদি, নীরুর স্ত্রী, নীরুর শাশুড়ী প্রভৃতি দাঁড়াইয়া ছিলেন, আমরাও গিয়া জুটিলাম। রাণী দইয়ের হাঁড়ি হাতে লইয়া পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইল।

নীরুর মা। এস, আমরা দোতলায় যাই, আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে।

দিদি, আমি ও নীরুর মা, এই তিন জনে উপরে গেলাম। সেখানে কালীকান্তের স্ত্রী, কাদু ও আরও কতকগুলি রমণী ঘরে ঘরে ঘুরিতেছিল। নীরুর মা কালীকান্তের স্ত্রীকে বলিলেন, "বড় বৌমা, ছেলেরা কখন আসবে বলতে পার ?" বড় বৌমা বলিল, "তারা ত আসবে না।"

নীরুর মা। সে কি, আসবে না কি ?

কালীর স্ত্রী। তারা যে মাংস-টাংস কত কি বাজার ক'রে এনেছে, তাদের রান্নবান্না হবে ; এখানের নিমন্ত্রণ শুনে হায় হায় করতে লাগলো ; কিন্তু আসবার জো নাই, জনকতক বন্ধুকে যে খেতে বলেছে ! তারা বলেছে, কাল ভোরে আসবে, আর বর ক'নে বিদায় হ'লে তবে যাবে।

দিদি। আমারও পোড়া মন, আমি যদি কাল রাত্তিরে বলি যে, নীরুর মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে, তা হ'লে তারা ত আজ ভোরে আপনারা এসে হাজির হয় ! মেজকাকীর বাড়ী কি তারা নেমন্তন্নর ওয়াস্তা রাখে ? সে ছোটর বাড়ী—নেমন্তন্ন না হ'লে যায় না, আর সেখানে এত আবদারও করে না।

নীরুর মা। ছোট বৌ বিধবা হয়ে পর্য্যন্ত বাপের বাড়ী থাকতেন। তার পর এখন ছেলেগুলি মাথাধরা হ'তে বেরিয়ে বাড়ী করেছেন, তাঁকে ওরা অত চেনে না, আমি ওদের হাতে ক'রে মানুষ করেছি, আমার কাছে সমীহ কি ! রাণী ত আমার ঘরেই শুতো, আমার ঘরেই খেতো। নীরু আর রাণী এক বছরের ছোট-বড় ; নীরু হ'তে রাণীর একটু একটু হিংসা হয়েছিল, রাণী করতো কি—হ'ল নীরুর ক'ড়ে আঙ্গুল কামড়ে দিলে, নয়ত চিম্‌টি কেটে দিলে, নয়ত কাঁথাখানা উঠানে ফেলে দিলে—এমনি করতো, আবার কত আদরও করতো। একত্রে খেলাধুলা—নীরু রাণীকে বড় ভালবাসে, মার পেটের বোনকেও কেউ এর চেয়ে ভালবাসতে পারবে না। ঐ দেখ, আমাদের ছোট বৌ, আর তার বৌ, আর নাতি নাতনী এল। যাই ভাই, একবার নীচে যাই।

দিদি। ছোট বৌয়ের আক্কেল দেখ ! সন্ধ্যা জ্বেলে এখন নেমন্তন্ন খেতে এলেন। আয় আমরা বেড়াই।

দিদি। (অন্য ঘরে গিয়া) এ ঘরে কে শোয় মেজবৌমা ?

"এ ঘরে আমি শুই" বলিয়া মেজবৌমা (নীরুর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী) উত্তর দিল। ঘরে একজোড়া খাট, কড়িকাঠ হইতে মশারি ঝুলিতেছে ;

মশারির ভিতর পাখা। পরিষ্কার বিছানা—প্রস্তুতই আছে। একটি আয়না-টেবিল, তাহাতে নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য—একটি আন্‌লাতে কয়েকখানি শাড়ী কোঁচানো আছে, জ্যাকেট ও শেমিজ দুই একটি ঝুলিতেছে, গোটা দুই কামিজও ঝুলিতেছে—একটি বড় আলমারি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে—একটি গ্লাসকেসে দেশী বিলাতী খেলনা সাজানো—একটি দেরাজের উপর কতকগুলি ধুতি উড়ানি কোঁচানো রহিয়াছে। এটি নীরুর মেজ ভাইয়ের ঘর, দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক ধারে একখানি সোফা ও খানদুই চৌকি—একটি টিপাইও এ ঘরে আছে। দেয়ালে অনেকগুলি ছবি টাঙ্গানো। সে ঘর হইতে নীরুর ঘরে গেলাম। পাশাপাশি দুইটি ঘর—একটিতে খাট বিছানা আলমারি প্রভৃতি প্রায় পূর্ব্বোক্ত ঘরেরই মতন আসবাবপত্র—আর একটিতে নীরুর ছোট ছোট সন্তানেরা থাকে—খুব উঁচু গদিপাতা মেঝেতে বিছানা করা, মশারি ফেলা রহিয়াছে, ছোট ছোট বালিশ পাশ-বালিশ দিয়া প্রত্যেকের শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। ঘরে একটি মাদুরের উপর কাঁথা পাতিয়া একটি চার পাঁচ মাসের শিশু কোলে করিয়া একজন দাসী বসিয়া আছে।

দাসী। মাসিমা, বৌদিদি কোথা গা? আমি যে খোকাকে আর রাখতে পারছি নে। একবার যদি এসে দুধ দিয়ে যান, তবে আবার কত ক্ষণ থাকে। লক্ষ্মীছেলে বলতে হবে—সেই যে বেলা নয়টার সময় বৌদিদি নেবে গেছেন—আর দেখা নেই।

নীরুর মামী। ও মা, তুই খেতে যাস্ নি? সবাই যে বসেছে।

দাসী। থাক্ মা, আমার খাওয়ার জন্যে কি। দেখ, বাছার মুখ দেখ—দেখ দেখ, ঠোঁট ফোলাচ্ছে দেখ, মার মুখ দেখতে পাচ্ছে না ব'লে ঠোঁট ফোলাচ্ছে দেখ—ও ধন, ও মাণিক, কেন যাদু, নিশ্বেস ফেল কেন ধন?

বলিয়া মুখচুম্বন করিতে লাগিল। নীরুর স্ত্রী তাড়াতাড়ি আসিয়া ছেলে লইয়া বলিল, "যাও যাও ঝি, তুমি এইবার ব'স গে; ছোটকাকীমার বাড়ীর ঝি আর তুমি, এই বাকি আছে, আর সবার হয়েছে। রান্নাঘরের রকে তোমাদের পাতা ক'রে দিয়ে এসেছি; ঠাকুরঝি আছেন, তোমাদের সব দেবেন। যাও যাও, ওসব এখন গোছান গাছান মাজা-ধোয়া থাক্, কামিনী এসে করবে এখন।"

দাসী। আমার জন্যে কি বৌদিদি, কাজের বাড়ী—বেলা ত হবেই। ছেলে যে মারা পড়ল।

নীরুর স্ত্রী। কেন, গাইদুধ খাওয়াও নি ?

দাসী। না হ'লে কি রাখতে পারতুম ? কিন্তু এক দিনে অত গাইদুধ খেলে অসুখ হবে যে।

নীরুর স্ত্রী। কি করবো বল, একটার পর একটা কাজ—যাও, এখন তুমি যাও, কামিনীকে পাঠিয়ে দিয়ো।

ঝি চলিয়া গেল। নীরুর স্ত্রী ছেলে শান্ত করিয়া, ছেলে ঘুমাইতেই কাঁথায় শোয়াইয়া একটি নেটের ঢাকা চাপা দিল। কামিনীকে ঘরের কাজ করিতে বলিয়া আমাদের অন্যান্য ঘরে লইয়া গেল। সকল ঘরগুলিই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একটি ঘর বসিবার। নানা গঠনের চেয়ার, সোফা, ফুলদানি, ছবি দিয়া ঘরটি সাজানো। ঘরে একটি হারমোনিয়ামও আছে। নীরুর মামী বলিলেন, "নীরুর সঙ্গে অনেক সাহেব-সুবোর ভাব আছে কি না, তাহাদের মেয়েরা সব বৌমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তাই এই ঘর সাহেবি ধরনে সাজানো। দেখ না—কত মেম আসবে বিয়ের দিন। আমাদের বৌমারা সবাই বেশ ইংরাজী কথা কইতে, গান বাজনা করতে জানেন। ঐ ছবিখানা বড় বৌমার হাতের, ঐ বালিশটা মেজ বৌমা করেছেন, ঐ টিপাই-ঢাকা বড় নাতনীর হাতের।"

সে ঘরের সব দেখিয়া শুনিয়া বারান্দার এক পাশে একটি ছোট ঘরে গেলাম, তাহাতে দুইটি ছোট ছোট উনান। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ ঘরে বুঝি ছেলেদের দুধ জ্বাল হয় ? ও মা, এ কি ! বারান্দায় যে শিল নোড়া, খুন্তি চাটু, এক সংসারের জিনিস সব রয়েছে।"

নীরুর মামী। এ বৌমাদের ঘর সংসার, তা বুঝি জান না ? বৌমারা যে ভিন্ন !

আমি। সে আবার কি রকম ?

বৌমারা হাসিতেছে।

নীরুর মামী। এই দেখ বৌমাদের ভাণ্ডার। দেখাও না গো।

মেজ বৌমা। এখন ছোঁবার জো নেই, আমাদের যে ভাত-খেগো কাপড়।

নীরুর মামী। বটে—আবার এত বিচার !

নীরুর স্ত্রী। বিচার না করলে ত মা আমাদের হাতে খাবেন না।

নীরুর মামী। তবে শোন ছোট্‌ঠাকুরঝি, বলি—ঠাকুরঝি বলেন কি যে, এখনকার মেয়েরা খালি লেখাপড়া শেখে, ঘরকন্নার কাজ শেখে না, এটা ভাল নয়; তাই তিনি করেন কি, ছোট ছোট বৌঝিয়েদের হপ্তায় তিন দিন ক'রে রাঁধতে হবে নিয়ম ক'রে দিয়েছেন—গৃহস্থের সকলের রান্না নয়, নিজেদের মতন। এক দিন সকালে রাঁধে, এক দিন বিকেলের জলখাবার করে, এক দিন রাত্রের খাবার করে, ক'রে আপনারা খায়, যে দিন ভাল হয়, শাশুড়ী দেওরকে আদর ক'রে খাওয়ায়। এই যে দুটো জালের আলমারি দেখছ, এর একটায় চাল ডাল, ঘি ময়দা, তেল নুন, চিনি মশলা, সব আছে—আর একটায় তরিতরকারি, ফল, জলখাবারের সন্দেশ-টন্দেশ, মিছরি, বার্লি, সাবু, এরারুট, এই সব থাকে। ঐ দেখ, ঐ তাকে সব পাথরের বাসন; ঐ দেখ, ঐ তাকে কাঁসা পিতলের বাসন। ঐ বৌদের শিলনোড়া, যে দিন যা রাঁধতে ইচ্ছা হবে, আপনারা তার মতন মশলা-টশলা বেটে ঘ'ষে নেবে। আপনারা রাঁধবে, আপনারা খাবে—সেই সেই দিন সেই সেই বেলা তারা হেঁসেলের রান্না কিছুই পাবে না।

দিদি। মেজ বৌ বিধবা মানুষ, সে ঐ পুঁটে পুঁটে বৌগুলো নাতনী-গুলোর হাতে খায়?

নীরুর মামী। ঠাকুরঝি বলেন যে, তা না খেলে ওদের যত্ন আর উৎসাহ হবে কেন? ওরা আবার আচার-বিচার শিখবে কেন? হয়ত এঁটো হাতটাই কাপড়ে দিলে, নয়ত আঁশ হাতটাই ভাঁড়ারে দিলে—সব রকম শিক্ষা দরকার। তা সত্যি, বৌয়েদের এমন আচার-বিচার আর ওরা এমন পরিষ্কার যে, ওদের হাতে খেতে ভক্তি হয়। ঐ দেখ, ওদের রাঁধবার কাপড় সব কাচা কোঁচানো রয়েছে। ওরা দু-জন ক'রে এক-এক দিন রাঁধে; একজন রাঁধে, একজন যোগাড় দেয়। জল পর্য্যন্ত তুলে আনতে হয়—ঐ যে কতটুকু কলসী দেখ না। কুট্‌নো, বাট্‌না, চাল ধোয়া, এই সবই ওরা নিয়ম ক'রে করে। আট বছরের হ'লেই রাঁধতে হয়। ঐ যে বারান্দায় ক্ষুদে উনুনটি—ঐটি অ্যাপ্রেন্টিসদের; ওতে হাত পাকলে তবে ঘরে ঢুকতে পায়।

নীরুর মা। (আসিয়া) কি ভাই, আমার ছেলেমানুষি দেখছ?

আমি। ছেলেমানুষি কি ভাই—এ ত তুমি বেশ ব্যবস্থা করেছ।

নীরুর মা। কি করি, আমি দেখলুম—নীরু তো সাহেব হয়েছে, মেয়েদের বৌদের ইংরাজী শেখার জন্য একজন মেম রেখে দিয়েছে, হপ্তায় তিন দিন ক'রে মেম এসে তাদের শেলাই, ইংরাজী আর হারমোনিয়াম শেখায়। আমিও হপ্তায় তিন দিন তাদের ঘরকন্না শেখাবার ব্যবস্থা করলুম। আবার এটাও ত দেখতে হবে যে, ওদের চাপাচাপি বোধ না হয়। ওরা পোড়া-ঝোড়া যা দেয়, আমি আহ্লাদ ক'রে খাই ব'লে ওদের বড় আনন্দ হয়। আমি ওদের রান্নার কাছে গিয়ে কখনও টিক্‌টিক্ করি নে, যা ইচ্ছে নিজেরা করুক। কি দিয়ে কি রাঁধতে হবে আমাদের জিজ্ঞাসা করে, আবার রান্নার বইগুলোও কিনে দিয়েছি, তাতেই কাজ চলে যায়। এখন আমার মেজ বৌমা আর সেজ বৌমা রাঁধতে পারেন।

আমি। বড় বৌমা রাঁধেন না ?

নীরুর মা। তিনি খুব ভাল রাঁধতে পারেন, কিন্তু কখন রাঁধবেন ? তাঁর ছেলেতে মেয়েতে বলতে নেই, মা ষষ্ঠী বাঁচিয়ে রাখুন, দশটি—সকলের নাম ধ'রে কেমন আছিস জিজ্ঞাসা ক'রে উত্তর শুনতেই তাঁর দিন কাবার—তিনি রাঁধবেন কখন ! মেজ বৌমা সেজ বৌমাকেও আর নিয়মে রাঁধতে হয় না, তাঁরা এখন আউট—পাস হয়ে বেরিয়েছেন—ছোট ছোটরা রাঁধে। আপনারা ডাল ভিজোয়, ডাল বাটে, বড়ি দেয়, জাঁতায় ডাল ভাঙ্গে। মাসকাবারি এলেই আমি কিছু কিছু জিনিস ওদের ফেলে দিই, ওরা ওদের ভাঁড়ারে ঝেড়ে বেচে তোলে।

আমি। বেশ দিদি, বেশ কর। এতে ওদের শিক্ষাও হয়, মনও প্রফুল্ল থাকে—সকলে মিলে মিশে কাজ করে, তাতে একটা পাবিবারিক আত্মীয়তাও থাকে।

নীরুর মা। এখন আমার ভাঁড়ারের কাজ আমার সঙ্গে মেজ বৌমা ও সেজ বৌমা করেন ; সংসারের সব ওঁরাই দেখেন।

আমি। মেজদিদি, তোমার ছেলেরা কি সকলেই উপার্জ্জন করতে শিখেছে ?

নীরুর মা। পড়া সবারই শেষ হয়েছে, ছোট এইবার বি. এল. দেবে—কিন্তু রোজগার ভাই সব নীরুর, নীরু হ'তেই যা দেখছ সব। ওরা এখনও বিশেষ কিছু আনতে পারে না—মেজটির ওকালতিতে বিশেষ কিছু হ'ল না,—সে মুন্সেফিতে নাম লিখিয়েছে। সেজটি ডাক্তার, ন'টি

ইঞ্জিনিয়ার, এই নতুন চাকরি হয়েছে। নীরুর ইচ্ছা, ছোটকে বিলাতে পাঠায়—তা দেখি কি হয়, সে যা বলবে তাই হবে।

দিদি। এই যে ছোট বৌ, খাওয়া হ'ল? (তাহারা প্রণাম করায়) বেটা দুটি বেঁচে থাক্, গতর সুখে থাক্। হ্যাঁ লা, একেবারে সন্ধ্যা জ্বেলে কি আসতে হয়? ছেলেরা এসেছে?

রাণীর সহিত তাহার ছোট কাকী ও তাঁহার বধূ প্রভৃতি আসিয়া একে একে আমাদের প্রণাম করিতে লাগিল।

ছোট বৌ। ঘর সংসার গুছিয়ে তবে ত আসা, এই করতে করতেই বেলা গেল। ছেলেরা বৌয়েরা সবাই এসেছে। তুমি কখন এলে?

দিদি। আমি কোন্ ভোরে এসেছি, এসে গায়ে হলুদ দিলুম—ঘর সংসার ত সবারই বারো মাস আছে, তা ব'লে কি আপনার জনকে ভুলে থাকবো? থাকিস ত সেই কাছাকাছি, এক দিন বেড়াতেও কি যেতে নেই? এই দেখ্, আমার ছোট বোন এসেছে দেখ্।

আমি প্রণাম করিতে গেলাম, তিনি থাক্ থাক্ বলিয়া আমার দুই হাত ধরিলেন। দিদির ছোট জা মোটাসোটা, রং ময়লা, একটিও দাঁত নাই, বয়স কত অনুমান করা যায় না।

দিদি। তা ও তোকে প্রণাম করতে পারে, তুই ওর চেয়ে বড়; ও আমার কালীকান্তের বয়সী, কালীকান্ত তোর চেয়ে ঢের ছোট। কালীকান্ত যখন এক বছরের, তখন তোর বে হয়।

কালীর স্ত্রী। মেজ কাকীমা, এইবার আমাদের বিদায় করুন, সেখানে আবার যজ্ঞি ফেঁদে সব ব'সে আছে; কি যে করছে, তাই ভাবছি। তারা যে দিন রেঁধে বেড়ে খেতে যায়, আমার ভয় করে। বাজারে যাবার সময় ব'লে যাবে—তোমাদের কিছু আমরা চাই নে, সব কিনে আনবো—রান্না চড়িয়ে পাঁচ-শ বার আমার কাছে আসবে—তেজপাতা দাও—একবার এল পাঁচফোড়ন দাও—আবার এল ঘি দাও, কম হচ্ছে—আবার এল লঙ্কা দাও—এই কাণ্ড করবে। ও-শনিবারে করেছে কি—পোলাওটা ধরিয়ে ফেলেছে—রাত তখন দশটা বাজে, বিজয় ঠাকুরপো এল—বৌদিদি শোন, খান দশ বারো লুচি দিতে পার?—আমি বললুম, কেন?—না, পোলাওটা একটু ধ'রেও গেছে বটে, গ'লেও গেছে বটে, সেটা তেমন মুখরোচক হয় নি, অ মাংস আমাদের যথেষ্ট আছে, তাতেই পেট ভরবে,

তোমরা যেমন ভাতের সঙ্গে তরকারি দাও, আমরা তেমনি মাংসের সঙ্গে লুচি খাব, দু-দশখানা হ'লেই হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তোমরা ক'জন? বললে, বেশী নয়, এই জন ষোল। আমি বললুম, জন ষোলয় আট দশখানা লুচি খাবে কি ক'রে? বললে, ও ঠিক হবে, তুমি দাও না— ব'লে আরও কত বক্তৃতা করলে। আমি বললুম, চল, নীচে যাই, দেখি কি করতে পারি, তোমার বক্তৃতা রাখ। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি যে, ভাতটি সবে ফুটে উঠেছে—মেয়েরা পান্তা খেতে চেয়েছিল, তাই এক হাঁড়ি ভাত রেঁধে রাখতে দেওয়া হয়েছিল। ঠাকুরকে বললুম, ঠাকুর, ঐ আধকাঁচা ভাতের ফেন গাল, আমি আসছি। ভাঁড়ারঘরে গিয়ে চাট্টি ছোট এলাচ, বড় এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা, জাফরান, আধ সের দুধ, আধ সের মাখম-মারা ঘি নিয়ে এসে ঠাকুরকে বললুম, দাও—ঘি-ভাত ক'রে দাও। ঠাকুর ডেকচিতে ক'রে ঘি আর সেই ভাত আর মশলা চড়িয়ে দিলে, জাফরান বেটে দুধে গুলে ছেড়ে দিয়ে নুন দিয়ে দমে বসালে। জলখাবারের জন্যে বাদাম পেস্তা ছাড়ানো ছিল, তাও দেওয়া হ'ল—কুড়ি মিনিটের মধ্যে খাসা ঘি-ভাত তৈরি হয়ে গেল। ঠাকুরপো এত ক্ষণ চোরের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে, মুখে বাক্যি নেই, দেখছে আমি কি করি, যেমন হাঁড়ি নাবলো আর হুরে ক'রে লাফিয়ে বাহিরে গেল। বামন ঠাকুর হাঁড়িশুদ্ধ দিয়ে এল, তখন সব ভোজনে বসল।

রাণী। খাচ্ছে আর 'জয় অন্নপূর্ণার জয়' ব'লে চেঁচাচ্ছে—তার পরদিন কয় ভাইয়ে ফুলের মালা, তোড়া নিয়ে এসে বৌকে পূজো করবে—সেই ফুল দিয়ে বৌকে ভূষিত করলে, পায়ে চন্দন মাখালে, শাঁখ বাজালে, কত নকল যে করলে!

কালীর স্ত্রী। তাই বলছি আজ যাই, বেলাও গেছে, আবার নন্দাই দুটি আসবে।

নবদুর্গা। (মায়ের সন্ধানে আসিয়া) হ্যাঁ গা, আমার মা কই? এই যে—ও মা, বাড়ী যাবে না? ছোট কাকা কি ব'লে দিলে মনে নেই? এই বেলা চল, তারা যে ব'সে থাকবে।

কালীর স্ত্রী। কি ব'লে দিলে? আমি ত শুনি নি!

নবদুর্গা। বেশ ত তুমি! ব'লে দিলে যে, আজ আমরা শুধু মাংসই রাঁধব, তোমরা লুচি, কচুরি, পাঁপরভাজা, সন্দেশ, এই সব নিয়ে এস, সকাল

ক'রে এস। আবার বললে, চিনিপাতা দই এন, ভবানীপুরের দই খুব ভাল হয়।

কালীর স্ত্রী। আমি খালি দইয়ের কথা শুনেছি। দেখলে মেজ কাকীমা, ঐ দেখ, ওরা কি তোমাকে অমনি ছাড়বে? চল, আমাদের বিদায় কর। সবগুলি গুণে গেঁথে গাড়ীতে উঠতেই একটি ঘণ্টা যাবে। ন'ঠাকুরঝি, তুই ভাই সবাইকে জড় ক'রে খিড়কির কাছে নিয়ে দাঁড়া আমি খাবার নিয়ে যাচ্ছি। মাসিমা চলুন।

বড় বৌমা সকলের কাছে বিদায় লইয়া খাবার লইতে গেল—রাণী ও নীরুর মা সঙ্গে গেলেন। কাত্থ ছেলেদের সন্ধান করিতে লাগিল—তাহাদের পাওয়া যায় ত তাহাদের জুতা পাওয়া যায় না; জুতা পাওয়া যায় ত ধুতি পাওয়া যায় না; ধুতি মিলিল ত কোট কই? যখন আসিয়াছিল, জামা, ধুতি, জুতা সব পরিয়া আসিয়াছিল, যাইবার সময় কাহারও খালি গা, ধুতিপরা—কাহারও শুধু কোট গায়ে, ধুতি পুঁটুলিতে চলিল; কাহারও শুধু জুতা ও মোজা পায়ে আছে, বাকি সমস্তই পুঁটুলিজাত হইল—কোন মেয়ে একটা ফ্রক্ পরিয়াছে, কেহ একখানা শাড়ী। যা হোক, কোন মতে তাহাদের সংগ্রহ করিয়া একে একে গাড়ীতে উঠানো হইল। মস্ত এক চেঙ্গারি খাবার, ক্ষীর, দই, সন্দেশ লইয়া একজন চাকর গাড়ীর ছাদে উঠিল—বেটাছেলেরা খাবে বই ত নয়, সুতরাং কোন আচার-বিচারের আবশ্যকতা ছিল না। দাস দাসী দরোয়ান, সকলেই নূতন রং-করা বস্ত্র বক্‌শিশ পাইয়াছে, সকলেরই হাসিমুখ। তিনখানি গাড়ী পূর্ণ করিয়া আমরা ফিরিয়া চলিলাম। দিদি ও রাণী সেখানে রহিলেন। বিবাহের দিন যাইবার জন্য সকলে আমাদের অনেক অনুরোধ করিলেন।

তখন সন্ধ্যাকাল, সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছে, আমরা গড়ের মাঠ দেখিতে দেখিতে চলিলাম। বড় বড় জুড়ি গাড়ীতে সাহেব মেম হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে—কলিকাতায় এত সাহেব মেম আছে? আর ঐশ্বর্য্যও কি সব তাদের? বড় বড় জুড়িতে কেবলই ত সাহেব মেম! মধ্যে দু-একখানা গাড়ীতে বাঙ্গালী কিম্বা মারোয়াড়ী দেখিলাম। যেমন অন্ধকার হইতে লাগিল, অমনি গ্যাসের আলো জ্বলিয়া শহর আলোকিত করিল—পথে আলো, দোকানে আলো, বাড়ীতে আলো,—আলোয় আলোয় সাহেবদের বাড়ীগুলি যেন হাসিতে লাগিল।

ক্রমে আমরা বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। ছোট ছেলেরা চ্যাঁ ভ্যাঁ লাগাইয়া দিল—যাহারা গিয়াছিল, তাহারা ঘুমাইতে চায়—যাহারা ঘরে ছিল, মাতাদের দেখিয়া তাহাদের অভিমান উথলিয়া উঠিল, "আমাকে নিয়ে গেলি নে কেন? তুই কেন নিয়ে গেলি নে?" বলিয়া বায়না ধরিল। প্রথমে তাহাদের মা হাসিল, একটু আদরও করিল, ক্রমে ছেলের স্পর্দ্ধা বাড়িতে চলিল, কেহ মাকে মারে, "কেন নিয়ে গেলি নে"—কেহ মাথার কাপড় খুলিয়া দেয়, "কেন নিয়ে গেলি নে"—তখন তাহাদের মায়েরাও নিজ মূর্ত্তি ধরিল, চড় কিল বসাইয়া দিল। তাহাদের ক্রন্দনের রোলে বাহির হইতে হরকান্ত আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তাই ত বলি—চণ্ডীরা বাড়ী এসেছেন! না হ'লে এত সোরগোল কিসের! এখন বৌদিদি, ছেলে ঠেঙ্গানো স্থগিত কর—আমাদের উপায় কি ক'রে এসেছ বল দেখি?"

কালীর স্ত্রী। (একটা বেত দেখাইয়া) ছেলে ঠেঙ্গানো হয়ে গেছে, এখন গরু ঠেঙ্গাব, তাই পাচনবাড়ি সংগ্রহ করেছি।

হরকান্ত। না না, সে ত অন্নপূর্ণার কাজ নয়—শাস্ত্রে লেখে, অন্নপূর্ণা অন্ন দান করেন। পাচনবাড়ি শ্রীকৃষ্ণের দরকার, আমরা বরং শ্রীকৃষ্ণের জাতি, আমাদের হাতে লাঠি সোঁটা মানায় ভাল। তোমরা হ'লে সাক্ষাৎ ভগবতী, আর তুমি ত দেবী অন্নপূর্ণা—দাও বৌদিদি, কি এনেছ, পেট জ্ব'লে যাচ্ছে!

আমি। কেন? তোমরা বিকেলে চপ্ কট্‌লেট্ খাও নি?

হরকান্ত। আর মাসিমা, ভাগ্যলক্ষ্মী কি সব সময়েই সদয় থাকেন? আজকের কেমন অযাত্রায় বাজার যাওয়া গেল, আর পাঁচ মিনিট পরে গেলে নীরুদার বাড়ী খেয়ে খেয়ে পেট ফেটে যেত। অদৃষ্টের ফের! বিজয়দা রান্নার ফন্দি তুললেন! অত বেলায় ভাল মাংস-টাংস কিছু পাওয়াও গেল না, চপ্‌গুলো ভাজতে গিয়ে ছেড়ে ছেড়ে গেল, কট্‌লেটগুলো চুঁয়ে গেল—তাই ত অন্নপূর্ণার অর্চ্চনা করতে এসেছি।

বিজয়। (আসিয়া) হরা, আমাদের ফাঁকি দিয়ে খাচ্ছিস না কি? খবর নিতে এলি—বৌদিদি এসেছেন কি না, আর এইখানেই জ'মে গেছিস—খাচ্ছিস বুঝি?

কালীর স্ত্রী। এস না, তোমাকেও খাওয়াচ্ছি ভাল ক'রে! (বলিয়া বেত দেখাইল।)

বিজয়। ও হরাকে দাও বৌদিদি, ওটা অতিশয় নির্লজ্জ, এক পেট খেয়েও খাওয়ার নিন্দা করছে। পিসিমার ভয় হয়েছে নিশ্চয় যে, আজ তাঁর গোপালের কি দশা হ'ল! না পিসিমা, ভয় পেও না, যে দু-একখানা ভাল ছিল, তা তাঁকেই দিয়েছি।

দেখি, গণেশ হাসিতে হাসিতে একটি ছোট ছেলের হাত ধরিয়া আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া বিজয় বলিল, "এই নাও পিসিমা, তোমার ছেলে, আমার কথার সত্যি মিথ্যা জেনে নাও—দেখ দেখি গণেশদা, আজ একটু বাড়ী বাড়ী মনে হচ্ছে না?"

গণেশ। আমাকে এই ছেলেটি যে ডেকে আনলে।

বিজয়। আমি ডেকে আনতে ব'লে দিলুম যে। জামাইয়ের মত বাইরে থাক কেন?

আমি। তোমরা বৌদিদির কাছে যে সুখাদ্যের সন্ধান পেয়েছ, তাতে ভাইটিকে মনে পড়বারই কথা বটে! বৌমা, ও ভাল খাবারটি বাছা তোমার পুরনো দেওরদের দাও, নূতন দেওরকে মা তুই একখানা লুচি কচুরি দিলেই হবে।

বিজয়। পিসিমার বেশ বিচার যা হোক! কোথায় বৌকে শাসন করবেন—না, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া—একে কলিকালের মেয়ে, তাতে শাশুড়ীর আদর—আজ কপালে অনেক কষ্ট আছে!

কালীর ছেলে। (আসিয়া) ছোটকাকা, কি করছ? বাহিরে সবাই যে ছটফট করছেন—বলছেন যে, মহাভারতের পঞ্চ পাণ্ডবের জল আনার মত, যে যায় সেই যে ফেরে না।

কালীকান্তের স্ত্রী ঝোড়াশুদ্ধ খাবার বাহির করিয়া আনিল। বিজয় বলিল, "নিজের ছেলেকে দেখেই অন্নপূর্ণার অন্ন উথলে উঠল। দাঁড়া বাবা, আজ তুই খানিক ক্ষণ সামনে দাঁড়া—আর কি কি আছে, সব আগে বের হোক, তবে যাস।"

কালীর ছেলে। বিজয় কাকা, মাংস চড়িয়ে এসেছ, তা মনে আছে? কাউকে যে হাত দিতে বারণ ক'রে এসেছ, সে এত ক্ষণ ধোঁয়া উড়ছে।

"তাই ত বটে, দেখিস বাপ, ছেলেকে বঞ্চিত করিস নে, যা জোগাড় হয়, সব বাহিরে আনিস" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

গণেশ। (কাছে আসিয়া) মা এস, আমার ঘর দেখবে এস।

এ বেলা গণেশের মুখ প্রসন্ন। গণেশের ঘরে গিয়া দেখি, জোড়া খাট পাতা হইয়াছে, কয়েকখানি চেয়ার, একখানি সোফা, বারান্দায় ছু-তিনখানি ইজি চেয়ার ; টেবিলের উপর দোয়াত কলম, চিঠির কাগজ ; একটি শেল্‌ফ, তাহাতে কয়েকখানি বই সাজানো ; একটি ফুলদানি, তাহাতে একটি ফুলের তোড়া ; দেয়ালের গায়ে একটি আন্‌লা, তার পাশের দেয়ালে একখানি আয়না ও একটি ব্র্যাকেট, তাহাতে চিরুনি ব্রাশ সমস্ত সাজানো ; এক পাশে গণেশের ট্রাঙ্ক।

আমি। এ সব কি রে ? তোর ঘর এমন ক'রে কে সাজালে ? এত আসবাব পেলি কোথা ? বেশ হয়েছে ! কেবল একটি জিনিসের মাত্র অভাব আছে !

গণেশ। মা, বিজয় খুব বুদ্ধিমান্—এক মুহূর্ত্তে বুঝে নিয়েছে, কি হ'লে আমি সন্তুষ্ট হই। আজ এই সব আসবাবের কতক কিনে আনলে, কতক বাড়ী থেকে গুছিয়ে গাছিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে ঘর সাজিয়ে আমাকে এনে দেখালে। দেখ মা, কলম পোঁছাটি, কাগজ চাপাটি পর্য্যন্ত সব এনেছে। বিজয় যেমন বুদ্ধিমান্, তেমনি লোককে যত্ন করতে ! বড় দাদা তাই জন্যে আমাদের ভার বিজয়ের উপর দিয়েছেন। শুনলুম, বড় দাদা বিজয়কে খুব ভালবাসেন।

বিজয় ডাকিল, "গণেশদা, গণেশদা কোথায় গেলে ? এদিকে যে সব ফুরিয়ে গেল।" "যাই" বলিয়া গণেশ সাড়া দিয়া বলিল, "মা, তোমার সন্ধ্যাবন্দনা হয় নাই ? যাও, সেরে সুরে নাও গে, আমিও খেয়ে আসি—অনেক গল্প আছে। আজ ত আর তোমার দিদির "স্নেহের ক্রোড়" নেই, কাজেই আমি দয়া ক'রে তোমাকে স্থান দিলে তবে তুমি আজ রাতে শুতে পাবে। কেমন জব্দ মা !"

সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিয়া দোতলায় যাইয়া দেখিলাম, বাহিরে ছেলেদের আহার শেষ হইয়াছে, জামাই ছুটি বাড়ীর ভিতর আসিয়াছে। তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া আমি গণেশের উদ্দেশে চলিয়া গেলাম। জামাইদের লইয়া মেয়েরা বৌয়েরা রহস্যালাপ করিতেছে, আমি থাকিলে তাহাদের সঙ্কোচ বোধ হইবে।

গণেশ তখনও ঘরে আসে নাই, আমি দক্ষিণের বারান্দায় গিয়া বসিলাম। বড় শ্রান্ত বোধ হইতেছিল। কয় দিন হইতেই কলিকাতা

আসিবার জন্য জিনিসপত্র গোছান-গাছান প্রভৃতি শারীরিক পরিশ্রমের সহিত মনের মধ্যে একটা উদ্বেগও ছিল ; আসিয়া পর্য্যন্ত বিশ্রাম পাই নাই, কয়েক দিনের পর আজ এই একটু শ্রান্তি দূর করিবার নিরিবিলি অবসর পাইয়াছি। শ্রাবণের শেষ, দুই দিন বৃষ্টি হয় নাই ; শুক্লপক্ষের নবমীর চাঁদ ঘুমন্ত জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিয়াছে, আমি অলসনেত্রে বাগানের দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম। অনেক ক্ষণ পরে গণেশ আসিয়াই আমার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল ও আমার হাত লইয়া নিজের মাথায় রাখিয়া বলিল, "মা, কি ভাবছ ?"

আমি। কিছু নয় বাবা—

গণেশ। তবে অমন ক'রে ব'সে আছ কেন ? তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে।

আমি। (গণেশের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) না বাপ, কিছু নয়, একলাটি ব'সে আছি, তাই। ক'দিনের গোলমালে অমন একটু শুকনো দেখায়—দেখ্ দেখি, তোর কি শ্রী হয়ে গেছে—রং কালি ঢেলে দেছে, রোগা হয়ে গেছিস—

গণেশ। আর চোখের কোল ব'সে গেছে, গাল চড়িয়ে গেছে, আর কি কি হয়েছে ব'লে ফেল ! আমার তুমি সব দেখ, নিজের কিছু দেখতে পাও না।

আমি। বল্, তোর কি কথা আছে বল্।

গণেশ। আগে তুমি কি দেখলে-টেখলে বল, শেষে আমার কথা বলব এখন।

আমি। দিদির মেজ জায়ের বাড়ী গিয়েছিলুম, তাঁর নাতনীর বিয়ে, আজ গায়ে হলুদ কি না—তাঁরা বেশ লোক, খুব আদর যত্ন করলেন—ঘরদ্বার বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—খাবার করেছেন অঢেল—যদিও আমার অতটা করা বাজে খরচ ব'লে মনে হয়, কিন্তু শুনলুম যে, আজকাল সর্ব্বত্রই ঐ নিয়ম, একজন যদি না করেন, তবে নিন্দা হবে।

গণেশ। কি কি খাবার হয়েছিল, মা বল।

আমি। কত নাম করব—ভাত ছিল, তার সঙ্গে তিন রকম ডাল, ভাজা, চচ্চড়ি, শুক্তনি, ঘণ্ট, ডালনা, অম্বল সমস্ত—আবার পোলাও কালিয়া—আবার লুচি কচুরি—ক্ষীর দই ছিল, পরমান্নও ছিল। সেকালে আমাদের দেশে পাড়াগাঁয়ে যদি ভাতের যজ্ঞি হ'ত—ভাত তরকারি মাছ,

এ সব হ'ল, শেষকালে দই সন্দেশ অথবা জিলিপি অথবা পান্তুয়া, যা হোক এক রকম মিষ্টি—বেশী হ'ল ত দু-রকম মিষ্টি আর পরমান্ন। যদি লুচির যজ্ঞি হ'ল—লুচি, ছোকা, পটল অথবা বেগুন ভাজা, হয়ত একটা শাকভাজা, ক্ষীর দই, চার পাঁচ রকম মিষ্টান্ন—এই হয়ে গেল। আরও উৎকৃষ্ট হ'ল ত কচুরি, পাঁপরভাজা—এই পর্য্যন্ত। এখনকার লোকে তেমন খেতে পারে না, কিন্তু খাবাব আড়ম্বর খুব বেড়ে গেছে দেখছি।

গণেশ। আর কি দেখলে বল—সুন্দর সুন্দর অবিবাহিতা মেয়ে দেখলে না ?

আমি। (হাসিয়া) একটাও না—যে মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে, সেটি বেশ দেখতে, তা বই আব ত একটাও ভাল দেখলুম না।

গণেশ। হাসছ কি—তুমি ত ঐ লোভেই গেছলে! আজ পাঁচ বছর ধ'রে তোমার ত আর কোন কাজ নেই, কেবল কার ঘরে সুন্দর মেয়ে আছে, এই সন্ধানে আছ। তোমাকে বাড়ী থেকে টেনে বের করা যায় না, আজ এক কথায় যে তুমি নিমন্ত্রণে দৌড়লে, আমি বুঝি আর তোমার মতলব বুঝতে পারি নি! দেখ মা, কেমন ধরা পড়েছ!

আমি। (হাসিয়া) আমি ধরা পড়ি আর না পড়ি, তুই ত ধরা পড়লি ? তোর এখন সদাই বৌয়ের চিন্তা। তাই ত, কোথায় একটি ভাল মেয়ে পাই! শুধু রূপ দেখলেই ত হবে না, গুণ থাকা চাই আগে। পশ্চিমে সব সুন্দর দেখে দেখে চোখ এমন হয়ে গেছে যে, এ দেশে যা দেখি, তাই কেমন কালো কালো ছোট ছোট ব'লে মনে হয়।

গণেশ। মা দেখেছ, এখানকার গরু ছাগল পর্য্যন্ত কেমন ছোট ছোট আর নির্জীব রকম ? সাধারণ মানুষের রংও ময়লা, আর লম্বায়ও খাটো। তাই ত মা, তবে ত বড় চিন্তার বিষয়—বৌ কোথায় পাওয়া যায় ?

আমি। আচ্ছা আচ্ছা, তখন দেখা যাবে বৌ কোথায় পাওয়া যায়। তোর ত সে ভাবনা নয়, সে ভাবনা আমার। সুন্দর না পাই না পাব, আমি কালো বৌই করব—তোর কি ? তোকে আমি যা দেব, তাই তুই নিবি।

গণেশ। এই ত মা, এই জন্যেই ত অবাধ্য ছেলে হ'তে হয়। আমি ত বলি, কালোই কি, সুন্দরই কি, বৌ মোটেই দবকার নেই—বেশ মায়ে-পোয়ে সুখে আছি, আবার এর মধ্যে পরের মেয়ে এসে যদি ঠিক

না মিশে যায়, তবেই এই সুখটুকু হারাতে হবে—কেন এ ঝঞ্ঝাটে যাওয়া ?

আমি। তোর পুরনো কথা রাখ্—বল্, নতুন কি কথা আছে বল্।

গণেশ। তুমি ত মা কিছুই বললে না—আর কি দেখলে, বল—কত লোক এসেছিল, কার সঙ্গে আলাপ হ'ল—সব বল আগে।

আমি। এসেছিল অনেক, আমি কি সবাইকে চিনি ? গায়ে হলুদ খুব দিয়েছে, ঘি ময়দা তরকারি পর্য্যন্ত—এত আড়ম্বর ক'রে এ সব পাঠানো কেন নিয়ম হয়েছে, তা বুঝতে পারি না—কেবল লাভের মধ্যে উভয় পক্ষের লোকজন বিদায় কবতে আর তাদের খাওয়াতে যে খরচ হয়, তাতে আর একটা বিয়ে দেওয়া যায়। গায়ে হলুদে তাঁরা যা দিয়েছেন, এঁদের আবার ফুলশয্যায় তাই দিতে হবে। এদের বাড়ীই দেখে এলুম, নীরু ব'লে দিলে, যে সব জিনিস নষ্ট হবার নয়, তা অমনি রেখে দাও, ফুলশয্যায় যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কেবল লোকজনের লাভ বই আর কি। আর কি দেখলুম ?—বাগানটি বেশ। আর সব বৌ ঝি কত রকমের কাপড় গয়না প'রে এসেছে, তার মধ্যে আবার গয়না হারাল, এই সব গোলমাল। আমি আর বকতে পারি নে, পরশু ত তুই বিয়েতে যাবি, দেখিস সব।

গণেশ। আচ্ছা, এবার আমার কথা বলি। পিসিমার বাড়ী গেছলুম, তাঁর সঙ্গে দেখাও ক'রে এসেছি।

আমি। পিসিমা কি বললেন ? তোকে দেখে কাঁদতে লাগলেন ?

গণেশ। সে কি কান্না! কত আদর করলেন—ছেড়ে দিতে কি চান! অত বড় মস্ত বাড়ী, কেহ কোথাও নাই, কেবল গোলা পায়রাগুলো ঝট্‌পট্ করছে, বক্-বকম্ করছে—দেউড়িতে দরোয়ানগুলো ব'সে ব'সে সিদ্ধি ঘুটছে। পিসিমার সমস্ত কথার মধ্যেই 'তাঁর কেউ নেই' ভাবটা ফুটে উঠে। কে একজন শ্যামসুন্দর আছেন বোধ হয় পিসিমার পুষ্যিপুত্র—বললেন, শ্যামসুন্দরকে নিয়েই আছি। কাল ভোরেই মা গাড়ী আসবে, তোমাকে নিয়ে যেতে হবে। দরোয়ান আজ এসে বাড়ী দেখে গেছে।

আমি। কালই যেতে হবে ?

গণেশ। হ্যাঁ মা। পিসিমা বললেন যে, আমি আর থাকতে পারছি নে, এখনি বৌকে আন। যখন শুনলেন—তুমি ভবানীপুরে গিয়েছ, তখন

কালকের জন্য ব্যবস্থা হ'ল। মা, পিসিমা বলছেন যে, তাঁর বার-বাড়ীর দোতলা সমস্ত প'ড়ে আছে, সেইখানে গিয়ে আমাদের থাকতে।

আমি। না বাবা, এখানে যখন এসে নেবেছি, তখন একেবারে বাস্ উঠিয়ে যাওয়া কি হয়? দেখ, এঁরা কত যত্ন করছেন, তবে মাঝে মাঝে গিয়ে দু-চার দিন থাকা যাবে। কাল না হয় সেইখানেই থাকব, সেইখান থেকে পরশু ভবানীপুরে যাব। চল্ বাবা, মাটিতে শুয়ে আছিস, বিছানায় শুই গে।

মায়ে পোয়ে অনেক ক্ষণ গল্প করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। গণেশ ডাকিতেছে, "মা জাগো—বেলা হয়েছে।" জাগিয়া দেখি, বেশ বেলা হইয়াছে, এক ঘুমে রাত কাটিয়া গিয়াছে।

গণেশ। মা, সকাল সকাল স্নানাহ্নিক ক'রে নাও, গাড়ী এল ব'লে।

প্রকাণ্ড একটা ফটকের কাছে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতে তিন চার জন দরোয়ান উঠিয়া দাঁড়াইল, একজন ত্রস্তে আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া মস্ত সেলাম করিল, একজন ছুটিয়া বাড়ীর ভিতরপানে চলিয়া গেল। একটি ছেলে—বয়স পনর ষোল—আসিয়া পথ দেখাইয়া আমাদের লইয়া চলিল।

বাড়ীটা চকমিলান, এক দিকে মস্ত ঠাকুরদালান, উঠানে অনেক লোক রহিয়াছে, বাঁশ দিয়া একটা মাচা বাঁধা হইতেছে। বারান্দায় উঠিতেই ঘোমটায় মুখ ঢাকা একটি বিধবা রমণী আসিয়া আমার এক হাত ও গণেশের এক হাত ধরিলেন—অনুমানে বুঝিলাম, তাঁহার হাত কাঁপিতেছে; তিনি যেন ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন—ছেলেটি বলিল, "দিদিমা, উপরে চলুন।" সকলে দোতলায় গেলাম। "বৌ, সেই দেখা আর এই দেখা" বলিয়া ঠাকুরঝি কাঁদিয়া ফেলিলেন। গণেশ তাঁহাকে ধরিয়া দোতলার বারান্দায় বসাইল, আমিও বসিলাম—চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। গণেশও সেইখানে বসিয়া রহিল, তাহার চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আর দু-তিনটি রমণী সেখানে আসিলেন—একজন ঠাকুরঝিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ছোট বৌ, কেঁদ না—বাপের বংশধর এসেছে, কোলে কর।" ঠাকুরঝি গণেশকে কোলে করিবার জন্য টানাটানি করাতে গণেশ তাঁহার কোলের কাছে সরিয়া গিয়া "থাক্, এইখানে বসি" বলিল।

ঠাকুরঝি "চুপ কর বাপ্, কেঁদ না ধন" বলিয়া যত গণেশের চক্ষু মুছাইয়া দিতে লাগিলেন, তাঁহার নিজের চোখের জল তত হু হু করিয়া পড়িতে লাগিল। ঠাকুরঝি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি কি তখন জানি যে, বাবাকে দাদাকে মাকে আর দেখতে পাব না, আমি তা হ'লে বাবার মা'র সেবা ভাল ক'রে করতুম, দাদাকে প্রাণ ভ'রে দেখে নিতুম। এমন ভাই কি কারও হয়! আমরা দু-বছরের ছোট-বড় ছিলুম, কিন্তু এক দিনের তরে আমাদের ভাই বোনকে কেউ ঝগড়া করতে দেখে নাই। সেই সোনার প্রতিমা বৌয়ের এমন দশা হয়েছে!" ঠাকুরঝি এই প্রকার যত বিলাপ করেন, গণেশের চক্ষে তত দর দর ধারে জল পড়িতে থাকে : তাহার রোদন দেখিয়া ঠাকুরঝি ক্রমে শান্ত হইলেন, তিনি কেবল গণেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, দেখিয়া যেন তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না।

ঠাকুরঝি। জান বৌ, আমার ছেলে মেয়ে কেউ নেই—এখন শ্যামসুন্দর আমার সর্ব্বস্ব।

আমি। শ্যামসুন্দর কই ?

ঠাকুরঝি। বাড়ীর ভিতর আছেন, দেখাব এখন—ঐ যে তাঁর রাসমঞ্চ তৈরি হচ্ছে।

বুঝিলাম, শ্যামসুন্দর তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। অত বড় বাড়ী, বড় বড় ঘর সব শূন্য ; ঘরগুলির দরজা জানালা সব খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, ধুলাও ঝাড়া হইয়াছে, তথাপি তেমন পরিষ্কার নহে। ঘরে ঘরে ঘেরাটোপ-মোড়া বড় বড় ঝাড় ঝুলিতেছে, ছবি আয়নাগুলাও ঘেরাটোপ-মোড়া ছিল, বোধ হয় আজ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেন না, সেগুলি বারান্দার এক পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। উঠানে রাসমঞ্চ প্রস্তুত হইতেছে, বাঁশ বাখারি শোলা ও কাগজের ফুল প্রস্তুত হইতেছে—এই পূর্ণিমায় রাস।

ঠাকুরঝিরা বনেদী ঘর, তাহার উপর আমার নন্দাই আবার বিশেষ ধনী ছিলেন ; তাঁহার সন্তানাদি নাই ; এমন কি, সহোদর ভাই বা ভগ্নী কেহ জীবিত নাই। একজন দূর-সম্পর্কের বিধবা জা তাঁহার সন্তানাদি সহ ঠাকুরঝির বাড়ী বাস করেন ; তিনি তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভারগ্রহণ করিয়াছেন।

ঠাকুরঝি। বাবা, উঠে ঘরে ব'স—সোনার যাদু কি ধুলোয় বসতে আছে ? উঠে ব'স বাপ।

গণেশের হাত ধরিয়া, আমার হাত ধরিয়া ঠাকুরঝি উঠাইলেন। একটি ঘরের জানালা হইতে অতিথিশালা দেখা যায়—ঠাকুরঝি বলিলেন, "শ্যামসুন্দরের ভোগ হ'লে আমি এইখানে এসে বসি, অতিথিরা প্রসাদ পায়, তাই ব'সে ব'সে দেখি। এস বৌ, গণেশ, এস বাবা, বাড়ীর ভিতর যাই। (যাইতে যাইতে) বৌ, এই দেখ, এই সব ঘর দোর সবই শূন্য প'ড়ে আছে, গণেশ এসে কেন থাকুক না? আমি দশ দিন তাকে দেখে প্রাণ জুড়াই। বৌ বলব কি, গণেশ এসে আমার শ্যামসুন্দরের সেবার ক্রটি হচ্ছে, (করযোড়ে) হে ঠাকুর, অপরাধ মার্জ্জনা কর—আমি থেকে থেকে শ্যামের মুখ ভুলে যাচ্ছি, গণেশের মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। হ্যাঁ বৌ, গণেশের চেহারায় দাদার আদল আসে না?"

আমি। হ্যাঁ ঠাকুরঝি, অনেকেই তাই বলে বটে, তবে তাঁর নাক আরও ধারাল ছিল। ঠাকুরঝি, আমি তোমার বাড়ীর ঠিকানা ভাল জানতুম না, তাই দিদির বাড়ী এসে উঠেছি। সেখানকার বাস একেবারে উঠিয়ে আসা যায় না—তবে তোমার কাছে থাকব বই কি।

ঠাকুরঝি। কি পাপের মন! আজ কেবল মনে হচ্ছে গণেশের বিয়ে দিই, বৌ আসুক—সংসার ধর্ম্ম মনে পড়ছে। চল বাবা জল খাবে চল।

আমি। চল আগে শ্যামসুন্দরকে প্রণাম ক'রে আসি, তার পর জল খাবে।

ঠাকুরঝি সানন্দে "এস এস" বলিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া গেলেন। একটি খুব বড় ঘর, তাহাতে রৌপ্য সিংহাসনে কালো পাথরের শ্যামসুন্দর, বামে স্বর্ণময়ী রাধারাণী। শ্যামসুন্দর এক হাত আন্দাজ উচ্চ, রাধারাণী একটু ছোট। মাথায় সোনার মুকুট হইতে পায়ে সোনার মল পর্য্যন্ত, সর্ব্বালঙ্কারে বিগ্রহমূর্ত্তি শোভিত। পূজার উপকরণ সমস্তই সজ্জিত রহিয়াছে, সমস্তই রৌপ্যময়—এখনই পুরোহিত মহাশয় আসিবেন।

গণেশ। আমি কি পিসিমা পূজা দেখতে পারি?

ঠাকুরঝি। (সোৎসাহে) কেন পারবে না! ব'স বাবা ব'স।

একজন আসন আনিয়া দিল, গণেশ বসিল। পুরোহিত মহাশয় আসিলেন, পূজা আরম্ভ হইল। ঠাকুরঝি ধূপ ধুনা পোড়াইতে লাগিলেন,

মধ্যে মধ্যে শাঁখ ও ঘণ্টার শব্দ হইতে লাগিল; পুষ্প চন্দন ও ধূপ ধুনার গন্ধে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—বৈকুণ্ঠ হইতে নারায়ণ পূজা গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন—এ যেন তাঁহারই অঙ্গের সৌরভ। পূজা অন্তে ঠাকুরঝি উঠিয়া পাশের একটি ছোট ঘর দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ ঠাকুরের শয়নঘর।" আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। তাহাতে একখানি ছোট (বিগ্রহের উপযুক্ত) রৌপ্যময় খাট, জরির কাজ-করা মশারি, মখমলের বিছানা—ঘরের এক ধারে একটি গ্লাস্‌কেস, তাহাতে বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়োয়া অলঙ্কার, হীরার মুকুট, মুক্তার মালা ও বিস্তর রূপার বাসন সাজানো রহিয়াছে।

ঠাকুরঝি। এই সব দিয়ে শ্যামসুন্দরের উৎসবের দিনে ঠাকুরের সাজ হয়।

গণেশ। পিসিমা, রাত্রে এ ঘরে কে থাকে?

ঠাকুরঝি। শ্যামসুন্দর থাকেন।

গণেশ। এত বহুমূল্যের অলঙ্কার রয়েছে, কেহ পাহারা থাকে না?

ঠাকুরঝি। পাহারা কি দরকার? শ্যামসুন্দর নিজের জিনিস নিজেই পাহারা দেন; তাঁর জিনিস চুরি করে, এত বড় স্পর্দ্ধা কার!

বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। শ্যামসুন্দরের উপর তাঁহার যে আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, তাহা বেশ জানা গেল। এই বিশ্বাস না থাকিলে আজ এই অভাগিনী নারী কি লইয়া জীবন ধারণ করিত! পুরোহিত ডাকিয়া বলিলেন, "মা, ঠাকুরের জলযোগ হইয়াছে, এবার আপনারা প্রসাদ গ্রহণ করুন—আমি একটু ঘুরিয়া আসি, সময়ে আসিয়া ভোগ নিবেদন করিব।" পুরোহিত নিজে কিছু জলযোগ করিয়া চলিয়া গেলেন—আমাদের পরিচয় পাইয়া বিস্তর আশীর্ব্বাদ করিলেন। শ্যামসুন্দরকে যে মোহরটি দিয়া প্রণাম করিয়াছি, তিনি তাহা পাইয়া হৃষ্টচিত্তে আরও আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গেলেন।

ঠাকুরঝি আমাদের জলখাবার দিলেন—ফল, মেওয়া ক্ষীরের মিষ্টান্ন প্রচুর—অল্প অল্প কিছু খাইয়া ঠাকুরঝির শয়নঘরে গেলাম। সে ঘরেও বহুমূল্য খাট, পরিষ্কার বিছানা, ঠাকুরজামায়ের ও তাঁহার শিশু পুত্রের অয়েল পেণ্টিং, বড় বড় আয়না, লোহার সিন্দুক প্রভৃতি আসবাব। মেঝেয় একটি ছোট গদিপাতা বিছানা, ঠাকুরঝি ঐ বিছানায় গণেশকে বসাইলেন।

ঠাকুরঝি। এই ঘর আমার শোবার ঘর, কিন্তু এখন আর আমি শুই না, অমনি সাজানো থাকে। আমি এখন শ্যামসুন্দরের পাশের ঘরে শুই। এ বিছানায় আট বছর কেউ বসে নি—আজ গণেশ বসেছে।

গণেশ। (উঠিয়া বিছানার পাশে বসিয়া) পিসিমা, আমি এতে বসিবার যোগ্য নহি—এ পিসে মহাশয়ের আসন—তিনি ত দেবতা ছিলেন!

ঠাকুরঝি। না বাবা ব'স্, তোকে বসিয়ে আমার প্রাণ যে ঠাণ্ডা হচ্ছে! উঠে ব'স্ বাবা, উঠে ব'স। বৌ, বল্ না ভাই, বাবার কথা, মার কথা, দাদার কথা বল্ না ভাই। আমি ভাই ছেলেবেলা লিখতে পড়তে শিখি নাই, আবার আমার শ্বশুরবাড়ীর এমন নিয়ম ছিল যে, মেয়েরা কাগজ কলমের দিকে যেতে পারবে না; তাই কখনও একখানা চিঠি পাইও নি, লিখতেও পারি নি; তাঁর কাছে চিঠি আসতো, তিনি প'ড়ে শোনাতেন। বাবা আমাকে আশীর্ব্বাদ জানাতেন, আমিও প্রণাম জানাতে ব'লে দিতুম। তার পর প্রায় এক সময়েই বাপ আর তিনি গেলেন, তার আগেই মা ভাই গেছলেন—সব ফুরোলো! একরকম চিঠির পাট উঠে গেল। শ্যামসুন্দর দয়া করেছেন তাই তাঁর সেবায় মন নিবিষ্ট ক'রে রয়েছি—ত্রিসংসারে আপনার জন যে কেউ আছে বা কখনও ছিল, তা সব ভুলে গেছি—কাল গণেশের চাঁদমুখ দেখে সবাইকে মনে পড়েছে। আমার নাতি কাল এসে বললে, 'দিদিমা, একটি বাবু এসেছেন, বললেন যে, জিজ্ঞাসা ক'রে এস, মুলতানে কি তাঁর কেহ আছে? আমি মুলতান থেকে এসেছি।' আমার বুকটা ধড়াস ক'রে উঠলো, মাথাটা ঘুরে গেল—কেন, আবার কি সংবাদ দেয়! সাম্‌লে নিয়ে বললুম যে, 'বল গে—সেখানে আমার ভাইপো থাকে, তার নাম গণেশ। সে কেমন আছে—উনি কি তাকে চেনেন?' নাতি এসে বললে, 'দিদিমা, তাঁর নামই গণেশ, আমি তাঁকে উপরে এনে বসিয়েছি।' আমি ছুটে গেলুম—দেখেই চিনলুম—দাদার সেই মুখ বসানো রয়েছে—ও কি চিনিয়ে দিতে হয়! প্রাণ আপনি চিনে নিলে! বাবাকে ত বলতে গেলে কখনও দেখি নি। আমার জন্ম হতেই বাবা বিদেশে যান—কত দিন পরে ফিরেন, তখন আমি শ্বশুরবাড়ী থাকি; শ্বশুররা বড়লোক, কখনও পাঠাতেন না, বাবা এসে কত পায়ে ধ'রে নিয়ে যান। দাদার বে হবে হবে করেও বটে, আর বাপ মা ভাই পশ্চিমে

চ'লে যাবেন ব'লেও বটে, ছ মাস বাপের বাড়ী থাকি—নইলে বিয়ে হয়ে দু-বছর পরে যে ঘর করতে আসি, আর পাঠান নাই।

আমি। এঁরা কি সুন্দরী ব'লে গরিবের ঘর থেকে তোমাকে এনেছিলেন?

ঠাকুরঝি। সুন্দরী ব'লে নয়, কুলের মিল হ'ল ব'লে। বাবা যে মুখ্যি কুলীন—এঁরাও তাই। এঁদের ঘর পাওয়া যায় না।

আমি। ঠাকুরঝি দেশে যাবে?

ঠাকুরঝি। যাব। জন্মস্থান দেখতে এত ইচ্ছা করে ভাই! এক এক বার মনে হয় ছুটে যাই, আবার ভাবি—কার কাছেই বা যাব! কিন্তু কবে তোমরা যাবে? রাসের আগে আমি তোমাদের ছেড়ে দেব না। গণেশ বাবা, কাপড়-চোপড় কিছু আন নি কেন? দু-চার দিনও ত থাকবে? বৌয়ের কি, একখানা থান বই ত নয়, সে হয়ে যাবে—কিন্তু তুমি বাবা আজ খাওয়া দাওয়ার পর একবার গিয়ে তোমার কিছু কাপড়-চোপড় এনো।

আমি। কিন্তু কাল যে একবার আমাকে যেতে হবে, ভবানীপুরে যাব। আর দিদিকে ব'লে তবে এসে রাস পর্য্যন্ত থাকবো; দিদি ত আজ বাড়ী নেই, তাঁকে যে ব'লে আসা হয় নি।

ঠাকুরঝি। এত দিন যে দেখি নাই, বেশ ছিলাম—আর যে নড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না ভাই! বেলা হয়ে গেল, দেখি শ্যামসুন্দরের ভোগ দেওয়া হ'ল কি না। গণেশকে ভাত দিতে বলি।

দেখিয়া আসিয়া ঠাকুরঝি গণেশকে ও আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। গণেশের ভাত দেওয়া হইয়াছে—ভোজনপাত্র রূপার।

গণেশ। এই কি শ্যামসুন্দরের প্রসাদ পিসিমা?

ঠাকুরঝি। না বাবা, শ্যামসুন্দরের ভোগ নিরামিষ। ঐ তাঁর ভোগ দেওয়া হচ্ছে, প্রসাদ দেবে এখন, তুমি ব'স এসে। আমাদের এ বাড়ীতে মাংস রান্না পর্য্যন্ত হয় না, পাশের গোলাবাড়ীতে রাত্রে তোমার জন্য মাংস রাঁধতে ব'লে দিয়েছি, তুমি বার-বাড়ীতে খেয়ো এখন—এ বেলা মাছ ভাত খাও।

গণেশ। কেন পিসিমা আমার জন্য এত আয়োজন? মাকে জিজ্ঞাসা করুন আমি মাছ মাংস ভালবাসি নে। আমার জন্যে যদি বিশেষ ক'রে কিছু করেন, তবে আমি এখানে এক দিনও থাকবো না।

ঠাকুরঝি। কেন থাকবে না? তোমার জন্যে বিশেষ আয়োজন ক'রে যদি আমার সুখ হয়, কেন তুমি তা করতে দেবে না? স্বামী পুত্রকে সেবা যত্ন করাই আমাদের কাজ, সে ধনে আমি বঞ্চিত—শ্যামসুন্দরই তাঁদের স্থান অধিকার করেছেন, তাই প্রাণধারণ ক'রে আছি—আজ যদি আদরের ধন তিনি এনে দিলেন, আদর করবো না? সে দেশে কই-মাছ পাওয়া যায় না, ভাজা মাছটি খাও, বড় চিংড়িও পাওয়া যায় না—না? চিংড়ির মুড়োটি পাতে তুলে নাও।

পুরোহিত ও তাঁহার সঙ্গী ব্রাহ্মণ, ঠাকুরের ভোগ লইয়া আসিয়া এক পাশে রাখিলেন, ঠাকুরঝি তাহা হইতে কিছু কিছু গণেশকে দিলেন। গণেশের আহার হইলে আমরা ভোজনে বসিলাম। একখানি ছোট কালো পাথরে সামান্য কিছু প্রসাদী অন্ন ব্যঞ্জন ঠাকুরঝি নিজের জন্য উঠাইয়া লইলেন, বাকি সমস্তই আমাকে ধরিয়া দিলেন। ঠাকুরঝির নাতি আসিয়া গণেশকে বলিল, "একটি বাবু আপনাকে ডাকছেন।" গণেশ দেখিয়া আসিয়া বলিল, "মা, বিজয় এসেছে, বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইছে—যাব?" আমি বলিলাম, "তোমার ইচ্ছা হয় যাও।"

গণেশ। পিসিমা, যাব কি? অমনি কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে আসব।

অনুমতি পাইয়া গণেশ চলিয়া গেল। ঠাকুরঝির জা ও তাঁহার বিধবা মেয়েও আমাদের সহিত আহারে বসিলেন। ভোগের প্রচুর সামগ্রী আমাকে দেওয়া হইয়াছিল, আমি সকলের সহিত ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইলাম। ঠাকুরঝির জা বেশ মানুষ। পুত্র কন্যা লইয়া ঠাকুরঝির আশ্রয়ে আছেন: কন্যাটি বিধবা, তাহার ঐ একটি সন্তান—ঠাকুরঝির নাতি। সে সকলের অপেক্ষা ঠাকুরঝির অনুগত বেশী। জায়ের বড় ছেলেটির বিবাহ দিয়াছেন, বৌ বাপের বাড়ী আছে, রাসের দিন নিকট—আজ তাহাকে আনিতে লোক যাইবে। অন্তঃপুরে এই কয় জনে বাস করেন, বাহিরে আমলা কর্ম্মচারীরা একতলায় থাকে, দোতলা বন্ধই থাকে। কার্নিসে অসংখ্য পায়রা বাসা করিয়াছে, তাহাদের জন্য প্রতি দিন এক মণ করিয়া দানা বরাদ্দ আছে, দুই বেলা ছাতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ঠাকুরঝি দুই বেলা ছাতে তাহাদের খাওয়া দেখিতে যান। একটা জানালা দিয়া খিড়কির বাগান পুকুর দেখিতে পাইলাম। বড় বড় গাছ বিস্তর, তাহার

তলায় তলায় বড় বড় গরু দশ বারোটি, তাহাদের ছোট বড় বাছুর কুড়ি বাইশটি বাঁধা আছে ; তিন চারটি কচি বাছুর ছাড়া আছে, তাহারা ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। পুকুরটি বিশেষ বড় নয়, গাছের পাতা পড়িয়া অপরিষ্কার হইয়া আছে। এক ধারে ফুলের গাছ, অসংখ্য দোপাটি ফুল ফুটিয়া আছে—এক ধারে বিচালির গাদা, সেইখানেই দুই তিনখানি বিচালি-কাটা বঁটি ও কাটা খড়ের রাশি রহিয়াছে ; আট দশটা বড় বড় ঝোড়া ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে ; ঘুঁটে ও গোবরের স্তূপের অভাব নাই। আমি দেখিতেছি —ঠাকুরঝি আমার পাশে আসিয়া কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ শ্যামের গরু বাছুর—ভোগের জলপানির যত খাবার, সব ঘরেই হয়—ঐ ফুলে শ্যামের পূজা হয়। আমি ভাই সব গাইগুলির সেবা করতে পারি নে—ঐ যে শাদা গাইটি, ওঁর নাম ভগবতী—ঐটির সেবা করি, এখনকার মধ্যে ঐ বুড়ো গাই—অর্দ্ধেক ছানা পোনা ওঁরই। আমি ভোরে উঠে মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ওঁর শিঙে আর খুরে তেল হলুদ দিয়ে চান করিয়ে দিই, তার পর গা-টি পুঁছিয়ে চন্দন সিন্দূর পরিয়ে দিয়ে প্রণাম ক'রে বাহিরে এনে বাঁধি, বেঁধে একটি জাব দিই—উনি জাব খেতে থাকেন, আর আমি গোহাল মুক্ত ক'রে ঘরটি বেশ ক'রে ধুয়ে মুছে, ঘরে ধুনো জ্বালিয়ে দিয়ে বাছুর ছেড়ে দিই—দিয়ে গাই দুহে দিই—সেই দুধের ক্ষীরে শ্যামের বাল্যভোগ হয়। শ্যামের প্রসাদ একটু আধটু যা অবশিষ্ট থাকে, তা ওঁকেই দেওয়া হয়। উনি সাক্ষাৎ ভগবতী। ঐ দেখ, আমাকে দেখতে পেয়ে কেমন চেয়ে আছেন। কেন মা ভগবতী, কি মা ?"

গরুটি বাস্তবিক আমাদের দিকে চাহিয়া ছিল, "ভগবতী" বলিতেই হাম্বা রবে সাড়া দিল। ঠাকুরঝি বলিলেন, "গরু বাছুর সবাই আমাকে চেনে, গোলা পায়রাগুলোও আমাকে ভয় করে না। এক একটা হাত থেকে মটর খেয়ে যায়।"

আমরা বিশ্রামার্থে একটি ঘরে বসিলে, ঠাকুরঝির ভাশুরের সেই বিধবা মেয়ে নিস্তারিণী আসিয়া ঠাকুরঝির মাথার কাপড় খুলিয়া তাঁহার চুল এলাইয়া দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে দিতে বলিল, "কি করেছ কাকীমা, সেই ভোরে স্নান ক'রে যে ঝুঁটি বেঁধে রেখেছ, আর খোল নি, ভিজে জব-জব করছে যে!"

আমি। বাপ রে! ঠাকুরঝি, এখনও এত চুল আছে ? চুলের রাশ যে!

নিস্তারিণী। কেমন কালো ও কোঁকড়া দেখুন—এখনও হাঁটুর কাছে পড়ে, আগে চ'লে গেলে চুলের ডগা মাটিতে ছুঁয়ে যেত ; এমনি যুত যে, এখনও এত অযত্নে এতগুলি আছে। দিনের মধ্যে সাত বার কাটতে যান, আমি অনেক মাথার দিব্যি দিয়ে রেখেছি। যে দিন না শুখিয়ে দিব, সে দিন আর চুল এলানো হবে না, উনি অমনি বাঁধা রইলেন—তার পর ভিজে মাথায় থেকে সর্দ্দি হয়।

ঠাকুরঝি। তুই আপদ্ রাখিয়েছিস কেন ? ওগুলো গেলে আমি বেঁচে যাই। এবার আর শুনছি নে—পেরাগে একবার যেতে পারলে হয়! বৌ, এবার তোমার সঙ্গে যাব, তীর্থগুলি করিয়ে দিও ; পূর্ব্বজন্মের বিস্তর পাপে এ জন্মে সকলেতে বঞ্চিত হয়ে আছি, ইহ জন্মের কাজগুলি করিয়ে দিও।

আমি। ঠাকুরঝি, তোমার কি কোন তীর্থ হয় নাই ?

নিস্তারিণী। কাকীমা কি সে রকম মেয়েমানুষ যে হেথা সেথা ঘুরে বেড়াবেন ? এত যে বয়স হয়েছে, মাথার উপর কেউ যে নেই, তবু দেখুন না, ঘোমটা একটু দেওয়া আছেই, ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা কন, গলার স্বর যেন বন্ধ হয়ে গেছে—আমার মা যত ক্ষণে যা বলেন, তাই করেন, ওঁকে তীর্থ করতে নিয়ে যাবে কে বলুন ? আর যা হোক কাকা মহাশয়ের অত বড় নামটা আছে, যার তার সঙ্গে যেতে পারেন কি ?

ঠাকুরঝি। বৌ, এবার আমি তোমার সঙ্গে যাবই ; গণেশ আমাকে সকল তীর্থ করাবে।

আমি। বেশ ত, দিদিও বলছিলেন যে আমাদের সঙ্গে যাবেন ; দিদি খুব পাকা মেয়েমানুষ, তু-বার ক'রে তাঁর সকল তীর্থ ঘোরা হয়ে গেছে, এইবার গেলে তিন বার হবে।

ঠাকুরঝি। (আগ্রহে আমার হাত ধরিয়া) তোমার পায়ে ধরি বৌ, আমায় নিয়ে যেও—বেশ হবে, দিদি সঙ্গে থাকলে আর ভাবনা কি!

ঠাকুরঝির জা। ছোট বৌ, আমিও কিন্তু যাব ভাই, এই সঙ্গে না হ'লে আর আমার হবে না।

ঠাকুরঝি। তুমি গেলে চলবে কেন দিদি ? ছেলেমানুষ বৌটি আছে, শ্যামসুন্দরের সেবা আছে, পাছে তাঁর সেবার ত্রুটি হয়, তাই জন্যেই ত

এত দিন তীর্থে যেতে চাড় করি নি—তুমি গেলে আর আমার যাওয়া হয় না।

ঠাকুরঝির জা। আরে, দেশ থেকে ছোট খুড়িকে এনে রেখে যাব, তিনিই শ্যামের সেবা করবেন—তিনি প্রাচীন মানুষ, দেবতা ব্রাহ্মণে তাঁর ছেদ্ধা ভক্তি খুব—আর বৌমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

ঠাকুরঝি। তবে বৌ, সেই কথাই রইল—যাতে আমার ইহ কালের কাজ হয়, তা করবে। গণেশের বিয়েটি শীঘ্র দাও ভাই, বৌয়ের মুখ দেখে জন্ম সার্থক করি। দেখ বৌ, গণেশের বিয়ে কিন্তু এ বাড়ী থেকে দিতে হবে। এস, তোমায় দেখাই, গণেশের বৌয়ের জন্যে আমি সব গহনা ঠিক ক'রে রেখেছি; তুমি বিয়ের সম্বন্ধ দেখতে যে চিঠি দিয়েছিলে, সেই চিঠি পেয়েই আমি ধীরে ধীরে সব গোছাচ্ছি।

ঠাকুরঝির আদেশে নিস্তারিণী লোহার সিন্দুক হইতে গহনার বাক্স বাহির করিল। তিনটা বাক্স—একটা বাক্স খুলিয়া দেখাইলেন—হীরা মোতির বিস্তর অলঙ্কার—একে একে সমস্ত দেখানে হইলে, সে বাক্স বন্ধ করিয়া বলিলেন, "দেখ ভাই, মানুষের শরীরের কথা বলা যায় না, যদি আমি নিজ হাতে বৌমাকে এই সকল গয়না না পরাতে পারি—বলা রইল—এ সমস্ত তার। আর এই হলদে বাক্সের গহনা (বলিয়া বাক্স খুলিতে খুলিতে)—এ সব আমার নাতির বৌ হ'লে পাবে (নিস্তারের ছেলের বৌ)।" সে বাক্সের অলঙ্কারও সমস্ত একে একে দেখাইলেন। নিস্তারিণী সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া রহিল—সে দুঃখিনী বিধবা, ঠাকুরঝির আশ্রিতা, কিন্তু এতটা আশা করে নাই! তার পর তৃতীয় বাক্সটি দেখাইয়া বলিলেন, "এটি আজ আর খুলিব না, এতে যা আছে, তার বিলি করাই আছে। এর ভিতর লেখন আছে।"

আমি। ঠাকুরঝি, পুষ্যিপুত্র নিলে না কেন ভাই? এত সম্পত্তি ছকড়া নকড়া হয়ে যাবে যে!

ঠাকুরঝি। কেন ভাই, শ্যামসুন্দরই ত আমার পুষ্যিপুত্র। যখন তাঁকে সকলে পুষ্যিপুত্র নেবার জন্য পেড়াপিড়ি করলেন, তিনি শ্যামসুন্দরকে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন, আমাকে বললেন যে, 'শ্যামসুন্দরই তোমার পুত্র, তাঁর সেবা ক'রেই সুখী হবে, অন্য সন্তানের মত তিনি তোমাকে কখনও ছেড়ে যাবেন না।' তিনি বলতেন, 'বিশ্বপতি আমার অন্তরে সদাসর্ব্বদা

বিরাজ করবেন ব'লে আমার সন্তানকে কেড়ে নিয়েছেন, আমাদের উপর তাঁর বড় কৃপা, এটি তুমি সর্ব্বদা মনে রেখ, তাঁর কাজের উপর হাত দেওয়া আমাদের উচিত নয়—পরের ছেলে ঘরে এনে কি তাঁকে ভুলে থাকবো?'—আমার শ্বশুর আমাকে যৌতুকে যে তালুক দিয়েছিলেন, সেইটি বাদে তাঁর সমস্তই শ্যামসুন্দরেব নামে। শ্যামসুন্দরের ভোগের প্রসাদ যাতে দশ জনে পায়, সে ব্যবস্থা আছে। তাঁর সেবা ক'রেই মনে শান্তি পেয়েছি—তবে রক্তমাংসের শরীর, এক-এক বার আপনার জনকে দেখতে, তাদের নিয়ে সাধ আহ্লাদ করতে ইচ্ছা হয়—তোমাকে পেয়ে বৌ, আজ কত কথা কইলুম। আমি বৌমানুষ, এত কথা কখনও ভরসা ক'রে কারও সঙ্গে কই নি। আমার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী নিস্তার আর দিদি—নিস্তার না থাকলে বোধ হয় এত দিনে ম'রে যেতুম, পেটের মেয়ে থাকলেও এর চেয়ে আমাকে বেশী যত্ন করত না। আমি আর ওর কি করব, যাতে ওকে কখন পয়সার কষ্ট না পেতে হয়, তা করব।

ঠাকুরঝির জা। আরও কি করতে হয় বোন? জান বৌ, হতভাগীর যখন কপাল পুড়লো, পনর বছর বয়স, কোলে এক বছরের ছেলে—বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, ছ মাস না যেতে যেতে সেই সোমত্ত মেয়েকে ভাশুর আর দেওর হাত ধ'রে একবস্ত্রে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিলে! সন্ধ্যে কালে পথে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, ওদের একটা বাগ্দীর মেয়ে দাসী ছিল, সে-ই দয়া ভেবে চুপি চুপি আমার কাছে দিয়ে গেল। হাতে দু-গাছি সোনার বালা ছিল, তাও হাত থেকে টেনে খুলে নিয়েছে। তিন কোশ পথ হেঁটে মেয়ে আমার দশটা রাত্রে আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ল! আমি তখন দেশেই থাকি, একজন লোক সঙ্গে দিয়ে ছেলেকে তার পরদিন সকালে নিস্তারের ভাশুরের কাছে পাঠালুম। ঘেন্নার কথা কি বলব দিদি—গিয়ে দাঁড়াবা মাত্রই চণ্ডাল বললে কি, 'বোনের সন্ধানে এসেছ? সে আমাদের কুলে কালি দিয়ে গেছে, তোমরা আমাদের সামনে এস না।' ছেলে ত কচি ছেলে, কাঁদতে কাঁদতে চ'লে এল, একটা কথা কইতে পারলে না। আমাদের আর কে আছে—দেওরের—তোমার নন্দাইয়ের কাছে এসে সব কথা বললুম। তিনি বললেন, 'ওদের সঙ্গে মামলা মকর্দ্দমা ক'রে তোমরা পারবে না, ওরা পাপিষ্ঠ চণ্ডালের অধম, সহজে যে দেবে অথবা কাকুতি মিনতিতে যে দয়া করবে, তা বোধ হয় না—তোমরা আমার কাছে

থাক ; তোমাদের সব ভার আমার। ঐ ছেলে যদি বাঁচে, তবে বড় হয়ে সে তার পৈতৃক সম্পত্তি বুঝে নেবে—আমি একরকম সংসারত্যাগী হয়েছি, মামলা মকর্দ্দমার তদ্বির আমার দ্বারায় হবে না।' সেই পর্য্যন্ত এখানে আছি—তোমার নন্দাই আমাদের এত করেছেন যে, মা'র পেটের ভাইও কারও এত করে না!—আর তোমার ননদের গুণের কথা কত কইব—নিজে ত দেখতেই পাচ্ছ! ওঁদের কল্যাণেই আমার ছেলেটি উকিল হয়েছে, দু-পয়সা আনতে শিখেছে—এখন যাতে ভাগ্নে তার বাপের ধন ফিরে পায়, সেই চেষ্টা করছে।

গণেশ। (বিজয়কে টানিয়া আনিতে আনিতে) মা দেখ, বিজয় আসতে চাচ্ছে না।

আমি। কেন বিজয়, এস এস, লজ্জা কি ?

বিজয়। না, লজ্জা কি! আমি বুঝি লজ্জা করছি ? আমি বলছিলুম যে, বাড়ী যাই, বেলা গেল।

গণেশ। বাঃ, তা আমি ছাড়ব কেন ? মা দেখ, কত বাজার ক'রে এনেছি।

একজন ভৃত্য অন্তঃপুরের দ্বারের কাছে কতকগুলি জিনিস রাখিয়া চলিয়া গেল। বিজয় ও গণেশ তাহা লইয়া আসিল। ভৃত্যেরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পায় না, সেই পূর্ব্ব প্রথাই এখনও ঠাকুরঝি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তবে কতকটা শিথিল হইয়াছে সন্দেহ নাই, নইলে ঠাকুরঝি সদরে গিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিতেন না, বা পুরোহিত মহাশয়ের সহিত কথা কহিতেন না।

গণেশ। পিসিমা, বিজয়কে দেখে ঘোমটা টানলে ত চলবে না, তা হ'লে ওকে ধ'রে রাখা ভার হবে। এখানকার চমৎকার ক্ষীরের মালপোর লোভ দেখিয়ে তবে ওকে এনেছি।

আমি। বিজয়, ঠাকুরঝিকে প্রণাম কর। এটি আমার ভাইপো—লক্ষ্মীছেলে!

ঠাকুরঝি। (ঘোমটা খাটো করিয়া) বেঁচে থাক, রাজা হও—এই যে খাবার আনি বাবা।

গণেশ। পিসিমা, তুমি ব'স, দেখ না, আমি কি কিনে এনেছি—এই দেখ, রূপার পুষ্পপাত্র, এটি শ্যামসুন্দরের জন্যে—একটা রূপার চা খাবার

বাসন—এই দেখ একখানি রেকাব—এটা ফুলদান—কেমন, বেশ না? এই দেখ গরদের কাপড় দুখানা—এখানা মা'র, এখানা তোমার—শাড়ীখানা মাসিমার—আর এই কতকগুলি এনেছি, মা বুঝবেন, কাকে কি দিলে ভাল হয়।

আমি। চায়ের বাসন-টাসন কার জন্যে এনেছিস? বল্ না—হাসছিস যে?

গণেশ। ওটা বিজয়ের জন্য, রেকাবিখানা সেখানকার দিদির জন্য, আর ফুলদানিটা হরকান্তর জন্য।

বিজয়। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আমি চললুম।

গণেশ। (বিজয়ের হাত ধরিয়া) আরে, রোস রোস, যাবে কোথা? কি বিপদ্—হয়েছে কি?

বিজয়। কি অন্যায়, এর জন্যে এত পয়সা নষ্ট করা! আমি কি তখন জানি যে, সদাব্রত করবার জন্যে এ সব কেনা হচ্ছে—আমি বলি নিজের জন্যে! নিজের জন্যে কি এনেছ?

গণেশ। নিজের জন্যে কি আনব—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ যে মসলার বাক্স, ঐটি আমার নিজের। সদাব্রতটা কি দেখলে? মা'র কাছে হাজার টাকা ঘুষ পেয়েছি, তবে ত বিয়ে করতে রাজি হয়েছি! ও টাকায় আমি যা খুশি করতে পারব, মায়ের সঙ্গে কড়ার আছে মশাই! আজ তার ক'টাই বা খরচ হয়েছে!

ঠাকুরঝির ইঙ্গিতে নিস্তার এত ক্ষণে অনেক প্রকার মিষ্টান্ন ফল প্রভৃতি পাত্রে সাজাইয়া লইয়া আসিল। দাসী দুইখানি আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দিল, জল দিল।

বিজয়। (খাইতে খাইতে) বাস্তবিক চমৎকার খাবার! ঘরে তৈরি বুঝি?

ঠাকুরঝি। হ্যাঁ বাবা, বাজারের খাবারে ত ভোগ হয় না—শ্যামসুন্দরের সব গরু আছে কি না—ক্ষীর ছানা ঘরে হয়, তাঁর জলপানিও ঘরেই হয়।

বিজয়। তবেই ত দেখছি গণেশদা আর আমাদের ওদিকে যাচ্ছেন না!

গণেশ। গণেশদা না গেলেন, তাতে ক্ষতি কি? বিজয়দা ত আসতে পারেন।

বিজয়। গণেশদা এখানে ত দিব্য জমিয়ে নিয়েছ দেখছি—এখানে আর নতুন নতুন নেই, সরম ভাঙ্গাতেও হচ্ছে না—বেশ যা হোক—কালকের তিনি নও যে!

গণেশ হা হা করিয়া হাসিতেছে ও খাইতেছে।

ঠাকুরঝি। বাবা, আমি আপনার জনের মুখ দেখতে পাই না, তোমরা যদি আস, তবে কত সুখী হই—এ তোমার পরের ঘর নয়! বৌ, তুমি ভাল ক'রে বল।

আমি। বিজয় আমার তেমন ছেলে নয়—ও অমন মেয়েমানুষের মত লজ্জায় জড়সড় হয় না। আসবে বই কি!

ঠাকুরঝি। ঐ কীর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে, শুনবে ত চল।

বাহির-বাড়ীর দোতলার বারান্দায় চিক ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সতরঞ্চি পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে—পাড়ার মেয়েরা অনেকে আসিয়া জুটিয়াছেন, বিধবাই অধিকাংশ—কাহারও হাতে মালা, কাহারও ঝুলিতে মালা, সকলেই জপে নিযুক্ত—জপও করিতেছেন, গল্পও করিতেছেন, কীর্ত্তনও শুনিতেছেন।

কীর্ত্তন

শ্যাম, যে ছিল তোমার কণ্ঠের হার
তারে ধূলার 'পরে লুটালে?
ব্রজে তোমার গরবে যে ছিল গরবী
তার সে গরব টুটালে?
তুমি চলে গেলে রথে রাধা সেই পথে
পরাণখানি দিল বিছিয়ে—
তার মর্ম্মে রথের চাকা, পড়ে গেল আঁকা,
দেখলে না চেয়ে ছি ছি হে!
মনে ভেবেছিল রাই তোমার সাধ্য নাই
সুখের বৃন্দাবন ছাড়িতে—
ছিঁড়ে রাধার ভুজফাঁদ তোমায় শ্যামচাঁদ
পারবে না কেহ কাড়িতে!
আজ মানছি শত বার হার হয়েছে তার
এত গরব তারে সাজে না!

ওগো তোমার পাষাণ প্রাণে প্রেমের কুসুম বাণে
কোন ব্যথা কভু বাজে না!
ওগো আমাদেরি রাধা সেই পড়েছে বাঁধা
তোমায় বাঁধা তার কর্ম্ম নয়!
ব্রজের লীলা শুধুই লীলা এই কি প্রকাশিলা?
ধরা পড়া তোমার ধর্ম্ম নয়!
এখন তোমার মনস্কাম পূর্ণ হ'ল শ্যাম,
দর্প চূর্ণ রাধার হয়েছে!
এখন, আর কি নিতে চাও এবার ক্ষান্ত দাও
প্রাণটুকু কেবল রয়েছে!

গণেশ। মা, কাল সন্ধ্যাবেলা আর পিসিমাকে দেখতে পাই নি কেন?

আমি। তোমার পিসিমা সন্ধ্যা আহ্নিকে নিযুক্ত ছিলেন, তাই দেখা পাও নাই।

গণেশ। সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত কি তিনি সন্ধ্যাবন্দনা করেন? তোমার ত অত দেরি হয় না!

আমি। আমার সন্ধ্যাবন্দনা, তপ জপ, সবই ত বাবা তুই—করতে হয়, তাই দুটি বেলা অবসরমত একবার ইষ্টমন্ত্র জপ করি—তার ভিতর তুই আবার সাত বার এসে উঁকি মেরে যাস, কত ক্ষণে আমার অর্চ্চনা শেষ হবে। হরি দয়া ক'রে তোকে দিয়েছেন, আমার যত ক্ষণ তুই আছিস, তত ক্ষণ এই রকমই হবে। তোমার পিসিমার মায়ায় জড়াবার কেহ নেই, ঘর সংসার সকলই তাঁর মিছে—থাকতে হয়, তাই থাকা—যথেষ্ট সময় আছে, পূজা অর্চ্চনা নিয়েই থাকেন।

গণেশ। পিসিমাকে দেখলে বড় শ্রদ্ধা হয়—না মা?

আমি। কেন, তোর হয় না কি?

গণেশ। হ্যাঁ মা; আমার মনে হয় যেন মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা। ঐ শাদা কাপড়খানি পরা, শুধু হাত সুগোল ধবধবে—ওতে যেন চুড়ি প'রলে, কি পেড়ে কাপড় প'রলে মানায় না।

আমি। আমার মনে হয়, শোক দুঃখ তাপ না থাকলে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না—সুখ সম্পদের গর্ব্বে হিতাহিত বোধশক্তি ক'মে যায়।

গণেশ। ঠিক বলেছ মা। বাবা যাবার আগে আমি কি রকম দুরন্ত আর আবদারে ছেলে ছিলুম, তোমার মনে নেই? তার পর কি রকম শান্ত হয়ে গেলুম!

আমি। সে অমন ছেলেবেলা সবাই দুরন্ত থাকে।

গণেশ। না মা, তা নয়। আমার বেশ মনে পড়ে, আমার মনের ভয়ানক পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। মরণের হাত যে এড়াবার জো নেই, এটা ছেলেবেলা থেকে আমার হাড়ে হাড়ে বিঁধে আছে!

আহারান্তে দুপুর বেলা আজ ঠাকুরঝির গাড়ীতে মায়ে পোয়ে ভবানীপুরে বিয়েবাড়ী চলিয়াছি। গাড়ীতে যাইতে যাইতে নানাপ্রকার গল্প হইতেছে—গণেশ মধ্যে মধ্যে চিনাইয়া দিতেছে—এই গোলদীঘি, এই হাসপাতাল, এই ধর্ম্মতলা, ঐ গড়ের মাঠ, ঐ যাদুঘর ইত্যাদি—দেখিতে দেখিতে নীরুর বাড়ী গাড়ী পোঁছিল। আজ রাত্রেই ফিরিয়া যাইবার জন্য ঠাকুরঝি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন এবং নিজের গাড়ীতে করিয়া পাঠাইয়াছেন; ঐ গাড়ী ভবানীপুরেই থাকিবে, বিবাহাদি সম্পন্ন হইয়া গেলে আমাদের লইয়া ফিরিয়া যাইবে।

"নীরে ত বাড়ী সাজাতেই ব্যস্ত, এদিকে কি যে হচ্ছে সে খোঁজ নেই। এমন ঘরেও মানুষে কুটুম্বিতা করতে চায়! আবার একখানা কি ফ্যাকড়া তুলেছে আর কি, নইলে দশটার সময় অধিবাস নিয়ে মানুষ গেছে, আর বারোটা বেজে গেল, এখনও নান্নীমুখের অনুমতি এল না! ক'নে শুখিয়ে যে মারা পড়তে বসলো!"

বিবাহের দিন ভবানীপুরে গিয়া দেখি যে, দিদি রান্নাঘরের রকে বেড়াইতেছেন ও গজ গজ করিয়া বকিতেছেন—নীরুর মা ভাঁড়ার ঘরের চৌকাটের উপর বসিয়া আছেন—অন্যান্য সকলে কাজকর্ম্ম করিতেছেন—কিন্তু সকলেই যেন কেমন মনমরা, কারও মুখে হাসি নাই!

আমি। (সকলকে প্রণাম করিয়া ও সকলের প্রণাম গ্রহণ করিয়া) কি দিদি, বক্‌ছ কেন—কি হয়েছে?

দিদি। নাঃ, বড় ভাবনা হয়েছে! এত ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি—নিজেরই সন্তান বল, আর দেওরদেরই বল—এমন বেয়াড়া কুটুম ভাই কখনও দেখি নি!

নীরুর মামী। এ সব ভাই গিন্নীর কাজ! শুনলে না, সেই ঝিটা ব'লে গেল, 'গিন্নীমার কিছু মনে ধরে না'—হয়ত অধিবাসের সামগ্রী মনে ধরে নি! রোস, বামন ঠাকরুনকে পাঠিয়ে দিই; তার বোন সেই বাড়ীতে কাজ করে, চুপি চুপি তার কাছ থেকে তথ্য জেনে আসবে! কি বল ঠাকুরঝি?

নীরুর মা। যা ভাল হয় কর ভাই, আমার মাথাটা ঝিমঝিম করছে।

নীরুর মামী চলিয়া গেলেন।

দিদি। মেজ বৌ, তুই জল খা—রোগা মানুষ, আর এই ঘুরুনি, এই ভাবনা, শরীরে কত আর সয়! খা তুই জল খা—আমি তোর বড়, আমি রইলুম, তোর আর থাকতে হবে না।

নীরুর মা। পূর্ব্বপুরুষ জল পাবেন, আমি আগে থাকতে জল খেয়ে বসবো, তা কি হয়? নান্নীমুখটি হয়ে গেলেই আমি জল খেতুম, নীরু তাতেই সকাল সকাল উয্‌যুগ করলে—সবই ত তৈয়ের কেবল অনুমতির অপেক্ষা—থাক, আর একটু দেখি—

নীরুর মামী। (আসিয়া) বামন ঠাকরুন জানতে গেছে—বরের বাড়ী কি হচ্ছে।

দিদি। কালই নীরু যে রেগে উঠেছিল—আমি বলি বিয়ে ভেঙ্গে যায়—কত ক'রে তাকে শান্ত করি!

আমি। নূতন কিছু হয়েছে?

দিদি। কাল বরের মা ব'লে পাঠিয়েছিল যে, বরকে ডেস্ক, আলমারি, এই সব দিতে হবে—আরও কত কি, সে সব আমি কোন নামও জানি নে—এই শুনে নীরু আগুন! আবার বরের বাপ ব'লে পাঠালেন, ভাল ক'রে বাড়ী সাজাতে হবে, তাঁর সঙ্গে ঢের বড় বড় লোক আসবেন। এক একটা ফন্দি আসছেই—বাপ রে, এ সেরাজদ্দৌলার নাতিরই বিয়ে, কি তার ঠাকুরদাদারই বিয়ে কে জানে!—

সকলেই কেমন নিরুৎসাহিত—পথপানে চাহিয়া চুপচাপ বসিয়া আছেন, গল্পও ভাল জমিতেছে না—এমন সময় নীরু আসিয়া বলিল, "জেঠাই-মা, সব চুপচাপ যে ব'সে আছ—এখনও নান্নীমুখ আরম্ভ হয় নাই? তোমরা বেশ যা হোক!"

দিদি। তুই এত ক্ষণ ছিলি কোথা?

নীরু। আহা, আমাকে দরকার কি? আমি যে ব'লে গেলুম, ধীরেকে দিয়ে নান্দীমুখ করাও। আমি বাজারে গেছলুম—ধীরে গেল কোথায়?

দিদি। ধীরে মাথামুণ্ড করবে কি—? এদিকে আয়, শোন বলি—এখনও যে অধিবাসের লোক ফেরে নি, অনুমতি আসে নি।

নীরু। অনুমতি আসে নি? লোক পাঠাও নি কেন?

দিদি। পাঠিয়েছি। ঐ যে বামন ঠাকরুন আসছে। কি গা মেয়ের কি খবর?

বামন ঠাঃ। ভাল বুঝতে পারলুম না মা, কিন্তু কি যেন একটা হয়েছে বুঝলুম। আমার বোন বললে যে, গিন্নীমাতে আর কর্ত্তাবাবুতে বকাবকি হচ্ছে, কে না কি গিন্নীমাকে বলেছে যে মেয়ে কুৎসিত, তাই কি বকাবকি হচ্ছে—কর্ত্তা না কি বলেছেন, তুমি যাও, আপনি দেখে এস।

নীরু। কি বিপদেই পড়েছি গা—যাই, ঘটককে ডাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝি। ঐ দেখ কারা এল—দিদি কোথায়, নাবিয়ে নিয়ে আসুন।

নীরুর মা। আরে, এ যে ঐ বরের বাড়ীর ঝি, আরও দু-জন মেয়েমানুষ নাবলো—ক'নে দেখতে এল নাকি? যাক, দেখে যাক। নীরু, তুই বাছা একটু স'রে যা, আবার গালমন্দ দিয়ে বসবি—কোন রকমে এখন শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হ'লে বাঁচি।

নীরু। শুভ কর্ম্ম নয়, অশুভ কর্ম্ম বল! দেখছি, এ মেয়ের কপালে অনেক কষ্ট আছে!—

দিদি। কি গো বাছা, এস এস, কি মনে ক'রে এমন সময়? এঁরা কে?

বরের বাড়ীর ঝি ও তাহার সহিত আর দুইটি স্ত্রীলোক—একজন সধবা, পরিধানে একখানি গরদের শাড়ী, দু-একখানি অলঙ্কার যাহা অঙ্গে আছে, তাহা খুব ভারি বলিয়া বোঝা গেল—আধঘোমটা দেওয়া। আর একজন বিধবা, থান-পরা—দাসীর মত নহে, ভদ্রমহিলা বলিয়াই বোধ হইল।

ঝি। (প্রণাম করিয়া) এই মা, আপনাদের চরণ দর্শন করতে একবার এলুম, এঁরা আমাদের পাড়ার ব্রাহ্মণের মেয়ে, গিন্নীমায়ের সই। মা, জানি নে কোন্ আবাগী গিন্নীমাকে বলেছে যে, মেয়ে না কি কালো,

তাই আমি বললুম যে, আচ্ছা, কেহ দেখে আসুন। তাই সইকে গিন্নীমা দেখতে পাঠিয়েছেন। মা, একবার বৌকে দেখান যদি—

দিদি। হ্যাঁ গা, অধিবাসের লোক এখনও ফিরলো না যে ?

ঝি। তারা খাওয়া দাওয়া ক'রে আসছে মা—এই এল ব'লে।

দিদি। অনুমতি নিয়ে ঘটকও এল না, এদিকে যে মেয়ে শুকিয়ে মারা পড়ে।

ইতিমধ্যে রাণী ইঁহাদের একটি ঘরে আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়াছে, তাঁহারা কেহ কথা কহিতেছেন না, একটু সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া আছেন। বামন ঠাকরুন আমাকে চুপি চুপি বলিল—"মাসিমা, ঐ সধবা মোটা মেয়েমানুষটি, ঐ বরের মা, আমি ঠিক চিনেছি, ঐই ত গিন্নী নিজে—সই কিসের ? আমি যে আমার বোনকে দেখতে ওঁদের বাড়ী যাই—আমিই ত এই মেয়ের কথা ঐ ঝিকে বলি—ও এখন আপনি বাহাদুরি নিতে চায়, আমাকে আমল দেয় না !" নীরুর স্ত্রী মেয়েকে লইয়া আসিল।

রাণী। এই দেখুন সই, ক'নে। আপনি যখন বেয়ানের সই, তখন আমারও সই।—আহা, বাছা এক দিনের ধকলে শুকিয়ে গেছে, চোখে কালি ঢেলে দেছে—এই দেখুন, কেমন হাত দুখানি দেখুন, যেমন নরম, তেমনি রাঙা।

ঝি। (সোৎসাহে) দেখুন দেখি গিন্নীমা, (জিব কাটিয়া) সই-মা, এ মেয়ে কি নিন্দের ?

সধবা স্ত্রী। না, মেয়ে নিন্দের নয়, বেশ মেয়ে—চল যাই। আসি ভাই—

প্রসন্ন ভাবে সকলে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল—জল খাও, কি পান খাও, বলিবার অবসর ছিল না।

বামন ঠাকরুন। দেখলে মা, ঝি গিন্নীমা ব'লে ডাকলে—ঐ গিন্নী নিজে।

দিদি। ও মা, ঐ গিন্নী ? গিন্নী নিজে এল ? ও মা, মান অপমান জ্ঞান নেই ! ও মা, কি হবে ! নতুন কুটুমবাড়ী, না ডাকতে এল ! বাবা, এখনকার মেয়ে সব কি করে গো ! হ'তই না হয় কালো বৌ, তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত ! গেরস্ত ঘরের মেয়ে, গেরস্ত ঘরের বৌ, গুণ থাকলেই সব মানিয়ে যায়।

নীরুর মা। গেরস্ত ঘরের মেয়ে বটে, কিন্তু গেরস্তরা ত নিতে আসে নি—তাঁরা যে বড় লোক, তাই ভাল ক'রে দেখে শুনে নিচ্ছেন।

দিদি। বনেদী ঘর হ'লে এমন করত না মেজ বৌ—এরা নতুন বড় মানুষ, তাই বেশী দেখাতে চায়।

নীরুর মামী। ভদ্র অভদ্র নতুনেও আছে, পুরনোতেও আছে—যাদের যেমন ব্যাভার!

ধীরু ও পুরোহিত আসিয়া নান্দীমুখ করিতে বসিল।

দিদি। কি রে, অনুমতি এসেছে?

ধীরু। হ্যাঁ, জেঠাই-মা। ঘটক বললে যে, বাড়ীর ভিতর মেয়েরা কি গণ্ডগোল করেছিলেন, তাতেই তার ফিরতে দেরি হ'ল।

নান্দীমুখ, ক'নে নাওয়ানো শেষ হইতে বেলা পাঁচটা বাজিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় বিজয় আসিয়া বলিল, "দিদি, বাড়ী সাজানো দেখবে এস, দেখসে কেমন হয়েছে। 'খুব ভাল করিয়া যেন বাড়ী সাজানো হয়' বরের বাপের এই আদেশে পতাকা পত্র পুষ্পে আমরা কেমন বাড়ী সাজিয়েছি, লক্ষ্মীটি, একবার তোমরা দেখে যাও—তবু এত পরিশ্রম সার্থক মনে হবে।"

রাণী। আর দেখা! আমাদের মরবার অবসর নেই, বাড়ী সাজানো দেখব কি—যাদের জন্যে করেছিস্, তারা দেখলেই শ্রম সার্থক হবে এখন।

বিজয়। তারা না দেখলে কিছু ক্ষতি নেই—বলছি ত তোমরা দেখলেই হ'ল।

আমরা দোতলার বারান্দা হইতে বিবাহের সভা দেখিতে পাইলাম। লতায় পাতায় উজ্জ্বল আলোকে যেন ইন্দ্রপুরী বলিয়া মনে হইতেছে। সভার এক দিকে দানসামগ্রী সাজানো, আর এক দিকে নিমন্ত্রিতদিগের বসিবার স্থান। অনেক সাহেব মেম আসিয়াছে, বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ত কথাই নাই—সভা পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে মন-কাঁদানো সুরে নহবৎ বাজিতেছে, মাঝে মাঝে ধীর গম্ভীর স্বরে ইংরাজী বাজনা বাজিতেছে—সমস্ত প্রস্তুত, বর আসিলেই হয়।

অন্তঃপুরে অধিকাংশ মেয়েরা সুসজ্জিত হইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে—কেহ কুলো বরণডালা ও শ্রী প্রভৃতি ছাল্‌নাতলায় লইয়া রাখিতেছে—কেহ চিতের কাটিতে তুলা জড়াইয়া তাহা তেলে ভিজাইয়া রাখিতেছে—কেহ ধুতুরার প্রদীপে তেল সলিতা দিতেছে—কেহ বরের

জলখাবার সাজাইতেছে—কেহ ক'নে সাজাইতে ব্যস্ত—কেহ নিজে সাজিতেছে। তেতলার ছাতে পাতা হইতেছে—চাকরেরা গেলাস, খুরি ও পাতা ঝুড়ি করিয়া বহিয়া বহিয়া ছাতে তুলিতেছে—বর আসিলেই বরযাত্রীদিগকে আহারে বসাইয়া দেওয়া হইবে—তাহা হইলে অধিক রাত্রি হইবে না।

দিদি। ৯টার মধ্যে লগ্ন, ৮টা বেজে গেল, এখনও বর এল না—ঘটার বর, বাজনার সাড়াও যে পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ রে মেজ বৌ, আবার কিছু হ'ল না কি ?

মেজ বৌ। (বারান্দায় বসিয়া) কি জানি ভাই, আর ভাবতে পারি নে !

রাণী। (আসিয়া) মা, আবার একটা কি ফন্দি নিয়ে ঘটক এসেছে গো—আমি বারান্দা থেকে দেখে এলুম, ঘটককে ঘিরে সব ছেলেরা কি কথা ক'চ্ছে। বর না নিয়ে এমন সময় ঘটক কি করতে এল ? নিশ্চয় আবার কি হয়েছে ! ঐ যে নীরু আসছে—

নীরু আসিয়াই হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "দিদি, বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে এলুম !"

রাণী। কি রে, কি সর্ব্বনেশে কথা বলিস ? শুনে ভয়ে গা যে কাঁপে। নান্দীমুখ হয়ে গেছে যে !

নীরু। হ্যাঁ, সত্যিই বলছি। আমারও গা কাঁপছে—কিন্তু ভয়ে নয়, রাগে ! ঘটক এখন এসে বলছে কি যে, গায়ে হলুদের দিন যে হাজার টাকা দিয়েছি, সেটা আমি বরকে আশীর্ব্বাদী দিয়েছি—আজ আড়াই হাজার টাকা পুরোই দিতে হবে—ঐ টাকা বরের বাড়ী পোঁছে দিলে, তবে বর আসবে। আমি ব'লে এসেছি যে, 'যদি আমি ও-বরে মেয়ের বিয়ে দিই, তবে আমার চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হবে !'

বলিয়া নীরু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল—আমরা স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে নীরুর মায়ের চোখ দিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে লাগিল—দিদি 'হরি মধুসূদন, লজ্জা নিবারণ কর, লজ্জা রক্ষা কর' বলিয়া মাটিতে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন, রাণী তাঁহাকে ধরিল।

আমি উঠিয়া নীচে গেলাম—হরকান্ত ও গণেশ ছুটিয়া যাইতেছে, সিঁড়ির ঘরে দেখা পাইলাম।

আমি। গণেশ, শোন্। ছুটে কোথা যাচ্ছিস ?

গণেশ। শুনেছ মা, কি হয়েছে ? নীরুদা বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছেন। বড় দাদা আমাদের ডেকে বললেন যে, 'তোরা চট্‌পট্ পাতা ক'রে, এ কথা প্রকাশ হবার আগে কন্যাযাত্রীদের খাইয়ে দে'—তাই মা, আমরা সব পাতা করছি। বড়দা বললেন, 'বিয়ে ত ভেঙ্গে দিলে, কিন্তু আজ রাত্রের মধ্যেই ত যে-কোন পাত্রের হাতে মেয়ে সমর্পণ করতে হবে, নইলে জাত যাবে।' নীরুদা বললেন, 'জাত যায় যাক্, আমি ভাল ছেলে না পেলে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি নে'—ব'লে উপরে চ'লে গেছেন।

আমি। তুই আমার সঙ্গে উপরে আয়, নীরুকে শান্ত করবি—

গণেশ। আমি মা কি বলব—আমি পারব না—

আমি। সে মাটিতে প'ড়ে আছে,—আয় না—

গণেশ কতকটা অনিচ্ছায় আমার সহিত উপরে আসিল—দেখিলাম, সকলে তেমনি নিশ্চল অবস্থায় রহিয়াছেন।

আমি। নীরু, ওঠ ত বাবা—

নীরু মুখ তুলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল ; আমি আবার তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "নীরু ওঠ।" নীরু উঠিয়া দাঁড়াইল—সে যে কি করিতেছে, তাহা যেন বুঝিতেই পারিতেছে না ; আমি গুরুজন—উঠিতে অনুরোধ করিলাম—সে উঠিল।—

আমি। (নীরুর হাতে গণেশের হাত দিয়া) নীরু, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে গণেশের হাতে তোমার কন্যাটি সম্প্রদান কর। তোমরা মৌলিক—গণেশের কুলকর্ম্ম হবে না, তার কুল খাটো হয়ে যাবে বটে, কিন্তু জাত যাবে না—তোমার জাত যেতে বসেছে। এখন তোমার মতে যা ভাল হয়, কর।

নীরু। মাসিমা, আজ আমার লজ্জা ও অপমানের পরিবর্ত্তে আপনি আমাকে এমন সোনার চাঁদ জামাই দিচ্ছেন—এতে আবার মতামত কি !

এই বলিয়া নীরু দুই হাতে আমার পা জড়াইয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া রহিল, তাহার চোখের জলে আমার পা ভিজিয়া গেল ; অনেক ক্ষণ তাহাকে টানিয়া তুলিতে পারিলাম না। দূর হইতে এক এক বার বাজনার শব্দ শোনা যাইতে লাগিল—একজন দাসী ছুটিয়া আসিয়া

বলিল, "ওগো, বর আসছে।"—চুপ্ চুপ্ করিয়াও ইতিমধ্যে দাসীমহলে জানাজানি হইয়াছে যে, বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বর আসিবে না।

রাণী। কাদের বর ?-

দাসী। ওগো, আমাদের বর। ঐ দেখ, বরের বাড়ীর ঝি আসছে !—

বরের বাড়ীর ঝি। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) বাবু কোথা গা ?

নীরু। কেন ?

বরের বাড়ীর ঝি। বর আসছে গো—তোমরা সব উয্যুগ কর। মা-ঠাকরুন সব শুনেছেন, তিনি কত্তাবাবুর উপর ভারি রাগ করেছেন, তিনি বললেন, 'অ্যাঁ, কথা দিয়ে এমন কাজ করা !' তিনি বলেছেন যে, 'আমি যদি ঐ মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে না দিই, তবে আমি কায়েতের মেয়ে নই।'—ঐ শোন, বাজনা শোনা যাচ্ছে—খবর দিতে আমি ছুটে এসেছি গো, ছুটে এসেছি।

নীরু। (দৃঢ়ভাবে গণেশের হাত ধরিয়া) বাছা, যেমন ছুটে এসেছ, তেমনি ছুটে যাও—বরকে ফিরে নিয়ে যেতে বল। আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে—এই দেখ আমার জামাই ! এস বাবা—

———

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত প্রবন্ধ

কলিকাতার স্ত্রী-সমাজ

পত্র

আমার ইচ্ছে যে, তোমাকে একবার আমাদের মেয়ে-মজলিসটা দেখাই। আজকাল মেয়েদের মধ্যে এমন একটা খিচুড়ী পাকিয়েছে যে, এক রকম পোষাকের, কি এক রকম কথাবার্ত্তার মেয়ে তিন চারিটি একটা মজলিসে দেখতে পাওয়া ভার। যুবতীদের মধ্যে যে কত রকম-বিরকমের পোষাক উঠেছে, সে আর লিখে ওঠা যায় না—প্রায়ই কারও সঙ্গে কারও মেলে না—না সাজগোজেই মেলে, না পোষাকেই মেলে। মধ্যমবয়স্কাদের মধ্যে বরং তার চেয়ে একটু মিল পাওয়া যায়। যুবতীদের দেখলে বোধ হয় চেনা যায় না যে, তারা একজাতীয় স্ত্রীলোক।

সে দিন আমি যে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেম, তার সব গল্প বলি শুন। আজকালের নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করবার একটি বাঁধা নিয়ম হয়েছে, তার যদি একটু ত্রুটি হয়, তবে আর নিমন্ত্রণকারীর নিন্দার সীমা নেই। কি কি করলেই খুব আদর করা হ'ল জান? সে দিন আমাকে যে রকম ক'রে তারা আদর করেছিল, তাই বললেই বুঝতে পারবে। প্রথমে পালকি থেকে নামবা মাত্র একজন হাত ধ'রে নিয়ে মজলিসে বসালে, তার পর আর আমার খবর নেই। যাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়েছি—তিনি গিন্নী ঠাকরুণ, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর তাঁর বোনেদের ও মেয়ের শাশুড়ীকে খুব যত্ন আদর করছেন—কেবল এই দুই কুটুম্ব ছাড়া আর কাহারও খবর কেহ নিচ্ছে না। আমি আর কি করি? চুপ ক'রে ব'সে ব'সে সব দেখতে লাগলুম।

* * * * *

ঘরে ব'সে অপেক্ষা ক'রে আছি যে, কখন্ তারা আসে। একটু পরে তারা ঘরে এল, আর পাঁচালির দলের মধ্যে না গিয়ে আমাদের সঙ্গেই বসল। তারা সব এক একটা বিশ্রী ধরণের পাতলা ওড়না মাথায় দিয়েছে * * তার ভিতরে একজন কোমর থেকে বোধ হয়, এক হাত ওসারের একটা মোটা কাপড় পরেছে—একজন হাটু পর্য্যন্ত—আর একজন বেশ পা পর্য্যন্ত পরেছে। যেমন বাঙ্গালীর মেয়েরা শাড়ী পরে, তেমনি

ক'রে প'রে আঁচলটা কাঁধে ফেলে একটা ক'রে কোমর-বন্ধ পরেছে। এক ব্যক্তি কোমর-বন্ধ পায় নি, তিনি চারটে গাঁট-দেওয়া এক ন্যাকড়া কোমরে জড়িয়েছেন। ওড়নাগুলো খুব পাতলা ও তাই দিয়ে মুখে ঘোমটা দিয়েছে—ওড়নার ওসার এক হাত হবে, এতে যদি দাড়ি পর্য্যন্ত ঘোমটা দেয়, তা হ'লেই কাজেই সমস্ত পিঠটা বেরিয়ে থাকে—তাদেরও তাই হয়েছিল। আমি ত খুব আশ্চর্য্য হয়ে তাদের দিকে চেয়ে ভাবছি যে, এরা কে—এমন সময় সেই বাড়ীর একটি ছোট মেয়ে তাদের বৌদিদি বৌদিদি ব'লে কথা কইতে লাগল—তখন বুঝলেম, তারা সেই বাড়ীর বৌ। তার পর অন্য বাড়ীর নিমন্ত্রিতদের দেখতে লাগলেম।—কারও গায়ে জামা আছে—কারও গায়ে নেই।—কেহ বা পুরুষদের মত চায়না-কোট পরেছে, কেহ বা ছেলেদের মত ঢলঢলে জামা পরেছে। কারও বা বেশ ভাল মেয়েলি জামা। কিন্তু বেশীর ভাগই চায়না কোট পরা। দু-বৎসর আগে যাদের খালি গা দেখেছিলেম, এবার তাদের গায়ে জামা দেখলেম ; আগে যেমন খারাপ রুচির কাপড়-পরা অধিকাংশ দেখেছিলেম —এবার আর প্রায়ই দেখতে পেলেম না। একটা ভারি মজার পোষাক দেখলেম। একটি ছোট মেয়ে, বোধ হয় বয়স আন্দাজ আট নয় বৎসর ; একখানি বেশ ঢাকাই শাড়ী পরেছে, আর তার উপর একটা সাটিনের গাউন পরেছে—তাও আবার উল্টো—অর্থাৎ সুমুখ দিক্‌টা পিছন দিকে দিয়েছে—পিছনটা সুমুখ দিকে দিয়েছে। এ কোন্ দেশী পোষাক বল দেখি ? পায়ে জুতো মোজা ত নেইই। রাজ্যের গয়না পরানো—মাথায় খোঁপা বাঁধা, শাড়ী পরা, সবই আছে—তবে আবার মাঝে থেকে একটা পেটিকোট কেন ? তার পর তাদের গল্পে একটু মনোযোগ দিলুম।

এক দল ঘর-সংসারের গল্প আরম্ভ করলে—মেয়ের অমুক জায়গায় বিয়ে দিয়েছি—অনেক দূর—মেয়েটি আনতে পারি নে—ভেবে ভেবে হাড় কালি হ'ল। আর একজন বললে—"আমার ছোট ছেলের ব্যারাম ; আমি আসতুম না—বেয়ান কিছুতেই শুনলেন না ; যে পেড়াপীড়ি ক'রে ব'লে এলেন, না এলে দুঃখ করবেন, তাই এলুম ইত্যাদি।" এরা সব অর্দ্ধবয়সী। যুবতীদের মধ্যে স্বামীর কথা হচ্ছে। পাঁচালিতে একটা বেদেনী সেজে আসে, সে স্বামী-বশ-করা ঔষধ জানে। যে সময় বেদেনী

এসেছে, একজন আর একজনকে বললে,—এই বেলা ওষুধ নাও, স্বামী বশ হবে। সে উত্তর দিলে—আমাদের আর সে ভয় নেই, এমন স্বামী আর কারও হয় না। তাদের মধ্যে পড়াশুনার কথাও আছে। অমুক বই পড়েছ—অমুক বইয়ের অমুক জায়গাটা পড়লে খুব কান্না পায়, এই সব কথাও হয়। একজন এসে আমার সঙ্গে ভাব করলে—সে এসে আমার সঙ্গে নানান কথা কইলে, আমার স্বামীর বিষয়েই জেয়াদা কথা জিজ্ঞাসা করলে, আর জিজ্ঞাসা করলে—তুমি লেখাপড়া জান কি না, ইংরাজী জান কি না।—এখন আর কেউ জিজ্ঞাসা করে না—তোমার শাশুড়ী ননদ কেমন—এখন বলে, স্বামী কেমন—কেমন ভালবাসে—স্বামীর নাম কি ? স্বামীর নাম ধরতে যেন তেমন বাধা নেই ! বৃদ্ধাদের মধ্যে প্রায়ই খাবার গল্প, এই—কি রান্না হ'ল, কেমন রান্না হ'ল—সে দিন সে এমন ভাল ডাল রেঁধেছিল যে, তার জামাই হু-বার ক'রে চেয়ে নিলে। তাঁদের নিজের রান্নার প্রশংসা, আর পাড়ার বৌ-ঝিদের নিন্দেই বেশী শুনলুম। একটি বৌ বেশ ভাল রকমের কাপড় অর্থাৎ জামা, শেমিজ ইত্যাদি প'রে এসেছিল দেখে তাদের মধ্যে একজন বললে—"দেখ দেখ, একটা ইজের-চাপকান-পরা বৌ দেখ। মা! কালে কালে কতই হবে।" তাঁদের সঙ্গে যে বউরা এসেছে, তাদের প্রায়ই কেবল পাতলা বেনারসী বা কেবল নীলাম্বরী কাপড় পরা ছিল। আমি আর একদিন একটা নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেম—আমার পরিচিত একটি মেয়ে জামা শেমিজ প্রভৃতি পরে—কিন্তু সে দিন দেখলুম পরে নি, তবে লজ্জা নিবারণের জন্য কাপড়টা মোটা ও জামা পরা ছিল। আমি তাকে শেমিজ না পরার কারণ জিজ্ঞাসা করলেম। সে বললে, "ভাই কি করব ? এদের বাড়ীর পায়ে নমস্কার। ভারি নিন্দা করে—আমার বোন পরত ব'লে তাকে সকলে কি ঠাট্টাই না করে! শাশুড়ী তাকে দেখতে পারে না—আমি একদিনের জন্য এসেছি, কাজ কি ভাই, নিন্দা করবে—আমার বোন ত পরা ছেড়েই দিয়েছে।" সেটা তার বোনের শ্বশুরবাড়ী।

আমি দেখেছি, যাদের বাড়ীর কাপড় পরা ভাল, প্রায়ই তাদের কথাবার্ত্তাও ভাল, ধরণ-ধারণও ভাল। যাদের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়েছি, তারা যে রকম ধরণের, তাদের নিমন্ত্রিতারাও প্রায় অধিকাংশ সেই রকম

ধরণের। অনেকের বেশ লেখাপড়া শিখতে, ভাল কাপড় পরতে খুব ইচ্ছা দেখতে পাই।

যা হোক, তার পর সে দিন ত এমনি ক'রে তিন চার ঘণ্টা কাটল।—কত ক্ষণ পরে একজন এসে সকলকে বললে, "পাত হয়েছে, আপনারা উঠে আসুন।" এখন সব মেয়েতে মেয়েতে প্রথম আলাপে "তুমি" বলবার জো নেই—আমার চেয়ে বয়সে যে পাঁচগুণ বড়, সেও আমাকে "আপনি" ব'লে কথা কইবে—না হ'লে অসভ্য ব'লে নিন্দা হয়। তার পরে সব কাপড় ছাড়তে আরম্ভ করলে। জরির কাপড়, বেনারসী কাপড় সব ছেড়ে সুতোর কাপড় প'রে খেতে যেতে হয়। আমি কাপড় ছাড়ি নি ব'লে আমার ভারি একটা নাম বেরিয়ে গিয়েছিল—কেউ ভেবেছিল খ্রীষ্টান, কেউ ভেবেছিল ব্রহ্মজ্ঞানী, সকলেরই চোখ আমার দিকে, আমি ত ভাল বিপদেই প'ড়ে গিয়েছিলেম। যা হোক, খেতে গেলুম। দেখলুম, লুচি-তোলা পদ্ধতি একটু কমেছে। দু-তিন বৎসর আগে দেখেছিলাম যে, আমাদের কায়স্থদের ঘরে,—এবং ব্রাহ্মণদের ঘরেও এমন মেয়ে নেই, যে তোলে না—তবে কেউ বেশী, কেউ কম। দু-বৎসর আগেকার একটা তোলার গল্প বলি শোন। একজন বেশ বড় ঘরের গিন্নী বৌ তিন-চারটি ছেলে মেয়ে নিয়ে এসেছিল। তারা সকলেই আমাব সুমুখে খেতে বসেছিল। তার পর গিন্নী সকল ছেলেদের ও নিজের সন্দেশের খুরিগুলি উঠিয়ে রাখলে—বড় বড় ছেলেরা খুরি তোলার মর্ম্ম বেশ বোঝে, তারা কিছু বললে না। সব ছোট, একটি দু-বৎসরের মেয়ে, সে কোন মতেই তার খুরিটি দেবে না—কান্না আরম্ভ করলে—খাবার জায়গায় ত ভারি হ্যাঙ্গাম বেধে গেল—তার মাও উঠিয়ে নেবে—মেয়েটিও দেবে না। খানিক পরে মা কোন মতে কান্না থামাতে না পেরে দিলে—দিয়েও কিন্তু মায়ের ভারি মন খুঁৎখুঁৎ ক'চ্ছে। কেবল বলছে—"এমন দেখি নি, অত খেতে পারবে না, কেবল নষ্ট করবে।" খানিক বাদে মা সেই মেয়েটিকে বললে, "দেখ্ দেখ্, কেমন একটা চিল উড়ছে।" যেমন সে চেয়ে দেখেছে, অমনি সে কতকগুলি খাবার তার খুরি থেকে উঠিয়ে অন্য খুরির মধ্যে রেখে দিলে, মেয়েটা একটু বুঝি সেয়ানা রকমের ছিল, সে চোখ নামিয়ে একবার খাবারের দিকে চাইলে, একবার মায়ের মুখের দিকে চাইলে, চেয়ে চেয়ে, "আমার

ছানাবড়া কই” ব’লে চীৎকার ক’রে উঠল—তখন তার মা ছানাবড়াটি দিলে, আর বিরক্ত হয়ে কত কি বিড়-বিড় ক’রে বকতে লাগল। এই নিমন্ত্রণের প্রায় এক বৎসর পরে ঐ রকম আর একটা ব্যাপার দেখেছিলেম। কথায় কথায় একজন বললে যে, “এই বাড়ীর একঘর জ্ঞাতির বাড়ীর মেয়েরা ভয়ানক খায়—আর ভয়ানক বেঁধে নিয়ে যায়।” শুনে আমার দেখবার ইচ্ছা হ’ল—আমি খাওয়া দেখতে চ’লে গেলুম। তারা সকলে ছাতে খেতে বসেছে। যদিও বর্ষাকাল, কিন্তু সে দিনটা বেশ পরিষ্কার ছিল—তাই ছাতেই খাওয়াতে ব’সে গেছে—আমি যখন উপরে গেলুম—তখন অল্প অল্প মেঘ করছে। সেই জ্ঞাতির পরিবারেরা একটি মাঝারি রকমের ছাত সম্পূর্ণ দখল ক’রে নিয়ে খেতে বসেছে। তাদের গিন্নী নিজে এসেছেন, তা ছাড়া গিন্নীর বৌ, ঝি, নাতবৌ, নাতনী, ছোট ছোট ছেলে, ছোট ছোট নাতি ত অগুন্তি এসেছে। যখন আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম, তখন তাদের লুচি খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। তখন গিন্নী আর তার বৌ-ঝিরা সব সন্দেশে হাত দিয়েছেন। গিন্নী বলছেন, “ওরে ভূতি, সন্দেশের সরা নিয়ে আয়।” ভূতি ত সরা আনতে পথ পায় না; কেন না, গিন্নী যদি প্রত্যেক জিনিসের সরা দুখানা ক’রে না পান এবং তাঁর বৌ, ঝি, ছেলেপিলেরাও সেই পরিমাণে না পায়, তবে তিনি তাদের খাওয়ানোর ভয়ানক নিন্দা করেন। সেই জন্যে ভূতি ব্যতিব্যস্ত হয়ে আবার তাঁদের সকলকেই সরা এনে দিলে। প্রথমে যে সরা পেয়েছিলেন, সেগুলি ত সকলে খেলেন, শেষেরগুলি এবং প্রথমে ছোট ছেলেরা যা পেয়েছিল, সেইগুলি সমস্ত একখানি মোটা চাদরে জমা হ’ল। এখন বিধাতার কি বিড়ম্বনা—বৃষ্টি আরম্ভ হ’ল, তখন কেবল তাদের ক্ষীর খাওয়া হয় নি—অন্য অন্য ছাতে যারা খেতে বসেছিল, তারা ত সব উঠে গেল। ওরা বলে, “ভাল রে ভাল, আমাদের যে ক্ষীর খাওয়া হয় নি। ও ভূতি, ক্ষীর নিয়ে আয়—ও বৌ, সরাগুলো বাঁধ্—ও ঝি, ছেলেদের নিয়ে যা” ক’রে ত গিন্নী মাতামাতি—ক্ষীর ত এনে দিলে—তখন ভয়ানক বৃষ্টি পড়ছে—পাল ভেদ ক’রে তাদের গায়ে জল পড়তে লাগলো—তখন কি করে, যদি বা ক্ষীর পেলে ত খেতে পায় না, দেখে তারা সেই ক্ষীর গেলাসে ক’রে নিয়ে উঠে চ’লে গেল—গেল ত গেল একেবারে পাল্কিতে গিয়ে বসলো, তার পর বোধ হয় বাড়ী গিয়ে

ক্ষীর খেয়েছে। বৌয়েরা সব এক হাত ক'রে ঘোমটা দিয়ে এক এক ক্ষীরের গেলাস হাতে ক'রে চলেছে। তুমি শুনলে আশ্চর্য্য হবে যে, তারা প্রত্যেকেই একেবারে হীরে দিয়ে বাঁধানো ছিল—আর তারা বেশ জানত বড় মানুষ।

দেখ দেখি, তোলাটা কি রকম প্রবল ছিল। যা হোক, সৌভাগ্যের বিষয়, এখন ঢের কমেছে—খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দাসীর সঙ্গে এসেছে—তারাই কেবল তুললে—আর কেউ না। আগে আগে দেখতুম, বড় মানুষের মেয়েরা রূপার গেলাস, রূপার পানের ডিপে সঙ্গে নিয়ে আসতেন—সকলের মাঝখানে নিজের গেলাসে জল খাওয়া হ'ত, পান খাওয়া হ'ত—এখন আর তা নেই, গেলাস ত আনেই না, কেউ কেউ পান আনে, কিন্তু অত দেখিয়ে দেখিয়ে খায় না।

এই সব দেখতে দেখতে খাওয়া শেষ হয়ে এল—যখন একেবারে শেষ হয়ে গেছে, তখন খোদ বাড়ীর গিন্নী সকলকার মুখের কাছে এসে এসে "আর কিছু চাই" জিজ্ঞাসা করিলেন—সকলেই বললে যে, "না।" যাঁর বাড়ী নিমন্ত্রণে গেছি—এই তাঁকে ভাল ক'রে দেখতে পেলুম, এই তাঁর গলার স্বর শুনতে পেলুম। নিমন্ত্রিতদের ঐ বাঁধা আদর আছে—পালকি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া, খাবার সময় ডেকে নিয়ে যাওয়া—আর খাবার শেষে গিন্নীর দর্শন দেওয়া—এই চূড়ান্ত আদর—এর ক্রুটি হবার জো নেই। সকল বাড়ীতে যে এই রকমই, তা ঠিক নয়—এক এক বাড়ীতে বেশ খোঁজ-খবর নেয়—তারা নিমন্ত্রিতদের দেখে বেশ আমোদ পায় ব'লে বুঝা যায়, কিন্তু এক এক বাড়ীর ভাব দেখে মনে হয় যেন তাঁরা নিমন্ত্রণ ক'রে নিমন্ত্রিতদের চরিতার্থ করেছেন।

তার পর পালকি ওঠার ব্যাপারটা বর্ণনা করি। মনে কর, নিমন্ত্রণকারী দুই শত ঘর নিমন্ত্রণ করেছে, অথচ চারখানি বই পালকি নেই—তখন একখানি পালকির জন্যে কত বাড়ীর মেয়ে যে হাঁ ক'রে থাকবে, তা ভেবেই দেখো না। তাদের সকলেরই বাড়ী যাবার বিশেষ দরকার—আর কে বল দেখি রাত ১০।১১টা অবধি সেই ভিড়ের মধ্যে থাকতে চায়? সুতরাং সকলেই আগে পালকি পেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু চুপ ক'রে ব'সে থাকলে পালকি পাবার জো নেই—যার সকলের চেয়ে জোর বেশী, সে-ই পালকি পেতে পারে। মেয়েরা সকলেই গিয়ে

দরজার কাছে দাঁড়ালো—ঠেলাঠেলি, চেঁচাচেঁচি, যেই একটি পালকি আসছে, অমনি একজন বলছে, "ওগো আমি আগে যাই, আমার কচি ছেলে ঘরে রয়েছে।" আর একজন বলছে, "ভাই, আমাকে যেতে দাও—আমার এই ছেলেটির জ্বর হয়েছে।" একজন বললে—"আমার নূতন জামাই আসবে, আমার এখনি না গেলে চলবে না।" এই রকম সকলেই একটা-না-একটা বলছে, তার পর "জোর যার মুলুক তার" একজন চ'ড়ে বসলো—পালকি চ'লে গেল। আবার একটু নিস্তব্ধ হ'ল—এ ওর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলে, কেউ হয়ত বললে "ও মা, এত ঘর খেতে বলেছে, পালকি বেশী রাখতে পারে না—এ ত খাওয়ানো নয়, কেবল মেয়েদের জব্দ করা—আমার মেয়ের বিয়ের সময় ন-খানা পালকি ছিল, চারখানা গাড়ী ছিল—আমি বরং বলেছিলুম—বলি অতয় কাজ কি—কর্ত্তা বললেন, না, সে কি হয়—ভদ্র মেয়েছেলে আসবে, তাদের কি কষ্ট দেওয়া যায়!" এই রকম শুধু সেই গিন্নী কেন, সকল গিন্নীই নিমন্ত্রণকারীর নিন্দা এবং তার পরেই নিজেদের সুখ্যাতি করতে লাগলেন। এই রকম পালকি যায় আসে, কিন্তু কাড়াকাড়ি ক'রেও পালকি সব সময় পাওয়া যায় না—নিমন্ত্রণকারীর আত্মীয়কুটুম্বর মেয়েদের যাবার সময় বাড়ীর ভিতর থেকে গিন্নী হুকুম ক'রে পাঠালেন, "বাগবাজারে ক্ষীরোর শ্বশুরবাড়ীর জন্যে একখানা পালকি ক'রে দিতে বল।" কর্ত্তা অমনি একখানা পালকি ধ'রে রেখে চেঁচাতে লাগলেন—"ও রে রামা, বাগবাজারের সোয়ারী ডেকে দে।" ঝম্ ঝম্ ক'রে বাগবাজারের সোয়ারী এলেন—পিছনে দাসীর মাথায় একটি বেশ বড়সড় রকম পুঁটুলি—কারণ, অবিশ্যি, মেয়ের শ্বশুরবাড়ী ব'লে বাড়ীর গিন্নী তাকে একটু বেশী যত্ন ক'রে খাইয়েছেন—জোর ক'রে ছুটো সন্দেশ বেশী দিয়েছেন এবং মেয়ের সেজ জা আসে নি ব'লে তার জন্যে এক ভাগ খাবারও দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বিনা কষ্টে পালকি উঠে চ'লে গেলেন—বাকি মেয়েরা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল। আমার একটি আলাদা পালকি ছিল। সেই পালকি ধ'রে মহাটানাটানি প'ড়ে গেল—হয়ত ছু-একজন বৌ ছুটোছুটি ক'রে গিয়ে তার মধ্যে ব'সে পালকি তুলতে বলছে, "আ মোলো বেয়ারাগুলো,-পালকি উঠা না!" বেহারা তাহাদের এত বোঝাচ্ছে যে, সে পালকিটা কর্ম্মবাড়ীর রোজের পালকি নয়—তা

তারা কি শোনে? চারটে বেহারা ও আমার দাসী তাদের বুঝিয়ে উঠতে পারে না—আমি দেখলুম মহা বিপদ্, অত ভিড়ের মধ্যে প্রাণ যায়, পালকিতে উঠবার জো নাই—সে একজন দখল ক'রে বসেছে। আবার তাদের উঠিয়ে দিয়ে পালকি চড়তে আমার ভারি মায়া করতে লাগলো, কোন মতে পারলুম না। সেখান থেকে চ'লে এসে আবার খানিক ক্ষণ ভিড় কমবার অপেক্ষা করতে লাগলুম—তার পর আমার দাসী এসে আমায় ডেকে নিয়ে যায়। সে দিন একজন ঐ রকম ঠেলাঠেলি ক'রে গিয়ে ত পালকিটি ধরেছে, ধ'রে সবে দরজা খুলেছে আর একটা ধুম্‌সো গিন্নী এসে তাকে এক ঠেলা দিয়ে তার নিজের নাতনীকে বসিয়ে দিলে—বৃষ্টিতে উঠানে বিলক্ষণ পিছল ছিল—সেই বৌটি ত ঝপাস্ ক'রে আর একজনের গায়ের উপরে প'ড়ে গেল ও দু-জনে জড়াজড়ি ক'রে কাদার উপর পড়ল। তারা ত এই রকম পড়ুক, যে নাতনীকে পালকিতে বসিয়েছে, সে ত দিব্যি আরামে পালকিটি চ'ড়ে চ'লে গেল। পালকি নিয়ে টানাটানি যে কি বিষম ব্যাপার, তা আর তোমায় কি বলবো। বাড়ীতে শাশুড়ী যদি বৌয়ের গলার স্বরটি শুনতে পান ত রেগে বাড়ী মাথায় করেন, কিন্তু পালকিতে উঠবার সময় যদি সেই বৌয়ের গলা শোনেন—তাতে বৌয়ের কিছু মাত্র লজ্জার ত্রুটি দেখেন না, তাতে তাঁর রাগ হয় না—বরং বৌকে পালকি ধরবার জন্যে চেঁচাচেঁচি করতে উত্তেজনা করা হয়। যদিও আমার একটি আলাদা পালকি ছিল, কিন্তু তবুও আমি শীঘ্র বাড়ী আসতে পাই নি। কেন না, আমি যেমন বাড়ী আসবার জন্যে গিন্নীকে ব'লে আসতে যাচ্ছি, অমনি গিন্নী আমার একটি আলাদা পালকি আছে শুনেই তাঁর একটি কুটুম্বুকে সেই পালকিতে দিয়ে আমাকে দেরি করাতে লাগলেন। যেমন আমি বললুম যে, আমি তবে এখন বাড়ী চললুম, তিনি বললেন, "এখনি যাবে কেন, একটু ব'সো না ভাই।" আমি বললুম, "না, আর বসবো না, বাড়ী যাই।" তিনি বললেন, "আচ্ছা, তবে পালকি আসুক।" আমি দুর্ভাগ্যক্রমে বললুম যে, আমার বাড়ী থেকে পালকি এসেছে। শুনেই তিনি বলেন, "ভাই, আমার এই বোনের কষ্ট হচ্ছে, ঘরে কচি ছেলে ফেলে এসেছেন, তোমার পালকি এঁকে রেখে আসুক। তার পর তোমায় রেখে আসবে।" আমি পালকি ছেড়ে দিলেম। এই রকম আরও দু-একজনকে সেই পালকিতে ক'রে পাঠিয়ে

দিয়ে তবে আমাকে বাড়ী আসতে দেন। কাজেই আমার রাত হয়ে গেল। তার পর যখন বাড়ী আসবো, গিন্নী বললেন, "তুমি সরা পাও নি?" আমি বললুম, "হাঁ, পেয়েছি বৈকি।" তিনি বললেন, "কৈ, তোমার সরা কৈ?" আমি যে সরা পেয়েও বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি নে, এটা তাঁহার ভারি আশ্চর্য্য মনে হ'ল—তিনি বিশ্বাসই করলেন না যে আমি সরা পেয়েছিলুম। আমি কি না তাঁর বোনের জন্যে পালকি ছেড়ে দিয়ে ভারি উপকার করেছিলুম, তাই তিনি আমার সঙ্গে আরও বিশেষ আত্মীয়তা ক'রে বললেন যে, "আর একটা সরা দিই, নিয়ে যাও।" আমি ত বিস্তর ক'রে তাঁকে বোঝালুম যে খেয়ে যাচ্ছি, আবার বেঁধে নিয়ে যাওয়ার আবশ্যক দেখছি নে। তিনি কিছুতেই তা শুনলেন না। শ্রীমতী শা—দাসী, সিমলা।*

২

মেয়েদের মধ্যে অনেক দল আছে। সে দিন আমি যে বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম, তাদের বাড়ীর সকলকেই নতুন রকমের দেখলুম।

ষেখানে পালকি নামালে, সে একটা ভারি সরু গলি—অন্ধকার, পালকি থেকে নেমে সম্মুখেই দু-তিন ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা দালানে পড়লুম—দালানের একদিকে রান্নাঘর, সেখানে এক রাশ ভাত রাঁধা, মাটির গামলায় ঢালা—তার উপর এত মাছি বসেছে যে, ভাত মোটেই দেখা যাচ্ছে না—কলাপাতে কতক রাঁধা তরকারি, কতক বা কাঁচা; মালসায় করা ডাল, সারি সারি চার পাঁচটা উনন, কোনটায় হাঁড়ি চড়ানো, কোনটায় কিছু নেই, আগুন জ্বলছে। দালানে জল সপ্ সপ্ করছে—ভয়ানক পিছল—বাঁ দিকে ভাঁড়ার-ঘর, কতকগুলো হাঁড়ি সাজানো আছে, কতকগুলো হাঁড়িতে দই, ক্ষীর, সন্দেশ প্রভৃতি আছে। যিনি আমাকে পালকি থেকে তুলে নিয়ে গেলেন, তাঁর একটা সাদাসিদে কাপড় পরা, বোধ হয় স্নান করতে যাবেন—আমাকে বললেন, "সে দিন এলে না কেন? এত ক'রে বললুম, এলে না—কি ভাগ্যি আজ এলে! চল, বৌ দেখবে—

* ইহা যে শরৎকুমারীর প্রথম রচনা, স্বর্ণকুমারী দেবী তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।—'ভারতী,' অগ্রহায়ণ ১৩১৬, পৃ. ৪৬৮ দ্রষ্টব্য।

বৌ বড় ভাল হয় নি।” সে দিন বৌভাত। উপরে নিয়ে গেলেন। সিঁড়িতেও জল, কিন্তু অত পিছল নেই—উপরে উঠে বারাণ্ডা দিয়ে একটা ঘরে যাওয়া গেল। সে ঘরে একটা খাট। খাটে একটা ময়লা মশারি ফেলা, বিছানা তৈরি রয়েছে। খাটের স্মুমুখে একটা কৌচ, তার স্মুমুখে একটি ছোট গদি। গদিতে একটি চাদর পাতা আছে—বাকি চারি দিকে সতরঞ্চ পাতা। দু-তিনটে আলমারি আছে ও একটা ছোট আলনা। সেই দিকে বৌকে সবাই মিলে সাজানো হচ্ছে। তখনও বেশী নিমন্ত্রিত কেহ আসে নি। বাড়ীর সকলেই বৌকে নিয়ে সাজাতে ব্যস্ত। যিনি বাড়ীর গিন্নীর বেয়ান, তিনিই আসলে গিন্নী। বাড়ীর গিন্নী ব্যারামী, চক্ষে ভাল দেখতে পান না, কেবল নামে গিন্নী। তার পর বৌয়ের দিদিশাশুড়ী বৌকে সাজিয়ে এনে বসালেন। নতুন বৌ বটে, কিন্তু হেসে হেসে অনেকের সঙ্গে কথা কইছে। বৌয়ের দিদিশাশুড়ী এসে স্মুমুখে বসলেন, আর বৌয়ের নড়বার জো রইল না। মাঝে মাঝে তার উপর ঝঙ্কার হচ্ছে—“ওরে বৌ, ভাল ক’রে ব’স্, ভাল ক’রে ব’স্—এখনই বাবুরা যৌতুক করতে আসবেন।” বৌ যে তার চেয়ে কি ক’রে ভাল হয়ে বসবে, তা সে কোন মতেই ভেবে পায় না। বৌ একটু স’রে বসলো, তখন তার হাসি শুকিয়ে গেছে। বৌ স’রে বসতেই মোটা খসখসে কাপড় মাথা থেকে স’রে পড়লো—একটু চুল উস্কখুস্ক হয়ে গেল—এই আর কোথায় আছে! দিদিশাশুড়ী বললেন,—“ঐ ত রূপ, আবার গুণও অশেষ। সকাল থেকে না হবে ত দশ বার চুল আঁচড়ে দিয়েছি, কেবলই খারাপ ক’রে ফেলছে—পাড়াগেঁয়ে মেয়েগুলো এক জাতই আলাদা—মাথার কাপড় কেবলই খ’সে খ’সে পড়ে। এই রকম ক’রে ধ’রে থাক।” বৌ সেই অবধি থেকে আড়ষ্ট হয়ে ব’সে রইল। তার পর “বাবুরা” যৌতুক করতে আসবেন ব’লে আমাদের সেখান থেকে উঠে যেতে হ’ল। কেবল গিন্নী বৌ নিয়ে জেঁকে বসলেন। যত মেয়েরা পাশের ঘর থেকে “বাবুদের” দেখবার জন্যে একেবারে ঝুঁকে পড়ল—প্রত্যেকেরই মুখ বোধ হয় বাবুরা দেখতে পেয়েছিল, কেবল শরীরটা আর একটা ঘরে ছিল মাত্র। একে একে বাবুরা আসতে লাগলেন, টাকার ঝমঝমানি ও গিন্নীর হাসি, আর বাবুদের দু-একটি কথা ও জুতোর শব্দ মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি। আর এই ঘরের মেয়েদের কথা শুনছি—কেউ বলছে, “ঐ দেখ আমার

ছেলে”—আর একজন বললে, “তোমার কর্ত্তা আসেন নি?” তিনি বললেন, “না। তিনি কি সব ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে আসেন!” কেউ বললে, “ঐ দেখ, অমুকের জামাই”—আর একজন বললে, “এখানে অমুক কি এসেছে, তাকে আমি কখনও দেখি নি।” পাশের একজন বললে, “ও মা, তাকে তুমি দেখ নি! সে এসেছে বই কি, তোমায় দেখাব এখন।” এই রকম দেখাদেখি নিয়ে এদের মধ্যে ঠেলাঠেলি গোলযোগ বেধে উঠল—এদিকে ঘর গরম হয়ে উঠেছে। ছোট অন্ধকার ঘর, এক দিকে একটা তক্তপোষ, ছেলেদের রাশীকৃত বিছানা তার উপর রয়েছে। একটা ময়লা মশারি টাঙ্গানো—আর আশে পাশে সিন্দুক আলমারিতে ভরা; সেই ঘরে পান তৈরি হচ্ছে। যা হোক, বাবুদের বৌ-দেখা শেষ হ'তে ত ঘণ্টাখানেক লাগল, এত ক্ষণ মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেইরকম গণ্ডগোল করছে। তার পর সব নিমন্ত্রিতারা এসে জমতে লাগলেন—সকলেরই ভাল রকমের কাপড় পরা। জামা ছাড়া কেউ ছিল না—একরাশ বিশ্রী গহনা-পরা নয়—বুক পর্য্যন্ত ঘোমটা দেওয়া নয়। এই সব দেখছি, এমন সময় আর দু-জন নিমন্ত্রিত এলেন, এদের পোষাক খুব ভাল পরিপাটি। একজন রোগা, খুব ভাল দেখতে, ভারি শান্ত, হাসিটি ভারি মিষ্টি, এমন বুঝি দেখি নি, সেই মজলিসে তাকে দেখে আমি ভারি খুশি হয়েছিলুম। তিনি সকলকার সঙ্গেই বেশ আস্তে আস্তে কথা কইতে লাগলেন—তাঁর গলার স্বরটিও মধুর। তাঁর যিনি সঙ্গিনী, তিনি তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট—যেখানে যা সাজে, তাই দিয়ে সেজেছেন, একটুও সাজগোজের ত্রুটি ছিল না, খুবই হাসছেন—হাসবার সময় তাড়াতাড়ি মুখে রুমালটি দেন, কেউ কিছু বললেই অমনি হেসে মুখে রুমাল দিয়ে চোখ নীচু করেন, হাসি তাঁর মুখ-ছাড়া নেই—অথচ কেন হাসছেন, তার ঠিকানাই পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর সঙ্গে একটি চার পাঁচ বৎসরের মেয়ে ছিল—তার পোষাক একেবারে বিবিয়ানা, আর যে দু-একটি ছোট মেয়ে ছিল, তাদের সকলেরই বিবিয়ানা পোষাক পরা—ছোট ছেলেও দু-একটি ছিল, তাদেরও ইংরাজী পোষাক ছিল। তার পরে সকলে খেতে যাওয়া গেল।

সকলে খেয়ে এসে আবার সেই ঘরে এসে জমা হলুম। একজন বাড়ীর মেয়ে, যাঁরা গাইতে পারেন, তাঁদের গান গাইবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন। এই ত একটা মহাগোলযোগ প'ড়ে গেল—এ বলে, “সই, তুমি

আগে গাও।” ও বলে, “আমার গান ত সবাই শুনেছে, তুমি গাও।” এই রকম ক’রে তো কেউই গাবে না, দু-শ মাথার দিব্যি, চার-শ পায়ে পড়াপড়ি হ’তে লাগলো। আমার গান শুনবার ইচ্ছা ছিল ; ভাবলুম, যদি দু-জনকার গান উপস্থিত সকলেই শুনে থাকে, তবে আর এত লজ্জা কেন ? এই রকম ক’রে কত সাধাসাধির পর একজন গাইতে সম্মত হলেন—তিনি ত একটি গান গাইলেন। বেশ গলা বটে। একজন যদি গাইলেন, তবে আর একজনকে সুকণ্ঠ বললেন, “তুমি না গাইলে আমি গাইব না।” তিনি বুঝি সব চেয়ে ভাল গাইতে পারেন, তাই তাঁর এত গুমর। এই ত আবার মহা গণ্ডগোল বেধে গেল। যাঁকে গাইতে বলা হ’ল, তিনি বললেন, “ও মা, আমি কি গাইতে পারি? তুমি কি ভাই জান না—জানলে গাইতে কি ?” একজন পাশ থেকে বললেন, “তাতে দোষ কি, গাও না, এখানে ত পুরুষ নেই, যেমন জান, তেমনি গাও—আপনা আপনি আমোদ করা বইত না।” এই রকম সাধাসাধি চলতে লাগল। আমি আর অপেক্ষা করতে না পেরে বাড়ী চ’লে আসবার উদ্যোগ করলুম।

এই দলটি দেখে আমি খুশি হয়েছিলুম, এঁরা তবু নানারকম আমোদ প্রমোদ করেন, কেবল পরের নিন্দা করেন না—এঁদের মধ্যে লুচি সন্দেশ তুলে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি মোটেই নেই।

কলিকাতায় শাশুড়ী ননদের শাসন দুই এক পরিবারে নেই, কিন্তু তবু আমি এখনও এমন এক একটি বাড়ী জানি যে, সে বাড়ীর কড়াক্কড়ে বৌয়েদের ওষ্ঠাগত প্রাণ। একটি শাশুড়ী, দু-তিনটি বিধবা পিস্‌শাশুড়ী দিন-রাত চোখ রাঙ্গিয়ে বৌদের চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন—বৌরা একালের মেয়ে, তাদের কারও কারও হয়ত বাপের বাড়ীতে একটু স্বাধীনতা আছে, তাদের যে কষ্ট! বাস্তবিক তাদের আমি কাঁদতে অবধি দেখেছি। গিন্নীদের শাসন তবু সহ্য হয়, কিন্তু শুধু তাই নয়, বাড়ীর রাঁধুনী বামনীরাও বৌদের উপর প্রভুত্ব করবে—দাসীরা সমান সমান ভাবে ঠাট্টা-তামাশা করবে। যে বৌয়ের বাপের বাড়ী একটু সভ্য রকমের, সে কোন মতেই ও-রকম শাসনে থাকতে পারে না, কাজে কাজেই শাশুড়ী তাকে দেখতে পারে না, রাত দিনই তার উপর সকলে কটাক্ষ করছে। স্বামী বেচারী হয়ত ভালমানুষ, সে কাকেও কিছু বলে না, মা তার উপরও চ’টে গেল। অন্য অন্য বৌদের ইচ্ছা আছে যে, সেই বৌয়ের মতন ধরণে চলে, কিন্তু

কারও হয়ত স্বামী ভারি রাগী—সে হয়ত কি বলতে কি বলবে, কাজ নেই বাপু ব'লে চুপ ক'রে থাকে। কারও হয়ত স্বামীতে দখলই নেই, সে ও-সব কিছু করতে গেলে অন্যের কাছে দূরে থাক্‌, স্বামীর কাছেই কত ধমক খাবে—কারও হয়ত স্বামী ভারি ভালমানুষ, গোলযোগে যেতে চায় না, স্ত্রীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে থামিয়ে রাখে, বাপ-মায়ের উপরও কথা কইতে পারে না, স্ত্রীর নামেও নিন্দা সইতে পারে না। এদিকে আবার শাশুড়ী বৌদের কোন বিষয়ে খোঁজ-খবর নেবেন না। বৌরা খেতে পেল কি না, অসুখ হয়েছে, কিছু চাই কি না, কিম্বা বৌয়ের ছেলেদের দেখা শুনা, সে সব কিছু নেই—কিন্তু বৌরা এখান থেকে ন'ড়ে ওখানে বসলে, সে খবরটি বিলক্ষণ নেওয়া আছে—অমনি তাতে একটা-না-একটা দোষ দেখবেনই দেখবেন। বৌদের মনে কর, ঐ রকম প্রভু রাঁধুনী বামনী, আর ঐ রকম ধরণের দাসীদের নিয়ে দিন কাটাতে হয়। একদিন দেখলুম যে, এক বৌয়ের ভাত খেতে যেতে একটু দেরি হয়েছিল ব'লে রাঁধুনী চীৎকার ক'রে বাড়ী ফাটিয়ে দিলে, আর সেই মাছি-ভিন-ভিনে রান্নাঘরে ভাত ফেলে দিয়ে অনায়াসে চ'লে গেল; সে দিন আর বৌয়ের খাওয়া হ'ল না। শাশুড়ী রাঁধুনীকে ত কিছু বললেনই না, বৌয়েরও কিছু খবর নিলেন না, বরং বোধ হয়, বৌয়ের "তেজের" কথা শ্বশুরকে বিস্তারিত ক'রে বর্ণনা করেছিলেন। এই সব বৌদের মধ্যে একজন দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিল—সে একটু স্বামীর সোহাগে সোহাগিনী, সে লেখাপড়া জানে। তার উপর বড় একটা জোর-জবরদস্তি চলে না। তার ছেলেটির বয়স পাঁচ ছয় বৎসর হবে—তাকে বেশ ভাল কাপড় পরিয়ে রাখে, কিন্তু তাদের বাড়ীর অন্যান্য ছয় সাত বৎসরের ছেলেমেয়েরাও কাপড়ের কোন ধার ধারে না। ঐ রকম অনেক বাড়ীতেই আছে।—ছেলেদের কাপড় পরানো চল্‌তি হ'লে বোধ করি ভাল হয়।

সে বাড়ীর ছোট প্রায় সব ছেলেই অতিশয় অসভ্য। ছেলেদের দোষ কি? তাদের যেমন শিক্ষা দেয়, তেমনই ত হবে—ছেলেদের সব দূর-সম্পর্কের ঠাকুরদাদা আছেন—পাড়ার পিসে মশাই আছেন—তাঁরা ছেলেদের যে সব শিক্ষা দেন, সে সব কথা আমরা মনে করতেও লজ্জিত হই—অথচ তাঁরা ভারি রসিকতা করছেন যেন, এমনি ভাবে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে অনায়াসে ছেলেদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করেন। ছেলেরা ভাবে, আমরা খুব

কথা শিখলুম, তারা আবার রাত-দিন আপনাদের মধ্যে সেই রকম ঠাট্টা-তামাশা করে। ঐ বাড়ীতে একজন একজন মা নিজের ছেলেকে ঐ সব বাবুদের কাছে যেতে দিতে রাজি নয়, তারা কোন মতেই যেতে দেবে না, বাবুরা তো আর তা জানেন না, তাঁরা এসে আদর ক'রে ডাকেন, ছেলেরা অমনি তাঁদের কাছে যাবার জন্যে আহ্লাদে লাফালাফি করতে থাকে—বিশেষ জোর ক'রে ধ'রে রাখলে কান্না আরম্ভ করে—কোনরূপে পালিয়ে গিয়ে ব'লে দেয় যে, "মা আসতে দিচ্ছিল না।" তার মা বেচারী ঘোর অপ্রস্তুতে পড়ে, আর সেই বাবুটি যদি মায়ের দেবর কিম্বা নন্দাই হন, তবে তাঁকে পর্য্যন্ত তাঁর অসভ্য ঠাট্টা খেতে হয়। ঐ সব ঠাট্টা শুনলে বোধ হয় তোমরা বিশ্বাস করতে পার না যে, কোন ভদ্রলোকে আজও এমন ঠাট্টা করতে পারে—আজও পুরুষদের মধ্যে এমন অসভ্য আছে। পুরুষরা যদি মেয়েদের ভাল কাপড়-চোপড় পরতে বলেন, তা হ'লে তারা নিশ্চয়ই পরে। অনেকে নিজের ইচ্ছা সত্ত্বেও সে খালি হয়ত স্বামীর জন্যে পারে না।—এক একজন কৃতবিদ্য পুরুষ কোন স্ত্রীলোক জামা পরেছে শুনলে হাঁ ক'রে থাকেন—কানে আঙ্গুল দেন। স্বামীরা যদি বেঁধে নিয়ে যাওয়া বিষয়ে পোষকতা না করেন, তাঁরা যদি মনের উল্লাসে আহারটি না করেন, তবে কি স্ত্রীরা বেঁধে নিয়ে যায়? স্বামীরা তা বোঝেন না—তাঁরাই বলেন যে, "ওগো, আজ আব ভাত রেঁধো না; বামী নেমন্তন্ন খেতে গেছে —খাবার আনবে।" পুরুষরা সভ্য না হ'লে আর মেয়েরা কি করবে বল—তাদের আর একলা দোষ কি ক'রে দেব? ('ভারতী,' ভাদ্র, কার্ত্তিক ১২৮৮)

শাশুড়ী-বৌ

মাতৃস্থানীয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর দল এ-কালের বধূদের উপর বড়ই উষ্ম। অপরাধ,—বৌ ঘরে এলেই ছেলে পর হয়, সুতরাং সে দোষ বধূর। আরও কি চাই—"যাহাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিলাম, ঝড়ে জলে বৃষ্টিতে এত কষ্ট করিয়া মানুষ করিলাম, আজ সে পর হইল! কোথাকার একটা হতভাগিনীর মেয়ে আসিয়া আমার সোনার ধনকে কি না বুক থেকে কেড়ে নিলে! ও মা, কি হবে—যাব কোথা—কি কলিকাল!"

সচরাচর ঘরে ঘরে এই কথা, এই কাব্য, এই কবিতা চলিতেছে। কোন শ্বশ্রূঠাকুরাণী হাত মুখ নাড়িয়া অনবরত দৃষ্টান্ত দিয়া কুটুম্ব কুটুম্বিনী, আত্মীয় আত্মীয়ানী, বন্ধুবর্গ, যে যেখানে আছেন, সকলকেই ঐ কথা বুঝাইতেছেন। কেহ অতি গম্ভীরভাবে কর্ত্তার সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন যে, কিরূপে ছেলের আর একটি বিয়ে দেওয়া যায় ও ছোটলোকের মেয়ে নিয়ে কি ক'রে ঘর করি। কেহ বা অত্যন্ত টিপিয়া টিপিয়া পাড়া-প্রতিবাসিনীর সঙ্গে বধূ ও পুত্র সম্বন্ধে দু-এক কথা কহিতেছেন। কেহ বা বধূর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া ছেলের সঙ্গে একটা মাসহারার বন্দোবস্ত করিতেছেন; কেন না, বধূর সংস্রবে থাকা অপমানের কথা। আর বৌ আসিয়া কি সর্ব্বনাশ করিল, তাহা বিধিমত প্রকারে কীর্ত্তন করিয়া গৃহস্থালীকে অরণ্যে পরিণত করিতেছেন।

সত্য বটে—যাহাকে ভূমিষ্ঠ হইতে কোলে করিয়া, বুকে করিয়া, জলে ঝড়ে, দুর্দ্দিনে সুদিনে সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি, যে মা ভিন্ন জানিত না, আজ সে বৌয়ের খোঁজ নেয়—আজ সে প্রশ্ন করে—"মা, কি হয়েছে গা, এত কান্নাকাটি কেন?" এত বড় স্পর্দ্ধা! "কাঁদে কেন"—"আমি কি জানি," "একটা তুচ্ছ কথা হয়েছিল বটে"—"বড়-মানুষের মেয়েকে বাপের বাড়ী থেকে নিতে এসেছিল বটে—তা আমি পাঠাই নাই, তার আবার কথা কি—এত কান্নাকাটিই বা কিসের—এত নাগা-নাগিই বা কিসের—আর এত জিজ্ঞেসবাদই বা কিসের!" আজিকার রাত্রির মত কথাবার্ত্তায় ইতি। পরদিন শাশুড়ীর মুখ ভার, বধূ কথা কহে না, ছেলে ম্লান—সংসারে আগুন লাগিল। শাশুড়ীর কান্নাকাটি—

"ছেলে বৌয়ের বশ, আমায় মানে না" আর "এ-কালের বৌ, তাই এমন।" "আমরা কেমন লক্ষ্মী ছিলাম"—"সে কালে এমন ছিল না।" এ কথা অশীতিবর্ষীয়া হইতে চল্লিশবর্ষীয়া সকল শাশুড়ীর মুখেই শোনা যায়। তাঁহারাও যে এক সময়ে বধূ ছিলেন এবং এই নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের মনে থাকে না।

তা বলিয়া সকল শাশুড়ীই যে বধূ নির্যাতন করেন, তাহা নহে। মাতার ন্যায় শাশুড়ী অতি বিরল। সচরাচর শাশুড়ী-বধূর সম্বন্ধ এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। শাশুড়ী এবং পুত্রবধূর সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, শ্বশ্রূ যদি বধূকে নিজ কন্যার মত ভাবেন এবং যত্ন স্নেহ করেন, তাহা হইলে সেই বালিকা কখনই তাঁহার অবাধ্য হইতে পারে না। "আমার লক্ষ্মী ঘরে এলেন, এস মা এস," শুনিতে মধুর, না ডাক ছাড়িয়া, "ও মা, কি পোড়া কপাল, কি অদৃষ্ট, কেবল ঠকালে, কি হবে—ওটা ছোট-লোকের মেয়ে—আমি তখনি জানি, বলেছিলুম কর্ত্তাকে যে, ও-ঘরে ক'রো না—তা শুনলেন না, এখন ভোগ ভোগে কে?" বধূ ঘরে না আসিতে আসিতেই যে কিসের এত ভোগাভোগ, তা ত ভেবে পাওয়া সুকঠিন। তবে প্রায়ই অনেক স্থলে শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে প্রথমেই নিরাশার ভোগ ভুগিতে হয় বটে। কারণ, দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র হইতেই পিতামাতার মনে বড়ই আশার সঞ্চার হয় যে, "বেটা-ছেলেটি হয়েছে, আর ভাবনা কি"—"ছেলের বিয়ে দিয়ে অর্দ্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকন্যা ঘরে আনিব।" "কপালে কি আছে কি জানি—অতও যদি না হয়, তবু সওদাগরের কন্যা, আর হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া ত হবে?" আশা কল্পনার সাহায্যে বহু দূরে ছোটে—কিন্তু প্রকৃত ঘটনার ত দৌড়িবার শক্তি নাই। যখন সত্য সত্যই এক জীবন্ত বৌ বাউটি দিবার কথায় শুধু পৈঁচা হাতে দিয়া দাঁড়ায় বা চুড়ি দিবার বন্দোবস্তে, ছাল্‌নাতলা-পার-করা হাল্‌কা খাড়ু হাতে হুদে আলতায় হাজির হয়, তখন বুকটা কি রকম যে ধড়াস করিয়া উঠে, তা ত কেহ বোঝেন না। গহনা লইয়া কান্নাকাটির পর বধূর রূপের দিকে নজর পড়ে। হাজার সুন্দরী হইলেও এই হুধে আলতার বরণের সময় কোন সুন্দরীই 'পাস' হইতে পারেন না। নিখুঁতেরও খুঁৎ বাহির হইবেই হইবে। নিদেন "বড় রোগা"—"তা হবে হবে, এর পর হবে ভাল।"

"বাপের বাড়ী অযত্নে বেড়ায়"—"এখানে আমার কাছে থাকতে থাকতে পুরবে।" কেহ বলেন, "একবার চেয়ে দেখ দেখি"—কেহ বলেন, "একটু হাস দেখি"—কেহ বলেন, "দাড়ির দিক্ চাপা"—কেহ বলে, "কপালখানা বড় ছোট"—আহা, তখন সত্যই কি সেই বালিকার মনে হয় না—

ফুলের মালা গাছি
বিকাতে আসিয়াছি
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

সবে মাত্র সে তাহার জননীর স্নেহমাখা করুণ অশ্রুময় মুখ দেখিয়া আসিতেছে—সবে মাত্র এই তাঁহার স্নেহময় হাত হইতে অপরিচিত হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। "এত দিন আমার ছিল, আজ তোমায় দিলাম" বলিতে বলিতে মাতার বুক ফাটিয়া যে ক্রন্দন উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখনও মনে তীব্রভাবে জাগিয়া রহিয়াছে—"তবে কি সত্যই আমি পর হইয়া গেলাম"—"তবে বিবাহটা কি উৎসবের নয়"—"তবে মা কি আমায় বনবাস দিলেন," "এমন জানিলে আমি ত বিবাহ করিতাম না।"

আহা, চেলির কাপড়-মোড়া, মাথায় ধানের বোঝা, হাতে জীবন্ত লেঠা মাছ, কক্ষে ঘট, পদতলে দুধ-আলতা-মিশ্রিত পিচ্ছল থালা, সদ্য পিতা মাতা হইতে উৎসর্গিত ক্ষুদ্র বালিকা যখন আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুলিত, তখন তাহার উপর ঝঙ্কার ঝাড়িলে তাহার প্রাণ যে কি চাহে, তাহা কি কোন শাশুড়ী কখনও ভাবেন। কিন্তু সকল শাশুড়ী ঠাকুরাণীদেরই যে একদিন এইরূপ বধূবেশে দাঁড়াইতে হইয়াছিল এবং এখনও তাঁহাদের প্রাণাধিকা দুহিতাদেরও যে মাঝে মাঝে ঐ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহা কেন যে তাঁহারা বিস্মৃত হন, ইহার রহস্য আজিও বুঝিতে পারা গেল না। সকলের মুখেই শোনা যায় বটে—"তুমিও যেমন, কুটুমের ধনে আবার কে কোথা বড়মানুষ হয়ে থাকে!" "বৌটি ভাল হবে, ভদ্রঘরের মেয়ে হবে, ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, তা হইলেই হ'ল।" কন্যা দেখা আরম্ভ হইল, এ-কন্যা ও-কন্যা সে-কন্যা—কন্যার রূপ আর মনে ধরে না, কিন্তু মনের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, রূপায় সন্তুষ্ট হইতেছেন না, তাই রূপের দোহাই দিতেছেন! বিশ পঞ্চাশটা দেখিতে দেখিতে, রূপহীনা রূপায় মণ্ডিতা কন্যা, চক্ষে ধূলি প্রদান করিল। তখন ধুয়া ফিরিল—"তুমিও যেমন, গেরস্থ ঘরের বৌ, অত রূপে কাজ কি, এ ত পট নয় যে,

ঘর সাজানো হবে, রূপ ক'দিন থাকে।" কিন্তু রূপা যে রূপের চেয়েও কম দিন থাকে, তাহা মনে নাই—এই বিবাহ উপলক্ষেই যে প্রাপ্ত রূপার অধিকাংশই হস্তান্তরিত হইবে, সে ভাবনা কে ভাবে—ছেলের শ্বশুরবাড়ী থেকে যিনি যত আদায় করিতে পারেন, তাঁহার ততই গৌরব বৃদ্ধি হয়, যিনি না পারেন তিনি নিজেকে ধিক্কার ও বধূকে নির্যাতন করিয়া তাহার পরিশোধ লন। জানিয়া শুনিয়া কুরূপা বধূ যখন আনা হইল, তখন আবার তাহার নিন্দা করা কেন—কেন তাহাকে হতাদর করা। গহনাপত্র দানসজ্জায় কখনও কখনও কম পড়ে বটে। হয়ত গহনা স্যাকরা দেয় নাই, হয়ত পিতা যথাসর্ব্বস্ব খরচ করিয়া ওই মেয়েটির বিবাহ দিয়াছেন—কালিকার খাবার সংস্থান নাই, তা আর কন্যাকে দিতে কোথা পাইবেন—মেয়েকে দিতে কি তাঁহার অসাধ, কি করিবেন—নিরুপায়। কিন্তু তিনি স্বীকার করিয়া না দিতে পারায়, বালিকা নববধূর উপর দিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণী নিজ ক্ষমতানুসারে প্রতিশোধ লন। বধূকে নিজ সন্তানের মত মনে করাই কর্ত্তব্য, সুন্দর কুৎসিত সন্তান মায়ের নিকট যেমন সমান আদরের, তেমনই কুৎসিতা বধূকেও আদর করিয়া লইলে ভবিষ্যতে শ্বশ্রূ ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্রী হইতে পারেন। বরং দুহিতা পর হইয়া যায়, বধূই গৃহলক্ষ্মী নামে অভিহিত হন। কিন্তু কয় জন শাশুড়ী বধূকে গৃহলক্ষ্মীভাবে গ্রহণ করেন? পরকে আপন করা গৃহিণীর কার্য্য, ক্ষুদ্র বালিকা আপন-পর কি জানে? সে যখন মায়ের কাছে যাব ব'লে কান্নাকাটি করে, তখন "আমি যে তোমার একটি মা, আমায় ফেলে তুমি যেতে চাও!—এস, কোলে করি" বলিয়া যে লক্ষ্মীরূপা শাশুড়ী তাহাকে মিষ্ট কথা বলেন, সে বধূ কি কখনও তাঁহার মমতাময় কথা ভুলিতে পারে, না তাঁহার অবাধ্য হইতে পারে? প্রচলিত কথাই আছে যে, বালক-বালিকাকে মিষ্ট কথায় বশীভূত করা যায়, তাড়না করিলে কথা শোনে না। আমাদের দেশে ৮ হইতে ১২ বৎসরের বালিকাদেরই বিবাহিত হইতে দেখা যায়। এই সকল ক্ষুদ্র বালিকা মিষ্ট কথায় সহজেই বশীভূত হইতে পারে। তার পর পুত্র যাহাতে বধূকে ভালবাসেন, সেই চেষ্টা, সেই ইচ্ছা করাই শাশুড়ীর উচিত, কিন্তু অনেক স্থলে তাহার ব্যতিক্রমই দেখা যায়। পুত্র, বধূকে আপনার মনে করে বা স্নেহ দেখায়, কি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়ায়, ইহা অনেক শাশুড়ীর চক্ষুশূল। তাঁদের

বোধ হয়—"ছেলে পর হইল, ছেলে পর হইল" এই কথাই অনবরত মনে জাগে। অনেক স্থলে বরং নাতবৌয়ের সহিত দিদিশাশুড়ীর ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শাশুড়ীর অজানিত ভাবে দিদিশাশুড়ী নাতি ও নাতবৌয়ের মিলন করাইয়া দেন। তাঁর ছেলে ত পর হয়েই গেছে—সে ত যেমন অদৃষ্ট, তার ফল ফ'লেই গেছে—তা ও কচি বৌটো কেন কষ্ট পায়—আহা, এই ত ওর আমোদ-আহ্লাদের বয়স! নাতবৌয়ের সঙ্গে বনে মন্দ নহে।

সকলেই জানেন যে, নব বিবাহিতদের ঘরে আড়িপাতা একটা চলিত প্রথা। ঠাট্টার সম্পর্কীয়ারাই আড়ি পাতিয়া থাকেন। আর মেয়ের মাও আড়ি পাতিতে পারেন এবং পাতিয়াও থাকেন। কিন্তু পুত্রের মাতাকে পুত্রের ঘরে আড়ি পাতিতে নাই। তাহাতে পুত্রের অকল্যাণ হয়, এবং পুত্র অল্পায়ু হয়। দুহিতা-জামাতায় প্রণয় হয়, জামাতা দুহিতাকে ভালবাসে, ইহা সকল মাতারই বাঞ্ছনীয়। তাঁহারা মেয়ে জামাইকে একত্র দেখিতে অত্যন্ত সুখানুভব করেন, সেই জন্য তাঁহাদের আড়ি পাতায় নিষেধ নাই। কিন্তু বোধ হয়, পুত্র-পুত্রবধূর মিলন মাতার প্রীতিজনক নহে, তাহাদের প্রেমালাপ ভাল লাগে না—তাই পুত্রের ঘরে আড়ি পাতা মাতার পক্ষে বিশেষরূপে নিষেধ। কোন নিষেধ যদি না মানা হয়, তাই একেবারে পুত্রের পরমায়ুর দোহাই দিয়া রাখা হইয়াছে। অনেক বধূর মুখে শোনা যায়—"আমার বৌ হ'লে আমি তাকে মেয়ের মত যত্ন করিব।" কিন্তু সে কথাগুলা প্রায়ই বধূ অবস্থায় শোনা যায়—শাশুড়ী শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেই কথাগুলা অন্য রকম হইয়া যায়।—"আমি এত যত্ন করি, কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, বৌ ভাল হ'ল না।" অবিশ্যি শাশুড়ী যখন নিজে বৌকে ভাত খাওয়াইয়া দেন, তখন যত্ন করেন না ত কি—তিনি যখন ডাল দিয়া ভাত মাখিয়া বড় বড় গ্রাস করিয়া বৌকে খাওয়াইয়া দিতে গেলেন, আর সে অত্যল্প খাইয়াই আর খাইতে চায় না—এটা তার দোষ নয়ত কি? কিন্তু ঠাকুরাণী, তুমি রাগ করিও না—নববধূ যদি সমস্ত ভাতগুলি তাড়াতাড়ি করিয়া চপলা বালিকার মত খাইয়া ফেলে, তা হইলে তুমিই নাক সিটকাইয়া "ও মা, রাক্ষুসে ঘরের মেয়ে" বলিতে ছাড়? অথবা সে কেন ভাত খাইতেছে না, তাহার কি খবর নাও? হয়ত সে ঝাল খায় না, তাহার মা যে তাহার রুচি অনুযায়ী আলাদা খাদ্য

প্রস্তুত করাইয়া তাহাকে দিতেন, তবে সে খাইত। হয়ত সে তাড়াতাড়ি খাইতে পারে না, সে হয়ত আসনের উপর পা ছড়াইয়া দেয়ালে ঠেসান দিয়া আনমনে হুঁ হুঁ করিয়া গান করিতে করিতে, নয়ত এলোমেলো ছাইপাঁশ বকিতে বকিতে ভাত খাইত। সে হয়ত "ভোজনীর সঙ্গে বসিত, রাঁধুনীর সঙ্গে উঠিত"—তাহার ভাত খাওয়ার যে একটি মধুর দৃশ্য, তাহা কেহ যে কত স্নেহময় দৃষ্টিতে দেখিত, তা কি তুমি জান, না জানিতে চেষ্টা কর? যখন তার পাশে বসিয়া বাপের বাড়ীর দাসী ভয়ে ভয়ে তোমাকে বলিতেছে—"ও বড় মিরিক্‌চিরে মা, ও সব সামগ্রী খায় না, ও বেশী খেতে পারে না!" তখন পুত্রবধূর মায়ের উপর দোষারোপ করিয়া তুমি কি বল না—"ও যেন ছেলেমানুষ, বেয়ান ত জানেন যে, মেয়ে-মানুষ হয়ে যখন জন্মেছে, তখন শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে। সব রকম খাওয়াতে শেখাতে হয়, গেরস্থ ঘরের বৌ ঝি, বারো মাস পোলোয়া কালিয়া জুটবে কোথা থেকে।" বালিকা-সুলভ চাপল্যে যদি বধূ বলিয়া ফেলে যে, আমি ত রোজ পোলাও কালিয়া খাই না, আমি দুদ ভাত খাই—তবেই সকলে অবাক্—কি বেহায়া মেয়ে—স্বচ্ছন্দে বের ক'নে চোপা করিল। এই রকম ভাত খাওয়ার ব্যাপারে সে ভাত খাইবে কি, একে নূতন স্থান, তাহাতে হয়ত রুচির সহিত মেলে নাই, তাহার উপর মায়ের প্রতি দোষারোপ, সে কি অপরাধ বুঝিতে পারিতেছে না, অথচ সকলের কথায় নিজেকে অপরাধিনী ভাবিয়া হতভম্বা হইয়া পড়ে—মাতার করুণ স্নেহপূর্ণ মুখখানি, স্নেহময় ভাব, আদর-যত্ন মনে পড়িয়া তাহাকে আরও আকুল করিয়া তোলে, তাহার কান্না আসে, কবে মা কি আদর করিয়াছেন, কবে মা কি খাওয়াইয়াছেন, কবে আবার মা তেমনি ক'রে খাইয়ে দেবেন, এই সকল যত মনে হয়, ততই হু হু করিয়া চক্ষে জল পড়িতে থাকে। কত কথাই মনে পড়ে, এক দিন সেই "ছেলেবেলা" (পাঁচ বৎসরের ক্ষুদ্র শিশুও মায়ের গলা ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে—"মা, আমি ছেলেবেলা কি করিতাম বল্ না") তাহার নিজের ছোট্ট থালাখানি করিয়া ভাত খাইতে বসিয়া যখন ভাতের মধ্যে ছোট একটি আঙ্গুল দিয়া ভাত গরম আছে কি না, পরখ করিয়া দেখিল যে, ভাত গরম নাই, অমনই অভিমানে তাহার বড় বড় চোখ জলে ভরিয়া গেল। তাহার মা কান্নার কারণ জানিতে পারিয়া কত আগ্রহ সহকারে কত আদর করিয়া গরম ভাত আনিয়া দিয়াছিলেন এবং

ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা আর না ঘটে, তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কেমন করিয়া হাসিয়া হাসিয়া তিনি মেয়ের একটা মস্ত কীর্ত্তির মত তাহার বাবার কাছে ঐ গল্প করিয়াছিলেন—বাবা শুনিয়া স্নেহে আপ্লুত হইয়া 'এস মা, আমার কোলে এস' বলিয়া কত চুমি খাইয়াছিলেন—এই সকল যত মনে পড়ে, ততই সেই বাবা ও মা আমায় কেন পর ক'রে দিলেন, এই প্রশ্ন মনে উদয় হইয়া অভিমান উথলিয়া উঠিতে থাকে,—তখন "ও মা, ভাত কোলে ক'রে কাঁদতে নেই, অকল্যাণ হবে। না খাও না খাবে, দুপুরবেলা কাঁদতে হবে না—শ্বশুরঘর সবাই করে—তুমি আজ কেবল আস নি।" এই সকল সান্ত্বনায় কান্না বাড়ে কি কমে—তাহা হে বধূ, তোমরাই বলিতে পার।

এই নববধূ অবস্থায় বর একটু বধূকে যত্ন করেন। অনর্থক ছোট মেয়েটি কাঁদিতেছে, তাহাকে জবরদস্তি আটকাইয়া রাখিবার আবশ্যকতা কি। বিশেষ, বিবাহের রাত্রে শাশুড়ীর আদর-যত্নে এবং "আজ আমি মেয়ে দিয়ে ছেলে পাইয়াছি" কথায় একটু টানও পড়ে। বর-কন্যা বিদায়ের সময় শ্বশুর-শাশুড়ীর কান্নায় বরের মনেও করুণ ভাব উদিত হয়। প্রায়ই দেখা যায়, হাতে হাতে সমর্পণের সময় বরও অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারেন না। আরও ক'নেকেও আপনার জন, আপনার জন বলিয়া মনে হওয়াতে বর একটু ক'নের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। তাহার কান্নাকাটিতে "আচ্ছা, তোমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে বলব" বলিয়া আশ্বাস দিয়া ঘুম পাড়ান। তখন তাহার প্রতি প্রেমের উদ্রেক ত হয় না, মমতার উদ্রেক হয়। আর ভবিষ্যতে প্রেমের সম্বন্ধেও বরকে নিজ বাটীতে একটু ভয়ে ভয়ে, একটু লজ্জায় থাকিতে হয়, কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে অনায়াসেই দিবা রাত্র যখন ইচ্ছা স্ত্রীর সাক্ষাৎ পান। সেখানে ভয়ে ভয়ে কথা কহিতে হয় না, পাছে কেহ আড়ি পাতিয়া শোনে। সেখানে অবাধে ইচ্ছামত প্রণয়োপহার দেওয়া চলে। অনেক মাতা পুত্রকে নিতান্ত লাজুক ভাবিয়া এবং পুত্রবধূ হইতে পৃথক্ শয়ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হয়েন। "আমার এমন সোনার ছেলে যে বৌয়ের দিকে ফিরে দেখে না—ঘরে শুতে যেতে চায় না। আমরা জোর ক'রে দি। তা ভাবিনী আড়ি পেতে দেখেছে, বাছা একটি কথাও কয় না। বৌটো বেহায়া, ঘরে যেতে বললেই যায়।" কিন্তু তিনি ত

জানেন না যে, তাঁর স্নেহাস্পদ কি রকম জুয়াচোর—যত ক্ষণ না তাঁহারা নিদ্রা যান, তত ক্ষণই তিনি চুপচাপ থাকেন। তিনি ত জানেন না যে, ঐ লাজুক বেচারী শ্বশুরবাড়ী গিয়া কেমন সারা রাত ধরিয়া গল্প করেন এবং বেলফুলের মালা লইয়া সাদরে প্রণয়িনীর মাথায় জড়াইয়া দেন। বধূর শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইলে মহা ভাবনা উপস্থিত হয়, কিন্তু সকলেই জানেন যে, বরের শ্বশুরবাড়ী না যাওয়া হইলে কত কষ্ট হয়। যত্নই যে ইহার মূল, সে বিষয়ে সন্দেহ কি। শাশুড়ী বধূকে দাসীভাবে দেখেন, জামাতাকে শাশুড়ী প্রাণাধিক বোধ করেন। এক পক্ষের ভাব "বেঁচে থাক্, কত বৌ হবে"—অপর পক্ষে "জামাই সুখে থাকলে তবে মেয়ের সুখ।" জামাই আদরে যত্নে শ্বাশুড়ীকে মা বলিয়া মনে করেন, বধূ লাঞ্ছনা খাইয়া শাশুড়ীকে বাঘিনী মনে করেন।

যাহা হউক, যত্নে যে পরকে আপন করা যায়, ইহা কিছু নূতন নহে। ভালবাসার জনই আপনার হয়। যাহাকে স্নেহ করা যায়, সকলের অপেক্ষা সেই-ই আপনার হয়। স্বামিস্ত্রীতে যতটা নিকট সম্বন্ধ, এত কাহারও সহিত যে হয় না, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু স্বামিস্ত্রীব মধ্যে আমাদের দেশে কোন প্রকার রক্তেব সংস্রব নাই।

শাশুড়ী-বধূর সম্বন্ধ এই যে, শাশুড়ী বধূকে যত্ন স্নেহ করিবেন, বধূ ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে। কিন্তু যত্ন স্নেহ না পাইলে ক্ষুদ্র বালিকার মনে ভক্তির সঞ্চার কিরূপে হইবে? প্রথমে শাশুড়ীরই যত্ন করা কর্ত্তব্য—যত্ন করা কিছু কঠিন নহে—যত্ন যাহাকে তাহাকে করা যায়—কিন্তু ভক্তির ভাব না আসিলে ভক্তি করা বড় কঠিন। শাশুড়ীর মনে প্রথমে স্নেহের উদ্রেক না হইতে পারে, কিন্তু যত্ন করিতে ত পারেন—পাঁচ জনে পাঁচ রকম কথা কহিলে, তিনি তাহাতে রসান না দিয়া, তাঁহাদের থামাইতে পারেন। যত্ন করিতে করিতে তিনিও যত্ন পান—ক্রমে তাঁহারও স্নেহের সঞ্চার হয়, বধূও ভক্তিশ্রদ্ধা, সেবা শুশ্রূষা করে। সে বাপের বাড়ী যাবার জন্য ব্যাকুল হয় না। সে হাসিতে হাসিতে মায়ের কাছে গিয়া, "আমার শাশুড়ী আমায় কত ভালবাসেন" বলিয়া মাতার ভয় দূর করিয়া মাতাকে সুখী করিতে পারে। শ্বশুরবাড়ীর লোক দেখিলে ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া যায় না, পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসে না, সে হাসিতে হাসিতে "মা কি ক'চ্ছেন" জিজ্ঞাসা করে,—জিজ্ঞাসা করে, "আমায় বুঝি নিতে

এসেছিস ?" নহে ত বলে, "মাকে বলিস, আমায় নিয়ে যেতে, খোকার এখানে বড় কষ্ট হচ্ছে।"

নবীন যৌবনে বোধ হয়, সকলেরই স্বামীর কাছাকাছি থাকিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু শাশুড়ীর বাক্যযন্ত্রণায় সে সাধ মনেই বিলীন হইয়া যায়। স্বামীর সঙ্গে যে রাত্রে দেখা হইবে, তাহাও অনিশ্চিত। সমস্ত দিন ঝালাপালা হইয়া রাত্রে যে একটু শান্তি পাইবে, তাহারই বা স্থিরতা কি! হয়ত পুত্র বাড়ীতে পদার্পণ মাত্রেই, মাতা বধূর নানাবিধ দোষ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। সে দোষের হয়ত কতক সত্য, কতক ভুল, কতক বাড়াইয়া বলা হইল। প্রভুও অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া রহিলেন। গভীর রাত্রে ঘরের মধ্যে যাইতে না যাইতে স্বামী মহা রাগতঃ ভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, সে কাঁদিয়া ফেলিল, প্রতিবাদ করিবে হয়ত ভাবিয়া আসিয়াছিল—বক্তৃতার চোটে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল—কিছুই বলা হইল না। কিন্তু এ অভিমান ত ঘোর অভিমান নহে যে মনের কথা মনেই থাকিবে। অভিমান ভঙ্গে সে যদি নিজ দোষ কাটাইতে পারে বা শাশুড়ীর ভুল বা দোষ দেখাইতে পারে, তাহা হইলে সুতরাং স্বামী তাহারই পক্ষপাতী হয়েন। নিজে না জানিয়া শুনিয়া অনর্থক রাগ করিয়াছেন, ধমকাইয়াছেন মনে করিয়া দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া পড়েন। মাতাকেই এই সকল গোলযোগের মূল মনে করিয়া মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। তাঁহার মাতা কতক কতক বুঝিতে পারিয়া আরও জ্বলিয়া উঠেন—ছেলেকে কিছু বলিতে না পারিয়া বধূকে আরও যন্ত্রণা দেন। কাজেই স্বামীর কাছে থাকা অপেক্ষা বাপের বাড়ী যাওয়া সহস্রগুণে ভাল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বাপের বাড়ী যাওয়া সুকঠিন—শাশুড়ী সহজে স্বত্ব ছাড়েন না—লোকের উপর লোক, অনেক সই সুপারিশে তবে আট দিনের কড়ারে যদি পাঠালেন ত যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইল।

"দেখো গো বড়মানুষের মেয়ে, যেন আট দিন সওয়ায় নয় দিন হয় না, তা হ'লে এ জন্মে আর হরি ঘোষের বাড়ীমুখো হ'তে দেবো না।" বিদায়ের প্রণামের আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে এই সরোষ আদেশে তাহার বাপের বাড়ী যাবার আনন্দ কমিয়া যায়। আট দিন ত বিদ্যুতের মত অতি শীঘ্র ফুরাইয়া গেল। এখনও ত মাকে কোন কথাই বলা হয় নাই। মামার সঙ্গে দেখা হইল না। মাসিমার বাড়ী যাওয়া হইল না—কই,

কিছুই ত হইল না।—নয় দিনের দিন সকালেই শ্বশুরবাড়ীর দাসী আসিয়া হাজির। আর দেরি সহে না। দাসীরই বা গর্ব্ব কত! মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর লোক বলিয়া এ-বাড়ীতে তাহার আদরই বা কত! এস এস শ্যামা যে, ব'স ব'স—বেয়াই কি করছেন, বেয়ান কেমন আছেন, ছেলে-পুলেরা সব ভাল ত? পুঁটুকে নিতে এসেছ, তা বেশ ত, সেই ঘরই জন্ম জন্ম করুক, তা নয়, আর দু-দিন রাখলে হ'ত। তা এ-বেলা না খাইয়ে-দাইয়ে কেমন ক'রে পাঠাই—ও-বেলা নিয়ে যেও।" আর কোথা আছে—শ্যামা অমনি তিরিবিরি করিয়া উঠিল—"আমি বসবো না গো, আমার এখন সব কর্ম্ম প'ড়ে রয়েছে—আমি বললুম যে, তোমার বে'নের সেই ধারা জান ত, মা-ঠাকরুণ, এ-বেলা পাঠালে অত ক্ষণ, সেই যার নাম রাত দশটা—তবু আমার কথা শুনলেন না"—বলিতে বলিতে প্রস্থান—পরে পুনঃ প্রবেশ—"ওগো, আমি আসতে নারবো, বিকেলে আপনারা রেখে এস—যেন সে-বারের মত রাত-টাত হয় না।" এই আজ্ঞা করিয়া হাত দুলাইয়া বকিতে বকিতে এবার নিঃসন্দেহ প্রস্থান। যদি ধনীর বধূ হন, তবে এক দাসী, এক চাকর, এক দরোয়ান ও এক ঘেরাটোপ-মোড়া পালকি হৈ হৈ করিয়া আসিয়া হাজির। "ঐ রে, তোকে বুঝি এ-বেলাই নিতে এল।" যমের দূত ফিরানো যায়, এ পালকি ফিরায়, মা বাপের সাধ্য নাই। কচি মেয়ের কান্নাকাটিতে যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কেহ আর দুই চারি দিন সময় চাহিয়া বিনীত ভাবে পালকি ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহার ফলে এই হয় যে, কতকগুলা কটূক্তি শুনিয়া সেই দিনই মেয়েটিকে জবরদস্তি ধরিয়া বাঁধিয়া শ্বশুরালয়ে দিয়া আসিতে হয়। আর বালিকার লাঞ্ছনা আরও বাড়ে। কিন্তু শাশুড়ী-বধূতে স্নেহের সম্বন্ধ থাকিলে শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় চিরপ্রচলিত রোদনের পরিবর্ত্তে সকলেই হাসিতে হাসিতে যাইতে পারে। শাশুড়ী ঠাকুরাণী যদি বধূ-বরণের সময় বধূর কর্ণে মধু না দিয়া নিজে মধুর বাণী বলেন ত বধূর চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়। হায়! কেন সকলে কুন্তীর ন্যায় শাশুড়ী হন না? মহাভারতে পঞ্চ পাণ্ডবের বিবাহের পর "মঙ্গলসূত্রধারিণী অবগুণ্ঠনবতী দ্রৌপদী শ্বশ্রূকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হইলে" কুন্তী আশীর্ব্বাদ করিলেন—বৎসে, ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের প্রতি, স্বাহা বিভাবসুর প্রতি, রোহিণী চন্দ্রের প্রতি, দময়ন্তী নলের প্রতি, ভদ্রা বৈশ্রবণের প্রতি,

অরুন্ধতী বশিষ্ঠের প্রতি এবং লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতি যেমন ভক্তিমতী প্রণয়বতী হইয়াছেন, তুমিও ভর্ত্তৃগণের প্রতি তদনুরূপ হও। হে ভদ্রে, তুমি বীর সন্তান প্রসব করিবে, স্বামী সহ যজ্ঞে দীক্ষিত হইবে, তোমার সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকিবে না। হে বৎসে, তুমি অতিথি, গৃহাগত সাধু, বালক, বৃদ্ধ ও গুরুজনের সৎকারে ব্যাপৃত হইয়া কালযাপন করিবে। তোমা হইতে কুরুজাঙ্গল প্রভৃতি প্রধান প্রধান জনপদে রাজা অভিষিক্ত হইবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বামীদিগের বল-বিক্রমার্জ্জিত বসুমতী বিপ্রসাৎ করিয়া এবং পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বস্তুজাত প্রাপ্ত হইয়া শত শত বৎসর পরম সুখে কালযাপন করিবে। হে বৎসে, অদ্য তোমাকে যেমন অভিবাদন করিলাম, তুমি পুত্রবতী হও, পুনর্ব্বার এইরূপে অভিবাদন করিব।” কুন্তী পুত্র ও পুত্রবধূর মিলন বাঞ্ছা করেন, যাহাতে তাঁহার পুত্রেরা বধূতে অনুরাগী হন এমন সকল উপদেশ তিনি বধূকে দিলেন। বধূকে যত্ন স্নেহ করা যেমন কর্ত্তব্য—শিক্ষা দেওয়াও তেমনই কর্ত্তব্য; বালিকা বধূ কার্য্যাক্ষম হইলে “তুমি কেমন ঘরের মেয়ে মা—কিছু জান না—আর তোমার মা-ই বা কেমন যে কাজকর্ম্ম কিছু শেখান নি।” শাশুড়ীদের মুখে এই কথাই শোনা যায়—বধূকে শিক্ষা দেওয়া যেন তাঁহার কাজ নহে। বধূ বাপের বাড়ী হইতে সকল শিখিয়া আসিয়া তাঁহার ঘরে দাসীর মত যদি খাটে, তবে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন।

কুন্তী দুই চারি কথায় বধূর কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলেন, নিজ স্নেহ জানাইলেন—তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কুন্তী দ্রৌপদীকে এত ভালবাসিতেন যে, পাণ্ডবেরা দুঃখ ভোগ করিতে আরম্ভ করিলে দ্রৌপদীর জন্য তাঁহার যত কষ্ট হইয়াছিল, এত কষ্ট নিজ পুত্রদের জন্য হয় নাই। উদ্যোগ পর্ব্বে কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন, “হে বাসুদেব, ক্ষত্রধর্ম্মনিরতা দ্রুপদনন্দিনী সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় সভামধ্যে আনীত হইয়া বিবিধ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া আমি যাদৃশ দুঃখিত হইয়াছি, দ্যূতে পরাজয়, রাজ্য হরণ ও পুত্রগণের নির্ব্বাসনের নিমিত্ত তাদৃশ দুঃখিত হই নাই।” বনগমনের সময় কুন্তী কহিতেছেন—

“হে পুত্র আমারে ছাড়ি না যাহ কাননে—
কৃষ্ণা, তুমি আমা ছাড়ি বঞ্চিবে কেমনে।”

দ্রৌপদী যেমন শ্বশ্রূর স্নেহ পাইয়াছিলেন, তেমনি তিনিও ভক্তি করিতেন। দ্রৌপদী যে কত দূর তেজস্বিনী গর্ব্বিতা মহিলা ছিলেন, তাহা তাঁহার নিজ মুখেই মহাভারতকার ব্যক্ত করাইয়াছেন—উদ্যোগ পর্ব্বে দ্রৌপদী যুদ্ধের নিমিত্তে কৃষ্ণকে কহিতেছেন, "হে মাধব, এই ভূমণ্ডলমধ্যে আমার তুল্য কামিনী আর কে আছে? আমি দ্রুপদ রাজার যজ্ঞ-সম্ভূতা কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয়সখী, আজমীঢ়-কূল-সম্ভূত পাণ্ডু রাজার স্নুষা ও ইন্দ্রসম তেজস্বী পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী ইত্যাদি" এই তেজস্বিনী দ্রৌপদীও শ্বশ্রূর জন্য চন্দন পেষণ করিতেন। কীচকবধে ভীমকে উত্তেজনা করিবার সময় দ্রৌপদী কহিতেছেন—"আর এই একটি দুঃখ আমার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, আমি আর্য্যা কুন্তী ব্যতিরেকে কদাচ কাহারও গাত্র-বিলেপন পেষণ করি নাই।" ইত্যাদি। আরও কহিতেছেন "আমি আর্য্যা কুন্তী ও তোমাদিগকে কখনও ভয় করি নাই।" শাশুড়ীকে ভয় করি না কথাটা নূতন বটে—কিন্তু কেমন মধুর! শ্বশ্রূ-বধূতে মাতৃভাব কুন্তী-দ্রৌপদীতে জাজ্বল্যমান। ('ভারতী,' আষাঢ় ১২৯৮)

এ-কাল ও এ-কালের মেয়ে

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে আমরা কখনই সম্পূর্ণ সুখ উপলব্ধি করি না। অতীত কালের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের কল্পনায় আমরা প্রকৃত সুখ অনুভব করি। কিন্তু বর্ত্তমানে সুখী হওয়া দূরে থাকুক, প্রায় সকলেই নিজ নিজ অবস্থা অপ্রীতিজনক বোধ করিয়া থাকি! অতীত কালের স্মৃতিতে কাঁটা খোঁচা নাই, ভবিষ্যতের কল্পনায় নিগড় নাই। সময়ের পরিবর্ত্তনে অতীতের আশ-পাশের ঝঞ্ঝাট চলিয়া যায়—থাকে শুধু সুখময় স্মৃতিটুকু। প্রতি বৎসর শরতের জোৎস্নায়, বসন্তের বাতাসে, বৈশাখী বেল-জুঁইয়ের গন্ধে পরিতৃপ্ত হইয়াও ভাবি, পূর্ব্বে যেমন ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না হইত—কই, তেমন ত আর এখন হয় না! বসন্তে এ বৎসর বসন্ত নাই —এ ত শীত—বেলফুলে গন্ধ নাই—মালীরা কুঁড়ি তুলে মালা গেঁথেছে। গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছি—বাতাসটি মন্দ নহে—ঢেউগুলি বেশ—কিন্তু শরীরটা ভাল নয়, এত জল হাওয়া লাগলো, তাইতো! কিন্তু আজ আর সে সকল কিছু মনে নাই—মনে আছে শুধু গঙ্গার ধারটুকু—তাহার ঢেউগুলি, মৃদুমন্দ বাতাস—মোহময় জ্যোৎস্না।

পানসিতে ঢেউ লাগায়—সে দিন মাথা-ঘোরায় যে কত কষ্ট হইয়াছিল, তাহা মনে নাই—মনে আছে সেই মাঝির গান—সেই দাঁড়ের ঝুপঝুপ শব্দ। অসুখকর স্মৃতি কি থাকে না? থাকে, কিন্তু তাহা তীব্রভাবে থাকে না;—অথবা আমরা মনুষ্য জাতি, তাহাকে সমাদরে স্থান দান করিতে চাহি না। আমাদের প্রিয়তমের রুগ্ন শয্যায় যখন আমরা তাহার সেবা করি, তখন আমরা কখনই মনে আনিতে পারি না যে, সে বিনা আমরা জীবিত থাকিতে পারি! কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সে চলিয়া যাইবার কিছু দিন পরে আর সে দুঃখের তীব্রতা থাকে না—মৃতকে বিস্মৃত হই—অন্ততঃ হইতে চেষ্টা করি। কিন্তু সুখের স্মৃতি জ্বলন্তভাবে আমাদের মনে জাগিয়া থাকে, স্মৃতিতেই আমরা প্রকৃত সুখানুভব করি। সুখের স্মৃতিকে আমরা অতি যত্নে আদরে পোষণ করি, বার বার তাহা স্মরণ করি, বার বার তাহার উল্লেখ করি। রুগ্ন শয্যায় সে যে কত কষ্ট পাইয়াছিল—তাহা মনে আনি না—কত যে মিষ্ট কথা কহিত, তাহাই মনে মনে শত বার আন্দোলন করিয়া থাকি।

এই বর্ত্তমানের স্বাভাবিক অসন্তোষের ফলেই বোধ হয়, আজকাল বঙ্গসমাজের এক দল মানব এক দলের মেয়ের উপর সাতিশয় অসন্তুষ্ট। তাঁহারা সেকালের মেয়েদের প্রভূত প্রশংসা ও এ-কালের মেয়েদের যথোচিত নিন্দা করিয়া দিন রাত খুঁৎ খুঁৎ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, এ-কালের মেয়েরা অতিশয় বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে, কোন কাজকর্ম্ম করে না, কেবল বিছানায় শুইয়া নভেল পড়ে, চেয়ারে বসিয়া কার্পেট বুনে। কেহ বলেন, বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া মেয়েরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, বিনা পরিশ্রমে শরীর অসুস্থ হওয়াতে স্বামীর উপার্জ্জিত অধিকাংশ ধনই ডাক্তারের ঘরে যায়। ছেলেরা দাসদাসীর দ্বারায় প্রতিপালিত হওয়াতে তাহারাও অনিয়ম ও অযত্নে রুগ্ন ও অসৎচরিত্র হয়। কেহ বলেন, শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী প্রভৃতি গুরুজনকে এ-কালের মেয়েরা ভক্তি করেন না, অতিথি অভ্যাগতদের যত্ন করেন না, ছেলে-পিলেকে স্নেহ করেন না। তাঁহারা বলেন, এ সমস্তই লেখাপড়ার দোষ—লেখাপড়া শিখিয়া মেয়েরা বিবি হইয়াছেন, তাহাদের আর লেখাপড়া শেখানো উচিত নহে। এইরূপ নানা জনে নানাবিধ দোষ দেখাইয়া পরিশেষে উপসংহারে বলেন যে, কখন গার্হস্থ্য সুখ চলিয়া গিয়াছে—দাম্পত্য প্রেম নাই, মাতৃস্নেহ নাই—বেচারী পুরুষদের মহা কষ্ট। তাঁহারা প্রাণপণে যে পরিবারের জন্য ধন উপার্জ্জন করেন, সে পারিবারিক সুখ তাঁহার তিল মাত্র নাই, কেবল জ্বালাতন। অভাব কিছুতেই ঘোচে না। কেবল টাকা নাই, টাকা নাই! স্ত্রী-শিক্ষার দোষেই ত এত অভাব। গৃহিণীর বিবিয়ানার খরচ চাই, ডাক্তার খরচ চাই, দাস দাসী চাই, রাঁধুনী চাই। যাহা হউক, এ বিষয়ে একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় এ-কালের প্রবলা অবলারা, বেচারী পুরুষদের অভিযোগ হইতে কিয়ৎপরিমাণে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

এ-কালের মহিলাদের অভিযোগকারিগণ কহেন, সেকালে এত দাস দাসী রাখা প্রথা ছিল না—মহিলারা নিজ হস্তে রন্ধনাদি করিতেন, নিজ হস্তে অন্য অন্য কাজকর্ম্ম সকলই নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু এ-কালের মেয়েদের দাস দাসী নহিলে চলে না। তাঁহারা হাত ময়লার ভয়ে পান সাজেন না, দুর্গন্ধ বলিয়া গোময়ে হস্তক্ষেপ করেন না।

সত্য বটে, এ-কালের মেয়েরা কতক পরিমাণে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা পান সাজিতে বসিয়া কাপড়ময় চুন খয়েরের হাত মুছিতে রাজী নহেন, তাঁহারা ভাতের হাঁড়ির কালি ও ব্যঞ্জনের হলুদে হস্ত রঞ্জিত করিতে নারাজ। পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়ম আছে যে, রন্ধনকারিণী হাত মুখ ধুইয়া, পরিধানবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, পরিষ্কার বস্ত্র পরিয়া তবে পরিবেশনে যাইতেন। এ নিয়ম যত পালন হউক বা না হউক, সেকালের মহিলারা গামছার কার্য্য সমস্তই নিজ পরিধানবস্ত্রে সারিয়া লইতেন। এ-কালের মেয়েরা পরিচ্ছন্ন হওয়াতে যাহাতে হাত অপরিষ্কার না হয়, তাহার উপায় করেন, তাঁহারা হাত মুছিবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন।

সেকালে তেল মাখিয়া স্নান করা পদ্ধতি ছিল, কিন্তু আজকাল সাবান মাখিয়া স্নান প্রচলিত হইয়াছে—চারি দিকে সাবান ছড়াছড়ি হওয়াতে সকলেই তাহা ব্যবহার করেন—মহিলারাও অবশ্য ব্যবহার করেন। কিন্তু যে সকল প্রভুরা দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বলুন দেখি যে, তাঁহারাই কি আপিসের ফেরত সাবান, চিরুনি, পাউডার কিনিয়া আনিয়া গৃহলক্ষ্মীকে প্রলোভিত ও প্রফুল্লিত করেন কি না? বাস্তবিক যদি বিজাতীয় বিলাসদ্রব্য ব্যবহার ও বিজাতীয় অনুকরণ বঙ্গীয় পুরুষদিগের অনুমোদিত না হইত, তাহা হইলে কি বঙ্গীয় রমণীগণ তাহা ব্যবহার করিতেন—না তাহা ব্যবহার করিতে সাহস পাইতেন? যাহা হউক, তা বলিয়া কি এ-কালে যাঁহার রাঁধুনী রাখিবার ক্ষমতা নাই, তিনি কি বাজার হইতে ভাত কিনিয়া খাইয়া থাকেন? না তিনি নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া আহার করেন? তাঁহার স্ত্রী বা মাতা রন্ধন করিয়া দেন না ত কে দেয়? প্রায়ই শোনা যায়, বউ রাঁধে না; বুড়ো শাশুড়ীকে দিয়ে রাঁধায়। কিন্তু সেটা এমনই কি দোষের? বিবেচনা করিয়া দেখিলে গৃহস্থের সকলের পক্ষে সুবিধা বলিয়াই শাশুড়ীকে রাঁধিতে সচরাচর দেখা যায়—এবং শাশুড়ী বা মাতা ইচ্ছাপূর্ব্বক রন্ধনের ভার লইয়া থাকেন। তবে কন্যাকে রন্ধন-ভার হইতে মুক্ত করিয়া মাতা তাহাকে খোঁটা দেন না, কিন্তু শাশুড়ী এবং তাঁহার আত্মীয়ারা বধূকে দুই এক কথা না শোনাইয়া থাকিতে পারেন না।

আমাদের দেশে হিন্দু বিধবারা প্রায় সকলেই স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়া থাকেন। এমন স্থলে যখন তাঁহার নিজের জন্য রাঁধিতেই হইল,

তখন তাহার উপর আরও দু-চার জনের রাঁধিতে কিছু কষ্ট হয় না। বিশেষ গার্হস্থ্যের অন্য অন্য কার্য্যের তুলনায় বসিয়া বসিয়া রন্ধন করাই প্রাচীনাদের পক্ষে অল্প কষ্টকর। কারণ, প্রাচীন অবস্থায় নড়াচড়া স্বাভাবিক নহে। ছোট ছোট সন্তানাদি লইয়া ব্যস্ত হইতেও হয় না। অনেক স্থলে শাশুড়ী নিরামিষ রাঁধিলেন, বৌ একটু মাছ রাঁধিয়া লইলেন। নিতান্ত যদি বৌ ছেলেপিলে লইয়া বিব্রত থাকেন ত শাশুড়ীই মাছ রাঁধিয়া কাপড় ছাড়িয়া ফেলেন। আর ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বয়োবৃদ্ধির সহিত সকল স্ত্রীলোকেরই রন্ধনে পটুতা জন্মে। বাস্তবিক পাক-প্রণালী পাঠ করিয়া ওজন করিয়া প্রত্যেক তরকারি রাঁধিতে হইলে দিনান্তে আহার জোটা ভার। সুতরাং বধূ হইতে শাশুড়ীর রান্না উত্তম হওয়ায় এবং রন্ধন-কৌশলাদি জানা থাকাতে অল্প খরচে হওয়ায় শাশুড়ীর উপর রন্ধন-ভার থাকা গৃহস্থেরও সুবিধা এবং মঙ্গল। শাশুড়ী নিজ পুত্র পৌত্রের জন্য রাঁধিতে কিছু ক্লেশ বোধ করেন না। তার পর যাঁহার ঘরে রাঁধুনী আছে, এমন মহিলারাও কি রান্না হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন? বাবুর সখের খাবার, ছেলেদের জলখাবার—এ সকলই ত প্রায় তাঁহাদের নিজ হস্তে প্রস্তুত করিতে হয়।

এই কলিকাতায় রাঁধুনী বা দাস দাসী সহজে পাওয়া যায় বলিয়া এখন প্রায় সকলেই দাস দাসী রাখিয়া থাকেন। বিশেষ অন্ততঃ একটি দাসী না রাখিলে কলিকাতায় বঙ্গকুলবধূর মান সম্ভ্রম রক্ষা হয় না। কলিকাতায় বাড়ীর চৌকাঠের বাহিরে কুলবধূর পা বাড়াইবার জো নাই, কোন লোক বাড়ীতে আসিলে স্বামী পুত্রের অনুপস্থিতিতে কথা কহিবার কেহ নাই। কলিকাতায় একটি দাসী ভিন্ন বাস করা যে কত অসুবিধা, তাহা যাঁহাদের দাস দাসী নাই, তাঁহারাই অনুভব করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামে দাস দাসীর তত আবশ্যক হয় না—পল্লীগ্রামে মহিলাদিগের কতকটা স্বাধীনতা থাকে, এবং বাটীতেও নিতান্ত পরিচিতেরাই সচরাচর হামেশা থাকে—তাঁহাদের সামনে যাওয়া ও স্পষ্ট না হউক, ইঙ্গিতেও কথা কহা চলে। অথবা আবশ্যক স্থলে খিড়কিদ্বার দিয়া বাহির হইতে পাড়ার মাসি, পিসি বা ভাইপো ভাইঝিকেও আনিয়া হাজির করা চলে। পল্লীগ্রামে দাস দাসী পাওয়াও সুকঠিন। জমিদার বা গ্রামের ধনী ব্যক্তিও অনেক চেষ্টা যত্ন করিয়া দাস দাসী পাইয়া থাকেন।

সেখানে সকলেই প্রায় গৃহস্থ ও চাষী লোক। তাহারা নিজের ঘরে খাটে-খোটে, পরের দুয়ারে যায় না। পরের দুয়ারে যাইতে হইলেই কলিকাতায় চলিয়া আসে—কারণ, রাজধানীতে কাজ মিলিবেই। কলিকাতায় দাস দাসী সহজেই পাওয়া যায় বলিয়া এবং আবশ্যকও অধিক বলিয়া এখানে সকলে প্রয়োজনানুসারে ক্ষমতানুসারে দাস দাসী রাখিয়া থাকেন। একটা রাঁধুনীর অসুখ হইলে সহজেই যদি আর একটা পাওয়া যায়, তবে কেনই বা কষ্ট স্বীকার করিবে? সকলেই ত সকল বিষয়ে দেখিতেছেন যে, হাতের কাছে উপায় থাকিতে কেহ কষ্ট করিতে চাহেন না। ট্রাম হওয়াতে ইতর ভদ্র সকলেই ট্রামে উঠিতেছে। পূর্ব্বে যাহারা চিরদিন হাঁটিয়া দলে দলে কালীঘাট যাতায়াত করিত, এখন তাহাদের মধ্যে কয় জন হাঁটিবার কষ্ট স্বীকার করে? এখন শাদা ফুলের মালা গলায়, কপালে সিন্দূর, কোলে ছেলে, মাথায় বোঝা, পরিশ্রান্ত পদাতিক যাত্রী বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বেলা দুই প্রহরের সময় কালীঘাটের ফেরত ট্রামে যাত্রী বোঝাই দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ একান্নবর্ত্তী প্রথা উঠিয়া যাইতেছে বলিয়া দাস দাসীর আবশ্যকতা বৃদ্ধি হইয়াছে। সেকালে একজন রাঁধিতে গেলেন, একজন বাড়ীর সকল ছেলেগুলিকে একত্র করিয়া ভাত খাওয়াইতে গেলেন। তখন এড়া ভাত খাওয়া ছেলেদের একটা পদ্ধতি ছিল—তখন প্রায়ই কর্ত্তারা প্রাতে উঠিয়া কাজকর্ম্ম করিতেন বা দেখিতেন, দ্বিপ্রহরে বাটী আসিয়া স্নানাহ্নিক ও আহারাদি করিতেন। তাহাতে ২।৩টার কম পুরুষদেরই আহার হইত না। সুতরাং রন্ধনকারিণী কিছু দশটার পূর্ব্বে রান্নাঘরে যাইতেন না। তাই জন্য নিয়ম ছিল, একজন সকল ছেলেগুলিকে একত্র করিয়া "চড়িভাতির" মত দুই একটি ব্যঞ্জন ও ভাত রাঁধিয়া আহার করাইতেন। ইহাতে স্নানের বা শুচির বিশেষ আবশ্যক ছিল না—সকল দিন রন্ধন করাও হইত না—এক এক দিন গ্রীষ্মকালে চাহি কি পান্তা ভাতও খাওয়ানো হইত। তাই এই ভাতের নাম "এড়াভাত" বা "বাসী ভাত"। সেকালে বহু পরিবার একত্রে থাকায় আজ ইনি, কাল উনি, এইরূপ পালা করিয়া রাঁধা হইত, সুতরাং সকলেই সকলের নিকট কোন-না-কোন বিষয়ে সাহায্য পাওয়াতে তাদৃশ ক্লেশানুভব করিতেন না। কিন্তু এখন সকলেই প্রায় পৃথক্ হওয়াতে রোগে, শোকে, অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ও শিশু সন্তানগুলিকে

লইয়া প্রত্যেককেই এত ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় যে দাস, দাসী না রাখিলে চলে না। অনেক নির্ব্বিরোধী প্রভু কহিবেন যে, একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা উঠিয়া যাওয়ারও ত ঐ বৌ বৌ ঝগড়াই কারণ। একান্নবর্ত্তী প্রথা আলোচনা করিতে গেলে স্বতন্ত্র কথা আসিয়া পড়ে, সুতরাং এখানে তাহার বিশেষরূপে আলোচনা ছাড়িয়া দেওয়া গেল। পৃথক্ রহিবার একটি প্রধান কারণ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ইংরাজ রাজত্বে কাশী যাইতে হইলে আর উইল করিয়া যাইতে হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বল্প আয়াসে অল্প খরচে বহু দূরদেশে যাতায়াত করিতে সক্ষম হইয়াছে। সুতরাং সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মস্থলে স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া যান। সুতরাং ঝগড়া-ঝাঁটি না হইলেও পৃথক্ থাকা হয়—সেকালে বিদেশে নিজ প্রাণ রক্ষাই দুষ্কর ছিল, সুতরাং কেহই কর্ম্মস্থানে নিজ স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতে পারিতেন না। দূরত্বানুসারে কেহ সপ্তাহে, কেহ মাসান্তে, কেহ বৎসরান্তে বাটী যাইতেন। কেহ বা দশ বিশ বৎসর উপার্জ্জন করিয়া একেবারে বাটী ফিরিতেন। সুতরাং তখন এক কর্ত্তার অধীনে বহু পরিবার প্রতিপালিত হইত। সময়ানুসারে একান্নবর্ত্তী প্রথার আবশ্যকতা ছিল, এই জন্য সকলেই কিছু-না-কিছু কষ্ট সহ্য করিতেন। স্ত্রী পুত্র, মাতা পিতা, সকলেই পরস্পরে পরস্পরের কাছাকাছি থাকিতে চাহে। এখন রেলের গাড়ী হওয়াতে যাতায়াতের খুবই সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতার কাছাকাছি পল্লীগ্রামে যাঁহাদের বাটী, সকলেই জানেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের পরিবার নিজ গ্রামে থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকেন না। তাঁহাদের ভিন্ন খরচ করিয়া থাকিতে যে অতিরিক্ত খরচ হয়, তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে রেলওয়ে কোম্পানীকে দিয়া থাকেন। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া স্নেহপূর্ণ গৃহে তাঁহারা যে আরাম পাইয়া থাকেন, তাহা কলিকাতার বাসায় পান না,—তাই জন্য তাঁহারা নিজে অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও বাটী হইতে যাতায়াত করেন।

যাহা হউক, এ-কালের মেয়েরা যে শুদ্ধ কার্য্যাক্ষম বলিয়া দাস দাসী রাখা হয়, এমন বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সেকালে ছেলেরা প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, পাড়ার পাঁচ সাতটি ছেলে একত্রে পাঠশালায় হাজির হইত—দ্বিপ্রহরে বাড়ী আসিয়া খাওয়া দাওয়া করিত। কিন্তু এ-কালের ভিন্ন প্রথা—বেলা

নয়টার সময় যেমন আহারাদি সম্পন্ন করিয়া বাড়ীর কর্ত্তাকে আপিস যাইবার জন্য হুড়াহুড়ি করিতে হয়—তেমনি ছেলেদেরও স্কুলের তাড়াতাড়ি পড়িয়া যায়। এখন "পাঠশালা" পরিবর্ত্তন হইয়া যেমন "স্কুল" হইয়াছে, তেমনই বেশভূষারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জামা, জুতা, ছাতা, কত কি চাহি। অনেক সময় জুতা অভাবে স্কুল যাওয়া বন্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু সেকালে গৃহস্থ-বালকের মধ্যে কয় জন বারো মাস জুতা ব্যবহার করিতে পাইত? পাল পার্ব্বণে পোশাকী কাপড়ের মত অধিকাংশের মাঝে মাঝে হয়ত জুতা আবশ্যক হইত। সেকালে যে যাহার পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিত—এ-কালে কি কায়স্থ, কি ব্রাহ্মণ, কি অন্য শ্রেণীর লোক, সকলেই স্কুল আপিস যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছে। এই সকল স্কুল আপিসের হাঙ্গামায় গৃহিণী ধীর ভাবে রন্ধনাদি করিবে, না সকলকে আবশ্যকীয় ভাবে গুছাইয়া দিবে? আর এই তাড়াতাড়িতে কি রন্ধনই ভাল হয়? না, সকল রকম ব্যঞ্জন হইয়া উঠে? মাছের ঝোল ভাত হয় ত ঢের। তাও বাজার আনিতে বিলম্ব সহে না, প্রায়ই বাসী মাছ রাখা হয়। প্রভাতে উঠিয়া, কয়লার উনানে আগুন দিয়া স্নান সমাপনান্তে ভাত না চড়াইতে "দাও দাও" শব্দ। কর্ত্তা ভাত দাও দাও চীৎকার করিতেছেন; আপিসে জরিমানার ভয়। বড় ছেলে নূতন অ্যাপ্রেন্টিস্, ত্রাহি মধুসূদন—ভাতের জন্য বুঝি নাম কাটা যায়। মধ্যম 'স্কুলের বেলা হ'ল, একটু সকাল সকাল না গেলে পড়া শুনতে পাব না।' তৃতীয়, 'মাষ্টার মারবেন'। চতুর্থ, 'খিদে পেয়েছে' করিয়া আঁচল ধরিয়া ঝুলিতেছে—কোলের খুকীটি একাকী পড়িয়া দুগ্ধ অভাবে ট্যাঁ ট্যাঁ করিতেছে। কে কাহাকে দেখে!—এমন অবস্থায় যে কি বিপদে পড়িতে হয়, তাহা যাঁহারা কখনও এমন অবস্থায় পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন।

এ-কালের মেয়ে এ-কালেরই উপযোগী। দোষেই হোক, আর গুণেই হোক, এ-কালের মেয়ে, সেকালের মেয়ের মত হইলে কি এ-কাল চলে? শুধু শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট রাঁধিতে জানিলে এ-কালে আর মান সম্ভ্রম নাই। পাঁঠার বড়া বড়ি চচ্চড়ি কে কতরকম জানেন, তাহারই এখন সকলে খবর লইয়া থাকেন। শাদা ভাতের মান নাই—হল্‌দে ভাত রাঁধিতে জানা চাহি। "পিঁড়া আলপনা," "ছাঁচ কাটা," "কাঁথা শিয়ান" এখন আর শিল্পের মধ্যে গণ্য নহে। আর তাহা বাস্তবিকই এত সহজ

যে, এ-কালের মেয়েদের পক্ষে তাহা কষ্টকর নহে। এ-কালের মেয়েরা "পিঁড়া আলপনা," "কাঁথা শিয়ান" সত্বেও অতি সুন্দর সুন্দর নানাবিধ শিল্প ও আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারেন। সেকালের মেয়েরা অবকাশ পাইলেই গল্প করিতে বসিতেন—গল্পটা কিরূপ, তাহা বোধ হয় বেশী বলিতে হইবে না, সেই গল্পের অধিকাংশই যে পরনিন্দায় পূর্ণ, সে বিষয়ে হলপ করা যাইতে পারে। এ-কালে একটু লেখা পড়া জানা থাকাতে, এবং বঙ্গভাষায় অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তক হওয়াতে কেবল পরনিন্দা করিয়া সময় কাটাইতে তাঁহাদের আবশ্যকও হয় না, প্রবৃত্তিও হয় না। পাড়ার বামন পিসি কয়েত মাসিকে একটু নুন, চারটি চাল দিয়া, ভাব-সাব রাখিয়া আবশ্যকমত সময় কাটাইবার খোরাক জোগাড় করিতে এ-কালের মেয়েরা ব্যস্ত হয়েন না। ধনী মহিলারা দাসীবেষ্টিত হইয়া নিজ প্রশংসা ও পরনিন্দা শ্রবণ করা অপেক্ষা নভেল পাঠ করিয়া, কার্পেট বুনিয়া সময় কাটানো গৌরবের বিষয় বিবেচনা করেন। এ-কালের মেয়েরা কিছু গর্ব্বিতা, এ-কালের মেয়ে নিজ মনোদুঃখ বা সাংসারিক অভাব বা স্বামী পুত্রের নিন্দাবাদ যাহার তাহার কাছে করেন না। নিতান্ত সখ্যতা বা আত্মীয়তা না থাকিলে, সকল পেটের কথা খুলিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তৃপ্তিলাভ করা, এ-কালের মেয়েরা পসন্দ করেন না। তাঁহারা বইখানি, কার্পেটটুকু, নিজের স্বামী পুত্র লইয়া দিন যাপন করিতে বা একেলা থাকিতে কষ্ট বোধ করেন না। সুতরাং পরনিন্দার হাতে ততটা আত্মসমর্পণ করিতে হয় না। ধনীর গৃহ ব্যতীত কয় জন গৃহস্থ মহিলা বিছানায় পড়িয়া দিন কাটাইতে সময় পাইয়া থাকেন, তাহা আমরা ত বুঝিতে পারি না এবং জানিও না। রন্ধন বা বাসন মাজা ব্যতীত কত কাজ আছে, গৃহস্থ ঘরের মহিলাদের স্বহস্তে যে সকলই সম্পন্ন করিতে হয়। বিছানায় পড়িয়া যে তাঁহারা অসুস্থতা টানিয়া আনেন, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অন্যায় দোষারোপ করা হয়। পল্লীগ্রাম যে এদানিক ম্যালেরিয়া জ্বরে উৎসন্ন যাইতেছে, তাহা ত আলস্যের ফলে নহে। তারপর অতিথি অভ্যাগতকে যত্ন করা—সত্য বটে, এ-কালের মেয়েরা অতিথি অভ্যাগতকে যত্ন করেন না। কিন্তু অতিথি কোথায়—কাহাকে যত্ন করিবেন ?

সেকালে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে পদব্রজে যাইতে লোকের আতিথ্য আবশ্যক হইত। তখন বহু পরিবারের অন্ন হইতে অনায়াসে দুই এক জনের অন্ন হইত এবং "আসুন্তি যায়ুন্তি হাঁড়িতে দুটি চাল বেশী ক'রে দাও" বলা হইত। কিন্তু আজকাল রেলওয়ের কল্যাণে কে কাহার দুয়ারে যায়? সুতরাং কালধর্ম্মে অতিথির অভাবে আতিথ্যের ভাবও ঘুচিয়া যাইতেছে। আর কি এখন কেহ পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে চটি দেখিতে পান? সেকালে প্রতি ক্রোশে চটি—প্রতি পাঁচ ক্রোশ অন্তরে সরাই থাকিত। চটিতে মুদিনী—সে কি দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য বা পরকালের ফল ভোগের জন্য অতিথিদের যত্ন করিত, এ বিশ্বাস বোধ হয় কাহারও নাই। এখন রেলওয়ে ষ্টেশনে লুচি কচুরি, মোণ্ডা মেঠাই, দুগ্ধ ফল প্রভৃতি সকল জাতিরই আবশ্যকীয় সকল রকম খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। আবশ্যক হইলেই উপাদান হয়। সমাজের যখন যেরূপ আবশ্যক, তখন সেইরূপ পাওয়া যাইবেই। নিজ নিজ স্বার্থের জন্যই সকলেই আবার পরস্পরে পরস্পরের আবশ্যকীয় হইয়া উঠে। আজ আমার ঘরে অতিথি এল, আমি আজ সেবা যত্ন করলে, তারা আমাদের আবার করবে এখন—এই স্বার্থ টুকু মনের এক প্রান্তে লুক্কায়িত থাকিতই। এখন তোমারও দরকার নাই, আমারও দরকার নাই—অতিথিও নাই, আতিথ্যও নাই।

এ-কালের মেয়েদের রুচি এখন সেকাল হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইয়াছে। সেকালের বাউটি পৈঁছার আর এখন আদর নাই। "কলসীর কাণা"র মত বাউটি পরিয়া নিমন্ত্রণ-সভায় গেলে আর কেহ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে না। "অমুক বোস্ অমন ক'রে বেড়ায় বটে,—কিন্তু দেখেছিস ভাই, মিন্‌সের পয়সা আছে—নইলে গিন্নীকে অমন কলসীর কাণার মত বাউটি দিতে পারে!" কথাগুলি সঙ্গিনীকে যদিও যথাসাধ্য চুপি চুপি বলা হইল বটে, কিন্তু বাউটি-ধারিণীর কানে তাহা পৌঁছিল। তিনিও প্রফুল্ল মনে, গৌরব নেত্রে বাউটি-সমালোচনাকারিণীর দিকে কটাক্ষ করিয়া "ঠিক বলেছ" ভাবটি প্রকাশ করা এখন আর কেহ গৌরবের বিবেচনা করেন না।

এক ঝুড়ি সুতায় গাঁথা সোনার নুড়ি, ঢিল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, লম্বা, চওড়া পদার্থ—নারকেল ফুল, মাদুলি, রুসণো, মরদানা, যবদানা নামে

অভিহিত করিয়া এবং তাহাদের সোনার কলসীর কাণায় সুকোমল বাহু আচ্ছাদন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী হরণ করা এ-কালের মেয়েরা যুক্তিসিদ্ধ মনে করেন না। এবং "আমার একখানি বেনারসী শাড়ী আছে গো" দেখাইবার মত। একটি বার বেনারসী শাড়ী পরিয়া নিমন্ত্রণ-স্থলে উপস্থিত হইয়া, অসহ্য গরমে শ্রান্ত হইয়া "১২৫৲ টাকার শাড়ী, খাসা! এক বার প'রেই কি মাটি করিব" এই কথা বার বার দাসীকে বলিয়া ও আশপাশের শুভ্র শাড়ীধারিণীদের শুনাইয়া কাপড়খানি সন্তর্পণে ছাড়িয়া রাখা তাঁহারা হাস্যজনক বিবেচনা করেন না।

পরিপাটি ও সুশ্রী দেখাইবার জন্য বস্ত্র অলঙ্কার পরিধান করা—বস্ত্র অলঙ্কারে যদি তাহা বিনষ্টই হইল, তবে তাহাতে আবশ্যক কি? এ-কালে অলঙ্কারসকল ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে—অলঙ্কারের কারুকার্য্য এখন নজরে পড়ে—মূল্যের লাঘবতায় তাহার মানহানি হয় না। মূল্যের সমষ্টি ট্যারচা, চৌখোপা, বেনারসী, আলমারি, বাক্সে পোকা ধরিতেছে।

শুভ্র বস্ত্রের আদর আজকাল অধিক পরিমাণে দেখা যায়। ক'নে বধূদেরই বেনারসী শাড়ী ব্যবহার করানো হইয়া থাকে। ঢাকার গুলবাহার পঞ্চম পেড়ে, কেবল মাত্র আইবড় ভাতে মাঝে মাঝে দর্শন দিয়া থাকে। এখন সুন্দর সুন্দর পাড়ের ঢাকাই শাড়ী ব্যবহার করিতে দেখা যায়। লজ্জাহীনা বলিয়া এ-কালের মেয়েদের একটি দুর্নাম রটনা করা হইয়া থাকে। যদিও এ-কালে ঘোমটা দেওয়া পদ্ধতিটা কিয়ৎপরিমাণে কম দেখা যায় বটে, কিন্তু কোন মহিলাই বিনা আচ্ছাদনে নীলাম্বরী শাড়ী পরিধান করেন না। এ-কালে বরঞ্চ বঙ্গমহিলাদের পরিচ্ছদ লজ্জাশীলতা এবং সুরুচির পরিচায়ক।

সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালী মেয়ের "যজ্ঞি" কি এক বিষম ব্যাপার। ৫০ জনকে নিমন্ত্রণ করিলে ২০০ শত জনের উপযোগী খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করাইতে হয়। অনেক সময়ে লুচি সন্দেশ বাঁধিবার বাহুল্যতায় এত অধিক পরিমাণে খাদ্য মজুত রাখিয়াও নিমন্ত্রণকারিণীকে অপ্রতিভ হইতে হয়। এই কুপ্রথা এ-কালের মেয়েরা অতিশয় ঘৃণা করেন। আজকাল যে এই প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা নহে। তবে ধনীদের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ গৃহস্থ মহিলাও সেকালের মত আহারস্থলে

উপবেশন করিয়াই সরা কয়খানি এবং পাতের লুচি কয়খানি তুলিয়া পশ্চাতে রক্ষা করেন না। এই বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া যে অতিশয় কুপ্রথা এবং অসুবিধাজনক, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?—ইহাতে পরস্পরকেই কষ্ট পাইতে হয়। আজ তোমার ছেলের ভাতে আমি এক পালকি খাদ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া লইয়া আসিলাম—কাল আমার মেয়ের বিয়েতে তোমাকে তাহার সুদ সমেত বুঝাইয়া দিতে হইল। তবুও প্রত্যেকেই বাঁধিয়া লইতে ছাড়েন না, এবং প্রত্যেক নিমন্ত্রণকারিণীও অসন্তুষ্ট হইতে ছাড়েন না। এই লজ্জাকর প্রথা এ-কালের মেয়ের রুচি অনুসারে বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। নিতান্ত দরিদ্রাবস্থা না হইলে আর সরা তুলিতে কোন মহিলারই হস্ত অগ্রসর হয় না।

এ-কালের মেয়ের স্বামি-ভক্তি লইয়া মাঝে মাঝে বড়ই আন্দোলন হইয়া থাকে। বোধ হয় কোন কোন দুর্ভাগা পুরুষ স্ত্রীর অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া আত্মবৎ জগৎসংসার দেখিয়া থাকেন। স্ত্রী পুরুষে অল্পবিস্তর বিবাদ বিসম্বাদ সেকালেও ছিল, এ-কালেও আছে। সেকালের মহিলারা স্বামীদিগকে ভক্তি স্নেহের সহিত ভয়ও করিতেন, এ-কালের মেয়ে স্বামীকে ভক্তি ও স্নেহ করিয়া থাকেন। "মেয়েলি কথা," "মেয়েমুখো," "স্ত্রৈণ" প্রভৃতি কথাতে মনে হয় যে, সেকালের পুরুষরা মেয়েদের কতকটা হীন ভাবে দেখিতেন। সুতরাং মেয়েরাও কতকটা ভয় করিয়া চলিতেন। সেকালের মেয়েরা স্বামি-নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এবং স্বামীকেও সকল কথা কহা নিন্দনীয় বিবেচনা করিতেন। বৃদ্ধ বয়সের পূর্ব্বে স্বামীর সহিত তাঁহাদের বড় একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিত না।

এ-কালে স্বামী স্ত্রীকে কতকটা বন্ধুভাবে দেখেন ; সকলকেই নিজ নিজ বাটীতে কর্ত্তৃত্ব করিতে হয়, সকলেরই অনেক সময় পরামর্শের আবশ্যক হয়, সুতরাং স্ত্রীই অনেক সময়ে পরামর্শদায়িনী হয়েন। কারণ, তাঁহাদের ঘরকন্নার মঙ্গলামঙ্গল ইষ্টানিষ্ট উভয়ের সমান। এই সকল নানা কারণে এ-কালের স্বামীকে স্ত্রী তত দূর ভয় করেন না, বরং তিনিই বাটীর গৃহিণী হওয়াতে স্বামী সদা সর্ব্বদাই তাঁহার যত্ন স্নেহ পাইয়া থাকেন। এ-কালে স্নেহ ভক্তির সহিত ভয় নামক পদার্থটি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাস্তবিক এ-কালে গৃহস্থের মধ্যে দরিদ্রতার অতিশয় পীড়ন দেখা যাইতেছে। কিন্তু এ-কালের মেয়ের দোষে তাহা নহে। সেকালে ২৲ টাকায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, এখন ৪৲ টাকার কম এক মণ চাউল পাওয়া যায় না। "যত আনি, তত নাই" তাহা এ-কালের মেয়ের জন্য নহে—আহার্য্য সামগ্রী মহার্ঘ হওয়াই তাহার প্রধান কারণ।

অধিক আর কিছু বলিবার নাই, একটু ভাবিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিবেন যে, কালের পরিবর্ত্তনে ও ইংরাজ রাজা হওয়াতে আমাদের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার গতিরোধ মানুষের অসাধ্য। আমাদের নব্যসম্প্রদায় ইংরাজী সম্প্রদায় দেখিয়া মুগ্ধ! তাহারা যথাসাধ্য সেইরূপ ধরণ-ধারণ করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ সুখী না হইতে পারিয়া বোধ হয় মহিলাদিগকে সকল অসুখের মূল বিবেচনা করিতেছেন। রমণীগণ চিরকালই পুরুষদিগের আশ্রিত ও তাঁহারা যে চিরকালই পুরুষ-দিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া থাকেন, তাহা কাহারও মনে হইতেছে না। আমাদের বাঙ্গালী যুবকদিগের রুচি, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার অনুসারেই এ-কালের মেয়ে গঠিত হইতেছে। লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী পরা, মাথায় চওড়া সিন্দূর, কপালে বৃহৎ সিন্দূরটিপ, নাকে নথ, দাঁতে মিশি, কৃষ্ণবর্ণ ঠোঁট, হাতে শাঁখা, পায়ে দু-গাছা মল—ঝোটন করিয়া খোপাবাঁধা স্ত্রীর সহিত, বোধ করি এ-কালের স্বামী বাক্যালাপ করা দূরে থাকুক, ঘরে ঢুকিতেও দিবেন না। তাঁহারা অতীত কালের মহিলাদের গুণটুকু মাত্র স্মরণ করিয়া, এ-কালের মেয়েদের উপর নানাবিধ দোষার্পণ করিতেছেন। বাস্তবিক ঐ সকল দোষে মহিলারা দোষী কি না—বাস্তবিক মহিলাদের নিজস্ব সম্পত্তি মায়া মমতা, স্নেহ ভালবাসা এ-কালের মেয়েদের আছে কি না, তাহা কেহ কখন ভাবিয়াও দেখেন না। হাতের কাছে কলম পাইলেই এ-কালের মেয়ে সম্বন্ধে যাহা মনে আসে, লিখিয়া ফেলেন। কিন্তু এ-কালের মেয়ে সেকালের মেয়ের মত হইতে পারে না এবং হইলেও তাহাদের উপর অধিকতর অনুরাগী হওয়া নব্য সম্প্রদায়ের পক্ষে অসম্ভব। দূর হইতে লেপাপোছা উঠান—চালে লাউগাছ, মাচায় শসাগাছ, আশে পাশে কামিনীফুলের গাছ, লেবুগাছ, দু-চারটি বেল ও জুঁইয়ের গাছ-বেষ্টিত কুটীরখানি দেখিয়া আমরা কল্পনায় কত বার ঐ কুটীরে বাস করিতে কত না সাধ করিয়া থাকি, নিজেদের কোঠাবাড়ীর ইট-কাঠের

উপর কত তীব্র বাক্যবাণ বর্ষণ করি। কিন্তু বাস্তবিক যদি কোঠাবাড়ী ছাড়িয়া ঐ কুটীরে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে তখন তাহার সমস্ত অসুবিধা আমরা জানিতে পারি। তখন কুটীরে বাস যে কতটা কষ্টকর এবং আমাদের পক্ষে কত দূর অসম্ভব, তাহা বুঝিতে পারি। এখনও পল্লীগ্রামে প্রতি গৃহস্থ বধূরা বাসন মাজে, রাঁধে, ধান সিদ্ধ করে, উঠান ঝাঁট দেয়, গরুর সেবা করে। কিন্তু বল দেখি—কয় জন গৃহস্থ পুরুষ গরুর দড়ি ধরিয়া চরাইয়া বেড়ায়—কাটারি দিয়া বাঁশ কাটিয়া বাগানের বেড়া দিয়া থাকে? কয় জন পুরুষ ছাতা জুতা ব্যতীত টোকা মাথায়, খড়ম পায়ে দিয়া পথ চলিতে অপমান বিবেচনা করেন না? চাষাভূষার ঘরেও অন্তত একটি কামিজ নাই, এমন ব্যক্তি কয় জন আছে? কিন্তু তাহাদের মেয়েরা জ্যাকেট একটা বৃহৎ জানোয়ার, কি বিলাতী খাবার, তাহা জানে না। তুমি আজ যদি আদর করিয়া তোমার মেয়েকে পূজার সময় একটি জ্যাকেট কিনিয়া দাও, তাহা হইলে সে শ্বশুরবাড়ী হইতেও কি দোলের সময় আর একটি জ্যাকেটের প্রার্থী হইবে না—এবং মেয়ের মা হইয়া স্বামীর নিকট সন্তানদের পোষাকের জন্য দৌরাত্ম্য করিবে না? অনেকে মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার বিরোধী, কিন্তু এখন ছোট ছোট মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হইয়া থাকে, পাড়ায় পাড়ায় স্কুল পাঠশালা বিরাজিত। পিতা মাতা ভাবেন, "আহা, পরের ঘরে যাবে,—একটু লিখিতে পড়িতে শিখুক—এর পর তবু দুটো মনের কথা লিখেও ত জানাতে পারবে,—পরের খোশামোদ করতে হবে না।" শুদ্ধ তাহা নহে, এ-কালে কন্যা দেখিতে আসিয়া, "তোমার নাম কি" জিজ্ঞাসা করিয়া "যাও মা, উঠে যাও" ইহা কেহ বলেন না। তোমার নাম কি জিজ্ঞাসা করিয়া, মেয়েটি বোবা কি না, পরীক্ষা করা হইল। এখন বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন, তাহারও ত পরীক্ষা চাই। "কি পড়" তাহার প্রশ্ন। একটু পড়াশুনা জানা না থাকিলে এ-কালের মেয়ের বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত দায়। অধিকাংশ এম. এ., বি. এ.র ধনুর্ভঙ্গ পণ, যেন শুধু রূপ দেখে না বিয়ে দেওয়া হয়, লেখাপড়া জানা চাই। বিবাহের সময় শিক্ষিত বর অশিক্ষিত ক'নে, অর্থাৎ কিছুই পড়িতে লিখিতে পারে না, শুনিলে অতিশয় দুঃখিত হন। তিনি বাসর-ঘরে শালী শালাজদের ক'নেকে লেখাপড়া শিখাইতে অনুরোধ করেন। ফুলশয্যা বাদে বর্ণপরিচয় প্রথম দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয়,

চরিতাবলী ইত্যাদি অসংখ্য পুস্তক শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দেন এবং বার বার লেখেন, যেন লেখাপড়াটা শেখানো হয়। বালিকার বিবাহ হইয়াছে, আর স্কুলে যাইবার নিয়ম নাই, সুতরাং স্কুলের ভয় বা বন্ধন নাই—তাহার পুতুলখেলায় মন,—সেও পড়িবে না, মাতাও ছাড়িবেন না—ভয়, পাছে জামাই রাগ করে। তিনি কর্ত্তাকে পেড়াপীড়ি করেন—"ও গো, মেয়েটাকে একটু পড়াও না।" ছেলেকে বলেন, "ও রে, সুশীকে সকাল বিকেল তোর কাছে বইখানা নিয়ে বসাতে পারিস্ নে?" দুপুরবেলা পাড়ার বিদ্যাবতী মহিলাদের সাধ্যসাধনা করিয়া বালিকাকে লেখাপড়া শিখাইতে অনুরোধ করেন। এ দিকে "ক খ" আরম্ভ না হইতে হইতে বরের নিকট হইতে মস্ত মস্ত প্রেমলিপি আসিতে আরম্ভ হইল। বিষম বিভ্রাট, কন্যার মাতা প্রমাদ গণিলেন, বাপ মেয়েকে লেখাপড়া শেখান নাই বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পাড়ার মেয়েরা উক্ত পত্রের উত্তর দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন,—কেহ ভাল কবিতা খোঁজেন, কেহ গান পছন্দ করেন,—তাহাদের দিনগুলা বেশ আমোদে কাটিল,—দেখিয়া শুনিয়া ঠাট্টার হাসিতে মেয়েটা লজ্জায় সারা হইল। তাই বলি, একটু লেখাপড়া না জানা থাকিলে বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত দায়। তবে যদি লেখাপড়াই শিখিল, তাহা হইলে এ-কালের মেয়ের ভাব ও রুচির পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য।

এ বিষয়ে আর অধিক কত বলিব, এইখানেই ইতি করা যাক। শেষ কথা এই যে, এ-কালের মেয়ে এ-কালেরই উপযোগী। ('ভারতী ও বালক,' আশ্বিন-কার্ত্তিক, মাঘ ১২৯৮)

আদরের, না অনাদরের ?

মঙ্গল আরতির মঙ্গল ধ্বনিতে জাগিয়া উঠিয়া আপনাকে শরতের মধুর জ্যোৎস্নায় মগ্ন দেখিলাম। পার্শ্বে শায়িতা সুকুমারী বালা আমারই, —আমারই সে—নির্ভয়ে নিস্পন্দে ঘুমাইতেছে। পাছে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তাই বড় সাধ হইলেও চুম্বন করিলাম না। মধুর জ্যোৎস্নায়, মৃদুমন্দ বাতাসে, ঈষৎ ঘুমঘোরে দেখিলাম, ধরণী নিজ সন্তান সন্ততি লইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রায় মগ্ন—বুকের কাছে নিঃশঙ্ক চিত্তে বাছারা ঘুমাইতেছে—সকলেই মাতৃস্নেহে, মাতৃআদরে আপ্লুত। হেথায় পক্ষপাতিতা নাই—সকলেই মাতার সমান যত্ন স্নেহের ধন। সুমধুর জ্যোৎস্নাটুকু মায়ের হাসিখানির মত প্রকৃতি জননীকে হাস্যময়ী করিয়া তুলিয়াছে—মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলাম—ঘুমন্ত প্রকৃতি কি সুন্দর! দেখিতে দেখিতে তখন বহু দিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—এমনই কত জ্যোৎস্নায় আপনাকে প্রিয়জনে বেষ্টিত দেখিলাম। স্মৃতিতে মধুর জ্যোৎস্না আরও মধুরতর মনে হইতেছিল, মনে পড়িল—"তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে, কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার।" সহসা তীব্র কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলাম—শুনিতে পাইলাম, আমার বাতায়নের সম্মুখবর্ত্তী পুষ্করিণীর ঘাটে একটা কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইয়াছে।

"কে ও ?—কেষ্টদাসী, আজ যে বড় রাত থাকতে থাকতে ঘাটে এসেছিস ?—কাল রাতে তোদের পাড়ায় শাঁখ বাজছিল, তোদের বৌয়ের কি এবার তবে বেটাছেলেটি হ'ল ?"

"না গো ছোট কাকী, সে কথা আর ব'লো না—আমাদের যেমন অদৃষ্ট, বৌয়ের আবার বেটাছেলে এ জন্মে হবে! যা হয়, একটা মেয়ে হয়েছে।"

"এবার তিনটে মেয়ে হ'ল বুঝি ?" "হ্যাঁ গো, কাকী, তিনটে হ'ল।" "তা হ'লে গণ্ডা ভর্ত্তি হবে—তবে যদি বেটাছেলে হয়।"

"হ্যাঁ গো খুড়ী, তারই ত মতন দেখছি। তা মেয়েটা হয়েছে শুনে দাদা বল্লে—কেষ্ট, আমি আর উঠতে পারি না, আমার গায়ে আর বল

শক্তি নেই। মায়ের কাছে ধাই বিদেয় চাইলে, মা আসলে বিছানা থেকে উঠলো না, কথা কইলে না। বৌ মেয়ে তুলবে না; কত বলা কওয়ায় কোলে নিলে, তা বলে যে, গলা টিপে দেব। আমি এখানে না থাকলে মেয়েটা বোধ করি মাটিতে প'ড়ে থেকে সদ্য মারা যেত। বাড়ীশুদ্ধ দুঃখেতে যেন কেমন হয়ে রয়েছে।"

"তা থাকবে বৈ কি, তিন তিনটে মেয়ে, কায়েতের ঘরে বিয়ে দিতে প্রাণ বেরুবে। অভাগীর মেয়ের যেমন অদৃষ্ট, দশ মাস গর্ভে ধ'রে কি না একটা মাটির ঢেলা হ'ল।" "আহা খুড়ী, পাছে এবার আবার মেয়ে হয় ব'লে বৌ ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেছে। আর পোড়া মেয়েগুলোরও সকলই বিশ্রী কি না, এবার বৌয়ের এমন অরুচি হয়েছিল যে, পেটে জল যেত না। মেয়েটা এই সবে চার বছরের; খুকী হয়েছে শুনে বলছে, ও ত খোকা নয়, তবে ওকে বিলিয়ে দাও।" "কচি ছেলে, ওরা যেমন শোনে তাই বুঝে; একটা একটা কথা পাকা মতন ব'লে ফেলে, তা আটকৌড়ে হবে ত?

"তা এখন কি জানি, হয়ত অমনি নিয়ম রক্ষা, আটটি ছেলে ডেকে কুলো বাজিয়ে দেবে। মা এবার কত সাধ করেছিল খোকাটি হবে, আটকৌড়েতে ভাল ক'রে হাঁড়ি করবে, তবে ষষ্ঠী পূজোতে তেল সন্দেশ বিলোবে, তা কিছুই হ'ল না, সকলই মিথ্যা হ'ল।"

"তা মেজদিদি নরেশের বিয়ে দিক না। এর হ'ল না হ'ল না ক'রে এত দিন পরে শেষে মেয়ে হ'তেই চললো। নরেশ একটি ছেলে, কেবল মেয়ে হ'লে নাম রাখবে কে?" "তা খুড়ী, দাদা কি করবে। এ-কালের ছেলে, ওরা ঝগড়া-ঝাঁটির ভয় পায়। বৌয়ের ছেলে হ'ল না হ'ল না ক'রে মা যখন হেদিয়ে দাদার বিয়ে দিতে চেয়েছিল, তখনই দাদা বিয়ে করতে চায় নি, তা এখন ত মেয়ে হচ্ছে—ছেলে হবার আশা হয়েছে। তবে মায়ের কি না একটি ছেলে, মা তাড়া-তাড়ি সকলই চায়। বৌয়ের কিছু এমন বেশী বয়সে মেয়ে হয় নি, বছর আঠারতে বুঝি বড় মেয়েটা কোলে হয়েছে—তা মা একেবারে অস্থির হয়ে বৌকে কত অষুধ বিষুধ খাইয়েছিল, কত মাদুলি, কত ঠাকুরের দোর ধরা, কত কি করার পর ঐ মেয়ে হ'ল। তা তখন আশা হ'ল, মেয়ে হয়েছে, তা এইবার তবে নাতি হবে—ও মা, বার বার তিন

বার, আর কত সহ্য করবে ! তা, মা ত বলে যে, বৌয়ের এবার মেয়ে হ'লেই ছেলের আবার বিয়ে দেব। তা দাদা যে রাজী হয় না, নইলে মা কন্যে পর্য্যন্ত দেখে রেখেছে। আর মাও একটু চিরকাল অধৈর্য্য আছে। আমরা তাই বলি, অত ভেবে হাতড়ে পাতড়ে বেড়ালে কি হবে, মেয়ে হয়েছে, ছেলেও হবে, তা এবার আর আমাদের কিছু বলবার রইল না।"

এখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই ; উষার ঈষৎ মাত্র আভাস পাওয়া যাইতেছে। এখনও কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ পশ্চিমাকাশে জ্বল-জ্বল করিতেছে। মৃদু মৃদু প্রভাত-সমীরণ কত দূর হইতে কেয়াফুলের সুমিষ্ট গন্ধ বহিয়া লইয়া আসিতেছে। জনকোলাহল এখনও উত্থিত হয় নাই। এমন সময় আমাদের পরিচিত গৃহিণীর কলকণ্ঠস্বরে পাড়ার সকল লোক জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আমিও উঠিয়া জানলায় গিয়া বসিলাম। এক দিকে বাখারির বেড়া এবং তিন দিকে ইমারৎবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র বাগান নামধারী স্থানের মধ্যে একটি ছোট রকম পুষ্করিণী। এখন বর্ষাতে কূলে কূলে জল হইয়াছে। কিন্তু চারি পাশের জল হিংচা, কলমি, সুশুনি শাকে সবুজ—কেবল মাঝখানে খানিকটা জল কতকটা পরিষ্কার আছে। পুকুরটির পাড়ে এক ধারে আম, জাম, জামরুল প্রভৃতি দু-চারিটি ফলবান্ বৃক্ষ—বৃক্ষের তলা কেহ কখনও পরিষ্কার করে না। এক ধারে পাঁচ ছয়টি কলাগাছ—প্রায়ই তাহাদের একটি-না-একটি গাছকে ফলভারে পুকুরের উপর অবনত দেখা যায়। এক ধারে দু-একটি আধ-মরা গাঁদাফুলের গাছ—দু-একটি জীর্ণ গোলাপগাছ—কখন তাহাতে ফুল হইতে দেখা যায় না। কদাচিৎ দু-একটি কুঁড়ি দেখা যায়, কিন্তু তাহা অর্দ্ধস্ফুট না হইতে হইতে শুকাইয়া যায়। একটি অপরাজিতা লতা, হতাদরে বেড়ার গায়ে লতাইয়া উঠিয়া বেড়ার কঙ্কালের কতক অংশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—মাঝে মাঝে দু-চারিটি ফুলও লতার বুকে শোভা পায়—সে ফুলে দেবপূজাও হয়। রোপণকালে লতাটির কত না আদর ছিল, কিন্তু এখন আর কেহ তাহার দিকে চাহে না—তবুও সে এখনও ধীরে ধীরে নিজ কার্য্য করিতেছে।

"ও মা, কথা কইতে কইতে যে ভোর হয়ে এল—আজ আর জাহ্নবী নাইতে যাওয়া হ'ল না। তা থাক্—একটু জাহ্নবীর জল পরশ করব

এখন—একেবারে তবে পুকুর থেকে চান্ ক'রেই যাই। ওগো, ও নাতবৌ, এইখানে আমায় একটু তেল দিয়ে যা।" আজ ঘাটের শুভ দিন—ভারি মজলিস—গৃহিণী নহিলে ঘাট ভাল মানায় না।

"তাই ত বলি কেষ্টদাসি, এ-কালের ছেলেপিলে কি মা-বাপকে মানে? আমার শ্বশুর বড় গিন্নীর (ইহার সপত্নীর) ছেলে হ'ল না ব'লে অমনই আমার সঙ্গে কর্ত্তার বিয়ে দিলেন—তা বাছা, পরমেশ্বর মুখ রক্ষা করলেন তেমনই, বছর দুই বিয়ে না হ'তে হ'তে প্রথমেই আমার রাধানাথ হ'ল—তা আঃ, কোথা গেল আমার সে ছেলে—আমি পোড়া-কপালী ব'সে আছি—ভাগ্যিস্ তার দুটো গুঁড়ো আছে, তাই নিয়ে সংসারে আছি—নইলে পাগল হয়ে কোন্ দেশে চ'লে যেতুম। তার পর জানিস্ বাছা, তার বছরখানেক বাদে বড় গিন্নীর হরলাল হ'ল। আমার যখন বিয়ে হ'ল, তখন ত বড় গিন্নীর ছেলে হবার বয়েস যায় নি—তবে ওর বাপ শুনেছি খুব ছোট বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন—আর কর্ত্তার চেয়ে বড় গিন্নী বছর দুয়ের বয়সে ছোট ছিল—বিয়ের সময় মাথায় প্রায় এক দেখে সুতো জোঁকা দিয়ে তবে বিয়ে হয়। আমার একটু ডাগর হয়ে বিয়ে হয়েছিল, কর্ত্তার ত আমি দোজপক্ষের মত নই—আমিই সময়কালে বিয়ের পরিবারের মত হলুম। তা সেকালের কর্ত্তারা অত হিসেব-কিতেব বুঝতেন না, বললেন বিয়ে কর—এঁরাও অমন এ-কালের ছেলেদের মত মা বাপের কথা ঠেলতে পারতেন না। আমার শ্বশুর বলতেন, যে-আবাগের বেটী কোঁদল করবে, সে বাপের বাড়ী গিয়ে থাকুক—আমার বাড়ী তার ঠাঁই হবে না। তাঁদের দবন্ ছিল কত—কর্ত্তা বাড়ীর ভেতর এলে আমরা কচিকাচা বৌ-ঝি ত ভয়ে কাঁটা হতুম—ঠাকরুণ শুদ্ধ ভয়ে সারা হতেন। একেলে মেয়েরা যেমন দিবা রাত্রি স্বামীর সঙ্গে মুখোমুখি ক'রে থাকে—জানিস কেষ্ট, আমাদের তা হবার জো ছিল না। রাত্রে সকল নিষুতি হ'লে তবে ঘরে কেউ দিয়ে আসত, তবে যেতুম। এক এক দিন বারান্দায়, কি দালানে ঘুমিয়ে পড়তুম—আর কেউ ঘরে যেতে বলতে যদি ভুলে যেত, তবে সেইখানেই রাত কাটত। রাধানাথ ছ-মাসের হ'লে তবে শাশুড়ী একদিন রাধানাথের বিছানা ঘরে দিলেন, সেই দিন থেকে যার যে দিন পালা পড়ত, সে সেই দিন ঘরে শুতে যেতুম। আমাদের ছেলে হ'লে ছ-মাস কর্ত্তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করবার হুকুম থাকত না—

তবে এদানী কিছু দরকার হ'লে কত্তা লুকিয়ে চুরিয়ে ভাঁড়ার-ঘরে, কি রান্নাঘরে এসে ব'লে যেতেন। তা বাছা, আমরা দিনের বেলা কথা কইতুম না—শাশুড়ী টের পেলে গঞ্জনা সহিতে হবে, এমন কথা নাই বা কইলুম। তা এ-কালে সব রকমই আলাদা দেখে শুনে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।”

মুখে অনর্গল বক্তৃতা চলিতেছে, হস্ত তৈলসমেত সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইতেছে। ক্রমে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে অনেকগুলি রমণীমুখকমল ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সকলেরই মন গৃহিণীর বক্তৃতার দিকে, সকলেই নিজ নিজ স্নান ভুলিয়া গিয়াছেন—কাহারও দাঁত মাজা আর শেষ হয় না, কেহ গামছা দিয়া গাত্র মর্দ্দন করিয়াও তৃপ্ত হইতেছেন না। মূল কথা, মিত্রদের মেয়েটা হইয়াছে শুনিয়া সকলেই—তাই ত, আহা, মেয়েটা হ'ল, বেটাছেলেটি হ'লেই সার্থক হ'ত, বলিয়া আহা উহু করিতেছেন। একজন আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “তা হোক, কত লোকের সাত মেয়ের পর ছেলে হয়—আমার পিসতুত বোনের সে দিন চার মেয়ের পর খোকাটি হয়েছে—খোকাটি এই ষেটের এক বছরের হ'ল।”

এই রমণীমণ্ডলীর মধ্যে দু-একটি ঘোমটাবৃত যুবতী বধূ ও কন্যা স্নান করিতেছিল—একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যা আর থাকিতে পারিল না। মাতৃ-সম্বোধনে কৃষ্ণদাসীকে কহিল—“তা মা, মামীর মেয়ে হয়েছে ব'লে তোমাদের দুঃখু রাখবার যেন ঠাঁই নেই, তাই ঘাটে এসেও সেই কাহিনী হচ্ছে—তা তুমি যা বল, আমার কিন্তু বাপু ঘোষেদের কালো কালো ছেলের চেয়ে মামীর মেয়েদের বেশ ভাল লাগে—অমন একটা কালো ছেলের চেয়ে সাতটা সুন্দর মেয়ে ভাল। তোমাদের এক কথা, মেয়ে বুঝি কোন কাজে লাগে না ? তুমি এই যে আষাঢ় মাসে এখানে এসেছ, দু-তিন মাস যে ক'রে দিদিমার সেবা করছ, মামা তেমন করেন ? দিদিমাই ত দুঃখ করেন, আমার মেয়ে অসময়ে যত করে, ছেলে আমার তেমন করে না। তার বেলা বুঝি মেয়ের দরকার ?—এদিকে মেয়ে হয়েছে শুনলেই সর্ব্বনাশ বাধে। এই যে ও-বাড়ীর ছোট ঠাকুরমা—কাকা ত এক পয়সা আনতে পারেন না—যাই ক্ষেমা পিসি ছিলেন, তিনি খরচপত্র দিচ্ছেন, তবে কাকার শুদ্ধ চলছে। কিন্তু শুনেছি, ক্ষেমা পিসির আগে আর দু বোন হয়, তাই ওঁর নাম ক্ষেমা রেখেছিল।” এমন বিদ্রোহসূচক

কথা শুনিয়া ঘাটশুদ্ধ সকলে অবাক্ হইয়া গেল। কাক আর ডাকে না, গাছের পাতা আর নড়ে না। গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন, "ওলো পের্‌ভা, থাম্ থাম্—যখন তোর হবে, তখন বুঝবি—এখন ছেলেমানুষ কি বুঝবি—ছেলেমানুষের মুখে অত পাকা পাকা কথা ভাল শোনায় না।"

"তা ছোট ঠাকুরমা, সত্যি কথা বলছি—কেন এই ও-বাড়ীর ছোট মামীও বলছেন যে, ওঁর যদি মেয়ে হয়, তাতে কিছু দুঃখু হবে না। মামীও ত মেয়েদের কত ভালবাসেন, কেবল দিদিমার লাঞ্ছনার ভয়েই ত পাছে মেয়ে হয় ব'লে অত ভয় পান। মেয়ে হয়েছে, এখন ছেলে হবার সাধ হয়, দিদিমার ভয়ে মেয়েদের ভাল ক'রে আদর পর্য্যন্ত করতে পারেন না। মামাবাবু ভয়ে পূজোর ভাল কাপড় অবধি করতে দিতে সাহস পেলেন না—নইলে মেয়েকে দিতে তাঁর ইচ্ছা হয়—কে জানে বাপু, তোমরা কি বোঝ—তোমরা কি মেয়ে নও—?" "হ্যাঁ গো জ্যাঠাইমা ঠাকরুণ, আমরা মেয়ে বটে, তা আমার কত আদর ছিল জানিস? আমি মায়ের প্রথম সন্তান—দিদিমার আদুরে, ঠাকুরমার আদুরে—ঠাকুরমা বলতেন, ও কি আমার মেয়ে, ও আমার সাত বেটা, তা ব'লে বাপু গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে হওয়া গৃহস্থের অলক্ষণ।"

ক্রমে প্রভার সমবয়স্কা আরও দু-চারিটি কন্যা ঘাটে আসিয়া জুটিল। হরিদাসী কহিল—"কি ঠান্‌দিদি, আজ যে ঘাট জাঁকিয়ে তুলেছ, ব্যাপারখানা কি?"

"কি লো হরিদাসি, এসেছিস? তাই ত বলি, তুই নইলে কি ঘাট মানায়? আমরা বুড়ো মানুষ, আমরা আর ঘাট জাঁকাব কি, দুটো দুঃখের সুখের কথা কইছি বই ত নয়। তোদেরই এখন জাঁকের বয়েস—তাই বলছিলুম, বলি হরিদাসী যে এখনও এল না—কাল রাতে বুঝি নাতজামাই এসেছিল?"

"সে আমি কি জানি ঠান্‌দিদি, সে তোমরা জান। আমরা ঘাটে আসতে আসতে পথের ধারে হরকালী কাকার বাড়ী গেছলুম—তাদের খোকা হয়েছে দেখে এলুম; তাই আসতে একটু দেরি হ'ল।"

"বটে! ওদের কেমন অদৃষ্ট দেখেছিস—এখন সময় ভাল, সব দিকে ভাল হয়—বৌয়েদের কেবলই বেটাছেলে হচ্ছে। আর ঘটাও তেমনি করে—এই আটকৌড়েতে হাঁড়ি করা রে—ষষ্ঠী পূজোয় তেল সন্দেশ

দেওয়া রে—ভাতে বোগ্‌নো করা রে—খাওয়ানো রে, দাওয়ানো রে, সব করে। কেষ্টর মার যেমন অদৃষ্ট—এ কটা বৌ—কেবল গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে হচ্ছে।”

হরিদাসী। তা হ’লই বা—মেয়ে বুঝি ফেল্‌না?

“ও বাবা! তোদের এ-কালের যে সবই সমান দেখি—পেরভাও ঐ কথা নিয়ে কত মুখনাড়া দিলে—মেয়েছেলে আবার কোন্ কাজের গা?”

“কোন্ কাজের নয় গা? বাপ মা, স্বামী পুত্র, কারও অসুখ হোক, কারও অনটন হোক, মেয়েতে যত করে, এত কোন্ ছেলেতে করে গা? মাকে মেয়ে যত যত্ন করে, মায়ের দুঃখ যত মেয়েতে বোঝে, এত কি ছেলেতে বোঝে? ওগো, স্ত্রীলোক হচ্ছে লক্ষ্মী—হাজার টাকাকড়ি থাক্, দেখ, যে বাড়ীতে গৃহিণী নেই, সে ঘরকন্না কেমন বেশৃঙ্খল, যে ছেলেদের মা নাই, সে ছেলেপিলের কত অযত্ন। মেয়ে হয়েছে শুনেই তোমরা লাপিয়ে ওঠ, কি না বিয়ে দিতে হবে! তা বাপু, ছেলের জন্য কি কিছু খরচ নেই? সেনেদের বাড়ী দেখতে পাই, ছেলেদের খাওয়া হ’লে তবে সেই পাতে মেয়েদের অমনি যা-তা দিয়ে খেতে দেয়। ছেলেদের জুতো জামা, সাফ কাপড়, মেয়েদের ময়লা পাঁচী ধুতি। ছেলেদের দু পয়সা ক’রে এক এক জনের খাবার বরাদ্দ, মেয়েদের এক পয়সার আটার রুটি ক’রে তিন চারটিকে দেয়। ছেলেরা ভাল গদিতে খাটে শোয়—মেয়েগুলি মেঝেতে মাদুরে একটা ছেঁড়া লেপ পেতে শোয়। বড় বড় ছেলেরাও মা-বাপের সঙ্গে শুতে পায়, ছোট বোন দুটি রাঁধুনীর কাছে শোয়। আহা, তাদের যদি একটু যত্ন আছে! সে দিন ও-বাড়ীর মেজ কাকীর মেয়ে মামার বাড়ী থেকে বাড়ী এসেছে, ঠাকুরমার কাছে সকালে ভাত চেয়েছে, তখনও কেউ খায় নি ব’লে ঠাকুরমা স্বচ্ছন্দে তাকে বললে কি না, মেয়েমানুষ আগদোফের ভাত খাবি কি! এখনও কেউ খায় নি, আগে ভাগে ভাত দাও! আগে বাপ খুড়ো খাগ, তবে সেই পাতে খাস। আহা, সে ছ-সাত বৎসরের মেয়ে, অত কি জানে, ভাতের জন্য কাঁদতে লাগল, শাশুড়ীর ব্যাভার দেখে মেজ কাকীমা রাগ ক’রে তখনই তাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে। আমাদের কাছে কত দুঃখু করতে লাগল যে, বাছা একদিন বাড়ী এল, দুটো ভাতের জন্যে কেঁদে চ’লে গেল, এ কি মায়ের প্রাণে সয়! তা কে জানে, মেয়ে আদরের না অনাদরের!”

"বাবা, এ-কালের মেয়েগুলোর মুখের তোড় দেখ, যেন ঝড় ব'য়ে গেল, যা যা, আর জলে প'ড়ে থাকিস নে, অসুখ হবে।"

যাহা হউক, অল্পবয়স্কারা আর অধিক উত্তর প্রত্যুত্তর করিল না। তাহারা স্নান সমাপনান্তে গৃহে চলিয়া গেল। সকলেই আসিতেছে, অল্পবিস্তর শুনিয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু পুষ্করিণী-অধিকারিণীর সেই তৈলমর্দ্দনই চলিতেছে। এমন সময় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া হরকালীর মায়ের প্রবেশ—কি ব্যাপার!—ইনি ভারি ব্যস্ত—ইঁহারই গৃহে কাল শাঁখ বাজিয়াছে—বধূর পুত্রসন্তান হইয়াছে।

"এ কি—ঠাকুরঝি যে, আজ গঙ্গা নাইতে যাস্ নি? আমি বলি, আজ কেবল আমারই যাওয়া হয় নি—তা বোন, কি করি, মেজ বৌমার কাল রাত্রে বেটা ছেলেটি হ'ল—তা ফেলে যাই কি ক'রে? জানিস ত, এ-কালের মেয়েগুলো সব বিবি হয়েছে—তাপ সেঁক নেবে না, ঝাল খাবে না। আমি তেমন মেয়ে নই—ঐ জন্যে বৌয়েদের কখন প্রসবকালে বাপের বাড়ী পাঠাই না। সেজ বৌয়ের বাপ আবার ডাক্তার, তিনি তাপ নিতে দেবেন না, ঝাল খেতে দেবেন না—মেয়েকে গদি পেতে শোয়াতে চান। জান ঠাকুরঝি, আমাদের যেমন নিয়ম আছে, ডাক্তার বলেন, ও-সব ফেলে দাও—আমি তেমন মেয়ে নই—এই ব'সে থেকে বৌকে ভাজা ভাজা ক'রে তাপ দিয়ে এলুম, এইবার নেয়ে গিয়ে ঝাল খেতে দেব। ডাক্তার আছেন, তিনি আছেন—তাঁর মেয়ে ঘরে এনে কি আমি নিয়মভঙ্গ করব। সে-বার আঁতুড়ে সেজ বৌয়ের মেয়েটা গেল, ডাক্তার দেখতে এসে বললেন, এই সব স্যাঁতানে জায়গায় প'ড়ে ব্যায়রাম হয়েছে—ব'লে আঁতুড় নাড়তে চান—আমি তা কিছুতে করতে দিই নি।"

"সে মেয়েটার কই কি ব্যায়রাম হয়েছিল, আমি ত শুনি নি—তার উপর না সেই বাবার দৃষ্টি পড়েছিল?"

"তাই ত বলছি ভাই—ওঁরা বড় বোঝেন, শিশি শিশি ওষুধ এল, গেলাতে চান—গিলবে কে?—বাবা মুখ চেপে ধ'রে আছেন—সে জ্ঞান নেই। ও রোগের যা, রোজা এনে সব করলুম, তা কিছু হ'ল না। হবে কি—রোজা বললে যে, পোয়াতি চাঁপাফুলের গাছের নীচে গেছল—তাই দৃষ্টি পড়েছে। সাহেবের মেয়ে, বেটী হয়ত কোন গাছতলায় মাছতলায় গেছল, ও-সব ত মানা হয় না। এবার আমি আর বাপের বাড়ীমুখো

হ'তে দিই নি। সে-বার যেন মেয়েটা গেল গেল, কিছু ক্ষতি হ'ল না—এবার বেটাছেলেটি হয়েছে, একটু ভাল ক'রে তাপ সেঁক না দিলে কি হয় ? পোয়াতি ভাল থাকলে, তবে ছেলের পিত্তেশ—কি বলিস ভাই ?"

"তা বই কি, বংশ রক্ষার জন্য বৌয়ের আদর, নইলে পরের মেয়ে ঘরে এনে জঞ্জাল বই ত নয়। তা হোক, বেটাছেলেটি হয়েছে—আটকৌড়েতে হাঁড়ি করিস। তোদের সূতিকাপুজো আছে ত ?"

"হ্যাঁ, সূতিকাপুজো হবে বই কি—তা লক্ষ বামনের পায়ের ধুলো কোথায় পাব,—বারোটি বামনের পায়ের ধুলো দেব—আর পুজা-আশ্রয় সব হবে। আটকৌড়ে যেমন আর সব বৌয়ের ছেলেদের বেলা করেছি, এরও তেমনি হবে—এক হাঁড়ি জলপান, একটি ক'রে সিকি, চারটে ক'রে মেঠাই, এই সব ঘরে ঘরে দেব—আর বাড়ীতে ছেলেরা যারা আসবে, তাদের বেটাছেলেদের দু আনা, মেয়েদের চার পয়সা ক'রে দেব। আর বেঁচেবত্তে থাকে ত ভাতটিও দিতে হবে। যেমন বেটাছেলেটি হয়েছে আহ্লাদের, তেমনি খরচপত্রও হবে। এই ধাইকে নগদ এক টাকা, একটা ঘড়া কালই দিতে হ'ল—আবার আসবে বিদেয় নিতে। মেয়ে হ'লে, সেই যা নাড়ীকাটা একটা টাকা ধরা আছে—আর কি !"

"তা পরমেশ্বর দিন দিয়েছেন, আমোদ-আহ্লাদ খরচপত্র করবি বই কি ! আমার দু মেয়ে এখানে আছে, আমার ঘরে তিনটে হাঁড়ি দিস, আর আমার সতীন-পো বৌও ভিন্ন হয়েছে।"

"হ্যাঁ ভাই, তা বললে ভাল। এই বাড়ী গিয়ে হাঁড়ির ফর্দ্দ করতে হবে। আবার বাজনা আসবে, তবে নাচ আসবে, তার বিদায় খরচ ঢের"—

"শুনেছিস, মিত্তিরদের বৌয়ের আবার মেয়ে হয়েছে !"

"ও মা, বলিস কি, আবার মেয়ে—কে বললে ?"

"এই কেষ্ট রাত থাকতে এসেছিল, আঁতুড় ছুঁয়েছিল কি না, সেই কত দুঃখ খেদ করতে লাগল—তারই সঙ্গে কথায় কথায় ত জাহ্নবী নাইতে যাওয়া হ'ল না—আমি ভোরে কাপড় কাচতে এসেছি, আর কেষ্ট এল।"

"হ্যাঁ ঠাকুরঝি, গঙ্গা তোমার কার নাম গা ?"

"আমার ছোট খুড়-শাশুড়ীর নাম 'গঙ্গামণি,' তাই আমরা জাহ্নবী বলি—ঠাকুরদের নাম আমাদের প্রায় করবার জো নেই। আমাদের

বৃহৎ পরিবার, সকল নাম বেছে চলতে হয় ত—আমরা ত একেলে নই যে, শুদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর নামটি হদ্দ মেরে কেটে বাছব।"

"তাই ত ঠাকুরঝি, মিত্তিরদের বৌটো কি গা—এবার গোটা চার পাঁচ মেয়ে হ'ল বুঝি—আমার বড় বৌমার ষেটের কোলে এই দুটি; দুটি নষ্ট হয়েছে; তাই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে মেজ বৌমারও দুটি বেটা, একটা মেয়ে, তা মেয়েটা মামার বাড়ী থাকে, দিদ্দিমার আদুরে, মেজ বৌমা বাপের একটি মেয়ে কি না। তা ঐ প্রথম মেয়ে দিদিমাই মানুষ করেছে, সে মেয়ের ভার আর আমাদের নিতে হবে না—দিদিমা তাকে হাতের তেলোয় ক'রে নাচিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, বেটাছেলে ক'রে কাপড় পরানো হয়, হেমন্তকুমারী নাম, তা হেমবাবু ব'লে ডাকা হয়। সে মেয়ের আদিখ্যেতা কত। আর সেজ বৌয়ের দুটো মেয়ের একটা সেই আঁতুড়ে গেছে, আর এই খোকাটি হয়েছে।"

"তা বেঁচে থাক্, আমরা সব পাঁচ কর্ম্মে যাব, খাব, নেব। আমাদের ঘরের কথা। মেয়েগুলো কেবল মিথ্যা বই ত নয়। সূতিকাপূজো নেই, আটকড়াই কর আর না কর, ভাত—তা বড় সাধ হয় ত পাঁচ জনকে এনে খাওয়াও। একটু কেবল পেসাদ মুখে দেওয়া, তার ক্রিয়া নেই, কর্ম্ম নেই, পিতৃপুরুষ এক গণ্ডূষ জল পায় না। ঐ যা বিয়ের সময় একবার পিতৃপুরুষ জল পান বই ত নয়।"

"যাই, এই বেলা বাড়ী যাই; সেজ বৌয়ের বাপ হয়ত এসে এতক্ষণ কত হাঙ্গামা করছে। ছেলেরা ছেলেমানুষ, তারা ত কথা কইতে বড় প্যারে না—আমি এমন জবরদস্তি না হ'লে রক্ষা ছিল! আর ছেলেগুলোরও ঐ মত—সব একেলে কি না। তা আমার উপর বড় কথা কয় না, বেশী বললেই আমি বলি যে, এখন বড় হয়েছিস, আমায় মানবি কেন? আমি তোদের চারটি নিয়ে বিধবা হয়ে কত কষ্ট ক'রে তোদের এত বড় করলুম, এখন আমি পর হলুম, শ্বশুরই আপনার হ'ল। তা ওরা আর বড় কথা কইতে পারে না। এই ছোট ছেলে—ঐ একটু মুখফোঁড়—আর কোলের কি না, আদুরে—ওকে কিছু বলতে পারি নে, ও আঁতুড় মাতুড় ছুঁয়ে নেপে সৃষ্টি করে। এই আঁতুড় উঠবে আর বৌগুলোকে দিয়ে নেপ বালিশ পর্য্যন্ত সব কাচিয়ে নেব।"

"ও কথা আর বলিস্ নে—জাত জন্ম আর রইল না। এ-কালের ছেলে, ওরা সব এক রকম। আমার ছোট জামাই অমনি, সে-বার বিধু প্রসব হ'তে এখানে এসেছিল, জামাই রোজ দেখতে আসত, সেই বিছানায় ব'সে গল্পসল্প ক'রে চলে যেত। প্রথম যে দিন এল—আমি তখন নাইতে গেছি—মালা হাতে ক'রে দাঁড়িয়েছি, আর আঁতুড় থেকে বেরিয়ে আমার খপ্ ক'রে পায়ের ধুলো নিলে। কি করব, বললুম—বাবা, আঁতুড় ছুঁয়ে কি আমায় ছুঁতে আছে? আবার হাতে মালা। তা অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'আমার অত মনে ছিল না।' আমি আর কি করব—মালা গেল, আবার পুকুরে নেয়ে মরি। তা জামাইয়ের যে মত, মেয়েকে সেই মতেই রাখতে হয়—আমি লুকিয়ে ছুটো ছুটো গুঁড়ো ঝাল দিই—মেয়েগুলোও তেমনি, হাত পেতে নিলে, কতক খেলে, কতক বা না খেলে—বলে, 'ঝাল খেলে মা কেবল জলতেষ্ণা বাড়ে বই ত নয়, তোমরা ত জল দেবে না—শুদ্ধ সাবু খেয়ে থাকলে তেষ্ণাও হয় না, জলও চাই না।' কে জানে ভাই, ওদের কেমন কথা। আঁতুড়ে তেষ্টা পায় না—আমাদের এমনি তেষ্টা ছিল যে, অতি ময়লা জলও এক কোষ চুরি ক'রে খেয়েছি। আমাদের কালে ঝাল দিয়ে শুদ্ধ মুখ ধুতে জল দিত। তাতে কি প্রাণ বাঁচে!"

"তা বই কি, আমার এই চারটি গুঁড়ো হয়েছে, ফি বারই আঁতুড়ে মাগীকে পয়সা দিয়ে পায়ে হাতে ধ'রে জল চুরি ক'রে খেয়েছি। এদিকে ভাজা ভাজা তাপ, ওদিকে সরা সরা ঝাল—যেমন তেষ্ণা, তেমনি গা'র জ্বালা—ওতেই ত শরীর ঝনঝনে হয়। ঐ গো, বাজনা এসেছে, তবে আজ আসি।" বলিয়া গামছা নিংড়াইতে নিংড়াইতে ভিজা কাপড়ের অঞ্চল স্কন্ধে ফেলিয়া প্রস্থান।

গৃহিণী। দেখেছিস্ গয়লা-বৌ, হরকালীর মায়ের তেজ দেখেছিস্! অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না, আপনার চার ছেলে ব'লে কেবল জানানো হয়—আমার চারটি গুঁড়ো। যমের জ্বালা ভুগতে হয় নি, তাই অত জাঁক—ছেলে হ'লেই ত হয় না। বাঁচাই মূল। যমে না সর্ব্বনাশ করলে আমিও আজ রাজার মা।

গয়লা-বৌ। তা বই কি মা-ঠাকরুণ, যমের জ্বালা বড় জ্বালা। আমার ছু ছেলে ছু মেয়ে যমকে দিয়েছি, এখন ছুটি মেয়ে একটি ছেলে নিয়ে প্রাণ ধ'রে আছি—বড়টি শ্বশুরবাড়ী গেছে; মা, কেঁদে কেঁদে মরছি। মা

আমরা দুঃখী মানুষ, তা বাছারা আমার এমন যে, আমার পয়সা নেই, কেমন বোঝে—পাছে চাইলে না দিতে পারি, তাই এত সোনার সামগ্রী পাড়ায় আছে, কখনও খেতে কিনতে চায় না।

গৃহিণী। তোর মেয়েটি না বেশ ভাগ্যিমন্তের ঘরে পড়েছে?

গয়লা-বৌ। হ্যাঁ মা, তোমার আশীর্ব্বাদে তারা বড় ভাগ্যিমন্ত, আর আমার নয়নতারাকে খুব যত্ন করে। কিন্তু তা ব'লে কি মায়ের মন বোঝে—আমি যে সকালে এক পয়সার মুড়ি তিন জনকে দিতে পারি না, তাতে যে আমার বুক ফেটে যায়।

গৃহিণী। তা কি করবি, কাঁদিস্ নে, চুপ কর্। মেয়েজন্ম পরের ঘরে যাবার জন্যেই হয়েছে। তাই ত বলি গয়লা-বৌ, মেয়েগুলো মিথ্যা। দু দিন বাদে পরের ঘর যাবে—তা ব'লে এ-কালের মেয়েদের কাছে তা বলবার জো নেই।

গয়লা-বৌ। তা মা, দু দিন বাদে শ্বশুরবাড়ী যাবে ব'লেই ত আমার প্রাণ কেমন করে। তাই জন্যেই ত মা, আমি মেয়ে দুটিকে না দেখে থাকতে পারি নে। বেটাছেলে মা, বেঁচে থাকলে ওরা আপনারা আনবে নেবে, বৌ হবে, আদর যত্ন চিরদিন পাবে—আমার প্রাণ ঠাণ্ডা থাকবে। মেয়েদের মা না করলে আর কে করবে? শাশুড়ী ননদ অত করবে না—দু দিন বাদে মেয়েরা আবার মা হবে—আপনার ছানাপোনা নিয়েই ব্যস্ত হবে। আজ যদি মা আমি না আদর করি ত কে আর তাদের আদর করবে?

গৃহিণী। তা বই কি! তোর ঢের গেছে কি না, তাই তোর বেশী মায়া—নইলে জগৎ জুড়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের আদর কম। ছেলেটি হয়েছে বলতে দশ হাত বুক হয়—শুনতে কেমন। ঘটাঘটি আমোদ আহ্লাদ হয়। সাত ছেলে হ'লেও অরুচি নেই। মেয়ে প্রথম হ'লে, লোকে বলে, তা হউক—এইবারে ছেলে হবে। প্রথম যা হয়েছে, বেঁচে থাক্—জেঁয়াচ বজায় থাকলে তবে ত মঙ্গল। তবে ত ছেলের পিত্তেশ।[১]

গয়লা-বৌ। হ্যাঁ মা, যাই—বেলা হ'ল।

ক্রমে ঘাট শূন্য হইয়া আসিল, স্বপ্নময় মোহমুগ্ধ নয়নে আসিয়াছিলাম, সত্যের তীব্রতা লইয়া ফিরিলাম। প্রকৃতি জননীর আর সেই মধুর স্নেহময় ভাব নাই—এখন চারি দিকে কর্ত্তব্যের ঘোর শাসন—কর্ত্তব্য লইয়া

সকলে ছুটাছুটি করিতেছে। নয়নে আর সেই মোহ নাই—সূর্য্যালোকে সকলই পরিষ্কার স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মনে জাগিতেছে আদরের, না অনাদরের! স্নেহেও পক্ষপাতিতা আছে—শুধু স্নেহে নহে—মাতৃস্নেহেও আছে—মাতাও কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে অধিক স্নেহ ও যত্ন করিয়া থাকেন। ভাবিতে ভাবিতে শয্যাসম্মুখে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, আমার সে ফুলটি এখনও ফুটিয়া উঠে নাই—আমার চুম্বনের সূর্য্যালোক এখনও সে ফুল স্পর্শ করে নাই, তাই এখনও সে ফোটে নাই—নিঃশঙ্ক সুষুপ্ত মুখে যেন লেখা রহিয়াছে পড়িলাম—

"অনুগ্রহ ক'রে এই ক'রো, অনুগ্রহ ক'রো না এ জনে।"

আমি তাহাকে চুম্বন করিলাম—হাসিয়া আঁখি মেলিয়া সে আমার মুখের পানে চাহিল। আমি বুকে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—মা আমার, তুমি আদরের, না অনাদরের ?—আমি আদরের! ('সাধনা,' মাঘ ১২৯৮)

আমাদের পুতুলের বিয়ে

আফিমের ঘোরে সারা রাতটা ঝিমাইয়া ভোরের দিকে একটু গাঢ় নিদ্রা হয়। বুড়ো বয়সে আফিম ধরিয়া শরীরের কিছু উপকার হোক আর না হোক, বহুকালের অভ্যাস প্রাতে শয্যা ত্যাগ আর এখন নাই। বেলা আটটার সময় প্রখর সূর্য্যের আলোকে এখন আমার ঘুম ভাঙ্গে। আজ সবে মাত্র নিদ্রাটা একটু গাঢ় হইয়াছে, এমন সময় সহসা আনন্দ-কোলাহলে ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম, ভৈরবী রাগিণীতে বাঁশীও বাজিতেছে, বহু কাল পরে আজ প্রভাত দেখিলাম, বাঁশী শুনিয়া বহু কালের একটি স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিল। সেই একদিন এমনই প্রভাতে, এমনই বাঁশীর স্বরে জাগিয়া উঠিয়া আমার পাশে যে একখানি ঘুমন্ত আধ-ঘোমটা দেওয়া কচি মুখ দেখিয়াছিলাম, সেই মুখখানি মনে পড়িল। সহসা নিদ্রাভঙ্গজনিত আলস্যময় ভাবে তখনই বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিলাম না। পূর্ব্ব আকাশের দিকে চাহিয়া কোলাহল শুনিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, আমাদেরই বাটী হইতে আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিতেছে। আমারই নাতি নাতনীর হাস্যধ্বনিতে, আমার মত পাড়ার লোকও জাগিতেছে। কিন্তু কিসের এত হাসি? কই, আমাদের বাড়ীতে ত আজকালের মধ্যে বিবাহ-উৎসব অথবা কোন মঙ্গল কার্য্য উপস্থিত নাই। আমার পুত্র-কন্যাগুলির ত সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দুই বৎসর হইল সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহ দিয়া, আমি ইহকালের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সেই অজানিত প্রবাসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। যদিও আমি নির্লিপ্ত থাকিতে চাহি বটে, কিন্তু আমার সন্তানেরা তবু আমাকে না জানাইয়া ত কোন কাজ করে না। আমার জ্যেষ্ঠা পৌত্রীটি সবে আট বৎসরের, তাহার বিবাহের এখনও বিলম্ব আছে। তাহার বিবাহের ভাবনা আর আমার ভাবিতে হইবে না—তত দিনে আমার ডাক পড়িবে—অথবা কি জানি? সকলই সেই মহামায়ার ইচ্ছা!—তবে আমার আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই। এখানে আমার থাকার কোন আবশ্যকও নাই। যাহাদের

সংসারে আনিয়াছিলাম, তাঁহাদের প্রতি যথাযোগ্য কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিয়াছি—তবে হে মা প্রকৃতি, আর এ অক্ষম জীবনে তোমার আবশ্যক কি ?

কত বৎসর পরে আজ অরুণোদয় দেখিলাম—সেই পুরাতন আজন্মপরিচিত লাল গোলাকার সূর্য্য সহসা দেখিতে পাইলাম। সেই বাঁশী বাজিতেছে, সেই বালক বালিকার পরিচিত হাস্যধ্বনি—এ সকল ছাড়িয়া কি অনিশ্চিত, অপরিচিত, অজানিত স্থানে যাইতে যথার্থই আমি ব্যগ্র হইয়াছি—না নিশ্চয় যাইতে হইবে এবং দিনও সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে জানিয়া মনকে প্রস্তুত করিতেছি ?

"আরও কত ঘুমোবে—দাদামশায় ওঠ না—এমন ঘুমও ত কখনও দেখি নাই বাপু—এত গোলমালেও তোমার ঘুম ভাঙ্গলো না!" "দাদামশায়, শিগ্‌গির ওঠ, শিগ্‌গির ওঠ।" "আপনারা চেঁচামিচি করচিস্ কর্, বাবাকে কেন এত সকালে জ্বালাতন করতে যাচ্ছিস।" দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকারা আমার খাটের চারি পাশে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পরে আমার কন্যা পুত্রেরা, তৎপরে বারান্দায় পুত্রবধূরাও উপস্থিত দেখিলাম। সকলেই উৎসাহ-প্রফুল্ল মুখে আমাকে আনন্দের সংবাদ জানাইতে ব্যগ্র। আমি উঠিয়া বসিতেই সর্ব্বকনিষ্ঠ খোকা বলিল, "দাদামছায়, আদ্ আমাদেল্ পুতুলেল্ বিয়ে।" তাড়াতাড়ি মধ্যমা পৌত্রী বালা কহিল, "দাদামশায়, দাদামশায়, আজ দিদির মেয়ের বিয়ে।"

খোকা। দাদামছায়, ছত্তির বিয়ে নয়, দিদির পুতুলেল্ বিয়ে।

তখন অষ্টমবর্ষীয়া দিদি আমার গলা ধরিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "হ্যাঁ দাদামশায়, আজ বাড়ীতে কাজ, আর তুমি এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমচ্ছ ?"

আমি। ওরে বুড়ি, আমার অপরাধ হয়েছে, তা মানলুম। কিন্তু কিসের কাজ, তা ত আমি এখনও কিছু জানতেই পারি নি—ব্যাপারখানা কি রে ?

দেখিলাম, দরজার পাশ হইতে ঘোমটা-দেওয়া হাস্যমাখা মুখে, শঙ্খ হস্তে বধূমাতা অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন—মতলবখানা, আমার ঘুম ভাঙ্গিলেই তিনি একবার শাঁখটা বাজান। তখন ঝম্ ঝম্ করিয়া

সর্ব্বমঙ্গলা "বাবা, তোমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন' এসেছি গো" বলিয়া প্রণাম করিল। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ন্ত নিকটে আসিয়া হাস্যমুখে কোপ-কটাক্ষে নলিনীর দিকে চাহিয়া কহিল, "এত বললুম, বাবাকে এত সকালে জাগাস নে—তা কেউ শুনবে না—আগেভাগে বাবাকে জ্বালাতন করতে এসেছে। শোন না বাবা! নলির মেয়ের বিয়ের গল্পটা শোন না।"

আমি। শুনছি বই কি, সব শুনছি—তা কাল ত কিছু শুনি নাই, আজ হঠাৎ এত সকালে, এত জোগাড় হ'ল কখন রে নলি?

নলি। ও দাদামশায়, এসব পরামর্শ অনেক দিন থেকে হচ্ছে—কাল বাবাকে জেদ ক'রে ধরলুম যে, আজ আমার মেয়ের বিয়ে হবেই হবে, তাই আজ হ'ল। পিসিমা, কাকীমা কাল রাত্রে সবাই এসেছেন—আজ সকালে তোমাকে জব্দ করবো, তোমাকে একেবারে চমকে দেবো ব'লে কাল দাদা আর কাউকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি।

বালা। দাদামশায়, বাবা বললেন—এত করছিস, তবে একটা বাজনা আনা, সকালে বেশ মজা হবে—বাবা ভাববেন, আমাদের বাড়ী আবার কার বিয়ে। পিসিমারা জোর ক'রে তোমায় বলতে দিলে না—নইলে আমি কালই সব তোমায় ব'লে দিতুম।

বিনয়। দাদামশায়, কেমন বাসর সাজানো হয়েছে দেখবে চল—দেখলে তোমার আবার বিয়ে করতে সাধ হবে।

আমি। তা বেশ ত ভাই, একলা প'ড়ে থাকি, অমনি নলির মেয়ের বিয়ের খরচে আমারও একটি হয়ে যাক না। আর ক'নেরও ত ভাবনা নেই—এমন সুন্দর নলি আছে—তাই তবে হোক—কি বল গো মা জননি, জামাই করবে কি?

আমার বাক্যের উত্তরস্বরূপে বধূমাতা সজোরে তিন বার শঙ্খধ্বনি করিলেন। "তা চল্ সব বারান্দায় চল্—তামাক খেতে খেতে, তোদের মেয়ের কোথায় বিয়ে হ'ল, কি বৃত্তান্ত, সব শুনি।" তখন কাহাকেও কোলে লইয়া, কাহারও হাত ধরিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিলাম। জোরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল—বাজনদারেরা জয় হোক বলিয়া, মাথা নাড়িয়া মহা উৎসাহে ঢোল বাজাইতে লাগিল।

বিনয় বড় ব্যস্ত—সে তাহার ছোট কাকাকে বলিল—"চল কাকা, আমরা সভা সাজাই গে, এখানে মিছি মিছি থেকে কি হবে—আমাদের হাতে এখনও কত কাজ—আলো সব ঠিক করতে হবে—মালা টাঙ্গাতে হবে, চল আমরা যাই।" তাহারা চলিয়া গেল।

নলি বড় মুস্কিলে পড়িয়াছে—মেয়ের বিয়ের আনন্দ তাহার হৃদয়ে ধরিতেছে না—সে আনন্দের ভাগী দাদামশায়কে না করিলে তার আর সোয়াস্তি নাই—এ বৃদ্ধ কাহাকেও উচ্ছ্বসিত করিতে পারুক না পারুক, কাহারও মুখে হাসি ফুটাইতে পারুক না পারুক, এখনও ঐ নোলক-পরা কোঁকড়া চুলে ঘেরা ক্ষুদ্র মুখের ঈষৎ হাসিতে আপনি হাসিতে পারে। ঐ মুখখানি দেখিলেই জানিতে পারি যে, এখনও আমি বাঁচিয়া আছি—আমি যে একটা জড় পদার্থ নহি—আমাতেও যে এখনও মানুষের সুখ-দুঃখের রেশ আছে, তাহা কেবল ঐ দুটো বড় বড় চোখ দেখিলেই অনুভব করিতে পারি। এই বৃদ্ধের জড়ভাব পাছে বৎসদের আমোদ উচ্ছ্বাস, উৎসাহ ও চঞ্চলতায় ব্যাঘাত করে, তাই আমার একটু ভাবনা হইল, মুহূর্ত্তের মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলাম, আমিও হাসিয়া হাসিয়া গান ধরিলাম—

এত ফুল কে ফোটালে!
হাসি-তরঙ্গ, মরি, কে ওঠালে!

নলির গলা ধরিয়া যখন এই গান গাহিতেছিলাম, তখন দেখিলাম, জয়ন্ত ছল ছল নেত্রে নলির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—মুখ ঈষৎ ম্লান। গান সমাপনান্তে মেয়ের ঘর-বর কেমন হইল, নলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন নলি মুখখানা ভারি গম্ভীর করিয়া বলিল, "সে কথা আর কি বলিব দাদামশায়, মেয়ের কি বিয়ে হয়—যে কাল পড়েছে—ভেবে ভেবে আমার পেটের ভাত চাল হয়ে যাচ্ছিল—তা দাদামশায়, কত খুঁজে খুঁজে সইয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করেছি। সইয়ের ছেলেটি এম. এ. পড়ছে। তা দাদামশায়, পাঁচ হাজার টাকা নগদ আর এই মেয়েকে দু-শ ভরি সোনা, খাট বিছানা, রূপোর দানসামগ্রী, ফুলশয্যায় সোনার রেকাব গেলাস দিতে হবে। সই বলে যে, আমার চার পাস করা ছেলে, আমি কি অত অল্প টাকায় রাজী হতুম, তবে তোমার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে সই পাতানো—আর মেয়েটিও সুন্দর, জানা ঘর, তাই করলুম। তুমি আমার

ছেলেকে নিয়ে আদর যত্ন করবে। আর মেয়েকে দেওয়া ত একবারে দিলেই ফুরোয় না, পাঁচ বারে তখন পাঁচ রকম ক'রে দিও। সইও গায়ে হলুদ ভাল ক'রে দেবে। মেয়েকে জড়োয়া ঝাপটা পাঠাবে, পাঁচ জন এয়োর পাঁচটা রূপোর সিঁদুরচুপড়ি দেবে। তা আমাদের আবার ফুলশয্যাতে রূপোর সিঁদুরচুপড়ি দিতে হবে। বাপ্ রে! সেকালে বাপু এত ছিল না—দিন দিনই ফন্দি বাড়ছে। না জানি আরও কত হবে!"

বালা পাশে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে দিদির কথার উপর কিছু বলিবার উদ্যোগ করিতেছিল, কিন্তু দিদির একটানা স্রোতে সে থই পায় নাই—দিদি থামিবা মাত্রই "শোন দাদামহাশয়, ওদের মিছি মিছি টাকা—পাই পয়সায় পারা মাখিয়ে টাকা করেছে! আর পুঁথির গয়নাকে জড়োয়া বলছে।"

নলি হাসিয়া বলিল, "তা দাদামশায়, এ ত আর সত্যির বিয়ে নয় —তবু দাদামশায়, আমি সত্যিকার রূপোর দান দেব, তবে সত্যিকার সব নেমন্তন্ন হবে—সত্যিকার লুচি-টুচি সব ত হচ্ছে, কেমন দাদা-মশায়?"

জয়ন্ত। বাবা দেখেছ, নলি আমাদের আজকাল বিয়ের পদ্ধতি, লেনা দেনা কেমন মাথার ভিতর ঠিক ক'রে নিয়েছে, আমি আশ্চর্য্য হয়েছি যে, ও কি ক'রে কথাগুলো ঠিক ঠিক বলেছে, ও কোথায় এত শুনলে!

বাস্তবিক আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। নলি অন্য বালিকা হইতে কতকটা বুদ্ধিমতী ও অনুকরণক্ষম, তা আমি জানিতাম। কিন্তু ও যে এত সংগ্রহ করিতে পারে, তা জানিতাম না। "কেমন রে নলি, তুই এত বিয়ের কথা জানলি কেমন ক'রে রে!"

"কেন দাদামশায়, বৈশাখ মাসে যখন দিদির বিয়ে হ'ল, তখন যে বড় পিসিমা তোমাকে কত কথা বললেন?"

আমার মনে পড়িল—সত্য, সম্প্রতি আমার দৌহিত্রীর বিবাহ উপলক্ষে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল বটে। এমন সময় ঐ বড় পিসিমা এসেছে, ঐ বড় পিসিমা এসেছে, ঐ দিদি এল, বৌমা এল, পুঁটি এল, কলরব প'ড়ে গেল। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা অভয়া আসিয়াই "হ্যাঁ রে জয়, টাকা রাখতে

বুঝি জায়গা পাস নি, তাই মিছিমিছি গুচ্ছির টাকা খরচ করতে বসেছিস্। এতই যদি সাধ ত দেখ্, মেয়ের বে দে না, হ'লও ত সাত আট বৎসরের, তোর বিয়ের সাধও মিটুক আর একটা কাজও হোক—মিছিমিছি এত টাকা নষ্ট—আজও তোর ছেলেবুদ্ধি গেল না—যেমন তুই, তেমনি বৌও উড়নচণ্ডী হয়েছে।"

সর্ব্বমঙ্গলা। কেন দিদি, বেশ ত হচ্ছে, এ মাসে কি আর আমাকে পাঠাত—ভাগ্যি নলির মেয়ের বিয়ে হ'ল, তাই ত আসতে পেলুম। বৌ কেমন ঠিক সত্যিকার বরণডালা সাজিয়েছে, কেমন সব গোছগাছ করেছে—ও-বাড়ীর সব আসবে, কেমন আমোদ হচ্ছে—দিদির সবতাতেই বকুনি।

অভয়া। না, তা বকব কেন, তোরা পয়সাগুলো খোলার কুচি ক'রে ওড়াবি, আমি চুপ ক'রে থাকব!

জয়ন্ত। দিদি, যেমন ক'রে হোক আমোদ হ'লেই হ'ল। দিদি, পুতুলের বিয়েতে ভাবনা কিছু নেই—খাঁটি কেবল আমোদটুকু পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আজ যদি নলির বিয়ে হ'ত দিদি, তা হ'লে কি এত হাসি হাসতে পারতুম—তাতে আমোদ কোথায় ভাই? মনে ক'রে দেখ দেখি দিদি, এত আদরের আমাদের নলি, তাকে কার হাতে দিচ্ছি, তা আমরা কিছুই জানতে পারব না—তার সুখ দুঃখে নলির সুখ দুঃখু। তার পরে আরও কত ভাবনা—দেখ, এই এখন আমরা সবাই আছি—নলির বিয়ের সময় যে সকলেই এমনি একত্রে আমোদ করতে পারব, তারই বা ঠিক কি? কার কখন্ ডাক পড়বে দিদি, তা ত আর আমরা জানি নে, আর আমাদের হাতও নয়।

অভয়া। যা যা, মিছে বকিস্ নে—তোর সব কথাতেই পোড়া কথা আসে।

সর্ব্বমঙ্গলা। তা দিদি, সত্যিই আমরা ত আর আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে আসি নি—মরতে ত সবাইকেই হবে—তার কেউ আগে, কেউ পরে—তাও আর পোড়া কথা কি।

আমি। ও রে বাছা, আজ নলির মেয়ের বিয়ে, আজ কি ও-সব অমঙ্গলের কথা বলতে আছে? ও রে, বাজনা বাজাতে বল্ না—বাজনা বুঝি চুপ ক'রে থাকতে এসেছে!

বাজনা বাজিয়া উঠিল—নলির মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বেচারা বাবা পিসিমার গম্ভীর তর্কবিতর্ক শুনিয়া ম্লানমুখে একবার এর মুখ, একবার ওর মুখ চাহিতেছিল।

অভয়া। জয়, আমার জামাইবাড়ী নেমন্তন্ন করেছিস্ ত? আর জামাইটিকেও আনতে পাঠাও, সে ছেলেমানুষ, আমোদ আহ্লাদ করবে।

জয়ন্ত। হ্যাঁ দিদি, তা জামাই আনাব বই কি, ছেলেরা কত দিন ধ'রে পুতুলের বিয়ে বিয়ে করছে, কাল আর শুনলে না, বললে—কালই হবে; তাই ত এখনও কাউকে বলা হয় নি।

অভয়া। হ্যাঁ ভাই, জামাইবাড়ী কাউকে পাঠাও, নতুন কুটুম্ব, ভাল ক'রে যত্ন করতে হবে। তা হ'ল ভাল, নলির মেয়ের বিয়ের অছিলায় জামাইটি দেখতে পাব।

সর্ব্বমঙ্গলা। আঃ, এত ক্ষণে দিদির মুখে হাসি দেখা গেল—জামাই জামাই ক'রেই দিদি সারা হয়ে গেল—পরের ছেলেকে অত কেন গা?

অভয়া। ও রে, তোর যখন হবে, তখন বুঝবি। এখনও মেয়ে হয় নি, তার জামাই।

সর্ব্বমঙ্গলা। আমার মেয়ের আমি বিয়ে দেবই না—মেয়েকে লেখা-পড়া শিখিয়ে ঘরে ছেলের মত রাখব। বাবা! মেয়ের বিয়ে দিতে যে খোশামোদ করতে হয়—আমি অত পারব না।

অভয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও এমন এক কালে কত কি বলতুম। তার পর যাই সত্যি কাজের সময় এল—তখন যে-কে সেই।

জয়ন্ত। দিদি, নলি কেমন গিন্নীপনা ক'রে বাবাকে বিয়ের সব খবর দিলে, যদি শুনতে ত অবাক্ হ'তে। মমতাময়ীর বিয়ের সময় আমরা সব কথাবার্ত্তা কইতুম, সেই সব শুনে কেমন গুছিয়ে মনে রেখেছে।

"সে কি রে, আমরা ত কই কখনও দেখি নি যে, নলি আমাদের কথা মন দিয়ে শুনছে। ওর বড় বুদ্ধি—বেঁচে থাকেন ত যার ঘরে যাবেন, তার ঘর উজ্জ্বল হবে।"

"দিদি এস, চল, বৌদিদি ডাকছেন—কেমন কুলো বরণডালা সাজানো হয়েছে, দেখবে এস। চল্ নলি, বাবাকে সব এনে আমরা দেখাই।"

আমি। তোরা সব যা, মুখটুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে দেয়ে আয়—আমিও আফিংটা খেয়ে গায়ে বল ক'রে নিই। আজ বড় খাটুনি মাথার উপর।

"ও গো ক'নের দাদা, আজ দু-সের দুধ হবে না—আজ দু-হাঁড়ি ক্ষীর চাই।"

"তা বাবা, আমায় বলা কেন—ক'নের মা ত তোমার কাছে দাঁড়িয়ে—তাকে বল।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঁর কাছে দু হাঁড়িতে হবে না—ওঁর কাছে পাঁচ হাঁড়ি।"

নলি। বল কি দাদামশায়, তা হ'লে কেমন ক'রে কুলোবে? বাবা যে সবে মাত্র আট হাঁড়ি বই ক্ষীর ফরমাশ দেন নি—তা হ'লে কেমন ক'রে হবে দাদামশায়—তুমি আর একদিন বেশী ক'রে খেও; আজ দাদামশায় বেশী খেও না।

জয়ন্ত। এইবার নলি জব্দ হয়েছে, যা—তোর আর ভাবতে হবে না—যাতে কুলোয়, তাই হবে এখন। * * *

মহা সমারোহ। জামাই, নাতজামাই, ভ্রাতৃবধূ, সকলেই ক্রমে ক্রমে আসিলেন, সকলেরই হাসি মুখ, সকলেই আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। বরণের সময় বধূমাতা নলির পার্শ্বে আমাকে দাঁড় করাইয়া আমাদের দুই জনকে বরণ করিলেন। কন্যা সম্প্রদানের সময় আমার দৌহিত্রী অমরাবতী আমাকে কন্যার পিতাস্বরূপে ধরিয়া লইয়া গিয়া কন্যা সম্প্রদান করাইল—কারণ, নলির মেয়ে বটে, কিন্তু মেয়ের বাপের সম্পূর্ণ অভাব। আমাকে কেহ মালা পরায়, কেহ চাদর পরায়, তাতে বড় হাসি। দেখিলাম, জয়ন্ত হাসিয়া হাসিয়া বন্ধুদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছে—নানারূপ হাস্য পরিহাসও চলিতেছে। বাসর-ঘরে গান বাজনাও হইতেছে—বিনয় দু-একটি গান জানে।

অনেক রাত্রে উৎসব শেষ হইলে আলোগুলি একে একে নিভিয়া আসিল, জন-কোলাহল ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল, আমিও শ্রান্তভাবে বিছানায় পড়িলাম—আমাকে যে কাজ করিতে হইয়াছিল, তাহা নহে—আমাকে যে আগ্রহ দেখাইতে হইয়াছিল, আমাকে যে হাস্য পরিহাস করিতে হইয়াছিল, আমাকে যে নিয়মিতাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাক্যব্যয় করিতে হইয়াছিল—তাহাতেই আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আমি প্রতি দিন এক নিয়মেই কাটাই। নিয়মিত স্নানাহারের পর নলির হাতে মাথাটি সমর্পণ করিয়া দুপুরবেলা একটু নিদ্রা দিই। বৈকালে উঠানে ছেলেরা খেলা করে, চাহিয়া চাহিয়া

দেখি—সন্ধ্যায় তাহারা ক খ গ ঘ পড়ে, নানারূপ ঝগড়াঝাঁটি করে, পাশের ঘর হইতে তাহা শুনি—পুত্রেরা আসিয়া দেশের সংবাদ কহেন, তাহার দু-একটি উত্তর প্রত্যুত্তর করি। রাত্রে বধূমাতারা যখন তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি লইয়া আহার করাইতে আসেন, তখন তাঁহাদের খবরাখবর লই ও তাঁহাদের পিতামাতাকে উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিদের লইয়া কিঞ্চিৎ রহস্যালাপ করিতে করিতে আহার শেষ করিয়া প্রশান্তচিত্তে ঘুমাইতে যাই। ইহার অধিক মনের উচ্ছ্বাস বা শরীরের বল আমার নাই।—ভাবিতে ভাবিতে জয়ন্তের কথা মনে পড়িল। বাস্তবিক আজ যদি নলিনীর বিবাহ হইত ত কত ভাবনা হইত। মনে আছে—নিজের এক একটি মেয়ের বিবাহ দিতাম, আর তাহার পূর্ব্বে ও পরে কত ভাবনা হইত। এক্ষণে মন জড় হইয়া গিয়াছে এবং হাতে ক্ষমতা না থাকিলে মনের সকল ভাবই শমিত হইয়া আসে; তাই আর সে সকল ভাবনা তত তীব্রভাবে নাই। হায়, আমার মধ্যমা কন্যা যখন স্বামিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়া ম্লানমুখে বেড়াইত, তখন আমার কি করিতে না ইচ্ছা করিত? যত ভালবাসা দিলে সেই মুখে হাসি ফুটে, আমি তাহাকে যে সকলই দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু পিতার স্নেহে যে সে ম্লানমুখে হাসি ফুটিবার জো নাই। সে যে ক্রমে প্রস্তরবৎ হইয়া আসিল—আমি দেখিলাম, আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। মা গো মহামায়া! যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না কেন মা? বুড়ো হইয়া মরিতে চলিলাম, তবু তোর রহস্য বুঝিতে পারিলাম না।

পরদিন দুপুরবেলা পাকা চুল তোলাইবার সময় নলির খোঁজ করিলাম —বালা আসিয়া বলিল, "দিদির মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেছে, তাই দিদি কাঁদছে, দিদি আসবে না।" শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না—নলির চক্ষে জল পড়িতেছে—হায়, কেন!—গিয়া দেখিলাম, নলি কাঁদিতেছে —জয়ন্ত তাহাকে কোলে করিয়া বুঝাইতেছে—"এই বুঝি তোমার বুদ্ধি আছে—পুতুলের জন্য এত কান্না! তোমার অত পুতুল আছে, একটা গেলই বা, অমনি পুতুল আবার হবে!"

কিন্তু নলির চক্ষের জল থামে না। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া বুকের কাছে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,

"মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেছে, তাই কাঁদছিস নলি?" সে মুখ ফুলাইয়া কহিল 'হুঁ'। কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাত্রি জাগরণে কাতরা নলি ঘুমাইয়া পড়িল। উৎসব-কোলাহলান্তে বাটী নিস্তব্ধ হইয়াছে—সকলেই শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছে—

আমারও স্বাভাবিক জড়ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে—কিন্তু মনের আজ বিশ্রাম কই?

নলি পুতুলের বিবাহ দিয়াছে; বলিতেছে—মিছামিছি মেয়ে; বলিতেছে—মিছামিছি মেয়ে বিবাহ দিলাম। কিন্তু কাঁদিতেছে সত্য। কিন্তু সত্য কোথায়? এই যে আমরা মানুষ বলিয়া নিজেরা অহঙ্কার করিয়া থাকি, আমাদের মনুষ্যত্ব কোথায়? নলির পুতুলকে নলি যেমন করিয়া নাড়ে চাড়ে, যথা ইচ্ছা তাহার প্রতি ব্যবহার করে, এমনই আমরাও কি এক আমাদের অজানিত কাহারও পুত্তলিকা মাত্র নহি? সেই কন্যা কি তাঁহারই ইচ্ছামত আমাদের পরিচালিত করিতেছেন না? নলিও কি একটা পুতুল নহে? কে নলিকে হাসায়, কে কাঁদায়? মা, কে তুমি এই অনন্ত কাল ধরিয়া এই সকল পুত্তলিকা লইয়া অনন্ত খেলা খেলিতেছ—কবে তোর বাল্যকাল ঘুচিবে, কবে তোর এই খেলা সাঙ্গ হইবে! ভাল, এই আমরা যে তোর পুতুল, আমাদের জন্য কি কখনও তোর প্রাণ কাঁদে? নলির পুতুল ভাঙ্গিলে নলি কাঁদে, নলির মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেল, নলি কাঁদিতেছে। কিন্তু তোর যে প্রতি দিন শত শত পুতুল ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তাহাতে কি তোর চক্ষে এক ফোঁটা জল পড়ে? যখন তুই তোর শত শত পুত্তলিকাকে পুত্রশোকে কাতরা করিয়া কান্দাইয়া আকুল করিয়া তুলিস, তখন সে খেলায় তোর কি সুখ হয়, একবার আমায় বল্ দেখি। তোকে জানি না, তোকে ত দেখিতে পাই না—কিন্তু তোর খেলা দেখিতে পাই। কোথায় তুই কি সুখে থাকিস, তাই এই নিদারুণ খেলা খেলিস, একবার আমায় বল্। না গো মা—জানি, তা তুই বলবি নে, তোর খেলা তুই বুঝি অনন্ত কালই খেলিবি—তা খেল্, কেবল এই কথাটি শোন্—এই ভাঙ্গা পুতুলটা নিয়ে আর খেলিস নে—এই প্রেমহীন বাসনাহীন জীর্ণ শীর্ণ পুতুলটাকে ফেলে দে—ভাঙ্গা পুতুল আর ভেঙ্গে ভেঙ্গে খেলা করিস নে।

('সাধনা,' কার্ত্তিক ১২৯৯)

কন্যাদায়

ভাই, তোমার বড় মেয়েটির বিবাহের একটি সম্বন্ধ করিবার জন্য আমাকে যে চিঠি লিখিয়াছ, তাহা পাইয়াছি। তবে এত দিনে আমাদের মনে পড়িয়াছে, এত দিন পরে দেশে আসিতে ইচ্ছা হইয়াছে! তুমি বিদেশে থাক—বিদেশ তোমার ভাল লাগে—দেশে আসিতে ইচ্ছা হয় না;—আমাদের মায়া ও দেশের সংস্রব একেবারে কাটাইয়াছ বলিয়া তোমার উপর কত মান করিয়াছি, কিন্তু এখন দেশে আসিয়া মেয়েটির বিবাহ দেবে স্থির করিয়াছ শুনিয়া হরিষে বিষাদ হইতেছে। তোমার চিঠির ভাবে বুঝিতেছি যে, এখনও তুমি তেমনই ছেলেমানুষ আছ—এখনও তোমরা সেই সকল সঙ্গিনী মিলিয়া বনভোজন, যমুনা-স্নান, দেবদর্শন করিয়া থাক। এখানে ভাই, আমাদের সে সব কিছু নাই। কেবল নিয়মিত রাঁধা-বাড়া, খাওয়া-শোওয়া এবং অন্নচিন্তা ছাড়া আর কোন রকম আমোদ-আহ্লাদ নাই। এমন কি, আমার শ্বশুরবাড়ী আবার গঙ্গাস্নানে যাইবারও নিয়ম নাই। মেয়েটির শীঘ্র বিয়ে হবে ব'লে দেখছি তোমার বড়ই আহ্লাদ হয়েছে—তোমার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে যেন তোমার সেই হাসিভরা কচি মুখখানা ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিতে পাইতেছি। আহা ভাই, আশীর্ব্বাদ করি, ললিতার বিয়ে দিয়ে যেন তোমার মনের মতন কুটুম্ব এবং পুত্রের মত জামাতা হয়।

ললিতার জন্য বর এখানে যথাসাধ্য খোঁজা হইতেছে, কিন্তু আজও তোমার ফরমাশমত গহনা তাহার জন্য প্রস্তুত করিতে দেওয়া হয় নাই। আর তোমাকেও লিখিতেছি যে, তুমিও আপাততঃ সেখানে গহনা প্রস্তুত করাইতে বারণ করিবে। কারণ, আজকাল এখানে নগদ টাকা ধরিয়া লওয়া নিয়ম হইয়াছে। এখন যে-রকম সব বিবাহের নিয়ম হইয়াছে, তাহার কতক কতক তোমায় লিখি, তা হ'লেই তুমি সব বুঝিতে পারিবে।

এ দেশে ক্রমশঃ দেখিতেছি যে, পুত্রসন্তানের মূল্য হু হু শব্দে বাড়িতেছে। যেমন ছেলের দাম বাড়িতেছে, তেমনই মেয়ের দাম কমিতেছে। মেয়েদের নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে এক রূপ, তা এখন শুদ্ধ রূপে আর কিছু হয় না। এক একটি কুমারী কন্যা এক একটি বিশমণী বোঝার

স্বরূপ পিতামাতার জ্ঞান হয়—একটির বিবাহ দেন, একটু হাঁপ ছাড়িয়া সুস্থ বোধ করেন।

সকল রকম বরের মধ্যে পাস-করা বরের দর বড় বেশী। বর যদি একটি পাস-করা এবং দরিদ্র হন, তবে দেড় হাজার দুই হাজারে বিবাহ হইতে পারে। গৃহস্থ হইলে চার পাঁচ হাজার—ধনবান্ হইলে পাঁচ সাত দশ হাজার। পিতা উপার্জ্জন করিতেছেন, ছেলে এল. এ. কি বি. এ., সে স্থলে দর বড় ভারি, সাত আট হাজার হাতে না করিয়া সে স্থানে সম্বন্ধ করিবার জো নাই। পূর্ব্বে সালঙ্কারা কন্যাদান বিধি ছিল, এখন নিরলঙ্কারা কন্যা ও নগদ টাকা বা কোম্পানীর কাগজ সহ বিবাহ বিধি হইয়াছে। শুনিয়াছি, কোন কোন বুদ্ধিমান্ বর যত ক্ষণ না টাকা গণনা শেষ হয়, তত ক্ষণ ছাল্‌নাতলাব পিঁড়ায় উঠিয়া দাঁড়ান না; ভয়—পাছে কন্যাটি সমর্পণ করিয়া কন্যাকর্ত্তা টাকা কিছু কম দেন—তখন ত ঐ অপদার্থ মেয়েটা ফেরত যাবে না।

তুমি আজ তোমার এত আদরের, এত সাধের মেয়েটিকে পরের হাতে সঁপিয়া দিতে বসিয়াছ, তুমি নিজের অবস্থামত যে তাহাকে সাজাইবে, তাহার আর জো নাই। তোমার ইচ্ছা যে, আপাততঃ তাহার যাহা কিছু আবশ্যক, সকলই তুমি তাহাকে দাও। যাঁদের ঘরে তোমার মেয়ের বিবাহ হইবে, তাঁহাদের রীতিনীতি স্বভাবচরিত্র কেমন—তাঁরা মাদুর পেতে শুতে ভালবাসেন, কিম্বা খাটে গদিতে শোয়া পছন্দ করেন, তাহার কিছুই তোমরা জান না—অথচ তোমার মেয়ের খাটে না শুলে ঘুম হয় না, তাই তুমি মেয়ে-জামাই চিরজন্ম ব্যবহার করিবে বলিয়া ভাল খাট বিছানা ফরমাশ দিয়া তৈরি করাইতে লিখিয়াছ—কিন্তু হায়, তোমার সে সাধ পূর্ণ করা দুঃসাধ্য বোধ হইতেছে। যে ভাগ্যবান্ তোমার বেহাই হইবেন, তিনি খাটের পরিবর্ত্তে নগদ দেড় শত টাকা চাহিবেন—তিনি চাহিবেন, "এখনকার যেমন সব টাকা ধ'রে লওয়া নিয়ম হইয়াছে, তেমনই লইব। নিজের মেয়েদের নগদ সমস্ত ধরিয়া দিলাম, এখন ছেলের বেলায় বুঝি ফাঁকি পড়িব, তা হবে না! আমার এই বি.এ.-পাস ছেলে, নগদ সাত হাজার দাও,—তার পর তোমার মেয়ে, তোমার জামাই, ইচ্ছা হয় খাট বিছানা দাও, তাদেরই থাকবে।" সুতরাং নিঃশব্দে তোমাদের টাকাগুলি গণিয়া দিতে হইবে। কোন কোন বরকর্ত্তা গহনা গড়াইয়া

দিতে অনুমতি দেন বটে, কিন্তু সোনা রূপা ভরি হিসাবে ওজন বুঝিয়া লইয়া থাকেন। যিনি কন্যার গহনার টাকাও বরসজ্জার টাকার সহিত নগদ লইয়া থাকেন, তিনি গহনা গড়াইবার মজুরির টাকাটিও যে হিসাবের মধ্যে ধরিতে ভুলিয়া যান, এমন ভ্রম যেন কাহারও না হয়। বরঞ্চ অল্প মজুরি দিলে স্বর্ণকার যে বধূর গহনার সোনা খারাপ করিয়া দিবে, ইহা তাঁহার অসহ্য বোধ হয়, সেই জন্য মজুরির হিসাবের টাকা দুই টাকার স্থলে তিন টাকা হিসাবেও লইতে পারেন। কোন কোন স্থলে গায়ে-হলুদের দিন কন্যাপক্ষ হইতে টাকা বুঝিয়া লইয়া বরপক্ষ নিজ গৃহ হইতে গহনা কন্যাকর্ত্তাকে পাঠাইয়া দেন। অনেক ধনীর ঘরে পুরাতন গহনা থাকে, তাঁহারা সেই সকল ব্যবহার্য্য অব্যবহার্য্য, ছোট বড় সেকালে-গঠনের নানাবিধ গহনা বধূর পিতাকে এইরূপে বিক্রয় করিয়া কোম্পানীর কাগজ বৃদ্ধি করেন। কন্যাকর্ত্তা এই সকল অলঙ্কার পরাইয়া, সালঙ্কারা কন্যা দানের ফল লাভ করিয়া ও কন্যাকে উপযুক্ত ঘরে বরে সমর্পণ করিলাম ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে বহু কালের পর একবার ভাল করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন। কোন কোন স্থলে কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া আসিলে পিতামাতা নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়া, পরে কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। পুত্রবধূর গহনা ও পুত্রের বরসজ্জার দ্বারা অনায়াসে নিজ কন্যার বিবাহ সমাধা হয়। এ বিষয়ে মাঝে থেকে তোমাকে একটি ঘরের খবর দিই, শুন।—তোমার মনে আছে বোধ হয় যে, দুই বৎসর পূর্ব্বে তোমাকে আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ বোন কমলার বিবাহের কথা লিখিয়াছিলাম। বাবা তাঁহার এই শেষ কন্যার বিবাহ বলিয়া সাধ্যাতীত খরচপত্র করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। আমার ভগ্নীপতির পিতামাতা নাই বলিয়া তাঁহারা কেহ নগদ টাকার জন্য অনুরোধ করেন নাই। তবে বরের খুড়ী জেঠাই মহল হইতে খুব লম্বা চওড়া রকম গহনাপত্রের ফর্দ্দ আসিয়াছিল। যাহা হউক, বাবা তাহাকে সুন্দর সুন্দর ব্যবহারোপযোগী সমস্ত গহনা ও বরসজ্জা দিয়াছিলেন। মা বলিতেন, "দেখ, যেন কোন গহনা বা জিনিস খারাপ হয় না। আমার কমলা যেন গহনাগুলি আজন্মকাল ব্যবহার করিতে পারে ও জিনিসপত্র ভোগ করিতে পারে।" কমলাকে গহনা ব্যতীত সুন্দর সুন্দর মূল্যবান্ শাড়ী ও গৃহসজ্জার নিমিত্ত খেলেনা ও আলমারি, সাদা শাড়ী, রেশমী শাড়ী এবং জরির শাড়ী ইত্যাদি রাখিবার

জন্য পৃথক্ পৃথক্ তোরঙ্গ, খাট বিছানা, সকলই দিয়াছিলেন। বরকেও উৎকৃষ্ট ঘড়ি, আঙ্গটি, তু-তিনটি চেন, রূপার বাসন প্রভৃতি দিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করেন নাই। এখন সেই সকল সাধের জিনিসের দশা কি হইয়াছে শুন। পরশু দিন, ভাশুরঝির বিবাহ-শেষে নিরাভরণা কমলা একটি মাত্র তোরঙ্গে তুই চারিখানি সাদা কাপড় লইয়া বাপের বাড়ী আসিয়াছে। কমলার ভাশুর, তাহার সমস্ত গহনাপত্র লইয়া নিজ কন্যাটি পার করিয়াছেন। নিত্য-পরিহিত তিনখানি সোনার গহনা ও পায়ের চারিগাছি মল ব্যতীত তাহার আর সমস্তই গিয়াছে। তাহার যতগুলি গহনা, যতগুলি কাপড় জামা, খেলেনা, খেলেনার বাক্স, আলমারি, খাট প্রভৃতি গৃহসজ্জাসামগ্রী ছিল, সমস্তই এখন হইতে তাহার ভাশুরঝির সম্পত্তি হইল। আমার ভগ্নীপতি তাঁহার নিজের বরসজ্জার সামগ্রীগুলি দিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই—কিন্তু ছেলেমানুষ কমলার গহনা, কাপড় ও খেলেনাগুলি পর্য্যন্ত দিতে তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাঁহার কথা কহিবার জো কি! এক দিন তিনি খুড়ী জেঠাই মহলে ইঙ্গিতে ইহার কিছু আভাস দিয়াছিলেন, অমনই তাঁহারা কহিয়া উঠিলেন—"অমন কথা বলিস্ নি—হ্যাঁ রে, স্ত্রীর গহনা আগে, না ভাইঝির বিয়ে আগে? কলিকালের সকলই একতরো।" কমলার বড় জা কহিলেন, "ঠাকুরপোর এখন ষোল আনা টান ছোট বৌয়ের উপর, এখন কি আর রত্নময়ীর উপর মায়া আছে!" কথাটা ক্রমে কমলার ভাশুরও নানা অলঙ্কারে সজ্জিত রকমে শুনিলেন। তিনি গায়েহলুদের দিন রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কখনও রত্নময়ীর অঙ্গ হইতে গহনা খুলিয়া, "এই নে তোর স্ত্রীর গহনা" বলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন, কখনও বলেন, "বৌটাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, আমি ও-ভাই এবং ভাদ্রবধূর মুখ দেখতে চাহি না"—হুলুস্থুল ব্যাপার! আমার ভগ্নীপতি ভয়ে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া অনেক কষ্টে হাতে পায়ে ধরিয়া ভ্রাতাকে শান্ত করেন। কমলা ত ভয়ে সারা—তাহার বড় জা স্বামীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "ও গো, ঠাকুরপোর কিছু দোষ নেই, ছোট বৌ যেমন শিখিয়ে দিয়েছে, তেমনই বলেছে। শ্বশুরবাড়ীতে শাশুড়ী মায়া জানিয়ে, দিবারাত্র কানে মন্ত্র পড়ছেন, যেন মেয়ের গহনা না যায়—তাতেই ঠাকুরপো অমন হয়েছেন।" মা বাপ্ কখনই ও-বিষয়ে কোন কথা কহেন না; কারণ,

তাঁহারা জানেন যে, যখন মেয়ে দান করিয়াছেন, তখন তাহার যাহা ইচ্ছা করিবে, তাঁহার্দের কথা থাকিবে না। আর বেচারী কমলা সবে এই এগার বৎসরের! সে আজও স্বামীর সহিত ভাল করিয়া কথা কহে না। গহনা কাপড়ের প্রতি আজও তার তেমন টান পড়ে নাই—তাহার এত জিনিসের মধ্যে যে খেলেনা শুদ্ধ আলমারিটি গিয়াছে, এই কষ্টই তাহার বড় মনে লাগিয়াছে। আহা, তাহাতে তাহার কত দিনের, কত দেশ-দেশান্তরের পুতুল খেলেনা সঞ্চিত ছিল, সেইগুলির সহিত তাহার কত স্নেহস্মৃতি গাঁথা ছিল! কত আত্মীয় স্বজন যত্ন করিয়া, আদর করিয়া তাহার জন্য ঐগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কমলা বিশেষ যত্নে সেইগুলি রাখিত ঢাকিত, তাহার নিকট সেইগুলি অমূল্য—তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইয়াছে। আমার ভগ্নীপতি জানিতেন যে, সেগুলি কমলার বড় যত্নের, এবং তাঁহারও ঐ সকলের মধ্যে একটু যত্ন নিহিত ছিল—কারণ, তাহার মধ্যে কতক কতক তিনি নিজে এবং তাঁহার বন্ধুরা কমলাকে উপহার দিয়াছিলেন। তাই তিনি কহিয়াছিলেন, "কমলার খেলেনা কাপড় চোপড় নিয়ে কাজ নেই, দাদা ত কিছু দিচ্ছেন না, তিনি ঐ সকল আবশ্যকীয় জিনিসগুলি কিনে দিন, আর অত ভারি ভারি রূপার দান এবং ভারি ভারি গহনা রত্নময়ীকে দিবার আবশ্যক নাই। ঐ গহনার কতক এবং রূপার বাসন কতক বিক্রয় করিয়া রত্নময়ীর হাল্‌কা করিয়া গহনা গড়ানো হউক—তারা যখন অত চাহিতেছে না, তখন আমাদের অত দেবার আবশ্যক কি? এইরূপ করিলে কতক গহনা উহার থাকে।" এই যুক্তিসঙ্গত কথাতে যখন এতটা লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হইল দেখিলেন, তখন তিনি নিতান্ত মনঃকষ্টে কমলাকে কহিলেন, "তোমার যাহা কিছু আছে, সকলই উঁহাদের ফেলে দাও; আমি উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছি, আমি ক্রমে ক্রমে তোমাকে সকলই দিব।" হায়, তিনি সকলই দিবেন সত্য, কিন্তু সেই সকল জিনিসে আর তাহার পিতামাতার স্নেহ গাঁথা থাকিবে না! তাই কি কমলার শ্বশুরবাড়ী একটু যত্ন আছে! যত্নের কথা উঠিলেই সকলে কহেন—"শ্বশুর শাশুড়ী নেই, আদর যত্ন তত্ত্বতাবাস আর কে করবে? তিনি ত জেনে শুনেই মেয়ে দিয়েছেন।" কমলা যে নিতান্ত ছেলেমানুষ, এ কথা কাহারও মনে হয় না। তাহাকে পুতুল খেলিতে দেখিলে, "বেশ, বুড়ো মাগীর কি হচ্ছে দেখ!" বলিয়া উপহাস করিতে

কেহ কুণ্ঠিত হইতেন না। কমলার ভাশুরঝি তাহা হইতে বয়সে কিছু বড়, সে এখনও ছেলেমানুষ, কিন্তু কমলার নাম বুড়ো মাগী! কমলার ভাশুরঝি এখনও প্রাতে উঠিয়া খাবার চাহে, বিসর্জ্জনের দিন গাড়ী করিয়া ভাসান দেখিতে যায়—সে পুতুল কিনিবার জন্য আবদার করে, না পাইলে অভিমান করে। একদিন সে কমলার নিকট কি একটি ছোট পুতুল চাহে, কমলা বলে যে, "না ভাই, ওটি আমার সেজ বৌয়ের ছেলে, ওটি দেব না, বরং একটি কাঁচের পুতুল দেব এখন।" এই আর কোথা আছে! রত্নময়ী কাঁদিয়া অস্থির, সকলের কাছে নালিশ করিল যে, "কাকীমার কাছে একটি পুতুল চাইলুম, তা কাকীমা দিলে না।" তখন কমলার লাঞ্ছনার আর সীমা রহিল না,—কেহ কহেন, "কি ছোটলোকের মেয়ে!" কেহ কহেন, "পুতুল ত ভারি, পয়সায় আটটা বেণেপুতুল, তার আবার কথা!" কেহ কহিলেন, "ও বৌ কাউকে নিয়ে ঘর করতে পারবে না!" কমলা তখন অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া তাহার বেণেপুতুলের বাক্সটি রত্নময়ীকে দান করে, কিন্তু তবুও তাহার উদারতা তাহাতে কিছু মাত্র প্রকাশ পায় নাই। কচি মেয়ে যে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিল, তাহা কেহ বুঝিল না, মাঝে থেকে সেই অবধি তাহার পুতুলখেলা শেষ হইয়াছে।

কথায় কথায় অনেক বাজে কথায় আসিয়া পড়িয়াছি, এখন আসল কথায় আসি। সত্য বটে যে, গহনা আগে, না ভাশুরঝির বিয়ে আগে, সত্য বটে যে, স্বামী, দেবর, ভাশুর, শ্বশুর অক্ষম হইলে বধূর গহনা লইয়া মান রক্ষা করাতে কোন কথা নাই—কিন্তু তাই বলিয়া এমন নির্দ্দয় ব্যবহার অমার্জ্জনীয়। তুমি লিখেছ, কন্যা দেখাইবার যদি তেমন আবশ্যক হয়, তবে বিবাহের মাস ছয়েক পূর্ব্বে তুমি দেশে আসিবে। কিন্তু আমি দেখিতেছি, তাহার বিশেষ আবশ্যক নাই; কারণ, এখন মেয়ে দেখিয়া সম্বন্ধ স্থির হয় না। পূর্ব্বে ছেলের দরদাম, অর্থাৎ পাওনা ঠিক না হইলে, কেহ মেয়ে দেখিতেও আসেন না। বরকর্ত্তা কহেন, "আগে পাওনা ঠিক হউক, পরে তখন মেয়ে দেখে আসা যাবে।" তাই আমরা ভাই, বর পসন্দ করিয়া, দেনা পাওনা ঠিক করিয়া, দিন স্থির করিয়া রাখিব, তুমি সময়মত দেশে আসিয়া বিবাহ সম্পন্ন করিবে। আমাদের ললিতার মত সুন্দর মেয়ে দেখিয়া কেহ অপসন্দ করিবেন না, তবে টাকা যে কত লাগিবে, তাহার কিছুই স্থির করিয়া এখন লিখিতে পারিলাম না। যদিও বরকর্ত্তা

অনুগ্রহ ক'রে তোমার কাছ থেকে মেয়ের গহনার টাকা শুদ্ধ নগদ না ধরিয়া লন, তথাপি বরসজ্জার ও দানসামগ্রীর টাকা নগদ দিতেই হইবে। হয়ত তাহা ছাড়া আবার বরসজ্জাও দিতে হইবে। ফুলশয্যার টাকাও নগদ ধরিয়া লওয়া হইয়া থাকে। বিবাহের মধ্যে আর স্নেহ বা প্রেম নাই—বর নাই, কন্যা নাই; আছে কেবল বরের পাস, এবং কন্যার পিতার টাকা। দুটো মনিষ্যিকে আজন্ম স্নেহবন্ধনে বাঁধিবার জন্যই ফুলশয্যার আয়োজন। ফুলের মালায় শোভিত হইয়া, বন্ধুবান্ধবের সহিত হাস্য পরিহাস করিয়া, নব বিবাহিতার সহিত আহারান্তে একত্রে নূতন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানায় শয়ন করিয়া তাহাকে আপনার ভাবিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, কন্যার পিতা কন্যার হিতার্থে, জামাতার প্রীত্যর্থে যথাসম্ভব ফুল ফল সকলই সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন। পাছে জামাতার মনে অনটনের ভাব আসিয়া মন উচাটন হয়, পাছে তিনি প্রশান্তমনে পত্নীর সহিত প্রথম আলাপ না করিতে পারেন, তাই কন্যার পিতামাতা ফুলশয্যার সমস্ত ভার বহন করেন। সে জিনিস পাঠানো নিয়ম যে একেবারে রহিত হইয়াছে, এমন নহে—বরকর্ত্তা গাছেরও পাড়েন, তলারও কুড়ান। কর্ত্তা নগদ টাকা লন, ওদিকে গৃহিণী বলেন, "ও মা, সে কি গো, টাকা ধ'রে দিয়েছেন ব'লে কি মেয়ে জামাইয়ের কাপড় আর জলখাবারটি দেবেন না! ফুলশয্যার সামগ্রী দেওয়া ত মেয়ে জামাইকে আশীর্ব্বাদ করা। মেয়ের মা-ই বা কেমন যে, আশীর্ব্বাদ না ক'রে চুপ ক'রে থাকবেন। তবে বেহানকে ব'লো, তাঁর মেয়ে জামাই উপবাস ক'রে থাকবে!" পরিহাসের সম্পর্কীয়ারা কহেন—"বেশ ত, আমরা তবে তাঁদের মেয়েকে বিনা বসনেই শয়ন করাইব!" বেচারা কন্যার পিতামাতা তখন ত্রস্তে আবার সেই সকল ফল, ফুল, বস্ত্র, দধি, ক্ষীর, সন্দেশ, সকলই পাঠাইয়া দেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়েই এমন নিয়ম হইতেছে যে, অনেক স্থলে টাকাও লওয়া হয়, আবার জিনিসও আদায় করা হয়। না দিলে মেয়ে পাঠান না ও বিস্তর তিরস্কার করেন। মাঝে মাঝে এমন দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাসী বিয়ের দিন, কন্যা বরের বাড়ী পৌঁছিবার পরেই অলঙ্কারগুলি ফেরত আসে। দাসী আসিয়া উপস্থিত, কি সমাচার? না, "কর্ত্তা এই গহনা ফেরত দিলেন, আর বললেন যে, তাঁর গহনায় কাজ নেই, তাঁর এমন ক্ষমতা আছে যে, তিনি তাঁর বৌকে এমন পাঁচ সুট গহনা

দিতে পারবেন! তা আপনারা আর মেয়ে আনতে যাবেন না—তা হ'লে সুবিধে হবে না।" সবে মাত্র বর কন্যা বিদায় করিয়া মাতা কাতরহৃদয়ে ভবিষ্যৎ ভাবিতেছেন, কুটুম্বিনীরা ঘর দুয়ার গুছাইতে ব্যস্ত, কর্ত্তা গৃহসজ্জা —ঝাড় লণ্ঠন যথাস্থানে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। সন্দেশওয়ালা ফুলশয্যার সন্দেশের ফরমাশ লইতে আসিয়াছে, মালিনী ফুলের গহনার বায়নার টাকা চাহিতেছে, এমন সময় এই অলঙ্কার সমেত প্রেরিত প্রস্তাবে যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে নিস্তব্ধভাবে রহিল। পরে, "কেন কেন, কি হয়েছে বাছা, আজকের দিন কি ওর সন্ধ্যাবেলা গহনা খুলিতে আছে!" ইত্যাদি কথা কোন মুখরা প্রতিবেশিনীর মুখ হইতে বাহির হইলে, তবে পিতামাতা অনুনয় বিনয় দ্বারা আসল কথাটা অবগত হয়েন। কথাটা এই যে, গহনা ওজন করিয়া দেখা হইয়াছে যে, সোনা ভরি হিসাবে কম আছে এবং গহনায় অনেক পান বাদ যাইবে। সুতরাং যদি ভাল চাও, তবে গহনাগুলি ফেরত লইয়া নগদ টাকা ধরিয়া দেওয়া হোক। এই ত ব্যাপার! যাহা হউক, এই যে মনোভঙ্গ আরম্ভ হয়, ইহা আর শীঘ্র জোড়া লাগে না। বরপক্ষের অমোঘ অস্ত্র যে, মেয়ে পাঠাইব না। এই অস্ত্র তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করেন। যদি কন্যাপক্ষের এক্সপ্রেস্‌মুখী ঢাল থাকে, তবে তাঁহারা সামলাইয়া যান, নচেৎ জন্মের মতন প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে হয়।

তোমার মনে আছে ভাই, ছেলেবেলা দিদিমার কাছে আমরা কত ঘুমপাড়ানি গান শিখেছিলুম—সেইটে মনে পড়ে কি?

"আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে,
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ী কোন্‌খান দিয়ে,
আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে,
সরু ধানের চিঁড়ে দেব পথে জল খেতে।"

এখন যদি ভাই, কন্যা ছায়ায় ছায়ায় যাবে ব'লে. কোন মা স্নেহবশে আম-কাঁঠালের বাগান দিতে চাহিতেছেন, এমন কথা বেহাই শুনিতে পান —তা হ'লে অমনই কহিবেন—"বেয়ান, আম-কাঁঠালের বাগান আর কি হবে, আমরা কলিকাতায় থাকি, এত দূরে এসে আম-কাঁঠাল নিয়ে যেতে ঢের খরচ পড়বে—আর কে দেখে, কে বা শুনে; তা দুর্গাকে আমরা ভিজে

গামছা মাথায় দিয়ে নিয়ে যাব এখন, আম-কাঁঠালের বাগানের দামটা আমাকে দিয়ে দাও—ও টাকা তোমার মেয়ে জামাইয়েরই থাকিবে।”

পুরাতন কথা আছে, লিখিলে পুঁথি ঢের বেড়ে যায়—তা আজিকার মত আমার এই চিঠি শেষ করি—আশা করি, এই পত্রপাঠে ছেলেবেলাকার আম-কাঁঠালের শ্লোকটা সকলের মনে পড়িবে, এবং আম-কাঁঠালের বাগানের ছায়ার মূল্যটাও যে বরকর্ত্তার ন্যায্য প্রাপ্য, এই প্রথা ঘরে ঘরে প্রচলিত হইবে। এবং সকলে আমাকে চির আয়ুষ্মতী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন। (‘সাধনা,’ আষাঢ় ১৩০০)

শৈশবে ধর্ম্ম-শিক্ষা

বৎসরান্তে আবার সেই শরৎ ফিরিয়া আসিল—আবার সেই দুর্গাপূজা আসিতেছে। কিন্তু বাঙ্গলার ঘরে ঘরে কই সে পূজার আয়োজন? কই সে দরিদ্রের আশা, প্রবাসীর প্রিয়-মিলন, বালকের উল্লাস? কই, সে ঘরে ঘরে আগমনী কই? বিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহার সহিত তুলনা করিবারও বড় আবশ্যক নাই, গত বৎসরের সহিত তুলনা করিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে, গত বৎসরেও যে উৎসব ছিল, যতগুলি প্রতিমা হইয়াছিল, এ বৎসর তাহাও নাই। গৃহস্থে আর কেহ দুর্গাপূজা করেন না। অবস্থাপন্ন ধনীদিগের কাহারও কাহারও গৃহে পূজা হয়, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মভাবের অভাবই দেখা যায়। সেই পূজার মধ্যে পূজা নাই, কেবল মাত্র উৎসবটুকু আছে। গত বৎসর যাহার গৃহে পূজা হইয়াছিল, এ বৎসর দেখিবে, হয়ত সেই পূজার দালান বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, দুই ভ্রাতা তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে পূজার দালানের মাঝেও পাঁচিল পড়িয়াছে—একজনের রান্নাঘর হইয়াছে—একজন তাঁহার নিজের অংশের দালান ভাঙ্গিয়া বৈঠকখানা বানাইতেছেন।

পূজা শেষ হইল। পল্লীগ্রামের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা পড়িয়া আছে; অধিবাসীরা কলিকাতায় বাসা করিয়া রহিয়াছেন—দেশের জল বায়ু অসহ্য, ছেলেরা কলিকাতায় লেখাপড়া করে, কর্ত্তাকে সদাসর্ব্বদা মামলা মোকদ্দমার জন্য কলিকাতায় না থাকিলে নয়—সুতরাং সমস্ত পরিবারই কলিকাতায়। গৃহের শালগ্রামশিলার নিত্য পূজা রীতিমত পুরোহিত করিয়া থাকেন, দুর্গাপূজার সময় কর্ত্তার বৃদ্ধা মাতা দেশে গিয়া "দালানটি ফাঁক দিতে নাই" বলিয়া, অমনি অমনি পূজাটি সারিয়া আসেন। কোন বৎসর হয়ত ছেলেপিলে বধূ সমস্ত পরিবার পূজার সময় দেশে যান, কিন্তু সে কেবল একটু বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য, পূজার জন্য নহে। যদি দেশের জলবায়ু ঐ সময়ে অস্বাস্থ্যকর থাকে, তবে কেহই আর দেশমুখো হয়েন না। আপিস স্কুল হইতে পূজার ছুটি পাইয়া, কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া পূজার সময় প্রায় সকলেই ভ্রমণে বাহির হয়েন। পূজার কথা তখন

আর মনে থাকে না, পিতৃপুরুষের ক্রিয়াকলাপ কোন মতে সারিয়া লইতে বলেন। গৃহস্থঘরে আনন্দোচ্ছ্বাস দূরে থাক্, কর্ত্তা গৃহিণী ভাবিয়া অস্থির হইতেছেন যে, কিরূপে সংবৎসরের দেনা মিটাইব, কিরূপেই বা সন্তানদিগকে এক একখানি কাপড় বা পোষাক দিব! কাপড়ের দোকানে নানাবিধ কাপড় সাজানো হইতেছে, দর্জ্জির দোকানে লাল, নীল, সবুজ, জরি-দেওয়া, ফুলকাটা ইত্যাদি পোষাক ঝুলিতেছে; জুতার দোকানে আলমারি ভরা জুতা, তবুও মুচিদিগের বিরাম নাই—ঘাড় হেঁট করিয়া জুতা সেলাই করিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া সঙ্গতিহীন নিশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছেন, অবস্থাপন্ন দরদস্তুর করিতেছেন, কাহারও ঐ সকল "খেলো বাজারে" জিনিস মনোমত হইতেছে না, ভাল করিয়া তৈরি করিয়া দিবার জন্য বায়না দিতেছেন। দোকানী পসারী, ক্রেতা বিক্রেতা, সকলেরই মনে এক ভাবনা—কিরূপে দু-পয়সা উপার্জ্জন হয়, কিরূপে পূজাটি মানে মানে কেটে যায়। এখন বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই দ্রব্যসামগ্রী মহার্ঘ হইয়াছে, আয়ে আর কুলায় না—গৃহস্থ ধার করিয়া বৎসর চালাইতেছেন; সকলকে আশা দিয়াছেন—পূজার সময় মিটাইব। হায়! পূজা ত আসিল, কিসে যে কি হইবে, কি দিয়া যে দেনা মিটাইবেন, তাহার উপায় নাই!

কিন্তু সঙ্গতিহীনতাই কিছু ধর্ম্মের অভাব নহে, আর দুর্গাপূজাই কিছু এক মাত্র হিন্দুধর্ম্ম নহে। আমাদের যে মনুষ্যত্বের সার সামগ্রী প্রেম, ইহা আমরা কাহাকেও অর্পণ করিতে পারিতেছি না। ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাঁহার অস্তিত্ব লোপ হইতেছে। তাঁহাকে বিশ্বাস না করিলে তাঁহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু আমরা কি লইয়া এ জীবন বহন করিব? প্রেমহীন জীবন নিয়তই সুখশান্তিবিহীন হইবে!

অনেকে বলেন যে, ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমাদের যত কিছু দুরবস্থা। ধর্ম্মভাবের অভাব, ইংরাজী অনুকরণ, বিদেশী দ্রব্যে স্পৃহা, সকলই ইংরাজী শিক্ষার ফল। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে এ কি ইংরাজী শিক্ষার দোষ, না আমাদের জাতির দোষ! আমি ত যতটা অনুভব করি, সেকালেও আমাদের সাধারণের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার অভাব ছিল। শিশুকালে আমাদিগকে কোনরূপ ধর্ম্মের বিষয় জানানো হইত না, এখন ত হয়ই না। বালককালে আমরা প্রতিমা-পূজার কেবল মাত্র উৎসবটুকু উপভোগ করিতাম। পূজা করিবার কোন অধিকার আমরা পাইতাম না—দেবদেবী

স্পর্শেও শূদ্রের অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ আসিবেন, তিনি পূজা করিবেন; দেবতাকে পূজা করিবার অধিকার সাধারণের নাই। "দেখিস্ যেন ঠাকুর ছুঁস্ নে, দেখিস্ যেন পূজার সামগ্রী ছুঁস্ নে," এই কথাই শুনিয়া আসিতেছি। পাঁঠা বলির সহিত বালকে কিছুই পূজার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না; কোমলপ্রকৃতির বালক হইলে ভয়ে সারা হয়, পাঁঠা বলির সময় নিভৃতে লুকাইয়া থাকে; নিষ্ঠুরপ্রকৃতি হইলে আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়। পুষ্পাঞ্জলির সহিতও বালকদের কোন সম্বন্ধ নাই—পূজার তাহারা এই মাত্র জানে, দুর্গাঠাকুর আমাদের মত চাল-কলা ও পাঁঠা খেয়ে থাকেন। তবে প্রভেদের মধ্যে আমরা রেঁধে খাই, আর ওঁর কাছে কাঁচা ও জীবন্তটাকেই ধরিয়া বলি দিলেই ওঁর খাওয়া হয়। অন্য কথা কি কহিব, দুর্গাপূজার সাধারণ ভাব এই যে, বৎসরান্তে উমা তাঁহার পুত্র-কন্যাগুলিকে লইয়া একবার তিন দিনের জন্য পিত্রালয়ে আসেন। তাই সেই কয় দিন আমরাও একটু আমোদ-আহ্লাদ করিয়া লই। গৃহে যে নিত্য নিয়মিত শালগ্রামশিলা পূজা হয়, তাঁহার সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। পুরোহিত আসিয়া পূজা করেন, ঠাকুরমা স্নান করিয়া পূজার আয়োজন করিয়া দেন। বালক যদি ঠাকুরঘরের চৌকাঠ মাড়াইল ত সর্ব্বনাশ! "হাঁ হাঁ, করিস্ কি, করিস্ কি—এখন যা, এখন যা, পূজো হয়ে যাক, তখন দুটি ছোলা দেব এখন।" বালকের ধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধ ঐ ছোলাগুলি পর্য্যন্ত। বালক-বালিকারা যে সকল জিনিস হাতে না পায়, তাহার প্রতি তাহাদের অধিক আকর্ষণ হয়, সুবিধা পাইলে বালক দিব্য করিয়া শালগ্রামশিলা লইয়া খেলা করিতে ছাড়ে না। তার পর যখন দেখে যে, তাহার জন্য অতিশয় তিরস্কৃত হয়, এবং ঠাকুর ছুঁলে হাত বেঁকে যাবে, এই শিক্ষালাভ করে, তখন তাহার ঠাকুরের প্রতি স্নেহভক্তি কিছু মাত্র থাকে না। ঠাকুর ত ঠাকুর আছেন, সুবিধার মধ্যে মাঝে মাঝে ছোলা কলা পাওয়া যায়, তাও আবার পুরুত ঠাকুরই অধিকাংশ নিয়ে যান, নইলে দুটি বেশী পাওয়া যেত।

এই ত নিত্য পূজার সারসংগ্রহ। তার পর পার্ব্বণ পূজার অর্থ এই যে, কেবল "হে ঠাকুর, আমাকে অমুক দাও, হে ঠাকুর, অমুক দাও।" সরস্বতী পূজার পূর্ব্বদিন দোয়াতগুলি ধুইয়া রাখা হইয়াছে, সে দিন দোয়াত ছুঁইলে আর বিদ্যা হবে না। বালক পূজা করিতেছে;—

আইলেন সরস্বতী নির্ম্মলবরণে
হস্তে কঙ্কণ নূপুর চরণে,
গলায় গজমতি মুকুতার হার,
দাও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার।

বালিকা মহেশ্বরপূজা করিতেছে ;—

হর হর শঙ্কর তুমি দীননাথ,
কখনও না পড়ি যেন মূর্খের হাত।

সেঁজুতির ব্রত করিতেছে—

ময়না ময়না ময়না
সতীন যেন হয় না,
হাতা হাতা হাতা
খাই সতীনের মাথা।

শুধু দেবতার কাছে চাহিতেছে—তুমি আমাকে দাও। তুমি আমাদিগকে ভালবাস, তুমি আমাদের সকলের চেয়ে বড়, সকলের চেয়ে ভাল ; তোমার কাছে অসত্য নাই, অবিচার নাই, অন্যায় নাই, তুমি আমাদের মায়ের অপেক্ষা স্নেহময়ী, পিতার অপেক্ষা মঙ্গলময়, এমন পূজা প্রাচীন কাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত আমরা শিশুদিগকে শিক্ষা দিই নাই। আমাদের পূজার মধ্যে শিশুরা শুধু উৎসব এবং ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া আসিতেছে মাত্র। বাটীতে কোনরূপ বিপদাশঙ্কা উপস্থিত হইলে শিশুরা দেখে যে, নারায়ণকে তুলসী দান ও শিবস্বস্ত্যয়নের জন্য পুরোহিত ঠাকুর আসেন। শুদ্ধ যে ঈশ্বরের নিকট ভিক্ষা করিতে হয়, তাহা নয়, তাহাও আবার আমরা নিজেরা পারি না, তাহার জন্য আবার মধ্যস্থ চাই !

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর দিবস শিশুরা সকলে মিলিয়া করতাল লইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাইয়া বেড়ায় ;—

ব্রহ্মা নাচে বিষ্ণু নাচে আর নাচে ইন্দ্র,
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ।

কিন্তু সেই কৃষ্ণ কে ? না, সেই যে মা খোকাকে ঘুম পাড়ান, আর শ্লোক বলেন ;—

ও ললিতে চাঁপ কলিতে হেতা এসে দেখ্‌সে
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চুড়ো বাঁধা মিন্‌সে,
চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদম-তলায় কে ?—
নন্দের বেটা কেষ্ণ ঠাকুর ঘোমটা টেনে দে !

এই সকল শ্লোকেতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুদিগের মনে কিরূপে স্নেহ ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে ? খৃষ্টানগণ তাঁহাদের যীশুখৃষ্টকে সাধারণের চক্ষে কেমন সুন্দর করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহার কি এক অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছিল। খৃষ্টানেরা অন্য অন্য শিক্ষার সহিতই ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া থাকে। শিশুগণ মায়ের মুখের দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া গল্প শুনে যে, তাহাদের মতন ছোট শিশুদিগকে যীশুখৃষ্ট বড় ভালবাসেন। তিনি যখন আসিয়াছিলেন, তখন সে সময়ের সকল শিশুকে তিনি কোলে লইতেন। এই যীশু তাহাদের এত ভালবাসেন, তিনি এই সমস্ত মানবের জন্য তাঁহার হৃদয়ের রক্ত দান করিয়াছেন, সেই জন্য আমরা তাঁর পূজা করি, এবং বৎস, তুমিও তাঁহাকে ভালবাস। শিশুকাল হইতে এই বিশ্বাস, এই অলৌকিক মহত্ত্বের আদর্শে তাহারা বর্দ্ধিত হয়, আমাদের মত তাহাদের দেবতা অন্বেষণ করিয়া ঘুরিতে হয় না।

সমাজ যে স্রোতে চলিতেছে, তাহাতে উজান বহানো অসাধ্য। জোর করিয়া কেবল আবশ্যক বুঝিয়া কোন মতেই প্রতিমা পূজায় শ্রদ্ধা ভক্তি উদ্রেক করানো অসম্ভব। এখন স্বহস্তে রচিত দেবতায় কাহারও বিশ্বাস হয় না, সেই জন্য পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষার অর্থ কেবল ঝনাৎ করিয়া টাকা দেওয়া মাত্র। প্রতিমার সম্মুখে হাত জোড় করিয়া ঘাড় হেঁট করিতে যুবকসম্প্রদায় নিতান্ত অনিচ্ছুক—প্রতিমায় ভক্তি নাই, দেবতায় বিশ্বাস নাই। সেই জন্য বাটীর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটিই পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া থাকে। তাহারা জানে—টাকা দেব, সন্দেশ পাব—ওদের বাড়ী দুর্গাপূজা। সেকালে বালিকাদের মধ্যে যাহা কিছু ব্রত নিয়ম, মহাদেবপূজা ছিল, কিন্তু বালকদিগের কোন রকম ব্রত নিয়ম, পূজা বন্ধন ছিল না। শুনিয়াছি, বালিকারা যখন যা ব্রত করিত, তখন বালকেরা তাহাদিগকে উপহাস করিয়া বড়ই বিব্রত করিত। বালকেরা বালিকাদিগের ব্রত নিয়মের মধ্যে কিছু মাত্র পবিত্রতা অনুভব

করিত না—মেয়েগুলো সতীনের মাথা খাচ্ছে, চল ভাই দেখে আসি ইহাই তাহারা সার জানিত। এই সকল বালক যখন বড় হইয়া কেহ মেজেষ্টর, কেহ ডাক্তার হইলেন, তখন তাঁরা নিজের মেয়েদের ব্রত করিতে দেখিলে বলিবেন, "যা যা, সতীনের মাথা খেতে হবে না, ঘরে সন্দেশ আছে—খে গে—বেলা হয়েছে পিত্তি পড়বে।" "যাও মা, পড়া কর গে—স্কুলে যাও।" গৃহিণীর ইচ্ছা থাকিলেও কখনই কর্ত্তার অমতে সেই প্রাচীন প্রথা রক্ষা করা যায় না। এই সকল কারণে বিশ্বাসের ভিত্তি জীর্ণ হওয়াতে প্রাচীন প্রথা সকল লোপ পাইতেছে। কিন্তু তাহার স্থলে যে নূতন ধর্ম্মশিক্ষা আবশ্যক, ইহা কেহ কখনও ভাবেন না। বহু দূরদেশ হইতে ইংরেজ আসিয়া মস্ত মস্ত ইংরাজী স্কুল কলেজ স্থাপন করিল, ইংরাজী শিখিলে মোটা মোটা মাহিনার চাকরি মিলিবে—আমরাও অমনি পায়ে জুতা, মাথায় ছাতা, স্লেট হস্তে দলে দলে স্কুল অভিমুখে ছুটিয়াছি। মিশনরী পাদরীরা খৃষ্টান করিবার অভিপ্রায়ে পাড়ায় পাড়ায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। স্কুলের মাহিনা দিতে হয় না। একটা ঝি আসিয়া সঙ্গে করিয়া মেয়েদের লইয়া যায়। গৃহিণী কহিলেন, "দিয়ে আয় মেয়েগুলোকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে, দুপুর বেলা আটকানো থাকবে; যা হোক খগা বগা শিখবে আর পাড়ায় পাড়ায় রোদে রোদে বেড়িয়ে হাড় জ্বালাতন করবে না।" মেয়েরা বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাইতেছে, শিখিতেছে কি না কতকগুলি খৃষ্টানী গান ও যীশুখৃষ্টের কথা, কিন্তু তাহাও অশ্রদ্ধার সহিত, ঘৃণার সহিত; বালিকাদিগের যীশুখৃষ্টের প্রতি ভক্তি নাই, ভালবাসাও নাই। পাখী পড়ার মত অদ্ভুত বাংলা ভাষায় কতকগুলি বুলি তাহারা শেখে এবং তাহার সহিত খৃষ্টানদের ঘৃণা করিতে শেখে। কারণ, বাড়ীতে গেলেই তাহাদের কাপড় ছাড়িতে হয় এবং মেম ছুঁইয়াছে বলিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে হয়। এইরূপ ছয় সাত বৎসর বয়স হইতে জোর দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালাভ করিয়া বালিকারা বিদুষী হইয়া উঠে। শৈশব কালে তাহারা বিন্দুমাত্র ধর্ম্মের ধার ধারে না—মাতা হইয়া নিজ পুত্রকন্যাদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই শিক্ষা দিতে পারে না।

আমাদের প্রবাদ আছে;—

"আপ্ত (আত্ম) রেখে ধর্ম্ম তবে পিতৃপুরুষের কর্ম্ম।"

তা এ কথাটা শুধু কি আমাদেরই ? সকল জাতিরই তাই।

ইংরেজ আমাদের জন্য যে বীজ বপন করিয়াছে, এখন আমরা যদি ভাল করিয়া তাহার তদ্বির করি, তবে তাহা হইতে শুভ ফল পাইতে পারি। সেটা আমাদের হাত। আমরাও এখন নিজেরা স্কুল কালেজ করিতে শিখিয়াছি—কিরূপ শিক্ষা দিলে বালক-বালিকার মঙ্গল হইবে, কিরূপে শৈশব হইতেই তাহারা ধর্ম্ম আলোচনা করিতে পাইবে, কিরূপে তাহাদের দেবতাকে তাহারা স্নেহময় কল্যাণময় বলিয়া জানিবে, বিদ্যাশিক্ষার সহিত এই শিক্ষা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। শৈশবে মাতা রূপকথার সহিত মহাভারত রামায়ণের পুণ্যময় কথা শিশুদিগের নিকট গল্প করিতে পারেন। রামের কর্ত্তব্যপরায়ণতা, কৃষ্ণের বিপন্নসহায়তা, ভরত লক্ষ্মণের ভ্রাতৃস্নেহ, কর্ণ অর্জ্জুনের বীরত্ব, ধ্রুব প্রহ্লাদের দেবভক্তি শিশুর মনে ধর্ম্মের সহিত উদারতা শিক্ষাদান করিবে। উদ্দালকের গুরুভক্তি শুনিয়া তাহারা নিজ নিজ শিক্ষককে ভালবাসিতে শিখিবে; শিক্ষক অস্পৃশ্য, শিক্ষক ছুঁইলে অশুচি হইতে হয়, এই ভাব তাহাদের মন হইতে দূর হইবে।

এ ভাব মনে থাকিলে কখনই সেই শিক্ষকের শিক্ষা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না। যদি খৃষ্টান শিক্ষকের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয়, তবে প্রথমে ঘৃণার পরিবর্ত্তে শিক্ষককে ভালবাসিতে শেখানো উচিত। শুদ্ধ ব্রাহ্মণেই এখন গুরু হন না, সকল জাতিই শিক্ষাগুরু। ব্রাহ্মণে শূদ্রে আর বিশেষ প্রভেদ নাই, আর ব্রাহ্মণের প্রতি সেরূপ ভক্তিও নাই। দেবতা পূজা করিয়া, শিক্ষা দান করিয়া আর ব্রাহ্মণের চলে না, দেশীয় ভাষায় উপার্জ্জনের কোন সহায়তা করে না, ব্রাহ্মণেও ইংরাজের দাস হইয়াছে। গুরু এসেছেন বলিয়া আর কেহ ভয়ে তটস্থ হয় না, গুরুর অভিশাপে আর ভয় নাই; কারণ, গুরুঠাকুর হয়ত রেলির বাড়ীর কেরানী, দিব্য ইংরাজী জুতা পায়ে, শার্ট-পরা, একটি অতি ক্ষুদ্র শিখা টেরির পশ্চাতে অতি সংক্ষেপে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, অথবা মোটেই নাই—এই গুরু আসিলে আর কাহাকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না।

ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই এখন পরস্পর পরস্পরকে সমকক্ষই বিবেচনা করে। সুতরাং কেবল মাত্র পূজক ব্রাহ্মণকে দেবপূজার অধিকার দিয়া সাধারণে সন্তুষ্ট নহেন। একে দেবতায় বিশ্বাস নাই, তাহাতে ব্রাহ্মণে ভক্তি নাই, তবে কেবল উৎসব আর টাকা খরচ ছাড়া পূজার আবশ্যকতা

কেহ বুঝিতে পারেন না। এদিকে দেবতা অভাবে মন হু-হু করিতেছে, পৃথিবী অসার মনে হইতেছে। সামান্য কারণে আত্মহত্যা করিতে কেহ ভীত হয় না, ইহ কালের বন্ধন নাই, পরকালের ভয় নাই। ('সাধনা,' আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০০)

স্বায়ত্ত সুখ

আজকাল আমাদের দেশে নানা জনে নানা রকমে অসুখ বোধ করে। কিন্তু আহার অভাবে যে অসুখ, তাহা জীব মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকে, এবং তাহা সকলের পক্ষে একই রকম। আমাদের আজকালকার প্রধান অসুখ যে, আমরা পেট ভরিয়া আহার পাই না। শুধু বাঙ্গলার কথাই ধরি—অল্প সময়ের মধ্যে খাবার জিনিসের মূল্য কত না বাড়িয়া গিয়াছে। অন্য জিনিস সুপ্রাপ্য ও সুলভ হইলেও, আহার অভাবে কোন গৃহস্থ সুখী নহে। দেশে এন্‌ট্রান্স এফ. এ.-পাস লোকের অভাব নাই; কিন্তু কেরানীর মাহিনা দশ পনর টাকা মাত্র। এ দিকে চাউলের মণ ৪৲ টাকা। একটি গৃহস্থ অর্থাৎ মা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, ভাই, ভগ্নী ইত্যাদির দুই মণ চাউলের কম মাসটি যায় না। ধরিলাম,, ১৫৲ টাকা যদি মাসিক আয় হয়, তবে কেমন করিয়া গৃহস্থের চলে! শুধু স্ত্রীটিই কিছু আমাদের "পরিবার" নয়। আমি ১৫৲ পাই, এক বৎসর কাজ হইয়াছে। বাবা ৭০৲ পাইতেন, কষ্টে এন্‌ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম। কিছু আমার বিবাহের যৌতুকের সামগ্রী লইয়া, কিছু বা ঋণ করিয়া একটি ভগ্নীর দুই বৎসর হইল বিবাহ দেওয়া হয়। চল্লিশ টাকা হইতে এমন আর কিছু বাঁচে না যে ঋণ পরিশোধ হয়, কাজেই এন্‌ট্রান্স পাস হইয়াই চাকরির চেষ্টা করিতে হইল। অনেক হাঁটাহাঁটি, অনেক সুপারিশে ছয় মাস এপ্রেন্‌টিস থাকিয়া এই ১৫৲ টাকার কাজটি জুটিল। বিধাতার বিড়ম্বনা, দুই মাস কাজ হইতে-না-হইতে বাবা মারা গেলেন। তখন মা, ভাই, অবিবাহিতা ভগ্নী, সন্তান-সম্ভাবিতা স্ত্রীর আমিই এক মাত্র অন্নদাতা। তাহার উপর ভগ্নীর বিবাহের ঋণ কিছু আছে। উপায় কি—উপায় কেবল ঈশ্বর। দেশে একটু ভিটা আছে, কিছু ধানের জমি আছে, ভাগে যে ধান পাওয়া যায়, তাহাতে বড় জোর বৎসরের মধ্যে তিন মাস চলিতে পারে। কলিকাতার বাসাখরচ করিয়া বাস করা অসাধ্য। তাই কোন প্রকারে বাস্তুভিটা বাসের যোগ্য করিয়া পরিবার দেশে রাখিয়া আসিলাম। সেখানে ম্যালেরিয়ায়, আহারের কষ্টে তাহারা জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিল। ছয় মাস পরে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত প্রসূতি লিভার পিলা শুদ্ধ একটি পুত্রসন্তান

প্রসব করিলেন। ডাক্তার তাহার প্রকৃতিপ্রদত্ত খাদ্য মাতৃদুগ্ধ বন্ধ করিয়া রবিন্‌সন্স বার্লির ব্যবস্থা করিলেন। হাতে একটি পয়সা নাই, তা এখন ॥/১০ পয়সা কোথা পাব? পুত্র হইয়াছে, সুসংবাদে কোথায় মানুষ একটা সন্ধ্যাও একটু প্রফুল্ল হইবে, না হা ঈশ্বর, আবার এ কি দায়ে ফেলিলে? পুত্র হইয়াছে শুনিয়া বুক দশ হাত হইবে, না এমন ভাঙ্গিয়া গেল যে, সে দিন আর আহার করিতে যাওয়া হইল না। দেশে পরিবার পাঠাইয়া দিয়া কাকার শ্বশুরবাড়ী দু-বেলা দুটি আহারের জোগাড় করিয়া লইয়াছিলাম। রাত্রি যাপনের জন্য সিমলায় মামার বাসায় একটি করিয়া টাকা দিতে হয়। রাত্রি যাপন করি সিমলায়, আহার করি গরাণহাটায়, কাজে যাইতে হয় লালদীঘি। এক বৎসরের ষড়্ঋতু এমনই করিয়া কাটিয়াছে। সম্প্রতি হাতীবাগানে একটি প্রাইভেট টিউশনি জুটিয়াছে, বেতন ৪৲ টাকা, সন্ধ্যার পর দুই ঘণ্টা পড়ানো। কি করি, নিতে হইল— আর চলে না। নিজের নিতান্ত দরকারের তালিকা, বৎসরের হিসাবে খরচ—ধুতি ৪ জোড়া দাম—৬৲, জুতা দু-জোড়া, চটি—৩৲, উড়ানি ২ জোড়া—২॥০, পিরান ৪টা—৩৲, ছাতা ১টা—১৲, জলখাবার—১২৲, শীতের গায়ের কাপড় ১খানা—৫৲, এবং খুচরা খরচও ১৫।১৬ টাকা। পানটা, তামাকটা, দেশে যাইবার পথখরচ ইত্যাদি আঠার রকম খুচরা খরচ ত আছেই। এই ত ভাতখরচ ব্যতীত নিজের জন্যই এক বৎসরে ৫০৲ টাকা পড়িয়াছে, তাই শরীর না বহিলেও প্রাইভেট টিউশনি লইতে হইয়াছে। যা হোক, এখন নিজের ত প্রতি মাস গড়ে ৫৲ করিয়া খরচ, বাকি থাকে দশ। পরিবারের খাইখরচ ছাড়া ভাইটির ছাতা, জুতা, জামা, চাদর, বই, স্কুলের মাহিনা, বিবাহিতা বোনটির তত্ত্বতাবাস, যাহা না করিলে নয়—যেমন ষষ্ঠীবাঁটার তত্ত্ব, পূজার তত্ত্ব দুটি প্রধান—আর ছোটখাটো বৎসরে আরও অন্ততঃ দু-তিন বার ত বোনটির সংবাদ নিতে হয়। একবার শ্বশুরবাড়ী হইতে আনা, তাহার খরচ, পুনরায় পাঠাইবার সময় এক জোড়া নূতন শাড়ী, গামছা, মসলা, নারিকেল তৈল, সন্দেশ ইত্যাদি, তাহাতেও চার পাঁচ টাকা ব্যয় হইয়াছে। স্ত্রীটি ম্রিয়মাণ, সাধে একখানি ভাল শাড়ীও হয় নাই—গহনা ত দূরের কথা। তবু শাশুড়ীর অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া পাঁচ ব্যঞ্জন, ভাত ও লালপেড়ে শাড়ী দেওয়া হয়, তাহাতেও দশ টাকা খরচ হইয়াছে। মাসিক

আয় ত ১৫৲ টাকা, কিন্তু অবশ্যকর্ত্তব্য ত পর্ব্বতপরিমাণ—কোনটিই বাদ দিবার জো নাই। ভাগ্যে শ্বশুর মহাশয় তাঁহার মেয়েটিকে প্রসবসময়ে নিজালয়ে লইয়া গিয়াছেন, তাই রক্ষা যে, সূতিকা-খরচটা আমার লাগিল না। কিন্তু শ্বশুর মহাশয় আমার পুত্র হইয়াছে, এই শুভ সংবাদের সহিত প্রসূতি ও শিশুর জন্য যে সকল জিনিসপত্রের ফর্দ্দ পাঠাইয়াছেন, তাহা দেখিয়া ত আমার চক্ষু স্থির। বার্লি, সাগু, মিশ্রী, ফ্ল্যানেলের জ্যাকেট একটা, ঐ সাদা দুটি, শিশুর ফ্ল্যানেলের জামা দুটি, ঐ সাদা দুটি, ইত্যাদি। এদিকে মাসকাবারের ৮ দিন বাকি—হাতে গণ্ডা দুই যে পয়সা ছিল, তাহা পত্রবাহকের জলপানেই ব্যয় হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত অন্ততঃ ৫।৬ টাকা চাই, নইলে মান থাকে না। পত্রবাহক শ্বশুরবাড়ীর নাপিত; সে জানে, জামাইবাবু কলিকাতায় চাকরি করেন। প্রথম পুত্র হইয়াছে, মোটা বকশিশ পাইব। অতএব হাস্যবদনে হস্তে পত্র প্রদান করিয়া জোড়করে "আজ্ঞে, সুসংবাদ আছেন, মশায়ের পুত্রসন্তান হয়েছেন, শাল বকশিশ আজ্ঞা হোক।" সুসংবাদ শুনিয়াই ত ১৫৲ টাকার কেরানী মহাশয়ের মাথা ঘুরিতে লাগিল, তার পর পত্র পাঠের ত কথাই নাই। ভাগ্যে "আহ্লাদে পেট ভরে" বলিয়া একটা চলতি কথা আছে, তাই সে দিন আমার আহার করিতে গমনে অনিচ্ছা দেখিয়া বাসার সকলে "আহ্লাদ" মনে করিলেন ও নিজেরাও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পোলাও কালিয়ার একটা ফর্দ্দ চট্ করিয়া করিয়া ফেলিলেন। খরচ বেশী নয়—বাসার দশ জন, নাপিত, আমি, ঝি ও বামন ঠাকুর—খরচ মোট ১০৸৹ আনা। আমার পুত্র হইয়াছে, আমি ভোজ দিতে বাধ্য। আপাততঃ সকলে উদ্যোগী হইয়া ধারে সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন, সে বিষয় চিন্তা নাই বলিয়া সকলেই আশ্বাস দিলেন। তার পর—তার পর মাসকাবারে? থাক্ সে কথা।

এমনই অনাটন ঘরে ঘরে। ঘরে ঘরে পেট ভরিয়া ভাত পাওয়া যায় না। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যেমন চাউলের মণ ছিল পাঁচ সিকা, তেমনই দাল, কড়াই, দুগ্ধ, সকলই সুলভ ছিল। প্রায় সকলেরই একটু একটু ভিটা ছিল, বাড়ীভাড়া লাগিত না। তাই ১৫৲ টাকা আয় হইলে সচ্ছলে চলিয়া যাইত। আজকাল পল্লীগ্রামের লোক ঝাঁটাইয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছে, ভাড়াটিয়া বাড়ী পাওয়া দুষ্কর, ভাড়া চারগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। জ্বরের জ্বালায় গ্রামে বাস করিবার জো নাই।

দেশের উন্নতির জন্য এখন অনেকেই অনেক রকম কাজ করিতেছেন, কেহ কংগ্রেসে যোগদান করেন, কেহ প্রবন্ধ লেখেন, কেহ বক্তৃতা করেন, এমনই স্বদেশের জন্য কিছু-না-কিছু করিতেছেন ও কিছু করিবার জন্য প্রাণ চাহিতেছে। যদি দেশের উন্নতি করিতে হয়, তবে দেশের সাধারণ সকলের প্রতি ছোটখাটো অভাব অসুবিধার দিকে প্রথমে তাকানো উচিত। প্রথম দেশের স্বাস্থ্য যাহাতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় এবং পরে আমাদের নিজেদের বারো মাসে আবশ্যকীয় জিনিসগুলি যাহাতে আমরা দেশ হইতেই পাইতে পারি, তাহারই পথ দেখা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের কাছে কেবল অমুক দাও, তমুক দাও বলিয়া ক্রমাগত ভিক্ষা না করিয়া যদি নিজেরা নিজ নিজ গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াবার কতকটা চেষ্টা করি, তবে আদত কাজ হয়। আমরা যদি বিদ্যাশিক্ষার সহিত ক্রমিক একটি সবল ও সুস্থকায় জাতি হইতে পারি, তবে কালে কখন-না-কখন দেশের উন্নতি হইতে পারিবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, অনাটনে মনের ক্লেশে আমরা সমধিক হীনবল ও ক্লিষ্ট হইতেছি। দুই চার জন ধনী বা দুই চারি জন মোটা মাহিনার বাঙ্গালী লইয়া ত দেশ নহে, জনসাধারণ লইয়া দেশ। গবর্ণমেণ্টের কাছে যদি ভিক্ষা করিতে হয়, তবে জনসাধারণের মঙ্গলসূচক কোন কিছু ভিক্ষা করিলে দেশের কাজ হয়। নয়ত মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার দশ জন ছিল, কেন পাঁচ জন করিলে, দাও দশ জন করিয়া, বলিয়া চীৎকারে কি ফল? কমিশনার দশ জন হইলেও যা, পাঁচ জন হইলেও তা। ভোট লইবার সময় ব্যতীত কবে কোন্ গৃহস্থ কমিশনারের টিকি দেখিতে পান? দেশের লোক কমিশনার হইয়া যদি নিজ নিজ পল্লীর লোকের খবরাখবর লইতেন, যদি নিজ নিজ পল্লী পরিষ্কারের দিকে মনোযোগী হইতেন, যদি পল্লীর ইতর ভদ্র সকলের সহিত সহোদরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া হিতাহিত বুঝাইয়া দিতেন, তবে বুঝিতাম যে, কমিশনার যত অধিক হয়, ততই সাধারণের মঙ্গলের বিষয়। নূতন মিউনিসিপ্যাল বিল লইয়া ত শিক্ষিত মহলে মহা আন্দোলন চলিতেছে। তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহার ফলাফল তাঁহারাই জানেন—কিন্তু জনসাধারণের বিশ্বাস যে, কলিকাতার খোলার ঘরগুলা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া কোম্পানী আগুন ধরাইয়া দিবেন, কলে জল থাকিবে না, আগুন নিবাইবার পন্থা পূর্ব্বেই রোধ করিয়া রাখা হইবে। মৃতদেহ আর

পোড়ানো হইবে না, হিন্দু মুসলমান সকলকেই গোর দিতে হইবে। এমনই করিয়া সকল খোলার ঘর ভস্মীভূত করিয়া ও অন্য নানা উপায়ে দরিদ্র লোকদিগকে আর শহরে বাস করিতে দিবেন না। দেশের শিক্ষিত লোকেই বড় বুঝিয়াছেন যে, নূতন বিল পাস হইলে কতটা সুবিধা হইবে বা কতটা অসুবিধা হইবে, তা দেশের জনসাধারণ বুঝিবে। তাহারা কেবল একটা অসুবিধাজনক নূতন রকম কি প্রথা প্রচলিত হইবে, তাহার অপেক্ষা করিয়া ভয় পাইতেছে মাত্র। কিছু দিন পূর্ব্বে কন্‌সেণ্ট অ্যাক্ট নামক একটা বিল পাসের বিরুদ্ধে গড়ের মাঠে মস্ত "বিরাট্" সভা হইয়াছিল, এবং বিল পাস হইলে যে হিন্দুধর্ম্ম একদম লোপ পাইবে, ইহা জ্বলন্ত অক্ষরে জনসাধারণকে জানানো হইয়াছিল, কিন্তু সেই বিল পাস হইয়া গিয়াছে, সেই হিন্দুধর্ম্ম যেমন ছিল তেমনই আছে। একটি কোন নূতন নিয়মের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট উত্থাপন করিলেই এ দেশের সকল সংবাদপত্র, কেহ বুঝিয়া, কেহ না বুঝিয়া, ঐ বাঘ ঐ বাঘ করিয়া এমন চীৎকার করিতে থাকেন যে, যখন যথার্থ বাঘ আসিয়াছে বা আসিবে, তখন আর গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাতও করিবেন না। আমরা যদি নিজে নিজে কাজ করি ও তাহার সহিত যদি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করি, তবে সাহায্য পাইতে পারি—প্রাচীন প্রবাদ কথা সকলের মনে পড়িবে।

"খাটে খাটায় লাভের গাতি, তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি,
ঘরে ব'সে পুছে বাত, তার ঘরে হা ভাত জো ভাত।"

আমরা ঘরে বসিয়া বাত পুছিতেছি, নিজেরা খাটি না, তাই জন্যই ত আমাদের ঘরে হা ভাত জো ভাত হইয়াছে। আমাদের প্রপিতামহ পিতামহ ইহ লোকে যশ আকাঙ্ক্ষায় ও পরলোকে পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় যে সকল পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, শত বৎসরের মধ্যে আর তাহার পঙ্কোদ্ধার হয় নাই। আমরা পরকাল বিশ্বাস করি না, ইহ লোকের যশের মুখে ছাই। নিজেরা কলিকাতায় থাকিব, দিব্য কলের জল আছে, পুকুরগুলা বুজিয়াই যাক, আর পচিয়াই যাক, আমার ভয় কি! যে ৫০০৲ টাকায় পুকুর কাটাইব, তাহা কোন একটা লাট সাহেবের মেমোরিয়াল্ ফণ্ডে চাঁদা দিলে গবর্ণর-জেনারেলের মেমারীতে জ্বল-জ্বল করিয়া জ্বলিতে থাকিব। ম্যালেরিয়ায় জ্বালাতন হইয়া আমরা মাঝে মাঝে রেলের রাস্তার দরুন জল বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি

পাইতেছে, অতএব সমস্ত রেলের পথ একদিনে ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত বলিয়া প্রলাপ বকিতে থাকি, কিন্তু যে জন্য যথার্থ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হইয়াছে ও তাহা নিবারণের জন্য যথার্থ আমরা যাহা করিতে পারি ও যাহা গবর্ণমেণ্ট করিয়া উঠিতে পারেন, এমন ন্যায্য ভিক্ষা আমরা করি না। ভাল জলের অভাব যে পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যের একটি বিশেষ কারণ, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অনেকেই যে জলের অভাবে নিজ নিজ জন্মস্থানে বাস করিতে পারেন না এবং আধপেটা খাইয়াও নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাসা ভাড়া জোগাইতে বাধ্য হয়েন, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। রেলরাস্তা হওয়ায় অনেকেই বাড়ী হইতে কর্ম্মস্থানে যাতায়াত করিতে ইচ্ছা করেন, এবং অনেকেই যাতায়াত করেন। কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরে পীড়িত হইয়া ও জলকষ্টে বৎসরের মধ্যে আবার ছয় মাস কাল আসিয়া কলিকাতায় সপরিবারে বাস করিতে বাধ্য হন। এই রকম যাতায়াত ও নূতন সংসার পাতায় খরচপত্রের অন্ত হয়। জলকষ্ট যদি নিবারণ হয়, বন জঙ্গল যদি পরিষ্কার করা হয়, তবে পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য অনেকটা ভাল হইবে, তা হইলে অনেকেই আবার নিজ নিজ গ্রামে বাস করিতে পারিবেন। ইহাতে কলিকাতার বাটীভাড়া ও অন্য অন্য দ্রব্যের মূল্য কতক পরিমাণে কমিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কলিকাতাবাসী ও পল্লীবাসী উভয়েরই পয়সার সাশ্রয় হইতে পারে। প্লেগের হুজুকের সময় দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতার বাসিন্দার অনেকেরই গ্রামে আশ্রয়স্থান আছে।

আমাদের দেশের প্রধান আহার দুগ্ধ। গ্রামে এমন গৃহস্থ প্রায় নাই, যাঁহার দু-একটি গরু নাই। স্থানাভাবে কলিকাতায় কোন গৃহস্থই এখানে গরু রাখিতে পারেন না। কলিকাতায় দুগ্ধ ত দুষ্প্রাপ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গোয়ালার সাদা জল খাইয়া দুগ্ধ খাইলাম বলিয়া তৃপ্তি অতি অল্প লোকেই লাভ করিয়া থাকেন। কলিকাতায় দুধ, হয় মাখন-তোলা, না হয় জল-মিশানো, আর কোন গয়লার বাছুর ত নাই। গোয়ালারা হাট-বারে নূতন গরু কিনিয়াই কচি কচি বাছুরগুলি কশাইকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। ইহাতে যে স্বাস্থ্যের কি পর্য্যন্ত হানি হইতেছে, তাহা সকলেই জানেন। ভাল দুগ্ধ অভাবে লিভারগ্রস্ত হইয়া অনেক শিশু মারা যাইতেছে। সবল সুস্থ শিশু কদাচিৎ চক্ষে পড়ে। গো-জাতি

রক্ষা ও তাহাদের উন্নতির চেষ্টা না করিলে দুর্ব্বল বাঙ্গালী অধিক দিন টিকিবে না। শরীর সুস্থ ও সবল না হইলে ত কোন কাজে মন লাগে না, কোন কাজ করিবার ক্ষমতাও থাকে না।

আমাদের প্রতি খুঁটিনাটির দিকে বিদেশীয়েরা যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দান করিয়া বসিয়া আছেন, আমাদের সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য কি আবশ্যক, কোন্ জিনিসে আমাদের প্রলোভন হইবে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন ও বুঝিয়াই বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা আনিয়া আমাদের হাতে হাতে জোগাইয়া দিতেছেন, তেমন যদি আমরা আমাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যের দিকে চাহিতাম, তবে এত পরমুখাপেক্ষী হইতে হইত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা বলি। এই এ দেশে আজকাল ইতর-ভদ্র সকলেই প্রায় একটি করিয়া ফতুয়ার ব্যবহার করে। তিন আনা কি চার আনার কাপড় কিনিল, দরজীকে ফতুয়া করিতে মজুরি দিল তিন আনা। সর্ব্বশুদ্ধ খরচ ।৵০ বা ।৶০ হইল। ইংরাজ ভাবিল যে, আচ্ছা, কাপড় ত আমাদের কিনিতেছে, সে পয়সা ত ঘরে আসিতেছে, কিন্তু ঐ যে তিন গণ্ডা পয়সা দরজীকে দিলে, সেটা ঘরে আসে কি করিয়া, সে যুক্তি করা যাক। যেমন যুক্তি ভাবা—অমনি মাথায় আসা—আর অমনি তাহা কাজে পরিণত করা।

আশ্বিন মাস না পড়িতে পড়িতে হাত-কাটা অল্প মূল্যের গেঞ্জিতে রাস্তায় ভদ্রলোক হইতে মুদী, মালা, জোলা, গাড়োয়ান, ছেলে, বুড়ো শোভা পাইতে লাগিল। ছ-আনায় গেঞ্জি কিনিল, ফতুয়ার সঙ্গে খরচ একই, উপরি লাভ দরজীর খোশামোদ করিতে হইল না। কেনা আর গায়ে দেওয়া—আঃ, কি আরাম! টাকায় চারখানা কাপড় হইতে টাকা টাকা মূল্যের কাপড় পর্য্যন্ত দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে। যখন যাহা দরকার, তাহাই হাতের কাছে পাওয়া যাইতেছে। ঘরের গৃহিণী আলু পটোলের মত কাপড়, সাবান, ফিতা, দেশলাই কিনিয়া আমার শ্রমের অনেকটা লাঘব করেন এবং নিজের পছন্দমত সওদা করিয়া মনে মনে সুখানুভব করেন। এমন সুখে আমার দিন কাটিলে বাঁচি, তার পর দেশের ভাবনা ভাবিব। দেশের তাঁতীকুল নির্মূল হইতেছে বলিয়া আমি ছুটির বারটা কোথায় দেশী কাপড় কাপড় করিয়া ঘুরিতে পারি না, আর মোটা কস্তাপেড়ে কাপড় আনিয়া গৃহিণীর হাসিমুখ বাঁকা করিতে পারি না।

আপনি বাঁচিলে বাপের নাম। একে আমরা স্বভাবতঃ অলস, তাহাতে হাতের কাছে বিলাতী জিনিস পাইয়া পাইয়া আরও অলস হইতেছি। মেয়েরা আর চরকা কাটে না, দেশের সুতা বিক্রী হয় না। আর চুলের দড়ি বিনায় না—কেহ মাথায় দেয় না, কি হইবে! দুই পয়সা হইলেই এক গজ ফিতা হইবে, কেন এত মেহনত করিয়া চুলের দড়ি বিনানো! এমন যে সাধের চুল, আঁস্তাকুড়ে ফেলা যাইতেছে। কেহ কাঁথা সেলাই করে না, ছিঃ, কাঁথায় শোয়া লজ্জার কথা। আট গণ্ডা পয়সা হইলেই একখানা মোটা চাদর হয়, লোকে বলিবে যে, আমার আট গণ্ডা পয়সাও জোটে না যে, একখানা চাদর কিনি। টোকা গোলপাতার ছাতা আর বিক্রয় হয় না। দশ বারো আনায় দিব্য একটি একটি বিলাতী ছাতা হয়। রৌদ্র বৃষ্টি যত আটকাক্ আর না আটকাক্, দেখতে কেমন সুশ্রী, কেমন মোড়া যায়, কেমন সুবিধা, ছাতাকে ছাতা, লাঠিকে লাঠি।

খয়ের ছাঁচ, খয়েরের বাগান, খয়েরের গহনা, নারিকেল চিঁড়া, নারিকেলের ফল, শাড়ীতে ফুল তোলা প্রভৃতি মেয়েলী শিল্প প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। ঐ সকল সামগ্রী বিবাহের ফুলশয্যায় অবশ্য দেয় ছিল। কিন্তু এক্ষণে নগদ টাকা লওয়ার প্রথা হওয়ায় আর ও-সকল জিনিস ব্যবহার হয় না—সুতরাং ঐ সকল শিল্পের আদর নাই, কেহ আর তৈয়ারী করে না। ভদ্র গৃহস্থ বিধবা মহিলাগণ ঐ সকল শিল্প বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ ও তীর্থযাত্রার পথসম্বল সঞ্চয় করিতেন। আজকাল ঐ সকল শিল্পের আদর না থাকায় ও সেই স্থলে কোন নূতন শিল্প প্রচলন না হওয়ায় এক মাত্র দাস্যবৃত্তিই নিরুপায় বিধবার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বে কেহ দাস্যবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইতে চাহিত না। যদি বা কেহ পরের ঘরে কাজ করিতে যাইত, তবে নিতান্ত কোন সম্বন্ধ বাহির না হইলে নয়; সইয়ের বৌয়ের বেগুন ফুল সম্বন্ধ বাহির করিয়া গৃহস্থের নিকট আত্মীয়ার ন্যায় বাস করিত, তাহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করিত। এবং গৃহস্থও তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিত না। কিন্তু আজকালকার ঝি ও রাঁধুনী গৃহস্থের একটি কম অসুখের কারণ নয়। ঝি রাঁধুনী, ঝি রাঁধুনী মাত্র। পরের বাড়ী কাজ করিতে যাইতে কেহ সঙ্কোচ বোধ করে না। নিকট-আত্মীয়ের সহিত একটু মনান্তর ঘটিলেই অমনি চাকরি করিতে বাহির হয়। তাহাদের বাসনা, কেমন করিয়া

টু-পয়সা পুঁজি করিব। সৎ-অসৎ উপায় জ্ঞান নাই, পয়সা হইলেই হইল। কত ক্ষণে কাজ হইতে অবসর পাইব, কত ক্ষণে একবার ঘরে গিয়া বসিব! এক-একখানি খোলার ঘর প্রায় প্রত্যেকেরই ভাড়া করা থাকে। তা কি ঝিয়ের, কি রাঁধুনীর। এই বিষম টানাটানির মহলে ঝি রাঁধুনীর মাহিনা বৃদ্ধির ও গর্ব্বের সহিত হাতটানটা গৃহস্থের বিষম অসুখের কারণ। তাহাদেরই বা দোষ কি! অল্প মাহিনায় চলে না। ছেলে-মেয়ে আছে। হয়ত কারও মা আছে, কারও ভাই আছে। জিনিসপত্র দুর্মূল্য, কাজেই শুধু মাহিনার উপর নির্ভর করিলে চলে না। অতএব দাসদাসীর সহিত গৃহস্থের আন্তরিক স্নেহ জন্মায় না, অথচ না হইলে নয়, তাই বকাবকি চলিতেছে। পরস্পরে পরস্পরের প্রতি বিরক্ত। একে পেট ভরিয়া আহার জুটে না, তাহার উপর স্বাস্থ্যহীন শরীর, খাটুনি, চোখের সম্মুখে সহস্র প্রলোভনীয় সামগ্রী, অথচ হাতে পয়সা নাই,—তাই মনে আমাদের অধিকাংশেরই সুখ নাই, অনবরত খুঁৎ খুঁৎ করিতেছি। পুরাতন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি, নূতন পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। নিজের অভাব অনাটনে দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিতে হইতেছে, কেবল নির্ম্মমতার ভার বোঝা হৃদয়ে বহন করিতেছি। ইংরাজের সংস্রবে তাহাদের জাতীয়তা, তাহাদের স্বদেশহিতৈষিতা, তাহাদের স্বজাতিপ্রিয়তা দেখিয়া শুনিয়া আমাদেরও তেমনই হইতে সাধ যায়। কিন্তু ঘরকন্নার সহস্র পীড়নে সে সাধ চকিতের ন্যায় বিলুপ্ত হয়।

আমাদের চারি দিকে গ্যাসের আলো, ইলেক্‌ট্রিক লাইট, রেলওয়ে, পাঠশালা, বিদ্যালয় হইতে ডসনের জুতা, রদরহ্যামের ঘড়ি, জুরির বিচার প্রভৃতি সকলই আছে। কিন্তু যত দিন যে-সকল ছোটখাটো দৈনন্দিন দুঃখ নিবারণের উপায়গুলি আমাদের স্বায়ত্ত, যে-সকল সুখলাভ আমাদের স্বায়ত্ত, তাহাদের চর্চ্চায় মনোনিবেশ না করিব, তত দিন নূতন মিউনিসিপ্যাল বিল পাস হউক বা না হউক, তাহাতে দেশের আপামর সাধারণের কিছু মাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। ('ভারতী,' কার্ত্তিক ১৩০৬)

হিন্দু বালিকাগণের শিক্ষা

বেথুন স্কুলে বালিকাদিগের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে—হিন্দু বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র বোর্ডিং একান্ত আবশ্যক; সেখানে হিন্দু মতে থাকার ব্যবস্থা থাকিবে; কেবল হিন্দু বালিকারাই থাকিবে।

বেথুন স্কুলে যে প্রণালীতে বালিকাদের শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে, আমি তাহার ভালমন্দের আলোচনা করিতেছি না—সে যেমন চলিতেছে চলুক—যাঁহারা নিজ নিজ কন্যাকে উচ্চশিক্ষা দান করিতে চান, তাঁহাদের পথ প্রশস্তই আছে—আমি হিন্দু বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতেছি।

দেখা যায়, সাধারণ হিন্দু বালিকাগণ বারো তেরো বৎসর বয়সের মধ্যেই বিবাহিতা হয়। ছয় সাত বৎসর বয়সের কম আর কোন বালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় না—তাহা হইলে হিসাব মত সাধারণ হিন্দু বালিকারা বড় জোর ৫ বৎসর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে। পাঁচ বৎসরে প্রচলিত প্রথা অনুসারে শিক্ষা পাইয়া তাহারা কতটুকু জ্ঞান লাভ করে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। মাঝে হইতে বালিকারা ঘরকন্নার কাজ শিক্ষা করিবার অবসর হারায়।

হিন্দু বালিকাদের জন্য বেথুন বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র একটি বাসস্থান ও হিন্দু আচারে আহারাদির ব্যবস্থা মাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে, বাস্তবিক হিন্দু বালিকাদের উন্নতি হইবে না—বরং বারো মাস স্কুলের রাঁধা ভাত খাইয়া মেয়েরা ঘরের কাজকর্ম্মে একেবারে অপটু হইবে, অলসতাও প্রশ্রয় পাইতে থাকিবে। কে কুট্‌নো কোটে, কে বাট্‌না বাটে, কে ভাঁড়ার দেয়, কে জলখাবার গোছায়, তাহারা তাহার কিছুই জানিতে পারিবে না—আহারের সময় সমস্ত হাতের কাছে প্রস্তুত পাইবে—কোন চিন্তা নাই! ঘরকন্নার কাজ "হাতে কলমে"র কাজ। পাঁচখানা 'স্বাস্থ্যরক্ষা' ও দশখানা 'পাক-প্রণালী' পড়াইলেও কিছু হইবে না। অতএব বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু বালিকাদের হাতে কলমে ঘরের কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

যে সকল হিন্দু বালিকার এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা বা সম্ভাবনা নাই, তাহাদের বাঙ্গলা ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, শুভঙ্করী মতে অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষা দান করিলে তাহারা সকল বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারে। আজকালকার বাজারে ইংরাজী ভাষা একটু জানা থাকা আবশ্যক, অতএব ইংরাজী ভাষা শেখানো হোক; অঙ্ক ইত্যাদি ইংরাজীতে শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা নাই। শরীরতত্ত্ব ও অল্প স্বল্প চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত; তাহা হইলে ছেলেপিলে আছাড় খাইয়া হাত-পা ভাঙ্গিলে অথবা রক্তপাত করিলে বা পুড়িয়া যাইলে "বাবা গো, মা গো, কি হ'ল গো, কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো, গোপাল কেন অমন করে, ডাক্তার ডাক গো" বলিয়া চেঁচামিচি না করিয়া, স্ত্রীলোকেরা ধীরভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া অথবা ঔষধ লেপন করিয়া, তখনকার মত যথাকর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিবে। সেলাই শিক্ষার বন্দোবস্ত ত থাকিবেই। সেলাই শিক্ষার প্রচলন অধিকতর না হওয়াতে আমাদের দেশে গৃহস্থের ইদানীং ভাতখরচ অপেক্ষা দরজীর খরচ বেশী লাগিতেছে।

তার পর বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঘরকন্নার কাজ শিক্ষা দিবার সহজ উপায় এই যে, হিন্দু বালিকাদের প্রতি তাহাদের বোর্ডিঙের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করা। একজন সুগৃহিণী ধীরপ্রকৃতি মহিলার অধীনে বালিকারা বোর্ডিঙের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। যেমন বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের মহিলারা পালা করিয়া গৃহস্থালীর কাজ সম্পন্ন করেন, তেমনই করিয়া বোর্ডিঙের কর্ত্রীর সহিত নিজেদের দৈনিক কাজ করিতে করিতে বালিকারা অতি সহজেই ঘরের কাজে সুনিপুণ হইবে। শিশুকাল হইতে পরস্পরে পরস্পরকে যত্ন সেবা করিতে করিতে সেবা-যত্নের ইচ্ছা ও অভ্যাস দৃঢ়রূপে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে। আমি জানি, পল্লীগ্রামের সাত আট বৎসরের বালিকারা মাতার দক্ষিণ হস্ত। মা আঁতুড়ঘরে গেলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকারা কেমন যত্ন করিয়া কনিষ্ঠের লালন পালন করে, পিতার সেবা করে, মাতার শুশ্রূষা করে—ঘর নিকায়, জল তোলে। বিদ্যালয়ে থাকিলে "দায়ে প'ড়ে" এ সব কাজ শিখিবার ত অবসর হয় না; সুতরাং বোর্ডিঙের ভার বালিকাদের দেওয়া উচিত। রোগে শুশ্রূষা, গৃহমার্জ্জনা, বিছানা করা, আলো সাজানো, ভাঁড়ার দেওয়া, তরকারি ও মাছ কোটা, বাটনা বাঁটা, জলখাবার গোছানো; লুচি-রুটির ময়দা মাখা ও বেলা, মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা,

রন্ধন ও পরিবেশনে সক্ষম হওয়া প্রত্যেক স্ত্রীলোকের একান্ত কর্ত্তব্য। অনেকে বলিতে পারেন—'আমার মেয়েকে জন্মেও হাতা বেড়ি ধরতে হবে না, নাই বা শিখলে ঘরের কাজ!' ধনি-কন্যাদের নিজ হাতে ঘরের কোন কাজ করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও, সকল কাজে ভাল রকম অভিজ্ঞতা না থাকিলে দাস দাসীদের পরিচালন করিবার ক্ষমতারও অভাব হয়। সকলেই জানেন যে, নূতন দাস দাসী লইয়া কি প্রকার বিব্রত হইতে হয়। নিজেরা সকল কাজে পারগ না হইলে, তাহাদের শিক্ষা দিবেন কেমন করিয়া? অতএব সর্ব্বদা দাস দাসীদের অধীন হইয়া থাকিতে হয়; সদাই ভয় হয়, গোলাপী ছেড়ে গেলে চলবে কেমন ক'রে—বিষণ ঠাকুর বাড়ী গেলেও সপরিবারে উপবাস করতে হবে! দাস দাসীরাও সে ভাবটা বিলক্ষণ বোঝে এবং নানা প্রকারে নিজেদের দর বাড়াইয়া গৃহে অশান্তি উৎপাদন করে। লালন পালনের ভার মেয়েদের স্বাভাবিক। মাতৃহারা অভিভাবিকাহীন শিশুদের মধ্যে দেখা যায়, আপনা হইতেই ক্ষুদ্র বালিকা মাতার অভাব পূর্ণ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে। খেলাঘর পাতিয়া ধুলার ভাত, ইঁটের চচ্চড়ি রাঁধিতে বালিকারা ভালবাসে; ঐ খেলাঘরের পারিপাট্য সাধন করিতে করিতে গৃহিণীপনায় তাহারা সিদ্ধহস্ত হয়: কিন্তু বিদ্যালয়ে বাস করিতে হইলে, অথবা দিনের অধিকাংশ সময় বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করিতে হইলে 'হাতে-কলমে' ঘরের কাজ শিক্ষার অভাবে স্বভাবতই ঘরের কাজে অপটু হইয়া পড়ে। তখন অনভ্যাসবশতঃ আগুন-তাতে মাথা ধরে, বাটনা বাটিতে গিয়া নোড়া আয়ত্ত করিতে পারে না, এক ঘটি জল গড়াইতে গিয়া দুই ঘটি ফেলিয়া দিয়া শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনার পাত্রী হয়।

অনেকের বিশ্বাস যে, যে রকম দিন কাল পড়িয়াছে, বরের দর যেরূপ 'হু হু' করিয়া চড়িয়া যাইতেছে, অনটনে ঘরকন্না যে রকম অশান্তির আকর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পরে আর কেহ কন্যাদায় হইতে সহজে মুক্ত হইতে পারিবেন না, সুতরাং হিন্দু বালিকাদের বিদ্যাবতী করা নিতান্তই দরকার। বিবাহ দেওয়া যখন আয়াসসাধ্য হইতে চলিল, তখন বালিকাদের উচ্চশিক্ষা দিয়া তাহাদের জীবনোপায় করিয়া দেওয়া পিতামাতার অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য। তাঁহারা হয়ত বলিতে পারেন যে, বিদ্যালয়ে গৃহস্থালী কাজ শিক্ষার কোন

আবশ্যকতা নাই ; লেখাপড়া শিখুক, মেয়েরা স্বাধীন ভাবে নিজেদের জীবিকা যাহাতে নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার উপায় হোক।

হিন্দু বালিকারাও স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, ইহা যদি বিদ্যাশিক্ষাদানের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়—তবু এমন কেহ বলিতে পারেন না যে, বালিকারা কোন কালেও বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে না ; সুতরাং সব হিসাবেই দেখা যায় যে, বালিকাদের বিদ্যাশিক্ষার সহিত গৃহস্থালী কাজে সুশিক্ষিতা করিয়া তোলাও অবশ্যকর্ত্তব্য—তাহাতে গৃহের মঙ্গল—তাহাতে সমাজের মঙ্গল।

পল্লীগ্রামের কোন পাড়ায় যদি একজন সহৃদয় মহিলা থাকেন, তবে সে পাড়ার প্রত্যেক গৃহস্থের সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে তিনিই সর্ব্বাগ্রে বুক দিয়া পড়েন। পাড়ার সকলেরই তিনি মাতৃস্থানীয়া। আমার পুত্রকে আমি যেমন স্নেহ করিব, অবশ্য সকলকে তেমনই স্নেহ করিতে পারিব না, কিন্তু ধনী দরিদ্র, আত্মীয় পর, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমানভাবে যত্ন করা যাইতে পারে। যাঁহারা অতিথি অভ্যাগত, আশ্রিত অনুগত, আত্মীয় পর, দাস দাসী, সকলকে সমানভাবে যত্ন করেন—তাঁহারাই আদর্শ গৃহিণী। বালিকাগণ সুশিক্ষিতা হইয়া আদর্শ গৃহিণী হইলে সকল দিকে মঙ্গল।

আমাদের দেশের সাধারণের যেমন ধারণা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকদেরও বিদ্যাশিক্ষা করা উচিত, তেমনই আবার ইহাও দেখা যায় যে, শিক্ষিতা মেয়েদের উপর সাধারণে তেমন সন্তুষ্টও নহেন। বোধ হয়, আজকাল যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা ঠিক সাধারণের উপযোগী নহে। বেথুনের হিন্দু বোর্ডিঙে যদি সর্ব্বপ্রকারে হিন্দু বালিকার উন্নতির ব্যবস্থা হয়, তবে সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের উপর সাধারণের অধিকতর শ্রদ্ধার উদয় হইবে—অসন্তুষ্ট ভাব দূর হইবে—আর হিন্দু মহিলারা আবশ্যক মত কেরানীগিরিও করিতে পারিবেন, আবার সুশৃঙ্খলে গৃহধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া গৃহসংসার শান্তিময় করিয়া রাখিবেন।

স্ত্রীলোকের হৃদয়ে স্নেহ দয়া মায়া প্রভৃতির গভীরতা যেমন অধিক—প্রসারতা তেমন নহে। কোন দিন যদি বাছার ঝোলের দু-খানা মাছের একখানা মাছ অপর কাহাকেও ভাগ দিতে হয়, অমনই মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে থাকে—'আহা, বাছা আজ আমার উপোস ক'রে রহিল।'

সুশিক্ষায় এই সকল সঙ্কীর্ণ ভাব যখন দূর হইয়া যাইবে, যখন নারীহৃদয়ে স্নেহের গভীরতার সহিত উদারতার মিলন হইবে, অলসতা দূর হইয়া পরিপাটি কার্য্যকুশলতায় গৃহে গৃহে মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা বিরাজ করিবে—তখন সকলে হাতে হাতে স্ত্রীশিক্ষার সুফল ভোগ করিবেন—গৃহসংসার মধুময় হইবে—সমাজের মঙ্গল হইবে।

কন্যার উদ্দেশে কবি গাহিয়াছেন—

'কভু না বাসনা করি হও তুমি রাজ্যেশ্বরী
সুখে থাক করি আশীর্ব্বাদ,
উদার উন্নত প্রাণে চাহিবে সংসার পানে
এই শিক্ষা হোক—মনে সাধ!' ('ভাণ্ডার,' শ্রাবণ ১৩১২)

প্রবাসের পাঠশালা

পণ্ডিত মহাশয় স্কুলে আসিয়াই প্রথমে লালমোহনকে ডাকিতেন, তাহাকে দু-চারটা পড়া জিজ্ঞাসা করিয়াই কান মলিয়া দিয়া কয়েক ঘা বেত মারিয়া একটা গাধার টুপি মাথায় পরাইয়া বই হাতে দিয়া বেঞ্চির উপর দাঁড় করাইয়া দিতেন। লালমোহনের বয়স বছর দশেক হইবে, তার ছোট ভাই প্যারীমোহনের বছর ৮।৯—লালমোহনের পরে তাহার ডাক পড়িত। তাহাকেও দু-একটা পড়া জিজ্ঞাসা করিয়াই পণ্ডিত মহাশয় তাহার দুই কান ধরিয়া আচ্ছা করিয়া একবার ঝাঁকাইয়া দিতেন, পরে বেত মারিতে আরম্ভ করিতেন—বেতের বিরাম নাই, বেতের উপর বেত পটাপট্ পটাপট্! লালমোহন নিঃশব্দে বেত হজম করিত, কিন্তু প্যারীমোহন প্রথম ঘা হইতেই 'আল্লা (আর না) পণ্ডিত মশাই, আল্লা পণ্ডিত মশাই' বলিয়া করুণ স্বরে কাঁদিয়া স্কুল ফাটাইয়া দিত। এক এক দিন বেত মারিতে মারিতে পণ্ডিত মহাশয়ের এমন রাগ চড়িয়া যাইত ও তিনি এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন যে, স্কুলের ছাত্রীদের পাশের ঘরে পাঠাইয়া দিয়া প্যারীমোহনকে বিবস্ত্র করিয়া প্রহার করিতেন।

লালমোহন প্যারীমোহনকে শিক্ষাদান করা হইলে একে একে অন্য ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষাদান আরম্ভ হইত—বালকদের বেত্রাঘাত এবং বালিকাদের গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড় মারা শেষ হইতে হইতে বেলা ১২॥০টা বাজিত; তখন পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রীদের কয় জনকে (জন ৬।৭) সঙ্গে করিয়া উপরের তলায় জলযোগ করিতে যাইতেন, ছেলেরাও জলখাবারের ছুটি পাইত। লালমোহন প্যারীমোহন এক এক দিন সে ছুটিও পাইত না, একজনকে বেঞ্চির উপর আর একজনকে ইঁটের উপর পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে আদেশ দিয়া পণ্ডিত মহাশয় উপরে চলিয়া যাইতেন।

মায়ের কাছে শুনিয়াছি, যখন আমি প্রথম স্কুলে ভর্ত্তি হই, তখন আমার বয়স চার বৎসর পূর্ণ হয় নাই—তখনকার এক এক দিনের কথা আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। মনে পড়ে, উপরে পণ্ডিত

মহাশয়ের একখানি মাত্র ছোট ঘর ও তার সম্মুখে অল্প একটুখানি ছাদও ছিল; বড় স্কুল-ঘরটার ছাদ যে কোথায় ছিল, তা মনে নাই। আমাদের ৬।৭ জনকে সেই ঘরের মধ্যে পুরিয়া পণ্ডিত মহাশয় এক ছিলিম তামাক সাজিয়া খাইয়া মুখ ধুইতে চলিয়া যাইতেন। একটি বালকের উপর আদেশ থাকিত, সে আমাদের জলখাবার সিঁড়ির কাছে পৌঁছিয়া দিত—কাহারও বাড়ী হইতে খাবার আসিত, কেহ বাড়ী হইতে পয়সা আনিয়া খাবারওয়ালার কাছ হইতে কিনিয়া খাইত। যদি রৌদ্র না থাকিত, তবে ছাদে, নয়ত পণ্ডিত মহাশয়ের ক্ষুদ্র ঘরখানিতে আমরা খেলা করিতাম। খেলাটা হইত প্রায়ই যাত্রার নকল করা; আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ, আমার মাথায় একটা 'পেন-কলম' বাঁধিয়া দিয়া হেমা আমাকে কৃষ্ণ সাজাইয়া একখানা টুলের উপর দাঁড় করাইয়া দিয়া নিজে বৃন্দা হইয়া নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গান করিত—দুঃখের বিষয়, গানের এক ছত্রও আমার মনে নাই। অন্য মেয়েরা সখী হইয়া আমার দু-দিকে দু-জনে দাঁড়াইত —মধ্যে মধ্যে সখীরাও গান করিত আবার নাচিত। এত কথা মনে আছে অথচ গানের এক ছত্রও যে মনে নাই, তাহার কারণ বোধ হয় যে, হেমার গান আমি ভাল শুনিতেই পাইতাম না; পণ্ডিত মহাশয়ের ভয়ে হেমা যে অতি মৃদু স্বরে গান করিত।

একদিন বাবা আমাকে একটা ময়ূরপুচ্ছ দিলেন, পরদিন বইয়ের মধ্যে সেই পুচ্ছটি দেখিয়া হেমা বড় খুশী হইল; বলিল, "আজ আর 'পেন্-কলম' দিয়া চূড়া বাঁধিতে হইবে না, আসল ময়ূরপুচ্ছের চূড়া হইবে।" যথা-সময়ে 'আসল ময়ূরপুচ্ছের চূড়া' মাথায় বাঁধিয়া আমি 'আসল কৃষ্ণ' হইয়াছি ভাবিয়া বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম, সেটা আমার খুব মনে আছে। পণ্ডিত মহাশয়ের আগমনে কৃষ্ণযাত্রা ক্ষণেকের জন্য স্থগিত হইত। মেঝেতে একখানা চেটাইয়ের উপর একটা লেপ ও চাদর পাতা থাকিত, একটা ময়লা বালিশও ছিল, তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া বসিতেন—রাত্রেও সেই শয্যায় তাঁহার শয়ন হইত। বিছানার পাশে একটা কুঁজা ও একটা গেলাস থাকিত; এক গেলাস জল গড়াইয়া লেপের তলা হইতে আফিমের কৌটাটি বাহির করিয়া একটা রিটার আঁটির মত এক ডেলা আফিম পাকাইয়া পাকাইয়া এক ঢোঁক

জল গালে করিয়া ডেলাটি ছাড়িয়া দিয়া ঢক্ করিয়া গিলিয়া ফেলিতেন, তার পর মধু দিলে শিশু যেমন চুষিয়া চুষিয়া খায়, পণ্ডিত মহাশয় তেমনই তৃপ্তির সহিত নিজের আঙ্গুলের আফিমটুকু চুষিয়া চুষিয়া খাইতেন। অবসর বুঝিয়া ক্ষেত্রমণি বলিত, "বড় মিষ্টি লাগছে, না পণ্ডিত মশায় ?" পণ্ডিত মহাশয় প্রসন্নচিত্তে একটু মুচকে হেসে বলিতেন, "হুঁ হুঁ, তোরা কি বুঝবি !" অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে একটুখানি বিদ্যুৎ যেমন, পণ্ডিত মহাশয়ের গম্ভীর মুখের হাসিটুকু ঠিক সেই রকম। আঙ্গুল দুটি চোষা হইলে হাতটি ধুইয়া পণ্ডিত মহাশয় আবার এক ছিলিম তামাক সাজিতেন ও বালিশে ঠেসান দিয়া ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করিয়া তামাক টানিতেন, ক্রমে ক্রমে চক্ষু দুটি মুদিয়া আসিত ; এক এক দিন তাঁহার হাত হইতে হুঁকাটা পড়িয়া গিয়া বিছানায় জল ও আগুন পড়িয়া যাইত, মেয়েরা তাড়াতাড়ি গিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া দিত।

পণ্ডিত মহাশয় চক্ষু বুজিলেই হেমা নিজের পকেট হইতে একটা আফিমের কৌটা বাহির করিত। হেমার বয়স দশ এগারো বৎসর ; একটা ইজের, একটা জামা পরিয়া ও মাথায় একটা ছিটের রুমাল বাঁধিয়া সে স্কুলে আসিত। তার দুই কানে চারিটি করিয়া আটটা সোনার মাকড়ি, নাকে নোলক ও পায়ে চারগাছা মল ছিল—সে মেয়েদের মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মার খাইত। হেমার আফিমের কৌটা শুনিয়া সকলে বোধ হয় বিস্মিত হইয়াছেন, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। হেমা খয়ের ভিজাইয়া ছোট ছোট গুলি বানাইয়া রাখিত ও তাহাই কৌটা ভরিয়া লইয়া আসিত এবং পণ্ডিত মহাশয়ের আফিম খাওয়া হইলেই তাঁহার অজ্ঞাতসারে "এস ভাই, আমরা আফিম খাই" বলিয়া আমাদের সকলকে এক একটি গুলি খাইতে দিত ; কিন্তু আমরা সেই খয়েরের গুলি ঢক্ করিয়া গিলিয়া খাইতাম না—পণ্ডিত মহাশয়ের আঙ্গুলের আফিমের মত চুষিয়া চুষিয়া খাইতাম এবং শেষে জল খাইয়া জলের মিষ্ট স্বাদ পাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতাম। যত ক্ষণ পণ্ডিত মহাশয় ঢুলিতেন, হেমাও তত ক্ষণ হাত মুখ নাড়িয়া যাত্রার অভিনয় করিত—তখন তাহার গলা হইতে কিছু মাত্র স্বর বাহির হইত না, কেবল হাঁ করা দেখিয়া আমরা বুঝিতাম—হেমা গান করিতেছে।

ময়ূরপুচ্ছ মাথায় বাঁধিয়া ঠিক আসল কৃষ্ণ সাজার সুখ আমার ভাগ্যে অধিক দিন ঘটে নাই। ময়ূরপুচ্ছ মাথায় বাঁধিবার লোভে একদিন ক্ষেত্রমণি বলিল, "আমি কৃষ্ণ সাজিব।" হেমা বলিল, "দূর! অমন ধেড়ে কৃষ্ণ কি মানায়? সে হবে না।" ক্ষেত্রমণির বয়স নয় দশ—সে বলিল, "তবে আমি রাধিকা সাজিব, রাধিকার মাথায় ত চূড়া থাকে।" হেমা বলিল, "একটা বই ময়ূরপুচ্ছ নয়, তা কেমন ক'রে হবে?" ইহা লইয়া হেমাতে ও ক্ষেত্রমণিতে বিষম ঝগড়া হইয়া গেল—যাত্রার দল পৃথক্ হইল।

সব মেয়ে তাহার দলে হওয়ায় ক্ষেত্রমণির দল ভারি হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকে (আমাকে) লইয়া বৃন্দা সখী (হেমা) এক দল বাঁধিল। ক্ষেত্রমণির দল ভারি হইবার একটা কারণ ছিল—পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত ক্ষেত্রমণি লাল মলাটের কি একখানা বই আনিত এবং পণ্ডিত মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সুর করিয়া তাহা পড়িত, সব মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া শুনিত—কেবল হেমা যাইত না এবং আমার ময়ূরপুচ্ছের উপর লোভ করিয়াছিল বলিয়া আমিও যাইতাম না। হেমা আমাকে কৃষ্ণ সাজাইয়া টুলের উপর উঠাইয়া দিয়া যাত্রা করিত, কিন্তু ভাল জমিত না—আমাদের মন থাকিত ক্ষেত্রমণির বইয়ের দিকে। একদিন হেমা আমাকে বলিল, "যা ত সুকুমারি, ক্ষেত্রমণির পিছন থেকে চুপি চুপি দেখে আয় ত বইখানার নাম কি।" আমি ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে শুনিলাম, ক্ষেত্রমণি পড়িতেছে, 'দাদা আর কি আর কি, প্রাণপতি কোলে ল'য়ে জলে ভেসেছি'—আমি পিছনে গিয়াছি জানিয়া ক্ষেত্রমণি ফস্ করিয়া বইটা বন্ধ করিল—মলাটের উপর লেখা আছে 'ভগবদ্গীতা'। আমাদের বাড়ীতে একখানা ভগবদ্গীতা ছিল, পরদিন সংগ্রহ করিয়া লইয়া স্কুলে গেলাম এবং অতিশয় গর্ব্বভরে হেমাকে দিলাম। আমাদের বইখানা নূতন চক্চকে, ওদের খানা ছেঁড়া—আজ হেমা সুর করিয়া 'দাদা আর কি আর কি' পড়িয়া সকলের তাক লাগাইয়া দিবে, এই আনন্দে পণ্ডিত মহাশয়ের জলযোগের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি;—অনেক কষ্টে সময় আসিল, কিন্তু পড়িতে গিয়া শুধু যে সমস্ত বইখানার মধ্যে 'দাদা আর কি, আর কি' পাওয়া গেল না, তা নয়, এক বর্ণও আমরা পড়িতে বা বুঝিতে পারিলাম না। হেমা বলিল, "এ কি এনেছ, এ যে সংস্কৃত!" এখন বুঝিতে পারি, ক্ষেত্রমণি সুর করিয়া 'মনসার ভাসান' পড়িত—কিন্তু আমার বেশ মনে আছে, সেই বইয়ের মলাটে

ভগবদ্গীতা নাম আমি পড়িয়াছিলাম—বোধ হয় ছু-খানা বই একত্রে বাঁধানো ছিল।

ঝিমুনি ভাঙ্গিলে পণ্ডিত মহাশয় গলা খাঁকারি দিয়া উঠিয়া বসিতেন, তাঁর ড্যাবা ড্যাবা লাল চক্ষু আরও ছু-চার বার ঢুলিয়া পড়িত, কয়েক বার ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া জোরে নিশ্বাস বহিয়া যাইত, তার পর তিনি সজাগ হইয়া ঠোঙ্গাশুদ্ধ খাবার লইয়া খাইতেন; তার পর জল, পান ও আর এক ছিলিম তামাক খাইয়া আমাদের লইয়া নীচে নামিয়া আসিতেন। আমরা সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে শুনিতে পাইতাম, ঝড়ের মত হুড়মুড় হুড়হুড় করিয়া ছাত্রেরা স্কুলঘরে প্রবেশ করিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থা ছিল, ছেলেরা ও পণ্ডিত মহাশয় জলযোগের জন্য আধ ঘণ্টা মাত্র ছুটি পাইবেন। পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রদের আধ ঘণ্টা সময় জলযোগের জন্য ছুটি দিয়া নিজে জলযোগ করিতে যাইতেন, কিন্তু দেড় ঘণ্টার কম কোন দিনই স্কুলঘরে আসিতে পারিতেন না। সেই দেড় ঘণ্টা ছাত্রেরা এমন কোলাহল করিত, এমন ছুটাছুটি করিত যে, তাহাদের আনন্দধ্বনি উপর হইতে শুনিয়া আমার হিংসা হইত—আমিও কেন নীচে থাকিতে পাই না—প্রতি দিন একঘেয়ে যাত্রা খেলায় মন তৃপ্তি মানিত না।

নীচে আসিয়া পণ্ডিত মহাশয় লালমোহন প্যারীমোহনকে পাঁচ মিনিটের জন্য ছুটি দিতেন—এটা কিন্তু তাহাদের উপরি লাভ; কারণ, পূর্ণ বলিত, পণ্ডিত মহাশয় উপরে উঠিলেই অন্য ছেলেদের মত লালমোহন প্যারীমোহন লাফালাফি ছুটাছুটি করিত এবং খড়মের শব্দ পাইলেই আবার যে যাহার শাস্তির স্থানে দাঁড়াইত। পাঁচ মিনিট ছুটির পর ফিরিয়া আসিয়া তাহারা বসিতে পাইত। তখন পণ্ডিত মহাশয় সকলকে একটু একটু পড়া বলিয়া দিতেন, বোর্ডে আঁক কসাইতেন ও ছুটির অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঘর শুদ্ধ সকলকে নামতা পড়াইতেন।

আমাকে পণ্ডিত মহাশয় বড়ই তাচ্ছিল্য করিতেন—কোন দিন ছু-একটা পড়া লইলেন, কোন দিন কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়াই "এইখান থেকে এই পর্য্যন্ত পড়া ক'রে আনিস্" বলিয়া বিদায় দিতেন। আমার ছুই বৎসর বয়সের সময় হইতে বাবা একখানা বর্ণপরিচয় লইয়া আমাকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন; আমার চার বৎসর বয়সের সময় অল্পে অল্পে আমি বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ 'সায়' করিয়াছিলাম, 'বোধোদয়' ধরিয়া স্কুলে

ভর্ত্তি হইলাম। বাস্তবিক 'বোধোদয়' পড়িবার মতন তখন আমার বোধোদয় হইয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু বাবা সকলের কাছে গল্প করিতেন যে, 'সুকুমারীর অগাধ বুদ্ধি,' ও এর মধ্যে 'বোধোদয়' পড়ে।

স্কুলে ভর্ত্তি হইবার দু-চার দিন পরেই কি একটা পড়া বলিতে না পারায়, পণ্ডিত মহাশয় আমার গালে একটা প্রকাণ্ড চড় মারিলেন—সে কি চড়! আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম! লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিলাম না! ইহার পূর্ব্বে আমি কখনও কাহারও কাছে মার খাই নাই। বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল, কিন্তু কাঁদিলাম না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম; সমস্ত দিন আমার গাল জ্বালা করিতে লাগিল। ছুটির পর বাড়ী আসিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া একেবারে মায়ের কোলে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিলাম, "পণ্ডিত মশায় আমাকে মেরেছে।" মা আমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আহা হা, আহা হা! হতভাগা পণ্ডিত বাছাকে একেবারে মেরে ফেলেছে, এমন চড় মেরেছে যে, পাঁচ আঙ্গুলের দাগ পড়েছে! ম'রে যাই, ম'রে যাই, বাছা রে আমার!" বাবা তখন বাড়ী ছিলেন না, মা একেলাই বকতে লাগিলেন ও আমাকে শান্ত করিলেন। পরদিন কিছুতেই আর স্কুলে যাইতে দিবেন না, বাবা অনেক বলা কহায় স্কুলে পাঠাইলেন, কিন্তু বাবা পণ্ডিত মহাশয়কে একখানা 'কড়া' করিয়া চিঠি লিখিয়া দিলেন যে, "আমার মেয়ে পড়া বলতে পারুক না পারুক, খবরদার, আমার মেয়েকে মারিবেন না।"

চিঠিখানা আমিই হাতে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম—পণ্ডিত মহাশয় পড়িয়া আমার দিকে এমন কটমট করিয়া তাকাইলেন যে, আমার গায়ের রক্ত যেন শুকাইয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তোর পড়াশুনা কিছু হবে না, কাল পাঁচটা পয়সা আনিস, একখানা বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ দিব, তাই তুই পড়বি। না মারলে কখনও লেখাপড়া হয়?" বলিয়া আমার কান ধরিয়া নীচু ক্লাসে বসাইয়া দিলেন এবং অধিকতর আগ্রহের সহিত পরে পরে লালমোহন ও প্যারীমোহনকে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। প্যারীমোহনের সে দিনের কান্নার সুর এখনও আমার কানে যেন লাগিয়া রহিয়াছে!

লালমোহন ও প্যারীমোহন এত যে মার খাইত, তবু কোন দিন স্কুল কামাই করিত না। একদিন তাহারা স্কুলে আসিল না—পণ্ডিত মহাশয়

আস্ফালন করিতে লাগিলেন যে, "আসুক তারা স্কুলে, হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই করিব।" বাড়ী গিয়া শুনিলাম, মা ও বাবা বিষণ্ণভাবে বসিয়া কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি বলিলাম, "কি হয়েছে মা?" মা বলিলেন, "আহা, তোদের স্কুলের সেই যে লালমোহন ও প্যারীমোহন— তাদের বাপ ম'রে গেছে, তারা কাল দেশে যাবে।"

আমি। কেন মা তারা দেশে যাবে?

মা। আর কি করতে এখানে থাকবে, না খেতে পেয়ে মারা যাবে যে। বাপ চাকরি করতো, তবে ত খেতে পেত।

আমি। দেশে গিয়ে কি খাবে মা?

মা। দেশে গিয়ে যা হয় খাবে।

মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করিলাম যে, 'যা হয়' খাবে, না খেতে পেয়ে মরিবে না। তখন জানিতাম না যে, আমাকেও একদিন 'যা হয়' খেতে হবে।

পরদিন বই স্লেট না লইয়া শুধু হাতে, শুধু পায়ে, বিষণ্ণমুখে লালমোহন ও প্যারীমোহন স্কুলে আসিল—কেহই ভাল করিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না; সকলেই এই দুঃসংবাদ শুনিয়াছিল। যদিও তখনও পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে আসেন নাই, তথাপি কেহ গোলমাল করিল না, লালমোহন প্যারীমোহনের মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পণ্ডিত মহাশয় আসিতেই লালমোহন ও প্যারীমোহন অসঙ্কোচে তাঁহাব কাছে গিয়া চেয়ারের দুই পাশে দুই জনে দাঁড়াইল। পণ্ডিত মহাশয় একবার দুই জনের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেই, দুই জনের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ক্ষণেক পরে লালমোহন বলিল, "পণ্ডিত মশায়, আজ আমরা দেশে যাব।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "যাও বাবা, দেশে যাও, ভালয় ভালয় পৌঁছও। বাবা, রাগ বড় চণ্ডাল—তোদের অনেক মেরেছি, সে সব কথা ভুলে যাস্; ভাল ক'রে পড়াশুনা করিস"—আরও কত কি বলিলেন, তাহা আমার মনে নাই—তবে বেশ মনে আছে, সে দিন পণ্ডিত মহাশয় কাহাকেও একটা চড়ও মারেন নাই। লালমোহন প্যারীমোহন একে একে প্রত্যেকের কাছে আসিয়া "আমরা আজ দেশে যাব" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। আমার কাছে আসিতেই আমি 'ভ্যাঁ' করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। লালমোহন আমাকে কোলে করিয়া "কেঁদ না সুকুমারি" বলিয়া আদর করিল।

দিনের পর দিন যায়—পূর্ণকে বিশেষরূপে শিক্ষিত করিতে পণ্ডিত মহাশয় মনোনিবেশ করিলেন। প্রহার খাইয়া খাইয়া এক দিন পূর্ণ, ঘুমন্ত পণ্ডিত মহাশয়ের টিকি চেয়ারের সহিত বাঁধিয়া দিল—সে দিন পণ্ডিত মহাশয় পূর্ণকে একটা অন্ধকার ঘরে লইয়া গিয়া কি শাস্তি দিলেন জানি না, কিন্তু পূর্ণ সে দিন বাড়ী যাইবার সময় শাসাইয়া গেল—"দেখব কেমন পণ্ডিত মশাই, তাকে দেশছাড়া ক'রে তবে ছাড়ব।" পরদিন হইতে আর সে স্কুলে আসিল না।

একদিন হেমা আসিয়া বলিল, "কাল আমরা দেশে যাব, আমার বে হবে।" পরদিন হইতে হেমারা দুই বোনে আর আসিল না।

তখন গ্রীষ্মকাল—ভোর ৬টায় স্কুল বসে, বেলা ১০টায় ছুটি হয়। পণ্ডিত মহাশয় আর কাহাকেও জলযোগের ছুটি দিতেন না বা নিজেও ছুটি লইতেন না।

একদিন আমরা কলরব করিয়া যে যাহার পড়া মুখস্থ করিতেছি—একজন সাহেব আমাদের স্কুলে আসিলেন। পণ্ডিত মহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে সেলাম করিয়া বলিলেন, "হুজুর আইয়ে আইয়ে বৈঠিয়ে, হাম ইংরাজী জান্‌তা নেই।" সাহেব টুপি খুলিয়া দুই হাতে নমস্কার করিয়া, হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মশায়, আমি সাহেব নই, আমি বাঙ্গালী, আপনার স্কুল দেখতে এসেছি" বলিয়া একখানা চেয়ার লইয়া স্কুলের মাঝখানে বসিলেন।

একটা বড় ঘরের তিন দিকে খান-ছয়েক বেঞ্চি পাতা, এক দিকে একটা বড় ডেস্ক, একটা বোর্ড, পণ্ডিত মহাশয়ের একখানা চেয়ার, আর দেয়ালে ম্যাপ—এই আমাদের স্কুল! পণ্ডিত মহাশয় একে একে তাঁহার সব ভাল ভাল ছাত্রদের সাহেবের নিকট লইয়া গেলেন; মেয়েদের মধ্যে ক্ষেত্রমণিকে লইয়া গিয়া 'খুব ভাল মেয়ে' বলিয়া পরিচয় দিলেন। ভাল ভাল ছেলেমেয়েদের দেখা হইলে সাহেব বেঞ্চির কাছে আসিয়া এক একটি ছেলের বই দেখিতে লাগিলেন—"দেখি তুমি কি পড়, দেখি তুমি কি পড়," বলিয়া কাহাকেও একটা বানান জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকেও বা একটু পড়িতে বলিলেন। ক্রমে আমার কাছে আসিয়া মিষ্ট স্বরে বলিলেন, "দেখি তুমি কি পড়।" আমি আমার দ্বিতীয় ভাগ তাঁহার হাতে দিলাম—আমার থলির ভিতর কিন্তু 'বোধোদয়' আর 'কবিতাবলী' সর্ব্বদাই থাকিত।

সাহেব। ঈস্! এ যে দ্বিতীয় ভাগ! তুমি এত পড়েছ?

আমার পার্শ্ববর্ত্তী একটি মেয়ের বয়স আট নয় বৎসর, নাম কালিদাসী, সেও দ্বিতীয় ভাগ পড়িত, সে বলিল, "ও বাড়ীতে 'বোধোদয়' আর 'কবিতাবলী' পড়ে, ওর বাবা ওকে পড়ান।" সাহেব আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গো মা, তুমি 'বোধোদয়'ও পড়তে পার, আবার 'কবিতাবলী'ও পড়? তুমি যে মা সরস্বতী! তোমার নাম কি মা?" আমি বলিলাম, "সুকুমারী।" সাহেব হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমার একটি ছেলে আছে, তার নাম সুকুমার—তুমি তার সঙ্গে ভাব করবে? তোমাকে দেখলে সে খুব খুশি হবে।" আমি ঘাড় নাড়িয়া "হ্যাঁ" বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি আমাকে একটা কবিতা মুখস্থ বলিতে বলিলেন; আমি 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' বলিলাম, তিনি করতালি দিয়া বাঃ বাঃ বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটির বয়স কত?" পণ্ডিত মহাশয় একটু মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "যে সেয়ানা মেয়ে, বয়স সাত আট বৎসর না হইয়া যায় না।" সাহেব আমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "না; অত হবে না।" কালিদাসী বলিল, "ও এই অগ্রাণ মাসে ৫ বছরে পড়েছে—ও আমাদের খোকার বয়সী, আমি জানি।"

সাহেব। তা হ'লে সাড়ে চার বছর বয়স—তাই হবে। তোমার বাবার নাম কি সুকুমারী?

আমি। শিবনাথ মিত্র।

সাহেব। তিনি কি করেন, মা?

আমি। তিনি ডাক্তার।

স্কুলের ছুটির ঘণ্টা পড়িল—ছেলেরা ধীরে ধীরে যে যাহার বই গুছাইতে লাগিল।

সাহেব। মশায়, স্কুলটি চলে কি ক'রে?

পণ্ডিত মহাশয়। বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা চাঁদা ক'রে চালান।

পণ্ডিত মহাশয় আরও অনেক কথা বলিলেন, সে সব আমার মনে নাই, তবে বড় হইয়া মায়ের কাছে শুনিয়াছি যে, দিল্লী-প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা ছেলেমেয়েদের বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য চাঁদা করিয়া ঐ স্কুলটি করিয়াছিলেন—পণ্ডিত মহাশয়কে মাসিক ২০৲ টাকা ও স্কুলের একটি বেহারাকে ৫৲ টাকা দিতেন; স্কুল-বাড়ীটা দিল্লীর এক দল ভদ্রলোক

অমনি দিয়াছেন, তাহার ভাড়া দিতে হইত না। পণ্ডিত মহাশয় সেই বাড়ীতেই বাস করিতেন ; স্কুলের বেহারাটা তাঁহার কাজও করিত—সেও স্কুল-বাড়ীতে থাকিত।

স্কুলের ছুটি হইয়া গেলে, ছেলেরা হৈ হৈ করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল—সবশুদ্ধ ত্রিশ চল্লিশ জন হইবে। আমি একে নিতান্ত ছোট, তাতে মেয়েমানুষ, আমি অত ছুটাছুটি করিতে পারিতাম না। ছেলেরা বাহির হইয়া গেলে, সর্ব্বশেষে আমি বাহির হইয়া চাকরের হাতে স্লেট ও বই দিয়া ছাতাটি হাতে করিয়া বাড়ী যাইতাম। আমাকে লইতে নিয়মিত চাকর আসিত। আজ চাকরের হাতে স্লেট বই দেওয়া হইলে, সাহেব-বাবুটি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "সুকুমারি, চল তোমাদের বাড়ী যাই।" এত ক্ষণ আমি তাঁহার সহিত বড় বেশী কথা কহি নাই—বাড়ী যাইবার কথা শুনিয়া বড়ই আহ্লাদ হইল ; দুই হাতে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "বেশ ত, চল না।"

সাহেব। কি খেতে দিবে ?

আমি। যা রান্না হয়েছে।

সাহেব। কি রান্না হয়েছে ?

আমি। মাছের ঝোল আর ভাত আর আলুভাতে আর চচ্চড়ি আর ডাল—(এইখানে একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলাম) আর অম্বল আর দুধ।

রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করায় আমি ভারি মুশকিলে পড়িয়াছিলাম : কারণ, মা আমাকে দিনের মধ্যে চার পাঁচ বার দুধ খাওয়াইয়া পেট ভরাইয়া রাখিতেন, অন্য খাদ্যের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না।

সাহেব। তুমি কি খেতে ভালবাস ?

আমি। আঙ্গুর আর পেস্তা।

পথে যাইতে যাইতে অনেক কথা হইয়াছিল, তাহা কি আর সব মনে আছে! এই পর্য্যন্ত মনে আছে যে, যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সাহেব বাবুর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে, কোন সঙ্কোচ নাই।

আমরা বাড়ীর দরজায় পৌঁছিতেই বাবা রোগী দেখিয়া টম্‌টম্ হাঁকাইয়া ফিরিলেন। আমাকে একজন সাহেবের হাত ধরিয়া থাকিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। আমি সাহেবের হাত দুই হাতে

ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম—বাবা কাছে আসিতেই হাত ছাড়িয়া বাবার হাত ধরিয়া বলিলাম, "বাবা, ও বাঙ্গালী বাবু"—বাবা কথা সম্পুর্ণ করিতে না দিয়া বলিলেন, "ছিঃ, 'ও' বলতে নেই, 'উনি'।" আমি কিছু লজ্জিত হইয়া সংশোধন করিয়া লইয়া বলিলাম, "বাবা বাবা, উনি বাঙ্গালী বাবু, সাহেব নয়।" বাবা একটু হাসিয়া বলিলেন, "নন।"

আমি। নন।

সাহেব আমাকে ধরিয়া কোলে তুলিয়া "নন—'নয়' বলতে নেই, 'নন' " বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। তার পর বাবা সাহেবকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। আমি স্কুলের কাপড় ছাড়িতে উপরে উঠিয়া গিয়া মাকে বলিলাম, "মা মা, একজন সাহেব-বাবু এসেছে, সে ভাত খাবে।"

মা। সাহেব-বাবু কি রে?

আমি। ঠিক সাহেবের মত পোষাক পরা, কিন্তু সাহেব নন, বাঙ্গালী-বাবু। মা, সে ভাত খাবে, মাছের ঝোল হয়েছে?

মা। ছিঃ, 'সে' বলতে আছে কি? 'তিনি' বলতে হয়। অত বড় মেয়ে, এখনও কথা কইতে শিখলে না! সারাদিন লক্ষ্মীছাড়া স্কুলে গিয়ে ব'সে থাকবে ত সহবত শিখবে কি!

আমি তিরস্কার খাইয়া একটু চুপ করিয়া রহিলাম।

মা আমাকে স্নান করাইয়া দিতেছেন, এমন সময় বাবা আসিয়া বলিলেন, "ও গো, একটি ভদ্রলোক এসেছেন, মাছের ঝোল ভাত খেতে চান, আমাদের মাছ আছে কি?"

মা। এখনও বাজার আসে নাই, দেখি, আজ মাছ পাওয়া যায় কি না; সব দিন ত মাছ পাওয়া যায় না।

আমি। মা মা, বাজারে যদি মাছ না পাওয়া যায়, তবে বাজারে সন্দেশ না পেলে তুমি যেমন ঘরে সন্দেশ কর, তেমনি ক'রে মাছ কেন তৈরি কর না?

মা। এ কোথাকার বোকা মেয়ে! হ্যাঁ গা, তুমি না বল যে, তোমার মেয়ের বড় বুদ্ধি?—মাছ কখনও ঘরে তৈরি করা যায়? মাছ নদীতে ধরে।

ছেলেবেলা যে-দিন যে-দিন নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জা পাইয়াছি, সেই সেই দিনের কথা আমার খুব মনে আছে।

স্নান করিয়া একটা খুব পরিষ্কার ইজের আর একটা কোর্ত্তা পরিয়া নীচে গেলাম—মা চুল আঁচড়াইয়া একটা টিপও পরাইয়া দিয়াছিলেন।

আমি গিয়া দেখি, সাহেব-বাবু বাবার একটা ধুতি পরিয়া বিছানায় চিত হইয়া শুইয়া আছেন। আমি যাইলে, আমাকে কাছে বসাইলেন। আমি বলিলাম, "তুমি বুঝি সাহেব-বাবু?" তিনি খুব হাসিয়া আমাকে টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "মশায় ডাক্তারবাবু, আপনি বড় ভাগ্যবান্—দিব্যি মেয়েটি আপনার!"

বাবা। তবু মেয়েটির বুদ্ধির পরিচয় এখনও পান নাই। ঘরে সন্দেশ তৈরির মত, ঘরে মাছ গ'ড়ে দিতে তার মাকে পরামর্শ দিচ্ছিল।

সাহেব। অর্থাৎ যে-কোন প্রকারে তার নবাগত বন্ধুকে মাছের ঝোল খাওয়ানো চাই।

ভারি হাসাহাসি হইল, আমিও প্রচুর আদর লাভ করিলাম। আহারাদির পর সাহেব-বাবুকে ও আমাকে লইয়া বাবা টম্‌টমে করিয়া সাহেব-বাবুর হোটেলে গেলেন; সেখানে আমরা গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম, সাহেব নামিয়া গেলেন। একটু পরে এক বাক্স আঙ্গুর ও অনেক বাদাম, পেস্তা, আপেল ও আরও কত কি ফল নিজে হাতে করিয়া আনিয়া আমার কোলে দিলেন।

বাবা। এ সব কি?

সাহেব। সুকুমারী ভালবাসে!

বাবা। কিন্তু ও যে চাপা প'ড়ে গেল—এত কেন?

সাহেব-বাবু পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া বলিলেন, "চলুন, ষ্টেশনে যাওয়া যাক; চাকরটাকে ব'লে এসেছি আমার ব্যাগটা নিয়ে যেতে।

বাবার সহিত শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া, আমার মুখে অনেক চুমো খাইয়া রেলগাড়ী চড়িয়া যখন সাহেব রুমাল উড়াইতে উড়াইতে চলিয়া গেলেন, তখন আমার ভারি কান্না পাইয়াছিল। বাবাতে আমাতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও বাবুটি কে গা? সাহেবী টুপি, পরেন কেন?"

বাবা। উনি গাজিয়াবাদের রেলের ইঞ্জিনিয়ার—বেশ বড় কাজ করেন। দিল্লীতে বেড়াতে এসেছিলেন, দুই দিন হোটেলেই ছিলেন, স্কুল দেখতে গিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। আমাদের

গাজিয়াবাদে যেতে বার বার ক'রে ব'লে গেছেন। তোমাকে নিয়ে একদিন যাব বলেছি।

আমি। বাবা, আমি যাব।

বাবা। সবাই বাড়ী থেকে গেলে চলবে কেন? তোর মা'তে আমাতে যাব, তুই বাড়ী থাকবি।

আমি। (মায়ের কাছে গিয়া) মা, আমি শোব কার কাছে ?

মা। শুনিস্ কেন ওঁর কথা, উনি ঠাট্টা করছেন! আমি গেলেই তুই যাবি—তুই কি একলা থাকবি ?

২

হেমাও আর স্কুলে আসে না, যাত্রা খেলাও হয় না—আমি ক্ষেত্রমণির সঙ্গে জুটিয়া গেলাম। একদিন ক্ষেত্রমণি বলিল, "সবাই যদি একটা ক'রে পয়সা দাও, তবে আমি এক জোড়া তাস কিনে আমার কাছে রাখব। রোজ স্কুলে আসব, ছুটির সময় আমরা খেলব।" আমরা দু-জনে ছয়টা পয়সা দিলাম।

পরদিন ক্ষেত্রমণি ছোট্ট এক জোড়া ময়লা তাস আনিয়া বলিল, "এর দাম দু-আনা, আমি নিজে দু-পয়সা দিয়েছি।" কালিদাসী শুনিয়া বলিল, "ও মা, সে কি লো, বলিস্ কি! তুই ঠকেছিস্—আমার যে এমনি এক জোড়া তাস আছে, তার দাম চার পয়সা। দেখি তোর তাস—মা গো! ময়লা পুরনো—এ ভাই তুমি ফিরিয়ে দিও।" ক্ষেত্রমণি গম্ভীরভাবে বলিল, "আর কি ফিরিয়ে নেয়। আয় না গোলাম চোর খেলি।"

হেমা যাওয়ার পর হইতে খেলা-টেলা কিছু হইত না, অগত্যা সকলে তাস খেলিতে বসিলাম। চোর প্রায় আমিই হইতাম; অন্য সকলে মাঝে মাঝে চোর হইত, কিন্তু ক্ষেত্রমণি কখনও চোর হইত না, গোলাম তার হাতে গেলেই সে আমার হাতে চালাইত।

একদিন ক্ষেত্রমণি আমাকে বলিল, "সুকুমারি, পুতুলের কাপড় কিনবি?" সে জানিত, আমি পুতুল খেলিতে ভারি ভালবাসি।

আমি। কোথায় বিক্রী হয়?

ক্ষেত্রমণি। আমায় পয়সা দিস, এনে দিব।

সেই দিন হইতে বাবার পকেট হইতে হউক আর মা'র কাছ থেকেই হউক, যেখানে যা পয়সা পাইতাম, ক্ষেত্রমণিকে দিতাম, সে আমাকে এক টুকরা করিয়া ছেঁড়া কাপড় দিত—কোনখানার দাম এক পয়সা, কারও দু-পয়সা, কারও বা চার পয়সা। ক্ষেত্রমণি বলিয়া দিয়াছিল, "ইস্কুলের মেয়েদের দেখাস্ নি, তা হ'লে তারাও চাইবে, ও বেশী পাওয়া যায় না। আর তোর মাকে দেখাস নি, মা বকবে।" ভয়ে কাহাকেও কিছু বলি নাই।

একদিন মা আমার পুতুলের বাক্স দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে, তুই এসব টুকরো টুকরো ন্যাকড়া কোথা পেলি? একটু ঢাকাই কাপড় ছেঁড়া, একটু নীলাম্বরী ছেঁড়া—এ সব কে দিলে তোকে?"

আমি। (ভয়ে ভয়ে) ওসব আমি কিনেছি মা।

মা। কোথা থেকে কিন্‌লি?

আমি। আমাকে ক্ষেত্রমণি কিনে এনে দেয়।

মা। ক্ষেত্রমণি কিনে এনে দেয়! এর দাম কত? এখানার দাম কত?

আমি সমস্ত বলিলাম।

মা। রোস—তোমার ক্ষেত্রমণির কাছে পুতুলের কাপড় কেনা বার করছি। একটা লক্ষ্মীছাড়া স্কুল, অনামুখো পণ্ডিত, মিথ্যাবাদী সব মেয়ে, সেইখানে দেওয়া হয়েছে মেয়েকে লেখাপড়া শিখতে!

মা গজ্‌গজ্ করিয়া বকিতেছেন—বাবা আসিলেন; বলিলেন, "কি হয়েছে? এত গর্জ্জন কেন?"

মা। তোমার মেয়ে সওদা করেছে দেখ—পুতুলের কাপড় কিনেছে।

তার পরদিন হইতে আমার স্কুল যাওয়া বন্ধ হইল। ক্ষেত্রমণির সঙ্গে আর দেখা হইত না। বাবা কোথা হইতে এক মাষ্টার জুটাইয়া আনিলেন, তিনি নিজে স্কুলে পড়িতেন ও আমাকে পড়াইতেন, আমাদের বাড়ীতেই থাকিতেন। তিনি নিজের পড়া মুখস্থ করিতেন, আমি বই হাতে করিয়া তাঁহার কাছে গিয়া বসিতাম, তিনি বইয়ের একটা স্থান দেখাইয়া দিয়া বলিতেন, "পড়"—আমি পড়িতাম; কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "আমি পড়ছি, আমাকে বিরক্ত ক'রো না।" বাবার কাছে যাহা শিখিয়াছিলাম, ক্রমে তাহা ভুলিতে লাগিলাম।—এইরূপে আমার বিদ্যালাভ হইতে লাগিল। ('বঙ্গদর্শন,' অগ্রহায়ণ, ১৩১৪)

শ্রীপঞ্চমী

মাঘ মাসের শেষ; বেলা একটু বড় হইয়াছে; তবু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহিণী যখন আহার করিয়া উঠিলেন, তখন বেলা প্রায় ৪টা। পানছেঁচাটুকু মুখে দেওয়া হইলে আঁচলখানি ভাল করিয়া গায়ে দিয়া সেজবৌয়ের আট মাসের মেয়েটিকে কোলে করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ও বৌয়েরা, খইয়ের মোয়াগুলো তোরা বেঁধে তোল্, আমি একবার ছোটদের বাড়ী থেকে আসি।"

নাকে বড় বড় মুক্তার নথ, অল্প একটু ঘোমটা দেওয়া, লালপেড়ে শাড়ী পরা, একটি প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা, আজ এত অবেলায় না গেলে হ'ত না; পরশু শ্রীপঞ্চমী, সর্দ্দার খুড়োর নৌকো হয়ত আজই আসবে, তরিতরকারি গঙ্গাজল সব রাখান ঢাকান, আপনি না হ'লে কে করবে!" শুনিয়া গৃহিণী একটু উগ্রস্বরে বলিলেন, "তোমার বাছা ঐ এক কথা—আমি কি আর মরবো না, চিরদিন তোমাদের এই ঘর-ঘরকন্না নিয়ে থাকবো? ও-সব এখন তোমার করবার কথা। এমন বৌ কলিকালে কেউ দেখে নাই! বেটার বৌ হ'ল, নাতি নাতনী হ'ল, নাতজামাই হ'ল, তবু এক হাত ঘোমটা! সর্দ্দারের নৌকো আসে, তুমি সব তুলিও পাড়িও, আমি একবার খপ ক'রে আসি—যাব আর আসবো। শ্রীপঞ্চমীর পরদিনই ছোটরা সব বিদেশে যাবে, আজ না গেলে আর এ দু-দিন যেতে পাব না।"

একটি অষ্টমবর্ষীয়া নববিবাহিতা বালিকা বলিল, "হাঁ বড়মা, এবার এখনও ঠাকুর এল না কেন গা?" গৃহিণী ঈষৎ বিরক্তিস্বরে বলিলেন, "এবার শুধু দো'ত পূজো হবে।" মেয়েটি বিস্মিত হইয়া বলিল, "ও মা! ঠাকুর আসবে না, তবে কি রকম পূজো হবে! কেন বড়মা, ঠাকুর আসবে না?" গৃহিণী বলিলেন, "কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম!—বলেন, এবার তোর 'বে-তে' ঢের খরচপত্র হয়েছে, এখন হাতে পয়সাকড়ি নেই, তাই দো'ত পূজো ক'রেই সারবেন, ঘটাঘটি হবে না।" বালিকা বলিল, "পো মশাইয়ের হাতে ঠাকুরপূজোর যদি পয়সা নেই, তবে আমার 'বে-তে' অত বড় যজ্ঞি করলেন কেন?" হাসিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ভাল

জ্বালা! আমি যত তাড়া করছি, তত বকিয়ে মারছে! স্কুলে প'ড়ে শুনে মেয়েগুলো অত্যন্ত বেহায়া হয়েছে, লজ্জা সরমের নাম নেই! এখন আয় লো, আমার সঙ্গে যাস্ ত আয়।" এই বলিয়া গৃহিণী নাতনী কোলে করিয়া ও পৌত্রের নববিবাহিতা কন্যা নন্দরাণীকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন।

কর্ত্তা কৃষ্ণকমল বন্দ্যোপাধ্যায় কেশবপুরের একজন বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ, বয়স পঁচাত্তরের কম হইবে না। বৃহৎ পরিবার—সাত পুত্র, পাঁচ কন্যা, ছয়টি পুত্রবধূ, তাহাদের সন্তানসন্ততি প্রভৃতি। লোকে বলিত, 'বাঁড়ুয্যের খুব কপাল-জোর, যেমন লক্ষ্মীভাগ্যি, তেমনই ষষ্ঠীভাগ্যি।' বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চারিটি পুত্র উপার্জনক্ষম হওয়ায় সংসারের আরও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তাঁহার পুত্রেরা কর্ম্মস্থানে থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রাদি বাড়ীতে থাকে—বিদেশে বধূদের পাঠাইতে বন্দ্যোপাধ্যায় বড় বিরক্ত হন, সে জন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও পুত্রেরা সর্ব্বদা পরিবার সঙ্গে রাখিতে পারেন না। বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি পুত্র এখনও পড়াশুনা করে; কনিষ্ঠের বিবাহ হয় নাই, আগামী বৎসরে হইবে।

গত পৌষ মাস হইতেই গৃহস্থের বড় ঝঞ্ঝাট পড়িয়াছে। উঠানে রাশি রাশি ধান আসিয়া পড়িতেছে, গোলাজাত হইতেছে, সিদ্ধ হইতেছে, শুখাইতেছে। সরিষা, কলাই ঝাড়া হইতেছে, অড়হর ভাঙ্গা হইতেছে; দুটো ঢেঁকি অনবরত খাটিতেছে,—সম্বৎসরের খাবার ঝাড়া বাছা তোলা রাখা ঢাকা,—তাহার উপর মাঘ মাসের প্রথম ভাগেই কর্ত্তার বড় আদরের প্রথম পৌত্রের প্রথম সন্তান নন্দরাণীর বিবাহের আয়োজন,—পরিবারের নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই।

মাঘ মাসের ৫ই শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, ঘরদ্বারগুলি মেরামত হইয়াছে, চালে নূতন খড় দেওয়া হইয়াছে,—কর্ত্তা বলিয়াছেন, "আমার জীবনের এই শেষ খড় দেওয়া, ঘর মেরামত করা, তাই এমন পুরু ক'রে এবার খড় দিচ্ছি যে, দশ বছর আর না সারাতে হয়।" তবু কাজের শেষ নাই—এখনও দু-চারটি মজুর রোজ খাটিতেছে, এখনও গাড়ী গাড়ী কাঠ আসিতেছে ও চেলা করা হইতেছে; বর্ষাকালের জ্বালানী কাঠ এই সময় সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়।

নন্দরাণীর বিবাহে কর্ত্তা সাধ্যাতীত ব্যয় করিয়াছেন; বলিয়াছেন, "আর কত দিন বা বাঁচবো, নন্দরাণীর বিয়েটি আমি থাকতে দিয়ে গৌরীদানের ফল লাভ করিলাম, আমার ইহ জন্মের কাজ শেষ হইল।"

দেখিতে দেখিতে সরস্বতীপূজা উপস্থিত। বিবাহে অনেক ব্যয় হইয়া গিয়াছে বলিয়া, প্রতিমা না আনিয়া সংক্ষেপে সরস্বতীপূজা সারিবেন বলিয়া গৃহিণীর কিঞ্চিৎ বিরাগভাজন হইয়াছেন।

সন্ধ্যা হয় হয়—অনেকগুলি গরু বাছুর আসিয়া গোয়ালে প্রবেশ করিল; ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হইতেছে, শাঁখ বাজিতেছে, ধুনার গন্ধে মনকে পবিত্র স্নিগ্ধ করিয়া আনিয়াছে,—এমন সময় গৃহিণী ত্রস্তে ব্যস্তে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ও সেজবৌমা, তোর মেয়ে নে গো, দুটো কথা কহিতে না কহিতে বেলা একেবারে গেল। গোয়ালঘরে সাঁজাল দেওয়া হয় নি,—অমনি ভাতখেগো কাপড়েই বেরিয়েছি।" বলিয়া, মেয়েটিকে একজনের কোলে দিয়া, তাড়াতাড়ি কতকগুলি শুষ্ক কুচা কাঠ ও খড়কুটা লইয়া, গোয়ালে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া, একটা গামছা হাতে করিয়া ঘাটে চলিয়া গেলেন।

কর্ত্তা সন্ধ্যাবন্দনা করিতে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন; বধূরা সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়া ঘরে গিয়াছে। খড়ের ঘর বটে, কিন্তু কপাট জানালা সব কাঠের—কয় দিন হইতে কন্‌কনে শীত পড়ায় আঁচলে আর শীত মানে না, তাই সকল ঘরেরই কপাট বন্ধ। বাহিরের কাজ শেষ করিয়া সকলেই আপন আপন ঘরের কাজে নিযুক্ত। কেহ রান্না চড়াইয়াছে, এখনই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ভাতের জন্য বায়না করিবে। কেহ তরকারি কুটিতেছে,—কেহ বাটনা বাটিতেছে, ঠক্ ঠক্ করিয়া হলুদ ছেঁচার শব্দ হইতেছে,—কেহ বিছানা করিতেছে,—কেহ কাচা কাপড়গুলি আল্‌নায় গুছাইয়া তুলিতেছে,—কেহ বা নন্দরাণীর বিবাহের গল্প করিতে করিতে সন্তানকে স্তন্য দান করিতেছে,—এমন সময় গৃহিণীর স্বর কানে গেল, "ও গো তোরা আয় গো, কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে, গোয়ালের চাল ধ'রে উঠেছে।"—তখন যে যেখানে যে কাজে নিযুক্ত ছিল, সমস্ত ফেলিয়া, ঝড়ের মত ছুটিয়া, উঠানে বাহির হইয়া দেখে—গোয়ালের চাল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে,—গৃহিণী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গোয়ালে প্রবেশ করিয়া গরুগুলির দড়ি খুলিয়া দিতেছেন ও "কি করলুম, হাতে ক'রে সোনার

সংসারে আগুন দিলুম, হায় হায় হায়!” বলিয়া রোদন করিতেছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত নথ-নাকে রমণীটি ছুটিয়া গোয়ালে প্রবেশ করিলেন এবং “মা কি করেন, শীঘ্র বাহিরে আস্থন” বলিয়া, গৃহিণীর হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আনিলেন। গৃহিণী তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, “বড় বৌমা, তোদের সব পথে বসালুম গো, হাতে ক'রে ঘরে আগুন দিলুম!” বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

“ভয় কি! ভয় কি! রামা ভূতো হরে কাটারি আন্, চাল কেটে ফেল্” বলিতে বলিতে কর্ত্তা বাহিরে আসিলেন। রামা ভূতো হরে পেঁচো কাটারি লইয়া চাল কাটিতে আসিল বটে, কিন্তু তখন কাহার সাধ্য চালে উঠে! রান্নাঘরের দাওয়ায় একটা খোলা কেরোসিন ছিল, একটি স্ফুলিঙ্গ যেমন তাহাতে পড়িল, অমনি রান্নাঘর ঢেঁকিঘর দাউ দাউ করিয়া উঠিল। বুঝিয়া বুঝিয়া বাতাস জোরে বহিতে লাগিল—শত জিহ্বা বাহির করিয়া সর্ব্বভুক্ অগ্নিদেবতা মনের আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে লাগিল।

মহিলাদের হায় হায় রব, বালক-বালিকাদিগের ক্রন্দন, প্রতিবেশীদের ‘জল আন্, কলসী কই, কাটারিখানা দে, জিনিসপত্র বাহির কর্, গোলা বাঁচা, কলাগাছ কাট্, লেপ তোশক যত আছে, ভিজিয়ে ভিজিয়ে চালে দে’ প্রভৃতি কোলাহলে, বাঁশ ফাটার চট্‌পট্ শব্দে দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিল। কর্ত্তার পুত্র পৌত্রেরা কেহই বাড়ীতে ছিলেন না,—কেহ বিদেশে, কেহ অভ্যাসমত বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন,—এমন অঘটন যে ঘটিবে, তাহা স্বপ্নের অগোচর। সুতরাং প্রতিবাসীরা তাঁহাদের নিজ নিজ ঘর দ্বার রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিতে আসিতে দুই তিনখানি ঘর জ্বলিয়া উঠিয়াছে; সে সকল ঘরের কোন জিনিসপত্রই বাহির হইল না,—অন্যান্য ঘরের জিনিসপত্র বাহির হইল বটে, কিন্তু কতক ভাঙ্গা, কতক ছেঁড়া, কে কোথায় কি ফেলিয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। কর্ত্তা মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, “দেখিস বাপ, জিনিস বাঁচাতে গিয়ে যেন কারও প্রাণহানি হয় না।” নামাবলীখানি গায়ে দিয়া তিনি সন্ধ্যা করিতেছিলেন, তাহাই গাত্রে রহিয়াছে। শুভ্র কেশ, ললাটে রক্তচন্দনের ফোঁটা, চারি দিকে অগ্নি নৃত্য করিতেছে, তাহারই মাঝে ঊর্দ্ধনেত্রে কর্ত্তা দাঁড়াইয়া, যেন মূর্ত্তিমান্ অগ্নিদেবতা!

দেখিতে দেখিতে একখানির পর একখানি ঘর অগ্নির প্রতাপে সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ভস্মসাৎ হইতেছে। কত কালের যত্নসঞ্চিত খাগড়াই বাসন, কাঞ্চননগরের থালা, ঢাকাই বাটা, বড় বড় পিতলের হাঁড়ি থালা গামলা,—কত শতরঞ্চ, গালিচা, আসন, পিঁড়ি—কত শাল, রুমাল, ঢাকাই শাড়ী, বেনারসী জোড় ভস্মরাশিতে পরিণত হইল, তাহা অন্যে জানিবে কি, গৃহস্থ স্বয়ংই জানেন না। তাঁহারা বিহ্বলনেত্রে অগ্নিরাশির দিকে চাহিয়া আছেন—আর এইটুকু মাত্র অনুভব করিতে পারিতেছেন, পরিধানের বস্ত্রখানি ব্যতীত 'আমার' বলিতে আর তাঁহাদের কিছুই নাই।

অভুক্ত অবস্থায় ও অনিদ্রায় কর্ত্তা গৃহিণী, বড় বধূ ও বাড়ীর পুরুষগুলি বাহির-বাড়ীর উঠানে রাত্রিযাপন করিলেন। মহিলা ও বালক-বালিকাদের ছোট কর্ত্তারা (কর্ত্তার খুড়তুত ভাই) লইয়া গিয়া আশ্রয় দিয়াছেন,—কর্ত্তাকে কিছুতেই কেহ লইয়া যাইতে পারেন নাই। "এ বয়সে ভিটা ছেড়ে আমি কোথাও রাত্রিবাস করিব না" বলিয়া তিনি উঠানে বসিয়া পড়ায়, গৃহিণী প্রভৃতি তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিলেন।

প্রভাত না হইতে হইতে পিপীলিকাশ্রেণীর মত তাঁহার পরিবারস্থ সকলে একবস্ত্রে, শুষ্কমুখে অনাথা ভিক্ষুকের ন্যায় যখন আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল, তখন আর তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় বিজয়া দশমীর দিন বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া যাহারা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়,—ইহারা কি তাহারাই! তাঁহারই প্রাণের প্রাণ, প্রাণাধিক ধন! কাঁদিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ও মা, তোরা ভিখারিণী হয়েছিস মা! হাতে ক'রে তোদের পথে বসিয়েছি রে!" গৃহিণীর রোদনের সঙ্গে সঙ্গে রোদনের মহা কোলাহল উত্থিত হওয়ায় অশ্রু মোচন করিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "কর কি গিন্নী! ছি ছি, কিসের ভিখারিণী? ভয় কি—ও মা, তোদের যার যা গেছে, সব আমি দেব, ভয় কি! আমি থাকতে তোদের কিসের ভাবনা—যে ঘর গেছে, তার চেয়ে ভাল ঘর হবে। হরেন্দ্র, নরেন্দ্র, ওঠ বাপ,—আজকের মধ্যে একখানা ঘর তোলা চাই-ই চাই। ভগবান্‌কে স্মরণ ক'রে সকলে কাজে লেগে যাও—কারও যে প্রাণহানি হয় নাই, এই মনে ক'রে তাঁর চরণে প্রণাম কর।" সকলে তাঁহার সহিত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে পর তিনি বলিলেন, "আমার মা যশোদা নন্দরাণী কই মা?" কর্ত্তার কনিষ্ঠ পুত্র "আয় নন্দা, বাবার

কাছে আয়” বলিয়া লোকারণ্যের মধ্য হইতে নন্দরাণীকে বাহির করিয়া আনিল,—নন্দা চোখ মুছিতে মুছিতে পিতার পিতামহের কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কর্ত্তা তাহাকে শান্ত করিবেন কি, তাঁহার নিজেরই কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। গৃহিণী বলিলেন, “সব যাক, কিন্তু নন্দার গহনাগুলি যে গেল, এই আমার প্রাণে সহিতেছে না। বিয়ের এক বৎসরের মধ্যে কি বিয়ের ক’নের গহনায় আগুন ছুঁতে আছে! মনে কত যে অমঙ্গল গাহিতেছে! আহা, কচি ছেলে—কাঁদবে না, অমন সব নতুন গহনা।” কর্ত্তা বলিলেন, “কাঁদিস নে মা, আমি আবার তোকে সব গহনা দিব।” বলিতে বলিতে একজন একটি বাক্স হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, “এই নন্দার গহনার বাক্স পাওয়া গেছে।” সত্যই নন্দার গহনার বাক্স অভগ্ন অক্ষত অবস্থায় অগ্নিকবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, “বাঁচিলাম, আর আমার কোন ক্ষেদ নাই—মা দুর্গা দুর্গতিহারিণি, এই জন্যেই তোমাকে সকলে দুর্গতি-নাশিনী বলে মা।”

তখন প্রভাত-সূর্য্য দশ দিক্ আলোকিত করিয়া স্বভাবতঃই সকলের মনে বল দান করিতেছে—আবার নিরাশার অন্ধকার ঘুচিয়া সকলের মনে আশার আলোক দেখা দিয়াছে। ক্রমে ক্রমে অনেকেই ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়া কর্ম্মান্তরে মন সংযোগ করিল। কর্ত্তা নন্দরাণীকে মৃদু স্বরে বলিলেন, “কেন যশোদারাণি, কিসের জন্যে তোমার এত দুঃখু? সবাই খেলতে গেল, তুমি কেন গেলে না মা? তোর গহনা ত সব পাওয়া গেছে।” তখন নন্দরাণী ধীরে ধীরে বলিল, “আমার পুতুলের বড় বাক্সটা পুড়ে গেছে।”

কর্ত্তা। আবার হবে পুতুলের বাক্স, তার জন্য ভাবনা কি?

নন্দা। তাতে যে আমার কত ভাল ভাল পুতুল ছিল, তেমন আর হবে না।

কর্ত্তা। সে কি মা? আর হবে না? কেন হবে না? আমি আজই সব আনিয়ে দেব।

নন্দা। বড়মা যে বললেন, তোমার হাতে পয়সা নেই ব’লে সরস্বতী ঠাকুর আনা হয় নি, তুমি পয়সা কোথা পাবে?

কর্ত্তা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে আবেগভরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি মিথ্যা কথা বলিয়াছি, আমি প্রবঞ্চক, দেবতার সহিত শঠতা করিতে গিয়াছিলাম, তাই দেবতা আমাকে এই শাস্তি দিলেন। দেবতার পূজার পাঁচ শত টাকা ফাঁকি দিয়াছি, তাই আমার দশ হাজারে ঘা পড়িল। বাপ সকল—যাও, আগে সরস্বতী-প্রতিমা আন, এই ভস্মস্তূপের উপর প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজা করিব, নচেৎ দেবতার ক্রোধের শান্তি হইবে না।" বলিয়া নন্দাকে কোলে টানিয়া লইয়া গাহিয়া উঠিলেন—

"কোথায় গো মা নন্দরাণী, কোলে নে তোর নীলমণি।" ('ভারতী,' আষাঢ় ১৩১৫)

মেয়ে-যজ্ঞি

মেয়ে-যজ্ঞি বলিলেই বুঝিতে হইবে বিশৃঙ্খলার সমষ্টি! প্রাতঃকাল হইতে ভিয়েনের গন্ধে, দাসীর কলরবে, ছেলের কান্নায়, মলের রুনুঝুনুতে, চুড়ির ঝন্ ঝন্ শব্দে যজ্ঞিবাড়ী সরগরম। পিচ্ছলে তাড়াতাড়ি চলা যায় না, অথচ হাতে অনেক কাজ, তাড়াতাড়ি করিতেই হইবে—সুতরাং কেহ আছাড় খাইয়া লোক হাসাইতেছে,—কাহারও ঢাকাই শাড়ীতে কাদা লাগায় মন খুঁৎ খুঁৎ করিতেছে, কোন ছেলে "সন্দেশ খাব রে" বলিয়া সেই কাদাতেই গড়াগড়ি দিতেছে।

একটি ঘরে বড় বড় বঁটি পাতিয়া সধবা, বিধবা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, কুৎসিতা, সুন্দরী মহিলারা তরকারি কুটিয়া ঝুড়ি ঝোড়া বোঝাই করিয়া দিতেছেন, হাসি গল্পের বিরাম নাই। বাঙ্গালীর মেয়েরা প্রত্যেকেই ইংরাজ মহিলাদের মত সুস্বরেব প্রতি মনোযোগিনী নহেন, সুতরাং কেহ বা কোকিল-কণ্ঠে, কেহ বা মোটা গলায় উচ্চ স্বরে কথা কহিতেছেন।

শিশু সন্তান আসিয়া মাতাকে বিরক্ত করিতেছে—অনেক ক্ষণ মায়ের ভ্রূক্ষেপই নাই—হাতে কাজ, মুখে গল্প, ঠোঁটে হাসি—যখন ছেলে পঞ্চম স্বরে—'মা, খাবার দে না, আ-আ'—বলিয়া ক্ষুদ্র হাতে দু-একটা চড় দিল বা মাথার কাপড়টা খুলিয়া দিল—তখন মা, 'আ মোলো যা হতভাগা ছেলে, তর সয় না' বলিয়া ক্ষুদ্র হাতের মৃদু চড়ে ঋণ সুদশুদ্ধ ফেরত দিয়া আবার গল্পে মনোনিবেশ করিলেন। কেহ বা 'এই যে বাবা, দিচ্ছি, খাবার দিচ্ছি চল, ক্ষিদে পাবেই ত' বলিয়া গল্পের হারানো খেই খুঁজিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে গল্পে প্রবৃত্ত হইলেন। ছেলে কাঁদিয়া 'যজ্ঞিবাড়ী' বলিয়া জানান দিতে লাগিল।

আর একটা ঘরে বালিকারা ও ছোট ছোট বধূরা পান সাজিতেছে। ঘোমটার প্রান্তে হাসিমাখা লাল লাল ঠোঁটের উপর নোলকটি ঝুলিতেছে। হাত দুখানি চুন খয়েরের দাগে রঞ্জিত; মাঝে মাঝে নিজের হাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সকলের বিষম ভাবনা হইতেছে যে, এই হাত লইয়া কেমন করিয়া লোকের সামনে বাহির হইবে—কেহ বা "কি ক'রে এ দাগ উঠবে ভাই" বলিয়া হাসিয়া আকুল হইতেছে। কেহ বা দাগ উঠিবার উপায়

বলিয়া দিতেছে। এই ঘরে শিশুর কলরব বড় একটা নাই,—যদি কোন শিশু "দিদি, নে-না" বলিয়া আসিতেছে, অমনি তাহার দিদি 'যা যা, ঐ ঘরে মা আছে যা' বলিয়া সত্যই বিদায় করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছে।

এমন সময় ডাক পড়িল—"ও রে, এই বেলা সবাই ভাত খেয়ে নে-না গো—এখনই যে সব মেয়েরা আসতে আরম্ভ করবে, তুটো বেজে গেছে।"

দালানে সারি সারি কলাপাতায় ভাত ও পাঁচ সাত প্রকার তরকারি একটু একটু দিয়া পাতা সাজানো আছে,—ভাত শুখাইয়া চাল হইতেছে, যে আসিতেছে, সে বসিতেছে। কেহ ডাকিতেছে—'ও সেজ বৌ, আয় না'—কেহ ডাকে, 'ন-দিদি, শীগ্গির নে-না ভাই খেয়ে, না হ'লে যে কারও চুল বাঁধা হবে না।' কাহারও ডাকাডাকিতে সাড়া নাই, পাতা পড়িয়া আছে। যাহাদের অর্দ্ধেক আহার হইয়াছে, তাহারা ডাকিল—'ও ঠাকুর, আর কি আছে নিয়ে এস না।' ঠাকুর এক পিতলের হাতা লইয়া আসিয়া সকলকে এক এক হাতা দিয়া গেল। "ও ঠাকুর—এদিকে এদিকে," "ও ঠাকুর, আর একখানা মাছভাজা দাও না," "ও ঠাকুর, মাছের ঝোলের মুড়োটা লক্ষ্মীর পাতে দাও—কাঁটার মাছ একখানা খুঁজে দাও ত।" ঠাকুর পরিবেশনে আসিলেই বধূরা ঘোমটার মাত্রা বাড়াইয়া হাত গুটাইয়া আহার বন্ধ করিতেছে, মেয়েরা চাহিয়া চাহিয়া খাইতেছে।

ভাত খাওয়ার পালা শেষ হইতে না হইতে একে একে নিমন্ত্রিতেরা আসিতে আরম্ভ করিলেন। একজন তাঁহাদের দেখিয়া "ঐ রে—কারা এল, ওঠ ওঠ, আর দই খায় না।" কেহ ত্রস্তে উঠিয়া পড়িল, কেহ গল্প বন্ধ হওয়ায় এইবার ভাল করিয়া কাজে মনোনিবেশের অবসর পাইয়া, 'দইটা বেশ হয়েছে জেঠাই-মা, আর এক খুরি দাও ত' বলিয়া প্রচুর দই খাইয়া লইল। একটি করিয়া শিশু প্রায় সকলের পাশে আছেই—কারও পাশে বা তুটি। মা এখন বিশেষ মনঃসংযোগে ছেলেকে আহার করাইতে লাগিল, কেহ উঠিতে বলিলে বলে, 'এই যে ছেলেটা খাচ্ছে, খাওয়া হোক, উঠি।' নিজেও যে না খাচ্ছেন, এমন শপথ করা যায় না।

এদিকে ত্বরিতাগত মহিলারা আপাদমস্তক বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া জড় ভরতের ন্যায় উচ্ছিষ্টের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন—কোন্ দিকে যাই। গৃহিণীরা দই সন্দেশের হাঁড়ি হাতে পরিবেশনে ব্যস্ততার সহিত বলিতেছেন, "এস এস—চল চল, উপরে চল।" কিন্তু উপরের সিঁড়ির

সন্ধান কে দেয়? সুতরাং নিমন্ত্রিতারা দাঁড়াইয়া আহার দেখিতেছেন। ইহাতে দু-একজন শীঘ্র আহার শেষ করিয়া—'পিসিমা যেন কি, এঁদের নিয়ে বসাও না গা' বলিয়া হাত ধুইতে গেল। তাহারা যখন হাত ধুইয়া আসিল, তখন আরও অনেকে আসিয়া জুটিয়াছেন। তখন একজন "আসুন আসুন, আপনারা এই দিকে এখন আসুন" বলিয়া উপরে লইয়া একটি ঘরে বসাইলেন। যাহারা পূর্ব্বের পরিচিতা, তাহারা আসিয়া সিঁড়ি, ঘর, মাদুর খুঁজিয়া লইয়া এক রকম বসিবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। মহিলারা প্রায়ই পরস্পরে পরস্পরের অপরিচিত;—মূক ও বধিরের ন্যায় বসিয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন। যদি কেহ কাহাকেও পরিচিতা পাইয়া থাকেন, তবে তিনি দুই এক কথা কহিয়া সকলের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন।

এমন সময় গৃহিণীদের কাহারও বন্ধু অথবা মেয়েদের শ্বশুরবাড়ীর কুটুম্ব বা পিত্রালয়ের কেহ আসায় তাঁহাদের কল্যাণে গৃহিণীদের কেহ একবার আসিয়া সকলকেই সমভাবে আপ্যায়িত করিয়া গেলেন—একজন আসিয়া পান দিয়া গেল। যাঁহারা সকাল সকাল আসিয়াছেন—মনোগত বাসনা যে, সকাল সকাল ফিরিবেন। গতিক দেখিয়া বুঝিলেন যে, সে আশা বৃথা!—

বাড়ীর মেয়েদের মধ্যাহ্নের আহার ও বৈকালিক বেশভূষা সমাপ্ত হইতে পাঁচটা বাজিল। তখন একটি গলা-খোলা লাল বডি বা হাতকাটা কালো জ্যাকেটের সঙ্গে কেহ নীলাম্বরী, কেহ ঢাকাই, কেহ শান্তিপুরের ডুরে পরিধান করিয়া দু-চারখানি অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া এ-ঘর ও-ঘর হইতে নিমন্ত্রিতাদের সংগ্রহ করিয়া উঠানে লইয়া গিয়া বসাইতে লাগিলেন; সেখানে শতরঞ্চির উপর পরিষ্কার চাদর পাতা। এক পাশে কারচোপের কাজের বিছানা, তাহাতে আইবড় ভাতের বা বৌভাতের বা 'সাধের' ক'নে উজ্জ্বল বস্ত্রালঙ্কার ও পুষ্পমাল্যে ভূষিতা হইয়া বসিয়া আছে,—সম্মুখে দুইটি বৃহৎ বৃহৎ পুষ্পাধারে বড় বড় দুটি গোলাপ ফুলের তোড়া। এক পাশে নাচের বাজনা বাজিতেছে, কতকগুলি কালো কালো মোটাসোটা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ঢোলক, মন্দিরা ও বেহালা বাজাইতেছে। তিন চার জন নাচওয়ালী আবাহু, আকণ্ঠ, আপাদমস্তক অলঙ্কার পরিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছে, কেহ বা সিগারেট খাইতেছে, কেহ পান খাইতেছে।

নিমন্ত্রিতাদের আসিতে দেখিয়া দুই জন তাড়াতাড়ি উঠিয়া নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে নাচ গান জুড়িয়া দিল ও নাচিতে নাচিতে প্রত্যেকের অতি নিকটে আসিয়া পেলার জন্য ব্যস্ত করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে উঠান ভরিয়া গেল, আতর গোলাপ ফুলের মালা ও তোড়া বিতরণে নিমন্ত্রিতাদের অভ্যর্থনা করা হইল। এখন যাঁরা আসিতেছেন, তাঁহাদের কোন চিন্তা নাই যে, কোথায় বসিব। প্রবেশপথে ও ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বাড়ীর মেয়েরা নিমন্ত্রিতাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। যে কেহ গাড়ী বা পালকি হইতে নামিতেছেন, অমনই তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া উঠানে বসানো হইতেছে। আসর জমজমাট, হঠাৎ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া পাল ভেদ করিয়া ছড় ছড় করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হৈ হৈ করিয়া সকলে উঠিয়া পড়িল, এবং 'নরেন কোথা গেলি,' 'খুকী ঝিয়ের কোলে যা,' 'হ'রে রুমালখানা মাথায় দে,' 'রোগা ছেলে ভিজে-গেল, ও মা কি হবে, আজ সবে দুটি ভাত দিচ্ছি' বলিতে বলিতে মহিলারা ঘরের ও বারান্দার দিকে ছুটিতে লাগিলেন। বেনারসী, ক্রেপ, বোম্বাই প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র ভিজিল। হুড়াহুড়ি, কলরব, কাদার পিচ্ছিল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। কে কাকে দেখে! তারই মাঝে নাচওয়ালীরা ভাঙ্গা গলায় চেঁচাইতেছে—ও গো, মেয়েদের দালানে বসাও না! তাহাদের বড় আশায় ছাই পড়িয়াছে, হীরা মুক্তা ও প্রচুর সোনায় ভূষিতা মহিলাদের দেখিয়া তাহারা আশা করিয়াছিল যে, প্রচুর পেলা পাইবে—কিন্তু—হায় রে বৃষ্টি!—

বারান্দায়, দালানে ও ঘরে ঘরে খাদ্যের পাতা সাজানো হইয়াছে, তিল মাত্র স্থান নাই যে মহিলারা আশ্রয় লয়েন, তা আবার গানের মজলিস বসিবে!

বৃষ্টির প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া বাড়ীর মেয়েরা অভ্যাগতদিগের হাত ধরিয়া সযত্নে আহারে বসাইলেন এবং বৃষ্টিতে সকলের বড়ই কষ্ট ও ক্ষতি হইল বলিয়া দুঃখ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গোলযোগে পরিবেশনে অনেক ত্রুটি হইতে লাগিল—কেহ লুচি পাইল, কচুরি পাইল না, সন্দেশ পাইল ত রসগোল্লা পাইল না।

রান্না হইয়াছে পোলাও, কালিয়া, চিংড়ির মালাই কারি, মাছ দিয়া ছোলার দাল, রোহিতের মুড়া দিয়া মুগের দাল, আলুর দম, ছোকা, মাছের

চপ, চিংড়ির কাটলেট, ইলিস ভাজা, বেগুন ভাজা, শাক ভাজা, পটোল ভাজা, দইমাছ, চাটনি, তার পর লুচি, কচুরি, পাঁপরভাজা; একখানি সরাতে খাজা, গজা, নিমকি, রাধাবল্লভি, সিঙ্গাড়া, দরবেশ মেঠাই; একখানা খুরিতে আম, কামরাঙ্গা, তালশাঁস ও বরফি সন্দেশ; আর একখানায় ক্ষীরের লাড্ডু, গুজিয়া, গোলাপজাম ও পেরাকী। ইহার উপর ক্ষীর, দধি, রাবড়ি ও ছানার পায়স। বাবুদের জন্য মাংসের কোর্মা ছিল, কিন্তু মেয়েরা অনেকেই মাংস খান না, এ জন্য তাহা মেয়েদের মধ্যে পরিবেশন করা হইল না। আহার্য্য প্রচুর ও অনেক প্রকারের, সুতরাং পরিবেশনে বিশৃঙ্খলা ঘটিলেও প্রত্যেকেরই ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল।

এইবার বাড়ী যাওয়ার পালা। "গাড়ী কই," "খোকা কোথা," "খুকীর গলার হার কে নিলে?" কিছুই খুঁজিয়া মিলিতেছে না! বৌমার হীরার ধুক্‌ধুকি নাই, টেপির মাথার টুপির ল্যাজ ছেঁড়া, গিন্নীর নাকের নথের নোলক পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে। অমিয় জুতা হারাইয়া শুধু মোজা পায়েই "আমার জুতো ও—ও—ও—ও" করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

গিন্নীর বকুনি, কর্ত্তার ক্রোধ শান্ত হইতে রাত ১২টা বাজিল। জুতার শোক ভুলিয়া অমিয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, এক ঘুমে রাত্রি প্রভাত। একজন বৈষ্ণব খঞ্জনি বাজাইয়া গান গাহিতেছে—জয় যদুনন্দন জগত-জীবন—। ('ভারতী,' ভাদ্র ১৩১৫)

মেয়ে-যজ্ঞির বিশৃঙ্খলা

সে আজ বোধ হয় ত্রিশ বৎসরের কথা, যখন 'ভারতী' নব উৎসাহে নূতন প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি তখন ছেলেমানুষ— আমাকে পাঁচ জনে বলিলেন—প্রবন্ধ লেখ।

সর্ব্বনাশ—"বামন হইয়া চাঁদে হাত" দেওয়া যেমন অসম্ভব কথা, আমার প্রবন্ধ লেখাও ঠিক তেমনই অসম্ভব। আমি বলিলাম—পারিব না। তাঁহারা দলে ভারি—বলিলেন, "হাঁ পারিবে—পারিতেই হইবে, নিমন্ত্রণে যাও, যাহা দেখিয়া আসিয়া গল্প কর—তাহাই লিখিয়া দাও।" আমি বলিলাম, "তাহাতে কি হইবে, সে ত প্রবন্ধ নয়।" তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন, "সে সব তোমার ভাবিতে হবে না—আমি তাই থেকে রচনা করিয়া লইব।" আমি দশ বৎসরের স্মৃতি একত্র করিয়া যাহা মনে পড়িল লিখিয়া দিলাম। কিছু দিন পরে দেখি, আমার সেই কদর্য্য হস্তাক্ষর 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কি ভয়ানক! ঘরে ঘরে একটা আন্দোলন, একটা আলোচনা পড়িয়া গেল—এ সব ঘরোয়া কথা কে লিখিল? ধরা পড়িলাম—লাঞ্ছনা যথেষ্ট ভোগ করিতে লাগিলাম। শ্বশুর ভাশুর প্রভৃতি গুরুজনেরা বলিলেন, "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী, 'কথামালা' প'ড়ে আর কত বিদ্যা হবে—নইলে ঘরের কথা কাগজে ছাপায়—মনে করেছে বড্ড লেখাপড়া শিখেছে—ছিঃ ছিঃ!" একে ছেলেমানুষ—তাতে বউ—লাঞ্ছনা খাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

এ লাঞ্ছনা গঞ্জনা আমাকে কিন্তু অনর্থক বিনা অপরাধে ভোগ করিতে হইয়াছিল। আমি প্রবন্ধও লিখিতে যাই নাই—ইচ্ছা করিয়াও লিখি নাই—কাহারও বা কোন সমাজের দোষ গুণ বিচারের শক্তিও আমার ছিল না—আমি সে বিচার করিতেও বসি নাই। কিন্তু আমার বিচারকেরা আমার বক্তব্য শোনার অপেক্ষা বা আবশ্যক বিবেচনা না করিয়াই একতরফা মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিলেন।

আজ স্বেচ্ছায় প্রবন্ধ লিখিব বলিয়া লিখিতে বসিয়াছি—মনের কথা যে গুছাইয়া লিখিতে পারিব, তাহার ভরসা কম—অতএব পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমার কোন কথা

অসঙ্গত বা অসংলগ্ন হইলে তাহাতে রুষ্ট না হইয়া যেন সঙ্গত কথাগুলির আলোচনা করেন। আজ আমাদের পিতা, স্বামী, পুত্র, সকলেই যাহাতে দেশের উন্নতি হয়, সে জন্য সাধ্যমত সচেষ্ট—আমাদেরও কর্ত্তব্য তাঁহাদের সহায়তা করা। কিন্তু কেমন করিয়া কি করিলে আমরা তাঁহাদের যোগ্যা গৃহলক্ষ্মী হইতে পারি, তাহা চিন্তার বিষয়। নারী জাতির উন্নতি ব্যতীত সমাজের উন্নতির আশা বৃথা। নারী জাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি হয়; কেন না, সন্তান পালন করা মাতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মা-ই ছেলেকে "মানুষ" করেন। তাই ছেলেকে মানুষ করিতে হইলে আগে মাকে মানুষ তৈয়ার করিবার যোগ্যা করা দরকার। সেই জন্যই ত স্ত্রীশিক্ষার এত ব্যবস্থা হইয়াছে, এত বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, আমার জীবনে এই ৪৫ বৎসরে স্ত্রীশিক্ষা কত দূর অগ্রসর হইয়াছে। হাঁ, পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা হইয়াছে—বর্ণপরিচয়ের জ্ঞানশূন্যা স্ত্রীলোক হাজারে একটিও মিলিবে না—কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালী রমণীর উন্নতি কতটুকু হইয়াছে? অথবা উন্নতি হইয়াছে, না অবনতি হইয়াছে? এক হিসাবে অবনতি হইয়াছে—সেকালের কিছুই নাই—অতএব মন্দের সহিত ভালটুকুও গিয়াছে। লেখাপড়ার সময় সেই পাঁচ ছয় বৎসর বয়স হইতে দশ এগার বৎসর পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ আছে—সেই কথামালা, বোধোদয় পড়াই শেষ পড়া। সেই তের চৌদ্দ বৎসর বয়সে বালিকা মা হইয়া শিশুপালনের ভার গ্রহণ করে। সে যে তখনও নিজেই মানুষ হয় নাই—সে আবার অন্যকে মানুষ করিবে কি? সেকালে যদিও ৮।৯।১০ বৎসর বয়সেও বালিকারা বিবাহিত হইত, কিন্তু ১৫।১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শ্বশুরালয়ে যাইয়া অধিক দিন বাস করিত না। এ-কালে বিবাহ ১৩।১৪।১৫তেও হয়, কিন্তু ১২ হইতেই "বে হ'ল না, বে হ'ল না, কবে হবে, কবে হবে"—এই আলোচনা ছাড়া শিক্ষার কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। বিবাহ হোক বা না-হোক, স্কুল ১০।১১ বৎসরেই ছাড়ানো হইয়া যায়। আর তাহাও বলি, সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়েদের এ রকম স্কুলের লেখাপড়ায় অধিক শিক্ষা না হওয়ায় কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই—শিক্ষার প্রণালী পরিবর্ত্তিত না হইলে বাস্তবিক উন্নতি হইবে না—অতএব বড় কথা ছাড়িয়া যে কথা নিতান্ত আমাদের ঘরের কথা, তাহাই লইয়া আলোচনা করি।

"মেয়ে-যজ্ঞি" বলিলেই বুঝায় বিশৃঙ্খলতার সমষ্টি—ইহা কি লজ্জার বিষয় নহে—ইহার কি প্রতিবিধান সহজে হইতে পারে না ?

মেয়ে-যজ্ঞিতে আমাদের বাঙ্গালী রমণীর প্রকৃত পরিচয় পাইয়া থাকি। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার ভাল-মন্দ বিচার করিয়া চলিতে পারি। অনেক বিশৃঙ্খলা সামাজিক নিয়মের জন্যও হয়—যেমন স্থান সংক্ষেপ হইলেও নিমন্ত্রণ করিতেই হইবে। "কা'কে রেখে কা'কে বাদ দেব," অতএব কুটুম্বিনী সকলেই আসিলেন—সন্তানদের কোথায় রাখিয়া আসিবেন—তাহারাও আসিল—সঙ্কীর্ণ স্থান—বালক-বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, সকলে একত্রে নানাপ্রকার বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে—বালক-বালিকারা যে "মানুষ," তাহাদের অশ্রাব্য যে কিছু থাকিতে পারে, সেখানে সে বিচার নাই, তাহাদের যে শরীর নামক পদার্থ আছে, ক্ষুধা আছে, নিদ্রা আছে, স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে যে তাহাদের কষ্ট হয়, এ কথা বিচার করা হয় না। শিশু ক্লেশে কাঁদিতেছে, বালিকা মাতা নিরুপায়ে তাহাকে যথাসাধ্য পিটনচণ্ডী দিতেছে—এ দৃশ্য মেয়ে-যজ্ঞিতে প্রচুর। যদি বলি, এত ছোট ছেলেপিলে এনেছ কেন—উত্তর—কার কাছে রেখে আসব। বাস্তবিক কে ভার লইবে ? নিমন্ত্রণের একটা নির্দ্দিষ্ট দিন যেমন স্থির করা হয়, তেমনই যদি একটা নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির করিয়া দেওয়া হয়—যদি পুরুষ রমণীর যেমন পৃথক্ ব্যবস্থা আছে, তেমনই ছেলেপিলের একটা পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট সময় বা দিনের ব্যবস্থা হয়, তবে শিশু নিমন্ত্রণ খাওয়ার হাত হ'তে কতক পরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। অনেক মাতা শিহরিয়া উঠিবেন যে, "লেখিকা বলে কি—ছেলে ঘরে ফেলে আপনি খেতে যাব—মুখে কি খাবার উঠে!" তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন যে, নিমন্ত্রণ-গৃহে শিশুরা যাবার সময় আগ্রহ সহকারে যায় বটে, কিন্তু সেখানে একটা বয়স্ক ব্যক্তির মত পোষাক আঁটিয়া গম্ভীর ভাবে আহারের প্রত্যাশায় বসিয়া ধৈর্য্য রক্ষা কত ক্ষণ করিতে পারে ? তার পর ক্রমশঃ তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান দূরে যায়—জুতা হইতে ক্রমে ক্রমে মাথার টুপি পর্য্যন্ত পুঁটুলিজাত হয় না কি ? মাতা শিখাইয়া আনিয়াছেন—"দুষ্টুমি ক'রো না বাবা, ক্ষিদে ক্ষিদে ক'রো না।" —আসিয়াছেন বেলা একটা—বাজিল রাত বারোটা, তখনও খেতে পায় না—ঘুমুতে পায় না—কর্ত্তব্যজ্ঞান কি থাকে ? আমাদের ঘরকন্না

এই রকম সকল বিষয়ে ঢিলা-ঢালা রকমের, শিশুদের শিশুকাল হ'তেই কর্ত্তব্যজ্ঞান এ জন্য মজ্জার সহিত মিশ্রিত হয় না। চলন-বলন, নড়ন-চড়নে যে একটা নিয়ম বা তাহার আবশ্যকতা আমরা আজও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। সময়ের মূল্য যে কত, তাহা বুঝিতে শিখি নাই। সময়ে নুন ভাত খাওয়াও ভাল, অসময়ে পোলাও লুচিরও মর্য্যাদা হানি হয়, তা আমরা বুঝি না। স্থানাভাব বিচার নাই—কুটুম্ব, পরিচিত, সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, আয়োজন প্রচুর হইয়াছে—কিন্তু দাঁড়াবার স্থান নাই—রান্না শেষ হইতে সন্ধ্যা হইল—কিছুতে দৃক্‌পাত নাই; "ও বৃহৎ ব্যাপারে অমন হয়ে থাকে।" এ ৪৫ বৎসরে এ বিষয়ের কিছু মাত্র বদল হয় নাই। এইখানে স্বীকার করিতেছি, একটি কুপ্রথা দূর হইয়াছে—"সরা তোলা"টা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। আহার করিতে আসিয়াই মিষ্টান্নের পাত্রে লুচিগুলি তুলিয়া পশ্চাতে রাখা—দু-তিনখানা পাতা একজনে অধিকার করিয়া, "ওখানা আমার সরর, ওখানা আমার বরর, এতে তরকারি দিও না" (মনে মনে লুচি যত পার দাও), তা আর নাই। আমাদের কন্যারা এই প্রথা এ দেশে ছিল বলিয়া বিশ্বাস করে না। একে ত আমাদের জানা থাকে না যে, কত লোক নিমন্ত্রণে আসিবে—অনুমান লোক দুই শতও হইতে পারে, তিন শতও হইতে পারে—কেমন হিসাব দেখুন! অতএব প্রচুর খাবার রাখিতে হয়—পাছে কম পড়ে। এর উপর যখন "তোলা" প্রথা ছিল, তখন গৃহস্থের কি কষ্ট ছিল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তা বলিয়া আজকাল খরচ গৃহস্থের যে কম হয়, তা কেহ যেন মনে না করেন। কারণ, ঘরে লইয়া যাওয়া হয় না বটে, কিন্তু নষ্ট হয় প্রচুর। সেকালে এত "রকমফের" ছিল না—লুচির যজ্ঞি—লুচি কচুরি, পাঁপরভাজা, আলুনি ছোকা, পটোল বা বেগুন-ভাজা, ক্ষীর দই মিষ্টান্ন (তাও মিষ্টান্ন মেয়েরা ঘরে লইয়া যাইতেন, স্বামী পুত্র আছেন)—সুতরাং এত "ফেলা-ফেলির ঘটা" ছিল না—মিতব্যয়িতা ছিল, লক্ষ্মীশ্রী ছিল। কাঙ্গালী-ভোজন ছিল, উদ্বৃত্ত সামগ্রী তাহাতে খরচ হইত। এক শ্রাদ্ধ ব্যতীত আর ত এখন কাঙ্গালী-ভোজন বড় একটা হয় না। তার পর বিশৃঙ্খলা ঘটিবার একটা বৃহৎ কারণ গাড়ী পালকি। সেকালের মত এখন আর কাহারও বাড়ী

পালকি আসে না—নিমন্ত্রণ করিয়া গেলাম, নিজেরাই যেও। ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু সুবিধা হইয়াছে—এখন ফিরিয়া যাবার ব্যবস্থা ও সময়মত আহারের ব্যবস্থাটা হইলে অনেক অসুবিধা দূর হয়। নিমন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, মেলা-মেশা—আলাপ-পরিচয়। কিন্তু আমাদের এই বৃহৎ যজ্ঞিতে সে সুবিধা আদৌ হয় না।

নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে গিয়াই সকলে চান, খাওয়াটা হ'লে হয়, চ'লে যাই—খাওয়াও যে কত ক্ষণ হবে, তার ঠিক নেই। মুখ চেনাচিনি অথবা আর কে কি বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া আসিয়াছে, ইহা লক্ষ্য করা ব্যতীত আর কোন রকম আলাপ-পরিচয় প্রায়ই হয় না। এখানে সাজসজ্জা সম্বন্ধে এই বলা যায়, মহিলাদের পরিচ্ছদের অনেকটা উন্নতি দেখিতে পাই। একবস্ত্রপরিহিতা বাঙ্গালী রমণী দেখা যায় না—বিধবারা তসর গরদ বা মোটা বস্ত্র ব্যবহার করেন। আর রেশমী বস্ত্র ছাড়িয়া সুতার বস্ত্র পরিধান করিয়া যে আহারে বসা হইত, এখন আর সে জ্বালা নাই। ইহা হইতে এই অনুমান করা যায় যে, "সকরীর" বিচার মেয়েদের মধ্যেও তত দূর প্রবল নাই।

শিশু সন্তানকে মানুষের মত মানুষ করিয়া গড়িতে মাতাই পারেন। আমাদের দেশের একরত্তি মেয়েদের কোলে বড় বড় সন্তান দেখিলে ঠিক সেই "১২ হাত কাঁকুড়ের ১৩ হাত বীচি" কথাটি মনে পড়ে। বালক-বালিকাকে, 'ছিঃ, এটা করিতে নাই,' 'ছিঃ, ওটা করে না' ইত্যাদি ধীর ভাবে শিক্ষা দিতে বড় একটা দেখা যায় না। ছেলে যত দূর সাধ্য অন্যায় করিয়া যাইতেছে, মাতা কিছুই বলে না, সকল রকম আবদার, অন্যায় দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেছে; হঠাৎ এক সময়ে মেজাজ খারাপ আছে—তখন শিশু ন্যায়সঙ্গত কিছু চাহিলেও প্রহার খায়। দু-চার ঘা প্রহার খাইয়া হাঁ করিয়া কাঁদিতে বসিল। অনেক পরে আবার মা আসিয়াই কোলে তুলিয়া যাহা চাহিয়া প্রহার খাইয়াছিল, তাহা দিলেন। তবে সে শিশুর ভাল মন্দ জ্ঞান হওয়া কি কঠিন নহে? সকল ঘরেই কখনও-না-কখনও এমন ঘটনা ঘটেই—ইহা কি সাধ্যমত নিবারণের চেষ্টা করিলে কতকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না? প্রথমে ছোটখাটো বিষয়ে কর্ত্তব্যের অধীন হইতে শিখিলে তবে ত বালকেরা বড় হইয়া বৃহৎ কার্য্যে কর্ত্তব্যের মর্য্যাদা বুঝিবে। যত্নে

মানুষ হইলে পরে ত সবাইকে প্রাণ ভ'রে যত্ন করিবে। পুত্রসন্তান যদি বা কিছু যত্ন পায়—হায়, কন্যাদের কি অযত্ন! এক একটি মাতার সহিত চার পাঁচটি কন্যা, একটি হয়ত পুত্র। পুত্রটি আদরের ঢেঁকি—বাহানা লইয়াই আছে। কন্যাগণ তাহার দাসী—ছেলে খাইয়া ফেলে দিলে তারা খাবে। তাহাদের ম্লান মুখে সঙ্কোচের ভাব দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। কন্যার প্রতি এত অনাদর কেন? বিবাহ-ব্যয়ভার কি ভয়ানক, সকলেই তাহা জানেন।—পুত্রকে পথে বসাইয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও পিতামাতা যে কন্যার বিবাহ দেন—সেই কন্যাকে কি যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে পারেন না? পারেন—কিন্তু "মেয়ের মুখ দেখিলেই যে বুক শুখাইয়া উঠে"—কাজেই আদর যত্ন আসে না। এই সকল অযত্ন-পালিত কন্যা কালে মাতা হইয়া কোন মতে ঘরকন্না চালাইয়া দেয়—অধিক আর কত করিবে!

আমি বলিয়াছি যে, মেয়েদের অবনতি হইয়াছে—শুনিয়া অনেকে হাড়ে জ্বলিয়া যাবেন। "এত মেয়ে বছর বছর বি. এ., এম. এ. পাস করিতেছে—আর তুমি কি না বল অবনতি!" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মেয়ে-যজ্ঞিতে একত্রে অনেককে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে সমস্ত বাঙ্গালী রমণীসমাজের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। পরিচ্ছদের কিছু উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু জাঁকজমকের দিকে যতটা দৃষ্টি, পরিচ্ছন্নতার দিকে তত দূর নহে—সুরুচিসঙ্গত বা শোভনীয় বা পরিপাটি নহে। ইহাতেও একটা ঢিলা-ঢালা ভাব সর্ব্বত্র রক্ষিত হয়—বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইলে মহিলারা আর নড়িতে চড়িতে পারেন না—ইহা পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনই আছে। ঘরে যার যত অলঙ্কার আছে, সমস্ত একত্রে পরিধান করাই নিয়ম—সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহাতে জড় ভরত ভাবটা পূর্ব্ববৎ।

আলাপ-পরিচয় যতটা হয়, তাহাও পূর্ব্ববৎ; কিন্তু আমার মনে হয় যে, পূর্ব্বে যেমন অপরিচিতাদের মধ্যেও সরলভাবে পরিচয় করিয়া লওয়া হইত, এখন তেমনও দেখা যায় না—এটা আমি অবনতি বলিয়াই মনে করি। মেলামেশার সুবিধা ত আমাদের মধ্যে তেমন নাই—তাও যদি দেখা হইলেও পরিচয় না করি ত আর কেমন করিয়া হইবে! মেয়েরা একত্র হইয়াছেন, এক দল নাচওয়ালী নাচ গান করিতেছে—এ প্রথা পূর্ব্বে

মোটে ছিল না—মধ্যে খুব প্রবল হয়—আজকাল যেন একটু কমিয়াছে। আমার মনে হয় যে, এ প্রথা যত শীঘ্র উঠিয়া যায়, তত ভাল। সে নাচ গান যে কেহ মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন বা দেখিতেছেন, তাহা ত আমি কখনই দেখি নাই—তাহাতে কেবল নিজেদের মধ্যে আলাপ-পরিচয়ের অবসরটুকুও হারাইতে হয়।

রন্ধনাদি ঘরের কাজে পূর্ব্বে যেমন মেয়েদের উৎসাহ ছিল, এখন তাহা তত দূর নাই—বিশেষতঃ কলিকাতার মেয়েরা ত শুনিয়া অবাক্ হইবেন যে, যজ্ঞিতে এখনও পল্লীগ্রামে স্ত্রীলোকেরা নিজেরাই রাঁধেন। ২০০।৫০০ জনের রান্না এক জন বা দুই জনই রাঁধেন। যাঁরা রাঁধেন, তাঁরা যত ক্ষণ রাঁধেন, তত ক্ষণ অবশ্য পরিবেশনে যোগদান করেন না—কিন্তু সে বিশাল ডেক্‌চি ও কড়া ধরিয়া যখন তাঁহারা ঝাঁকানি দেন, তখন তাঁহাদের শারীরিক বল ও কার্য্যকুশলতা দেখিয়া আনন্দিত ও বিস্মিত হইতে হয়। দশ বৎসরের বালিকা পঁচিশ ত্রিশ জনের রান্না অনায়াসে রাঁধে—কেবল হয়ত ভাতের হাঁড়িটা অন্যে নামাইয়া দেয়। কিন্তু রন্ধনাদি কার্য্যে পল্লীমহিলারাও আর সন্তুষ্ট নহেন—অসন্তোষের গুঞ্জন বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই গুন্ গুন্ করিতেছে শুনিতে পাই। এটা ত উন্নতির লক্ষণ নহে। ইহার ফল এই অল্প সময়ের মধ্যেই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের দিদিমা ও মা অনায়াসে অক্লেশে ঘরের সকল কাজ করিয়াছেন—আমার সময়ে দাস দাসীর চলন আরম্ভ হয়—তবে আমি কতক কতক কাজকর্ম্ম করিতে পারি—কিন্তু আমাদের কন্যারা সকল কার্য্যেই অপটু—তাহারা দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া মানুষ হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই দাস-দাসীর প্রচলন কমিয়া আসিয়াছে—আর সুলভে দাস-দাসী পাওয়াও যায় না, খরচেও কুলায় না। কাজের অভ্যাস-স্রোতে মাঝে একটা বাঁধ পড়িয়াছে—তাই ঘরের কাজ যে গৃহিণীদেরই একায়ত্ত, সেটা তাঁরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন না—ঘরের কাজ যেন কেবল দাস-দাসীর কাজ—দাস-দাসী রাখিতে না পারা যেন দুর্ভাগ্যের ফল, এমনই ধারণা সকলেরই হইয়াছে।

শিশু চক্ষের সম্মুখে তিল তিল করিয়া পরিবর্ত্তিত হইলে সহসা বোঝা যায় না যে, তাহার কত দূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু এক বৎসর পরে হঠাৎ দেখিলে যেমন একেবারেই বোঝা যায় যে, তাহার ঘোরতর পরিবর্ত্তন

হইয়াছে—আমি তেমনই অনেক দিন পরে মহিলা-সমাজ দেখিয়া একেবারেই বুঝিয়াছি যে, তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কিন্তু উন্নতি যে বিশেষ কিছু হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। বায়ু এলোমেলো ভাবে বহিতেছে, মধুর দক্ষিণে বাতাসও নহে, হাড়ভাঙ্গা উত্তরে শীতল বাতাসও নহে।

সকল বিষয়েই ভাল মন্দ দুই আছে। ভাল হইতে মন্দটুকু চক্ষে পড়িলেই সকলে সেটা পরিহার করিতে চেষ্টা করেন—তাই আমি আজ মেয়ে-যজ্ঞির বিশৃঙ্খলার সহিত সকলের সম্মুখে বর্ত্তমান স্ত্রীসমাজের কিছু কিছু চিত্র নিবেদন করিলাম—যদি সুশিক্ষিতা ধনী মহিলারা এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তবে তাঁহারা নিজেরাই অনেক অসুবিধা দূর করিতে পারেন—তাঁহাদের দৃষ্টান্তে যেমন ফল হইবে (ও কতক কতক হইতেছে), তেমন আর কিছুতে হইবে না। যেখানে কেবল সুশিক্ষিতা মহিলারা মিলিত হয়েন, সেখানে কোনই বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না। কিন্তু সে কয় জন? তাহাতে আমি বঙ্গরমণী-সমাজের উন্নতি হইয়াছে, এ কথা বলিতে প্রস্তুত নহি।

বারান্তরে এ বিষয় আরও বিশদরূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। ('ভারতী,' পৌষ ১৩১৬)

২

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রবন্ধ লেখা বড় দায়। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। আমার শত্রু মিত্র, আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই নানা দিক্ হ'তে নানা প্রকারে আমাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমি যে সকল পত্র পাইয়াছি, তাহার মধ্যে দু-চারখানি 'ভারতী'র পাঠক-পাঠিকার গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি।

পত্র নং ১

ভাই দিদি—আমরা গরিব ব'লে যে আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নাই, তা মনে ক'রো না। তুমি লিখেছ—"সুশিক্ষিতা-মহিলা-যজ্ঞিতে বিশৃঙ্খলা হয় না।" কিন্তু ভাই, বিবেচনা ক'রে দেখ, তাঁরা সুশিক্ষিতা ব'লেই বিশৃঙ্খলা ঘটে না অথবা ধনী ব'লে ঘটে না। তাঁদের প্রচুর দাস দাসী আছে,

আয়া আছে, গবর্ণেস আছে,—মাষ্টার পণ্ডিত আছে। তাঁরা মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্ব্বে কি পরে বিকেলের আহারাদির হুকুম দিলেন বা ভাঁড়ার দিলেন। একটু বিশ্রামের পর ইচ্ছামত নিজের গাড়ীতে নিমন্ত্রণ-স্থানে গিয়ে মিলিত হলেন। তার পর আহার,—তা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। মনে কর, সে দিন তাঁর কোলের খোকাটি অসুস্থ—দেখছেন আহারের দেরি আছে—সত্য মিথ্যা যে-কোন প্রকার একটা ওজর ক'রে তিনি চ'লে গেলেন। আমাদের ঘরে ভাই ও-রকম সুবিধা হবার আশা করতেই পার না।

জান ত আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ বুড়ো মানুষ—সংসারের কোন কিছুর মধ্যে থাকেন না। আমার ৬টি সন্তান—বড়টি এই দশ বৎসরের; একটি মাত্র ঝি অবলম্বন ক'রে ঘরকন্নার সকল কাজ চালাই। নিমন্ত্রণ যাবার দিন যদি তাদের কোন মতে ঘরে রেখে যেতেও পারি—কিন্তু খাবার কোথায় পাব ? বিকালের রান্না খাওয়ার সময়টা থেকে কোন মতে ছুটি নিয়ে তবে ত বাড়ীর বাহির হ'তে পারবো। তাদের জন্যে রেঁধে বেড়ে রেখে যেতে হ'লে আর যাওয়া হয় না। তা ভাই, লোকলৌকতা ত রক্ষা করতে হবে। ছেলেদের কষ্ট হবে ব'লে কি আত্মকুটুম্ব সব ত্যাগ করবো ? আজ তবে আসি।

তোমার ছোট বোন।

পত্র নং ২

শ্রীচরণেষু—দিদিমা, তুমি যে দেখছি "সমাজ-সংস্কারক" হয়ে উঠলে। আর যা কর না-কর, মেয়ে-যজ্ঞির সময়টা নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিও না। ভেবে দেখ, তোমার এ সেবক যে কাজকর্ম্ম উপলক্ষ্যে তোমাদের শ্রীচরণ দর্শন পায়, তার কত না অন্তরায় ঘটবে। আমার ত এই কুঁড়ে ঘর—দিদিমার দল কি পরিমাণ জানই ত। মনে পড়ে কি, ঠাকুরমা বলেছিলেন—"বাপ রে, যে দিকে চেয়ে দেখি, দেখি—বড় বৌয়ের বাপের বাড়ীর কুটুম !" তা তোমাদের ত কোন কাজকর্ম্মে বাদ দিতে পারি না—না ডাকলেও ত তোমরা ছাড় না। তার পর এ দাসের বিবাহ দিয়াছ; তা গৃহিণীর পিত্রালয়টি কিছু বাদ দেওয়া চলে না। বাকি রইলেন খুড়ী জেঠাই মাসি পিসি ভগিনী পাড়াপ্রতিবাসী প্রভৃতি। এঁদেরও অনেককে না

ডাকলে হয় না। এঁরা না হ'লে কাজকর্ম্ম করেই বা কে? তা আমার নিবেদনটা এই যে, অনির্দ্দিষ্ট সময়েরও একটা সুবিধে আছে। কতক আসছেন, খাওয়া-দাওয়া সেরে যাচ্ছেন—আবার কতক আসছেন,—এমনি ক'রে মধ্যাহ্নভোজন থেকে আরম্ভ ক'রে সায়াহ্নভোজন পর্য্যন্ত খাওয়া-দাওয়া চলতে থাকে। তাই বলছি, আর যা কর, সময়টা নির্দ্দিষ্ট ক'রে কাজ নেই। আমার মত কুঁড়ে ঘরে অনেকেরই বাস। শুধু একেলা কি আমি?

ইতি সেবক রাজু

পত্র নং ৩

শ্রীচরণকমলেষু—মাসিমা, আমার প্রণাম জানিবেন। 'ভারতী'তে আপনার যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহা আমরা পড়িয়াছি।

এ কি মাসিমা, আমাদের উপর আবার আক্রমণ কেন? আপনার মা, মাসিমারা আমাদের যেমন শিখাইয়াছেন, তেমনি শিখিয়াছি।

আপনাদের এমনি শিক্ষা দেবার ঝোঁক যে, কবে যে আমাদের অক্ষরপরিচয় হয়েছিল, তা ত মনেই পড়ে না। পাঁচ বছর বয়সে যখন আমরা ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হলুম, তখন বাড়ীতে মাষ্টার মশায় রাজর্ষি আর সেকেণ্ড বুক পড়াতেন। এ ত গল্পকথা নয় মাসিমা, এ সত্যিকার ঘরের কথা। ভোরে সেই বিছানা থেকে উঠেই স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'ত। ঘড়ির কাঁটায় ৮৷৷৹টা বাজলে আমরা গাড়ীতে উঠে স্কুলে চ'লে যেতুম—আর সেই সন্ধ্যা ৫।৫৷৷৹টায় বাড়ীতে ফিরে আসতুম। রান্নাবান্না ঘরের কাজ শেখবার অবসর পাওয়া দূরে থাক্, খেলা করতে অবসর পেতাম না। আবার সন্ধ্যা জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই মাষ্টার মশায় এসে হাজির হতেন। এমনি ক'রে খেলার সুখের মুহূর্ত্তটুকুও আমরা ভোগ করতে পাই নাই বললে হয়।

যা হোক, তার পর বিবাহ। বিবাহের পর পরের ঘরে পরের হাতে পড়েছি। তাঁরা যেমন, তেমনি হ'তে হয়েছে। রান্নাবান্নার কাজ ঘাড়ে পড়ে নাই—কাজেই তেমন পটু নহি যে, তা স্বীকার করিতেছি।

আগুন-তাতে গেলেই মাথা ধরে, তা ত সত্য। রান্নার কাজ তেমন অনায়াসে করতে পারি না বটে, কিন্তু তা ছাড়া যে সব কাজ

আমাদের করতে হয়, তার পক্ষে কি রান্নার কাজ করাটা এমনই শক্ত? অনভ্যাসবশতঃ শারীরিক ক্লেশ হয়, কিন্তু কাজটা কঠিন নয়। তার চেয়ে সংসারের সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য প্রতি খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি রাখা সুকঠিন নয় কি? সন্তানদের দেখা শোনা, দাস দাসীদের পরিচালনা করা, ঘর দ্বার পরিষ্কার রাখা, আর যাঁহার হাতে আমাকে সমর্পণ করেছেন, তাঁর সর্ব্বকার্য্যে সহায়তা করা ও তাঁর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সর্ব্বপ্রকারে দৃষ্টি রাখতে আমাদের যত হয়, এমনটি পল্লী-মহিলাদের কিন্তু হয় না। আমি অনেক পল্লীগ্রামে গিয়েছি, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তাতে এইটুকু বুঝেছি যে, আমাদের ঘরকন্নার দায়িত্ব তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে পড়েছে। আজ তবে আসি।

আপনার স্নেহের রেণু

পত্র নং ৪

ভাই ঠাকুরঝি—আর ব'লো না, জ্ব'লে মলুম। পুরুষদের চক্ষু যে ভগবান্ কেন দিয়েছেন, বলতে পারি না। একটু কি পছন্দ নেই। মেজ বৌমাকে চড়কের তত্ব করবো ব'লে তুটো জ্যাকেট কিনে আনতে বলেছিলুম। বলবো কি ভাই, তোমার দাদা মোটা মোটা তুটো সাটিনের জামা এনে হাজির! তাতে বিশ্বের জরি ফিতে লেস দেওয়া আছে। সে তুটো জ্যাকেট কি বালিশের খোল, তার ঠিক নেই! দেখে ত অবাক্। তোমাদের শিল্পবিদ্যালয় কেমন চলছে? রথের তত্বের জন্য কয়েকটি জ্যাকেট আমাকে তৈরি করাইয়া দিতে পার কি? দেখো যেন ভাল রকম হয়। ছিঃ ছিঃ, পুরুষ মানুষের কি কিছু পছন্দ নাই। এদিকে ত ভাল কাপড়খানি পরলে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকেন।

তোমার বৌদিদি

পত্র নং ৫

প্রিয় ভগিনি—'ভারতী'তে আপনার মেয়ে-যজ্ঞির বিশৃঙ্খলা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। মহিলাবর্গের দোষ গুণ, অভাব অভিযোগ মহিলাদেরই করা উচিত। আপনি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া ভাল করিয়াছেন। এক্ষণে মহিলাগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে,

তাঁহারা যেন প্রত্যেকে গৃহস্থালী বিদ্যা শিক্ষা, শিশুপালন প্রভৃতির উন্নতি ও সুশৃঙ্খলা সম্বন্ধে চিন্তা করেন এবং এই সকল বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পত্রিকা প্রভৃতিতে আন্দোলন করেন। কেহ কোন বিষয়ের ত্রুটি দেখাইলে ক্ষুণ্ণ না হইয়া যেন ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেন। নমস্কার।

আপনার শ্রীমতী দয়াবতী দেবী

এক্ষণে 'ভারতী'র পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, মেয়ে-যজ্ঞির বিশৃঙ্খলা নিবারণের উপায় যাঁহার যাহা মনে হয়, যেন 'ভারতী'তে প্রকাশ করিয়া আমাকে রক্ষা করেন। ('ভারতী,' অগ্রহায়ণ ১৩১৭)

স্বর্গীয় ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য

মহারাজ আমাদের কেবল মাত্র প্রভু ছিলেন না—পিতৃস্বরূপ ছিলেন। এই দুর্ঘটনা বজ্রাঘাতের মত আমাদের আহত করিয়াছে।

১৫ই ফাল্গুন অশুভ ক্ষণে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করেন। সোমবার প্রাতে কলিকাতা পৌঁছিয়া মঙ্গলবার রাত্রে কাশী যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় অনেক করণীয় কার্য্য ছিল, ফিরিয়া আসিয়া সম্পূর্ণ করিবেন —আর ফিরিতে হইল না।

পূর্ণ বারো বৎসর কাল মহারাজ রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন—মহারাজের বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ, হৃদয় তেমনই উদার ছিল। রাজ্যের উন্নতি করিবার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা বিঘ্ন-বিপত্তির জন্য মহারাজের অনেক সাধ পূর্ণ হয় নাই। মহারাজের রাজত্বকালে আগরতলায় একটি সুন্দর প্রাসাদ, হাসপাতাল, স্কুল, রাজকুমার-বোর্ডিং, আপিস প্রভৃতির জন্য পাকা বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। নূতন রাস্তা, দীঘি, সুন্দর সুন্দর বাংলা ও কর্ম্মচারীদের আলয় প্রভৃতিতে রাজধানীর সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

মহারাজের হৃদয় করুণার আধার, দীন দুঃখীর প্রতি তাঁহার অসীম দয়া ছিল। বিকালে মহারাজ প্রতি দিন বায়ু সেবনে বাহির হইতেন —একদিন দেখিলেন, একটি রোগকাতরা ভিখারিণী পথের ধারে পড়িয়া রহিয়াছে।—মহারাজ তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া রোষকষায়িত লোচনে ডাক্তারের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ইহাকে দেখিতেছ, এ কেন এমন করিয়া পড়িয়া আছে—তোমরা আছ কি করিতে?" ডাক্তারের আর সে দিন মহারাজের সহিত বায়ু সেবনে যাওয়া হইল না। অনেক বলা কহায় মহারাজ চলিয়া গেলেন, ডাক্তার উপস্থিত থাকিয়া রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া, তাহার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া, মহারাজকে জানাইয়া তবে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

মহারাজ অতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন। কাহাকেও সহজে কঠিন কথা বলিতেন না; নিতান্ত বিরক্ত হইলে কেবল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। কর্ম্মচারীদের আদেশ করিতে হইলে বিনীত

ভাবে আদেশ করিতেন। বিশেষ দরকারে একজন কর্ম্মচারীকে লিখিতেছেন—"তুইটি কথা শুনিয়া যেও, আমি অপেক্ষা করিয়া আছি। —কলিকাতা হইতে আসিয়া অবধি তোমায় দেখি না কেন?" তাঁহার খাসের কর্ম্মচারীদের তিনি কিরূপ জ্ঞান করিতেন, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত পত্রে জানিতে পারিবেন। "তুমি ত জানই, যিনি বাড়ীর কর্ত্তা, পূজার সময় স্বজন পরিজনদিগকে এইরূপ কাপড় বা অন্য কোন বস্তু দিয়া থাকেন। শ্রীমান্ শ্রীমতী সহ এইগুলি আমার আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিও।"

মহারাজার মৃত্যুর তিন চারি দিবস পূর্ব্বে তাঁহার একজন কর্ম্মচারীর কলিকাতায় বসন্ত রোগে মৃত্যু হয়—রোগসংবাদ শুনিয়াই কাশী হইতে মহারাজ টেলিগ্রাফিক মণিঅর্ডার যোগে ২০০৲ পাঠাইয়া দেন। মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া বলেন,—"সে গেল—তাহার জন্য বড় বেদনা পাইলাম। সে আমাকে ত প্রভু মনে করিত না, পিতৃস্বরূপ জ্ঞান করিত—তাহার পরিবারের ভরণপোষণের ভার, তাহার সন্তানদের শিক্ষার ভার, সকলই আমার। শ্রাদ্ধের সময় স্মরণ করাইয়া দিও, খরচ দিতে হইবে।"

মহারাজ ফুল অত্যন্ত ভালবাসিতেন। লিখিতেছেন,—"ফুল পাইয়াছি। আমি ফুলের অতিশয় পক্ষপাতী। আমার বিশ্বাস, ভগবানের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুলেরই সার্থকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমি অষ্ট প্রহর আমার চতুষ্পার্শ্বে ফুল ছড়াইয়া রাখিতে ভালবাসি!" সামান্য উপহার পাইলে আহ্লাদে আটখানা হইতেন; লিখিতেছেন, "তোমার প্রেরিত ফুল ও মিষ্টান্ন উপহার পাইয়া অতিশয় আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করিলাম।"

অনেক ভাল ডাক্তারের অপেক্ষা মহারাজ চিকিৎসা-বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। ডাক্তারি, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথি, টোটকা প্রভৃতি নানাপ্রকার ঔষধ সর্ব্বদা যত্নে মহারাজ রক্ষা ও ব্যবহার করিতেন। কর্ম্মচারীদের কাহারও অসুখ হইলে ডাক্তারের উপর ডাক্তার পাঠাইয়া ঔষধ পথ্য দিয়া অনুসন্ধান লইতেন। ইদানীং মহারাজের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। লিখিতেছেন,—"বাস্তবিক আমার ধাত রোগপ্রবণ হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবার শীতারম্ভে দূর স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া কিছু কাল বাস করিয়া দেখিব, এরূপ মনে করিয়া আছি।" বিদ্যার

প্রতি মহারাজের অতিশয় অনুরাগ ছিল। গ্রন্থকারগণ নূতন পুস্তকাদি পাঠাইলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাদের সসম্মানে পুরস্কৃত করিতেন।

সাধারণ সভা সমিতিতেও মহারাজ কখনও দানে বিমুখ ছিলেন না। কেহ কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিলে মহারাজ কখনও "না" বলিতে জানিতেন না। খেয়াল খাতায় মহারাজকে একবার লিখিতে অনুরোধ করায় মহারাজ লেখেন,—"ছাত্রজীবনে কবিতা-টবিতা লিখিতাম। এখন মন কঠিন হইয়া গিয়াছে, তোমাদের অনুরোধে দুই ছত্র লিখিয়া দিলাম—

সুখের নিলয় প্রেম সুমধুর
কোন অবাধ্যতা তাহাতে নাই ;
আত্ম ভোগ সুখ স্বার্থ অভিমান
প্রেমিক হৃদয়ে না পায় ঠাঁই।

মহারাজ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এবার কাশী যাইয়া তিনি সধবা কুমারীপূজাদি করিতে ত্রুটি করেন নাই এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অধ্যাপকদের সসম্মানে বিদায় দান করিয়াছিলেন। অধ্যাপকেরা প্রীত হইয়া মহারাজকে ধর্ম্মার্ণব উপাধি দিয়াছিলেন।

স্বস্তি বিবিধবিরুদাবলীবিরাজমানমানোন্নতমহারাজাধিরাজক্ষত্রিয়কুলতিলকচন্দ্রবংশাবতংশ-ত্রিপুরাধিপতিবিষমসমরবিজয়ি শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীযুতরাধাকিশোরমাণিক্যদেববর্ম্মবাহাদুরমহোদয়শ্রীশ্যামসুন্দরচরণারবিন্দমকরন্দমধুকরেষু।

বারাণসেব্বিবুধবৃন্দানাং শুভাশীরাশয়ঃ সমুল্লসন্ততরাম্।

মহারাজ, কালবশাদিদানীং ক্ষীণপ্রায়েষু বর্ণাশ্রমধর্ম্মেষু নষ্টপ্রায়েষু চ দ্বিজকুলপালনৈকব্রতেষু রাজন্যবর্গেষু ভবানেবৈকঃ ক্ষত্রিয়কুলসুধাসলিলনিধেঃ শীতরশ্মির্বর্ণাশ্রমধর্ম্মসংরক্ষণপরায়ণঃ পরিদৃশ্যতে। অতঃ স্মরহরনগরীনিবাসিনো বয়ং ভবতঃ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রচরণাম্বুজলোলুপতাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মসংরক্ষণতৎপরতাং চ দৃষ্ট্বা সন্তুষ্টহৃদয়াঃ সন্তো বিবিধগুণগণাভিরামং ভবন্তং "ধর্ম্মার্ণব" ইত্যুপাধিনা ভূষয়ামঃ।

আশাস্মহে চ সপরিজনস্য শ্রীমতো মহারাজস্য সকুশলং দীর্ঘমায়ুরিতি শম্। সম্বৎ ১৩১৫ চৈত্রকৃষ্ণদ্বিতীয়ায়াম্।

যে কর্ম্মচারীর যত্নে এই সকল ধর্ম্মকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল, তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ তাঁহাকে কলিকাতায় আসিয়া বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিবেন বলিয়া আশ্বাসিত করিয়াছিলেন।

মহারাজের হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ ছিল, বুঝি তাই জন্য মহারাজ এই শোচনীয়রূপে অকস্মাৎ প্রাণ দান করিয়া আত্মীয়, বন্ধু, কর্ম্মচারী, ভৃত্যবর্গের অন্তরে অন্তরে করুণা ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন।

দুর্ঘটনার দুই দিন পূর্ব্ব হইতেই মহারাজ কাশী ত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। রিজার্ভ গাড়ীর অভাবে বিলম্ব হইয়াছিল। শোচনীয় ঘটনার দিন ষ্টেশনে গাড়ী প্রস্তুত, রাত ১০টায় মহারাজ ট্রেনে উঠিবেন, সন্ধ্যা ৬টায় এই বিপত্তি—৮টায় সব শেষ।

কাশীতে কর্ম্মচারী ও ভৃত্যবর্গ ব্যতীত মহারাজের পুত্র বা আত্মীয় কেহ সঙ্গে ছিলেন না—রাজ্যেশ্বর রাজ্য ছাড়িয়া কোন্ বিদেশে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। রাজাকে বিসর্জ্জন দিয়া ভগ্নহৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে সকলে আগরতলা ফিরিয়া গিয়াছেন।

অনেক দিন হইল, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে স্মরণ করিয়া যে গানটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এইখানে তুলিয়া দিলাম।

"রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা,
ত্রিপুরপুরলক্ষ্মী বহে তব বরণডালা।
দীনজনদুঃখহরণ অভয় তব বাণী,
ক্ষীণজনভয়তারণ নিপুণ তব পাণি,
তরুণ তব মুখচন্দ্র করুণরস ঢালা।
গুণিরসিকসেবিত উদার তব দ্বারে—
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে—
গুণ-অরুণকিরণে তব সব ভুবন আলা।"

গানটি লিখিতে লিখিতে যেন মহারাজকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি—আর অধিক কি লিখিব। ('ভারতী,' বৈশাখ ১৩১৬)

ত্রিপুরার গল্প

পার্ব্বত্য ত্রিপুরার পর্ব্বতে পর্ব্বতে অনেকগুলি কুকি রাজা আছে। তাহারা সকলেই ত্রিপুরার রাজার অধীন। পূর্ব্বকালে মধ্যে মধ্যে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া মহারাজের সীমার মধ্যে আসিয়া লুঠপাট করিয়া পুরবাসীদের উত্যক্ত করিয়া যাইত। তখন ত্রিপুরা-রাজকে বিদ্রোহ দমনের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিতে হইত।

একবার একজন রাজা কুকিদিগের এক সহস্র প্রধান ব্যক্তিকে বিদ্রোহ অপরাধে বন্দী করিয়া আনেন। "পরদিন প্রাতে বন্দিগণের প্রাণদণ্ড হইবে"—এই সংবাদ রাজঅন্তঃপুর পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছিল।

মহারাণী অত্যন্ত করুণাময়ী ছিলেন—এক সহস্র ব্যক্তি এককালে পরদিন প্রাতে প্রাণ হারাইবে শুনিয়া তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

যথাসময়ে রাজা অন্তঃপুরে আহার করিতে আসিলে, রাণী রাজার দুই চরণ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "রক্ষা কর মহারাজ, রক্ষা কর।" রাজা বিস্মিত হইয়া "কি মহারাণি, কি হইয়াছে" বলিয়া রাণীর হাত ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া শান্ত করিলেন।

রাণী। মহারাজ, কাল প্রাতে না কি সহস্র মানুষের জীবন বধ করিবে?

রাজা। বিচারে বিদ্রোহীদের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছি।

রাণী। দয়া কর মহারাজ, তাহাদের ক্ষমা কর। তাহারা আমার সন্তান।

রাজা। মহারাণি, তাহারা বিদ্রোহী, তাহারা রাজ্যের ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছে।

রাণী। তাহারা আমার প্রজা, তাহারা আমার সন্তান। আমি জামিন রহিলাম, আর তাহারা তোমার রাজ্যে কোন প্রকার উৎপাত উপদ্রব করিবে না। 'রণে বনে' তাহারা তোমার সহায় হইবে—ক্ষমা কর।

রাজা। ক্ষমা করিলাম। কিন্তু আজ হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের শুভাশুভের দায়ী মহারাণী স্বয়ং।

রাণী সহর্ষে কহিলেন, "তোমার জয় হউক মহারাজ! একটি ভিক্ষা,—রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে এক সহস্র সোনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্র আমাকে প্রস্তুত করিয়া দিতে আজ্ঞা হোক।"

রাজা সাদরে কহিলেন—"তাহাও পাইবে। তোমাকে আমার অদেয় কি আছে মহারাণি!"

দ্বিপ্রহর রাত্রি—চারি দিক্ নিস্তব্ধ; রাজমহিষী দুইটি মাত্র দাসীর সহিত রাজপুরী হইতে বাহির হইলেন। একজন দাসীর হাতে একটি ডালায় সহস্র স্বুবর্ণপাত্র, আর একজনের হাতে প্রজ্বলিত মশাল।

মহারাণী ধীরে ধীরে যাইয়া বন্দিশালার দ্বার মুক্ত করিলেন, প্রহরীরা বিস্মিত হইয়া সসঙ্কোচে দ্বারের পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

রাণী কারাগারে প্রবেশ করিলে বন্দিগণ সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল—তাহাদের শৃঙ্খল ঝন্‌ঝন্ শব্দে রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল।

মহিষী নিজ হস্তে এক এক জনের শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিয়া বলিলেন, "বাছারা, আমি তোদের মা—এই নে আমার স্তন্য, তোরা পান কর্।" বলিয়া প্রত্যেক স্বুবর্ণপাত্রে দুই চারি বিন্দু স্তনদুগ্ধ দিয়া এক একটি পাত্র এক এক জন বন্দীর হাতে দিতে লাগিলেন।

দ্বার মুক্ত পাইয়াও তাহারা পলায়ন করিল না—বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া একে একে সকলে মহারাণীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে লাগিল; পরে সহস্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মহারাণী মায়ের জয়-জয়কার হোক।"

শুনা যায়, এখনও রাজমহিষী-প্রদত্ত স্বুবর্ণপাত্র সেই বিদ্রোহী কুকিদের বংশধরদিগের গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা সেই পাত্রকে গৃহপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের ন্যায় এখনও পূজা করে এবং বিদ্রোহী বন্দীরা বা তাহাদের বংশধরেরা কোন প্রকার উৎপাত করিয়া ত্রিপুরার কোন রাজাকে বিরক্ত করে নাই। তাহারাই ত্রিপুরা-রাজের বিশ্বস্ত অধীন; "রণে বনে" তাহারাই তাঁহাদের প্রধান সহায়। ('ভারতী,' ভাদ্র ১৩১৬)

দিদিমা

নামাবলীখানি গায়ে দিয়া আমার দিদিশাশুড়ী যখন গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেন, তখন বেলা ৮টা। আমি পানের বাক্স লইয়া পান সাজিতাম। তিনি গঙ্গাজলের ঘটিটি ও নামাবলীখানি যথাস্থানে রাখিয়া একটা বড় পিতলের ঢাকা খুলিয়া আমাদের খাবার দিতেন। তাঁহার আদেশে পান-সাজা রাখিয়া আমাকেও জলযোগ করিতে হইত। "আহা, তাড়াতাড়ি ক'রে আসছি, আহা, তোদের কত ক্ষিদে পেয়েছে।" খাবার দিয়া তসর কাপড় ছাড়িয়া তিনি বাজারের হিসাবপত্র লইতেন ও তাড়াতাড়ি "ঝোলের আনাজ" লইয়া রান্নাঘরের উঠানে যেখানে ঝি মাছ কুটিতেছে, সেখানে গিয়া, "ও ঝি, ঝোলের মাছটি আগে ধুয়ে দাও ত মা" বলিয়া ঝিকে তাড়া দিতেন।

গয়লা-বৌয়ের কাছে দুধ মাপিয়া লইয়া তাহার ঘরের কুশল সংবাদ লওয়া হইলে বলিতেন, "বাচ্ছা-কাচ্ছার দুধটুকু ভাল দিস মা—একটু সকাল ক'রে আসিস্ গো।" দুধের কড়া চড়াইয়া দিয়া "মাছের ঝোল নামলো গা?" বলিতে-না-বলিতে স্কুল আপিসের যাত্রীরা "দিদিমা, মা, ভাত," বলিয়া কেহ গামছা লইয়া চৌবাচ্ছায় ঝাঁপাইয়া পড়িতেন, কেহ বা পিঁড়িতে বসিয়া দিদিমার কাছে তেল চাহিয়া লইয়া তেল মাখিতেন ও গল্প করিতেন। দিদিমা "এই যে ভাত হয়েছে," "বামন-মেয়ে, ভাত বাড় মা"—"এই নাও দাদা তেল"—বলিয়া তেলের বাটি দিতেন, পরে খোরায় খোরায় দুধ জুড়াইয়া আহারের স্থলে লইয়া রাখিতেন। বড় বড় পিঁড়ি পাতিয়া একতলার দালানে আহারের ঠাঁই হইয়াছে—একে একে সকলে আহার করিতে আসিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ গঙ্গার ঘাটে কার কার সঙ্গে দেখা হ'ল"—কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজকের খবর কি দিদিমা?" কেহ বা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাঁড়ারের কিছু আনাতে হবে কি?" দিদিমা হাসিমাখা মুখে সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। এমনই করিয়া স্কুল আপিসের তাড়নার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশান্তভাবে হাসি গল্পের সহিত "বাবুদের" স্নানাহার সমাধা হইলে দিদিমা সকলের হাতে হাতে পান দিলে সকলে বাহির-বাড়ী চলিয়া গেলেন। তখন একটু

নিশ্চিন্ত হইয়া দিদিমা অবশিষ্ট দুধ জ্বাল দিতে লাগিলেন। কাহারও ঘন, কাহারও বল্কা বাটি বাটি রাখা হইল। দুধ জ্বাল দেওয়া শেষ হইলে নিরামিষ রান্নার বোক্‌নোটি চড়াইয়া তরকারি কুটিয়া চাল ধুইয়া নিরামিষের সমস্ত জোগাড় করিতে ব্যস্ত হইলেন। এক এক দিন আমি 'তরকারি কুটিব' বলিয়া ধরিয়া বসিলে 'আচ্ছা, তুমি এই আলু পটোলগুলি ছাড়াও' বলিয়া বঁটি ছাড়িয়া দিতেন। ইতিমধ্যে বাহির-বাড়ী হইতে ভৃত্যেরা বারম্বার আসিতেছে ও "বড়বাবুর জামাটা ছেঁড়া, আর একটা দিন,—মেজবাবু ও-কাপড় পরবেন না—ধোয়া বার ক'রে দিন,—ছোটবাবুর এ চাপকানের বোতাম নেই, সেরে দিতে হবে,—পান কই,—জল দিয়ে যান"; এই প্রকার কত কি বাহানা লইয়া দিদিমাকে ব্যস্ত করিতেছে। দিদিমার বিরক্তি নাই, ধীরভাবে সকল ফরমাশ সম্পন্ন করিতেছেন। তখন তিনি রন্ধনে নিযুক্ত; এ জন্য বাক্স, পেঁড়া, ধোয়া কাপড়-চোপড় কিছুই স্পর্শ করিবেন না, চাবি দিয়া আমাদের বাহির করিয়া দিতে আদেশ দিতেন। আমরা তাঁহার উপদেশ-মত কাপড়-চোপড় বাহির করিয়া দিতাম। ভৃত্যদের সমুখে আমরা বাহির হইতাম না, ভৃত্যেরা বাড়ীর ভিতর প্রায় আসিত না; যখন আসিত, সাড়া পাইলেই ঘরে লুকাইতাম। ঘোমটা দিয়া শ্বশুর-ভাশুরের সমুখে কখনও কখনও যাইয়া জল, কি পান দিয়া আসিতে হইত; কিন্তু ভৃত্যদের কিছু দিতে হইলে দাসী দ্বারা বা ছোট মেয়ের দ্বারা পাঠাইতাম। ভৃত্যেরা একতলার ভিতর-বাড়ীতে আনাগোনা করিত, দোতলায় কদাচিৎ যাইত। আমরা সকালে আসিয়া একতলার ভাঁড়ারে ঢুকিতাম—রান্না ও ভাঁড়ার-ঘর পাশাপাশি, সুতরাং আমাদের গণ্ডি রান্না ও ভাঁড়ার-ঘরের মধ্যে। তার বাহিরে যাইতে হইলে দাসী হাঁকিত, 'স'রে যাও, বৌঠাকরুণ যাচ্ছেন।' সময়ের কি বিচিত্র গতি! আজ আমাদেরই বাড়ী একটিও দাসী নাই, ভৃত্যেরাই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করে। যা হোক, বাবুরা স্কুল আপিস চলিয়া গেলে আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতাম।

বাহির-বাড়ীতে ভৃত্যেরা "রামরাজত্ব" করিত। দাসীরা কাজ সারিয়া তেল মাখিতে বসিত। যেমন যেমন আহার হইয়া যাইত—অমনই বাসন ধুইয়া ফেলিতে হইত। "এঁটো চণ্ডী" দেবতাটি বড়ই "বিঘ্নকারিণী।" বাড়ীতে যে বেলা ২টা পর্য্যন্ত "সকড়ি" পড়িয়া থাকিবে, তার জো নাই—

তা হ'লে "এঁটোদেবী" ত্বরিত গতিতে গিয়া স্কুল-আপিসের যাত্রীদের কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইবে—সুতরাং বাসন-কোসন পরিষ্কার না করিলে দাস দাসী কেহই অবসর পাইত না। বাড়ীর মধ্যে প্রচুর স্থান থাকা সত্ত্বেও দাসীরা বাসন মাজিতে ও স্নান করিতে বাহির-বাটীতে যাইত। সে সময়টা তাহারা নানা হাস্যালাপে বাড়ীটা মুখরিত করিয়া তুলিত।

ওদিকে যেমন ভৃত্যদের সমুখে আমাদের বাহির হইবার নিয়ম ছিল না, দাসীরাও তেমনই বাবুদের সহিত কথাটি পর্য্যন্ত কহিত না; এক হাত ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া কাজ করিত। বাবুদের সন্নিকটে জল, কি পানটি পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়ার তাহাদের অধিকার ছিল না, তাই দিদিমার অনুপস্থিতিতে আমরা বৌয়েরা বাবুদের সম্মুখে যাইতাম। সেখানে কোন ভৃত্য উপস্থিত থাকিলে সে অমনই সরিয়া যাইত। ভৃত্যের সমুখে আবশ্যক হইলেও কোন বৌ ঘোমটা দিয়াও স্বামীকে জল বা পান কিছুই দিত না। তিনি যে-কোন প্রকারে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতেন।

তখন আমাদের বাড়ীর অবিবাহিত মেয়েরা সবে মাত্র বেথুন স্কুলে পড়িতে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ৮টার সময়—হয়ত দিদিমা গঙ্গাস্নান করিয়া আসার পূর্ব্বেই ডাল, আলুভাতে, ডিমসিদ্ধ, মাছভাজা, মাখন, কাঁচা দুধ ও মিষ্টি দিয়া আহার সমাধা করিয়া কাপড়-চোপড় পরিয়া সদর-দরজায় গাড়ীর অপেক্ষায় বই স্লেট হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা ঘরের কোন কাজ করিতে অবসর পায় না।

দশটা সাড়ে দশটা বাজিলেই দিদিমা রান্নাঘরে আমাদের ভাত দেওয়াইতেন। রান্নাঘরটা খুব বড় ছিল; এক দিকে আমিষ রান্না ও আর এক দিকে নিরামিষ রান্না হইত। এ সকল হইয়াও যথেষ্ট স্থান ছিল, আমরা সেইখানেই প্রায় আহার করিতাম। "আঁশ হেঁসেলে" প্রায় এইরূপ রান্না হইত। মুগ, খাঁড়ী মসুর—হয় পেঁয়াজ দিয়া, না-হয় টক দিয়া ও কখনও মাষকলাইয়ের ডাল: ইহা ছাড়া মাছের ঝোল, হাঁসের ডিম সিদ্ধ বা ভাজা বা ডালনা, লাউ-কাঁকড়া বা লাউ-চিংড়ী, আলু-পটোল ভাজা, মাছভাজা, মাছের অম্বল, কখনও কখনও চিংড়ী মাছ দিয়া পুঁইশাক-চচ্চড়ি, কুমড়ো চিংড়ী, এই সব অদলবদল করিয়া হইত। অড়হর, ছোলা, মটর প্রভৃতি ডাল দিদিমা রাঁধিয়া খানিকটা 'ও-বেলার জন্য' রাখিতেন; বাবুদের গরম করিয়া দেওয়া হইত।

দিদিমার রান্না খাবার জন্য বাড়ীর সকলে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাই প্রত্যহই দিদিমা কিছু কিছু ব্যঞ্জন স্বতন্ত্র পাথরের পাত্রে ঢালিয়া রাখিতেন। দিদিমাকে অনেক রাঁধিতে হইত—বাড়ীতে বিধবা তিন চার জন ছিলেন—দিদিমাই সকলের রাঁধিতেন—তাঁহারা জোগাড় দিতেও বড়-একটা অবসর পাইতেন না। তাঁহাদের আহ্নিক পূজা সারিতে ১১।১২টা বাজিত। তাঁহারা নিজেদের ঘরের কাজকর্ম্ম, পুত্র-পৌত্রাদির পরিচর্য্যা করিয়া স্নান আহ্নিক করিতে যাইতেন।

আর সকল সময় তাঁহারা সবাই কলিকাতার 'বাসায়' থাকিতেনও না। দু-জন বা দু-মাস আছেন—আবার দেশে গেলেন—সেখানে বা দু-মাস রহিলেন, অন্যেরা আসিলেন, এইরূপ চলিত। বধূরা কখনও কখনও দেশে বা পিত্রালয়ে যাইত—কেবল "বাবুরা" পূজার সময় বা স্ত্রী দেশে থাকিলে কোন এক শনিবারে দেশে যাইতেন। বাবুদের মা ছয় মাস দেশে থাকিলেও কেহ দেশে যাইতেন না—কিন্তু স্ত্রীটি ছয় দিনের জন্য গেলেও বাবুর অমনই মাছ ধরা বা আম খাওয়ার সখ পড়িয়া যাইত। শুনিয়া দিদিমা মুচকি মুচকি হাসিতেন—পাছে কেহ লজ্জা বোধ করেন, তাই নিজে উপযাচক হইয়া বাড়ীর ছেলেদের দেশে পাঠাইতেন। অনেক সময় বধূরা পিত্রালয়ে থাকিলেও যদি শ্বশুর শাশুড়ী জামাতাকে লইতে লোক না পাঠাইতেন—তবে দিদিমা গঙ্গাস্নানের ফেরত হয়ত কুটুমবাড়ী গিয়া ইঙ্গিতে জামাই লইয়া যাইতে উপদেশ দিয়া আসিতেন। বলিতেন, "আহা, এই ওদের আমোদ-প্রমোদের সময়—এর পর যখন সংসার ঘাড়ে পড়বে, তখন কি আর ধুলোখেলার অবসর পাবে।" কিন্তু শ্বশুরবাড়ী শনিবার গিয়া সোমবার ভোরেই ফিরিতে হইত—অথবা কখনও কখনও রবিবার সকালেই আসিবার আদেশ দেওয়া হইত—বিশেষ আগ্রহ না দেখাইলে রবিবার থাকিতে দেওয়া হইত না। ছেলেদের পরীক্ষার সময় এ বিষয়ে কর্ত্তা বড় অধিক কড়াক্কড় করিতেন, কিন্তু দিদিমা অত ভালবাসিতেন না। তিনি বলিতেন, "আহা, বৌয়ের মুখখানি মধ্যে মধ্যে না দেখলে ওদের পড়াশুনায় উৎসাহ হবে কেন!" দিদিমা যে ব্যবস্থা করিতেন, তাহাতে কেহ দ্বিরুক্তি করিতেন না, সকল কার্য্য তাঁহার অনুমতি ও উপদেশ লইয়াই নিষ্পন্ন হইত। এমন কি, প্রত্যেকে প্রত্যহ আপিস স্কুল যাত্রার সময় "দিদিমা আসি—পিসিমা আসি, জেঠাই-মা আসি," ইত্যাদি বলিয়া তবে

যাইতেন। দিদিমা হাতের কাজ রাখিয়া প্রত্যেকের সমুখে আসিয়া 'এস দাদা, এস বাবা' বলিয়া শুভ কামনা করিতেন।

দিদিমা রাঁধিতেন—আমরা ভাত খাইতাম। বাড়ীর অনেক বধূ তাহার শাশুড়ীর সহিত কথা কহিত না, কিন্তু দিদিমার সহিত কথা কহিত। দিদিমা বলিতেন, আমার সহিত কথা কহিতে আছে। যদি কোন বধূর কাজে বা কথায় কোন ত্রুটি হইত, দিদিমা একটু অল্প হাসিয়া বলিতেন, "ছিঃ, ও-কথা বলতে নাই—অথবা এমন কাজ আর ক'রো না।" দিদিমার এইটুকু কথায় আমরা যেরূপ শাসিত হইতাম—অন্য গৃহিণীদের সারা দিন বকুনির ঝড় বহিলেও সেরূপ হইত না—বরং বকুনির চোটে কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির করিয়া তুলিতাম। বেচারা দিদিমা এমন অবস্থায় বড় বিপদে পড়িতেন। গৃহিণীকে বলিতেন, "আহা, ছেলেমানুষ বুঝতে পারে নি, আহা, আর করবে না।" বধূকে বলিতেন, "কাঁদতে নেই—আমরা না শেখালে তোমরা শিখবে কেন দিদি!" আমরা বলিতাম, "আপনি বারণ করলেই ত আমরা শুনি—তবে উনি অত বকছেন কেন!" দিদিমা বুঝাতেন, "আহা, ওর শোক-তাপের শরীর," কখনও বলিতেন, "আহা, ও একটু রাগী মানুষ—সকলের কি স্বভাব সমান হয়—তা ব'লে বৌমানুষকে কাঁদতে নেই, সব সইতে হয়।" আমাদের ভাত খাওয়ার সময় দিদিমা নানা প্রকার গল্প করিতেন, যাহার যে ত্রুটি সংশোধন করিতেন। যে বধূ যে নিরামিষ তরকারি ভালবাসে, তাড়াতাড়ি তাহাকে সেই তরকারিটি রাঁধিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেন। "দিদি, ব'সে খাও—এই ঝালের ঝোল হ'ল ব'লে।" প্রত্যেককে দিদিমা সমভাবে যত্ন করিতেন, প্রত্যেককেই মিষ্ট কথায় বশীভূত করিয়াছিলেন।

আমাদের আহার শেষ হইলে "বামন-মেয়ে" লোকজনদের ভাত দিত—সে আমাদের স্বজাতি, তাই দিদিমার হাতের ব্যঞ্জনাদি খাইত। কিন্তু সিদ্ধ চা'ল খাইত বলিয়া সে তাহার ভাত নিজে স্বতন্ত্র রাঁধিত। দিদিমা ও অন্য গৃহিণীরা আতপ চা'ল খাইতেন—অন্য গৃহিণীরা রাত্রে লুচি ও আলুনি ভাজা খাইতেন, কিন্তু দিদিমা দুগ্ধ, ফল ও সন্দেশ ছাড়া অন্য কোন জিনিস খাইতেন না। যদি কোন দিন লুচি খাইতে সাধ হইত, তবে দুপুরবেলা ভাতের সহিত খাইতেন। দিদিমার আহারাদির শেষ হইতে বেলা প্রায় আড়াইটা বাজিয়া যাইত।

ইতিমধ্যে আমরা পুতুল খেলিয়াছি—কেহ বা এক ঘুম ঘুমাইয়াছি—এবং যে কেহ একজন নজর রাখিয়াছি, দিদিমা কখন্ আহারে বসেন। দিদিমার আহারের সময় প্রায় আমি চেলীর বা গরদের শাড়ী পরিয়া দুধটুকু, জলটুকু দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতাম। সে সময়ে আমিই বাড়ীর সর্ব্বকনিষ্ঠ বধূ। সুতরাং পাকা চুল তোলার ভার আমার ছিল। আহারান্তে দিদিমা যখন দোতলার দালানে আঁচল পাতিয়া একটু "গড়াইতেন," তখন পাকা চুল তুলিতাম। দিদিমা বলিতেন, আহা, নাতবৌয়ের হাত যে—মাথায় হাত দিলেই ঘুম পায়। বলিতে-না-বলিতেই দিদিমা নিদ্রার কোলে গা ঢালিয়া দিতেন। নাতবৌয়ের হাতের গুণে যে এত শীঘ্র নিদ্রাকর্ষণ হইত, তা ঠিক নয়। রাত্রি ১১।১২টার সময় দিদিমা শয্যা গ্রহণ করিতেন; আর ২।৩টায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত। এক ঘুমের পর নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি আর শয্যায় থাকিতেন না। তপ-জপে নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং নিদ্রার দোষ কি! আদেশ ছিল যে, নিদ্রাকর্ষণ হইলেই যেন আমি উঠিয়া যাই। দিদিমা বলিতেন, —"আহা, ওরা ছেলেমানুষ, খেলা করবে, ওরা কি চুপ ক'রে ঘোমটা দিয়ে ব'সে থাকতে পারে!" এক ঘণ্টার মধ্যে দিদিমার নিদ্রাভঙ্গ হইত; দিদিমা এক বাটি দুধ গরম করিয়া নিজের হাতে আমাকে খাওয়াইতেন। পরে চুল বাঁধিয়া দিয়া কাপড় ছাড়িতে পাঠাইয়া সকলের জলযোগের ব্যবস্থা করিতেন। এ সকল হইয়া গেলে নিজে কাপড় ছাড়িয়া মালা হাতে করিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে আমার রামায়ণ বা মহাভারতের কোন স্থান হইতে পড়িয়া শুনাইতে হইত। কখনও বা কোন প্রতিবাসীর বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী কথকতা হইতেছে সন্ধান পাইলে তাঁহার দৈনিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত। সে সময় দিদিমা চুল বাঁধা প্রভৃতির ভার অপর কোন গৃহিণীর উপর দিয়া মালা হাতে করিয়া তিনটার পূর্ব্বেই "কথা" শুনিতে যাইতেন। সন্ধ্যার সময় দিদিমা সন্ধ্যা বন্দনা সারিয়া লুচি রুটি করিতেন। রাঁধুনী তরকারি রাঁধিত। গৃহিণীরা নিজেরা ময়দা মাখিতেন। লুচি ভাজা ও রুটি সেঁকার ভার দিদিমাই গ্রহণ করিতেন;—দাস দাসী ব্যতীত রাত্রে প্রায় কেহই ভাত খাইত না।

সকলকে আহারাদি করাইয়া প্রাতঃকালের জন্য ভাঁড়ার বাহির করিয়া এবং কিছু কিছু তরকারি কুটিয়া রাখিয়া নিজে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ

করিবার পর দিদিমা যখন বিছানায় যাইতেন, প্রায় রাত্রি বারোটা বাজিত। আবার ৩টা বাজিলেই প্রায় উঠিয়া বিছানায় বসিয়া জোড়হাত করিয়া ধ্যান করিতেন। ভোর ৪টার সময় হাত-মুখ ধুইয়া গো-সেবা করিতেন। ৫টার সময় ঘটি, নামাবলী, তসর কাপড় ও পুষ্পপাত্র হাতে করিয়া "ও মা বামন-মেয়ে, ও দিদি, নাতবৌ, ওঠ দিদি—বৌমা, ওঠ মা, বেলা হয়েছে—আমি তবে এখন আসি," বলিয়া গঙ্গাস্নান করিতে বাহির হইতেন। আমারও ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত—শুনিতাম, বৈষ্ণব ভিখারী গাহিতেছে—

হরি কোথা হে—তুমি কোথা হে
ও বিপদের কাণ্ডারী—তুমি কোথা হে ?

২

দিদিমা আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মাতাও নহেন, শাশুড়ীও নহেন—শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মাসি ছিলেন। দিদিমা বাল-বিধবা, চিরদিন পিত্রালয়ে বাস করিতেন। তাঁহার অল্প কিছু জমি জমা ছিল—তাহার আয় হইতেই তাঁহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ব্রত-নিয়ম প্রভৃতির খরচপত্র চলিত—হাতখরচের জন্য কখনও দিদিমাকে কাহারও কাছে হাত পাতিতে হইত না। এমন তীর্থ ছিল না, যাহা দিদিমা উদ্‌যাপন করেন নাই। আজিও সকলে একবাক্যে বলেন যে, দিদিমার পুনর্জ্জন্ম কখনই হইবে না।

আমি যখন তাঁহাকে দেখিলাম, তখন তিনি ইহ লোকের সকল কার্য্য সমাধা করিয়া পরলোকের দিকে চাহিয়া আছেন—কিন্তু তা বলিয়া তিনি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতেন না। আমাদের শাশুড়ী ঠাকুরাণী অনেকগুলি অপোগণ্ড শিশু সন্তান লইয়া অল্প বয়সে বিধবা হইয়া কায়ক্লেশে যখন সন্তানদের মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন—কন্যা ও পুত্রদের বিবাহ দিয়াছেন—মনে করিতেছেন, এইবার আমি একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিব—এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার ডাক পড়িল, তিনি চলিয়া গেলেন। পুত্রেরা এক মাত্র মাতাকেই পিতা মাতা উভয়ই জানিতেন—বধূরা নিতান্ত বালিকা—অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনায় নাবিকহীন তরীর মত সকলে অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছেন—শুনিয়া করুণাময়ী দিদিমা আসিয়া তাঁহাদিগকে স্নেহবক্ষে তুলিয়া লইলেন। আমাদের শাশুড়ী ছিলেন না, কিন্তু জেঠ-শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী ছিলেন এবং যথেষ্ট যত্ন আদর করিতেন—কিন্তু

তবুও অভিভাবক হইলেন দিদিমা ;—তাঁহাকে নহিলে চলিত না— দিদিমাও আনন্দের সহিত আত্মদান করিলেন। তাঁহার পিত্রালয়ে তিনিই গৃহিণী ছিলেন—এখানেও তিনি গৃহিণী। ঘরে গাড়ী ছিল, কিন্তু দিদিমা কোন দিন গাড়ী করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন না। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী প্রভৃতি বিশেষ পর্ব্বে অন্য গৃহিণীরা গঙ্গাস্নানে বা কালীঘাটে গাড়ীতে যাইতেন—কিন্তু দিদিমার সেই নিয়মিত ব্যবস্থা। প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় কালীদর্শন করিতেনই—প্রত্যুষে উঠিয়া পদব্রজে কালীঘাটে যাইয়া আদিগঙ্গায় স্নান করিয়া কালীদর্শন, সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিয়া বেলা ১১টায় গাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন। বলিতেন, "বর্ষা বা শীতের দিনে আমি অনায়াসে পায়ে হেঁটে কালীঘাট থেকে আসিতে পারি—কিন্তু অনেক বেলা হয়ে যাবে—অনেক খাবার করা আছে—ওরা কখন্ করবে ; আহা, পেরে উঠবে না—তাই তাড়াতাড়ি ক'রে আসছি।" অমাবস্যা পূর্ণিমায় বিধবারা কেহই ত ভাত খান না, কাজেই ঐ দিন বিস্তর রুটি লুচি তৈয়ারি হইত।

গৃহিণীরা কালীঘাটে গঙ্গাস্নানে সর্ব্বদা যাইতেন—আর কাঠের পুতুল, পুঁথির মালা, পিতলের খেলেনা, কাঠের খেলেনা—সংসারের কাজের উপযোগী হাতা, বেড়ি, খুন্তি, বেলন, নোড়া, বোক্‌নো, হাঁড়ি, চাটু, কড়াই, কত কি কিনিয়া আনিতেন—দেখিয়া দেখিয়া আমাদের কালীঘাট ও গঙ্গাস্নানে যাওয়ার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইত—কিন্তু কিছুতেই বাবুদের মত হইত না। বাবুরা তখন সবে এম. এ., বি. এ. পাস করিয়াছেন। আমাদের বাহির হইবার হুকুম ছিল না। আবার সাবেক নিয়মে তখন কাশীপুর বরানগর যাইতেও পালকিতে অথবা নৌকায় যাইতে হইত—গাড়ী চড়িতে পাইতাম না। ভাড়াটে গাড়ী ত নয়ই—নিতান্ত কোন দিন পালকি-বিভ্রাট ঘটিলে ঘরের গাড়ীতে চড়িয়া যাওয়া চলিত। এইরূপ পালকি-বিভ্রাট এক দিন আমার অদৃষ্টে ঘটায় দিদিমা আমার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন।

আমার পিতামহাশয় বিদেশে কাজ করিতেন—মাতাও পিতার নিকট বিদেশে, সুতরাং আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার আবশ্যক ছিল না। জেঠা খুড়া যদি লইয়া যাইতেন—এক বেলার জন্য পাঠানো হইত। একদিন গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দিদিমা বলিলেন—"নাতবৌ, তোমাকে এত দিন বলি নাই দিদি,—আহা, ছেলেমানুষ, ভাবনা চিন্তা

করবে—তোমার জাঠতুতো ভাইটির বড় অসুখ—আহা, বাঁচবার কিছু ছিল না—অনেক চিকিৎসায় হরির কৃপায় প্রাণ পেয়েছে, তুমি একদিন যাও, তাকে দেখে এস। আমি প্রতি দিন গঙ্গাস্নানের ফেরত তাকে দেখে আসি—এখন প্রাণের আশা হয়েছে তাই তোমায় বলছি। তাঁদের এখন তোমায় নিয়ে যাবার সময় নয়—তুমি আপনি যাও।

আমি তখন নিতান্ত বালিকা, এগার বৎসর মাত্র বয়স—দিদিমা আমাকে তাই জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। আমার বেশ মনে পড়ে, আমাদের ননদদিগকে কেহ আনিতে না গেলেও তাঁহারা মধ্যে মধ্যে নিজেরাই আমাদের এখানে অর্থাৎ পিত্রালয়ে আসিতেন। আমি ভাবিতাম, আমি কবে অমনই ইচ্ছা করিলেই পিত্রালয়ে যাইতে পাইব! তাই আজ দিদিমা যেই বলিলেন "তুমি আপনি যাও"—আমি ভাবিলাম, আমিও তবে একজন। দু-চার দিন পরে দিদিমা একদিন বলিলেন যে, "আজ তুমি ভাত খেয়ে যাও—অসুখের বাড়ী, না-খেয়ে গিয়ে ব্যস্ত ক'রে কাজ নাই।" আর কোথায় আনন্দ রাখি—অসুখ দেখতে যাওয়ার ত ভারি ভয় ভাবনা—অকস্মাৎ যে গিয়ে প'ড়ে সকলকে বিস্মিত ক'রে দিব, এই আনন্দ! সমবয়স্কা এক ভাশুরঝি ও একটি ছোট ভাগিনেয়ী ধরিল—আমরাও যাইব। সে ত আরও ভাল। নিজেরাই সব পরামর্শ আঁটিলাম, নিজেরাই ঠিকঠাক হইলাম—দিদিমার অনুমতি নেওয়াও নেই, কিছুই না। দিদিমা বলিয়া দিয়াছিলেন, পালকি ডাকাইয়া লইও। পিত্রালয় হইতে লইতে আসিলে অর্থাৎ পূর্ব্বদিন যদি কেহ আসিয়া বলিয়া যাইত, "কাল দিন ভাল আছে, অমুককে পাঠাইয়া দিতে হবে"—তবে অনেক সময় দিদিমা বলিতেন, "তোমাদের আর কাকেও আসতে হবে না—আমি এখান থেকেই পাঠাইয়া দিব।" আর ইহাও বলিয়া দিতেন যে, "এত দিন রাখিও।" তাই যে-বধূ যখন যাইত, প্রস্তুত হইয়া পালকি আনাইত, যাবার সময় সকলকে প্রণামাদি করিয়া বিদায় লইয়া যাইত। আজ আমি যখন প্রস্তুত হইয়া পালকি আনাইতে পাঠাইলাম—তখন গৃহিণীরা সকলে আহারে বসিয়াছেন—আমি আনন্দে এমনই বিহ্বল যে, তাঁহাদের আহার শেষ হওয়ার বিলম্ব সহে না;—সহিবেই বা কি করিয়া—২টা বাজে—কখন যাইব;—সন্ধ্যায় ফিরিতে হবে—কতটুকু সময় আর আছে? কাজেই খুব তাড়া দিয়া ঝিকে পাঠাইয়াছি। এখন ঝি মহাশয়া বাহিরে

চাকরদের কিছু না বলিয়া নিজেই গজেন্দ্রগমনে গিয়া এক ভাড়াটে গাড়ী ডাকিয়া আনিয়াছেন। আমরা যাত্রীদল প্রস্তুত—একজন পিত্রালয়ের ঝি—একজন শ্বশুরালয়ের ;—তার পর আমি ও ভাগিনেয়ী ও ভাশুরঝি চলিয়াছি ;—রান্নাঘরের দরজায় গিয়া "দিদিমা, আমরা যাচ্ছি" বলিতেই দিদিমা উন্মুখ হইয়া বলিলেন, "পালকি এসেছে ?" আমি "পালকি নয়, গাড়ী" বলিতে বলিতে অন্তঃপুরের দ্বার ছাড়াইয়াছি ;—দিদিমা আর কি করিবেন—"ও মা, ও ঝি, সাবধানে নে যাস, আর রাত করিস্ নে ; বেলাবেলি এস মা"—এইরূপ বলিতে লাগিলেন—আমরা শুনিতে শুনিতে গেলাম। গাড়ীতে উঠিয়া বলিলাম, "কই, চাকর নিলি নে"—ঝিয়েরা বলিল, "আমরা দু-জন আছি, আর চাকর কেন ?" আমি বলিলাম, "গাড়ী আনলি কেন ?" ঝি বলিল, "আড়ায় পালকি ছিল না, দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাই গাড়ী আনলুম—দেখ দেখি কেমন মজা—বেশ সবাই গাড়ীতে যাচ্ছি—পালকি হ'লে তোমরা ত সুখে যেতে, আমাদের ভাত খেয়ে ছুটতে ছুটতে প্রাণ যেত।" তার পর বেশ সুখেই কয়েক ঘণ্টা কাটানো গেল! কোথায় বা বেলাবেলি আসা—যার নাম রাত ন'টা। সকলেই প্রফুল্ল মনে আবার এক ভাড়া গাড়ী চড়িয়া আসিয়া হাজির। ঝম্ ঝম্ মলের শব্দে, হি হি রবে—বাড়ী জাগাইয়া আমরা আসিলাম—আমি বধূ,—দিদিমাকে প্রণাম করিতে গেলাম। দিদিমা তখন নাতিদের পরিবেশন করিতেছেন—রাত্রে দোতলার একটা ঘরে খাওয়া হইত—ঘর হইতে দিদিমা বাহিরে আসিলে প্রণাম করিলাম। তখন দিদিমাকে স্পর্শ করিব না, গাড়ীর কাপড়—পদধূলি লইলাম না। দিদিমা কিছু বলিলেন না দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, দিদিমার মুখ অসম্ভব গম্ভীর। ঘর হইতে কর্ত্তা বলিলেন, "দিদিমা, কার হুকুমে গাড়ী চ'ড়ে যাওয়া হয়েছিল।" কোথায় গেল সে আনন্দস্রোত—বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল—ও দিকে অন্য গৃহিণীরা ঝিয়েদের উপর ঝঙ্কার দিতেছেন—"গাড়ী চ'ড়ে নিমন্ত্রণ খেতে গেছলি—কাজকর্ম্ম সব প'ড়ে আছে—রঙ্গ ক'রে সব এলেন!"

কর্ত্তা যা-ই বলিলেন, "দিদিমা, কার হুকুমে যাওয়া হয়েছিল," অমনই দিদিমা তটস্থ হইয়া বলিলেন, "থাক্ থাক্, ছেলেমানুষ বুঝতে পারে নি, ও-কথা পরে হবে"—দিদিমার সেই বিরক্তির ভাব দূরে গেল, মুখচ্ছবি করুণায় ভরিয়া উঠিল। কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন, "ক'নে-বৌ, না বলা, না

কওয়া, গাড়ী ডাকিয়ে বেড়াতে যায়, এ কি রকম!" দিদিমা চুপ করিয়া রহিলেন—তখন কর্ত্তাতে ও অন্য গৃহিণীগণে ঝিয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঝি বলিল, "আড়াতে পালকি ছিল না—তাই গাড়ী এনেছি।" কর্ত্তা বলিলেন, "তবে রাত্রে কেন গাড়ীতে আসা হ'ল?" আর উত্তর নাই। "দারোয়ান বা চাকর নেওয়া হয় নি কেন?" উত্তর নাই। "এত রাত কেন?" উত্তর নাই। "অসুখের বাড়ী, তা ত বৌমা জানেন, তিনি মেয়েদের কেন নিয়ে গেলেন, কার হুকুমে নিয়ে গেলেন—কা'কে ব'লে নিয়ে গিয়েছেন? উনি যাচ্ছেন ওঁর বাপের বাড়ী, এ বাড়ীর মেয়েরা কেন গেল?" আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় গিয়া শুইলাম—খাওয়ার দরকার ছিল না; পিত্রালয় হইতে খাইয়া আসিয়াছিলাম—নচেৎ সে রাত্রে আর খাওয়া হইত না। এই একটি দিন মাত্র এক মুহূর্ত্তের জন্য দিদিমার মুখে আমার প্রতি বিরক্তির ভাব প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছিলাম।

দিদিমা সদাপ্রসন্ন, বর্ণ গৌর, পরিপাটি গঠন, দীর্ঘাঙ্গী, মাথার চুল ছাঁটা। আধা কাঁচা, আধা পাকা, ছোট ছোট কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে দিদিমাকে অনেকটা পুরুষ মানুষের মত দেখাইত। অত্যন্ত বিরক্ত হইলে দিদিমা টেপা ঠোঁট আরও দৃঢ়ভাবে টিপিয়া থাকিতেন—পাছে কোন কঠিন কথা বাহির হইয়া পড়ে, তাই যেন অত্যন্ত সাবধান হইতেন।

একদিন রাঁধুনীর অসুখ। বাড়ীতে পরিবার সে সময়ে বেশী ছিল না—আমিষ রান্না দিদিমাকেই রাঁধিতে হইবে। দিদিমা সকল কার্য্য করিতেন—কিন্তু আমিষ রান্না রাঁধিতেন না—রাঁধুনীর অসুখ হইলে বধূদের মধ্যে কেহ একজন মাছের ঝোল ভাত রাঁধিত। সে দিন আমি ছাড়া আর কোন বধূ ঘরে ছিল না—আমি ছেলেমানুষ, দিদিমাই রাঁধিবেন। দিদিমা গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন—ঠিক ফিরিয়া আসার সময় ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। রান্নাঘরে উনুন জ্বলিয়া যাইতেছে। দাসীরা চাল ধুইয়া, বাটনা বাটিয়া, মাছ কুটিয়া, থরে থরে সমস্ত গুছাইয়া ঘর-বার করিতেছে, কত ক্ষণে দিদিমা আসেন—বড়বাবুর আবার সে দিন তাড়াতাড়ি বাহির হইতে হবে।

আমার পান সাজা হইয়া গেল—তথাপি দিদিমা আসিলেন না দেখিয়া বুড়ো ঝি আসিয়া বলিল, "বৌমা, রান্নাঘরে চল, আমি দেখিয়ে দেব এখন, তুমি ভাতের হাঁড়িটা বসিয়ে ভাতটা চড়িয়ে দাও, ভাত হ'তে

হ'তে মা-ঠাকরুণ এসে পড়বেন।" আমি ভাতের হাঁড়ি নামাইতে গিয়া প্রথমেই একখানা সরা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম—ঝি বলিল, "তা যাক গে, তুমি হাঁড়িটা বসিয়ে দাও, বড়বাবুর আজ বড় তাড়া।" ঝি অন্য কাজে গেল, আমি ভাতের হাঁড়ি চড়াইয়া, হাঁড়ি পুরিয়া জল দিয়া, সরা চাপা দিয়া উপরে চলিয়া গেলাম। একটা বিড়ালের সাদা ধবধবে মোটাসোটা একটা বাচ্ছা হইয়াছিল—সেটাকে লইয়া খেলিতে লাগিলাম। অনেক ক্ষণ পরে চৈতন্য হইল যে, হাঁড়িতে ত চাল দেওয়া হয় নাই, অতএব এইবার যাওয়া যাক। পুরুষেরা অন্দরমহলে কেহ নাই, গৃহিণীরা দেশে গিয়াছেন, একা দিদিমা আছেন, তাঁর অত আঁটাআঁটি ছিল না—আমি ঝম্ ঝম্ ছুড়্ ছুড়্ করিতে করিতে, বেড়াল-ছানা নাচাইতে নাচাইতে বলিতে বলিতে চলিয়াছি—"চল, তোমাকে ভাতে দিই গে যাই, চল তোমাকে ভাতে দিই গে যাই।" সিঁড়ি হইতে দালানে পড়িতেই দেখি—ভাশুর মহাশয় ও দিদিমা। অমনই লজ্জাশীলা বধূ এক হাত ঘোমটা টানিয়া এক দৌড়ে ছুটিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিলাম। দিদিমা হাসিয়া বলিলেন, "মরি মরি, কি লজ্জা দেখ।" ভাশুর মহাশয় বলিলেন—"দিদিমা, আজ না কি বৌমা রাঁধছেন ?" দিদিমা বলিলেন, "হ্যাঁ, ঐ যে বেড়াল-ছানা ভাতে দিতে আসছে।" ভাশুর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"বুড়ো ঝি বললে, আমার তাড়াতাড়ি, তাই সে বৌমাকে দিয়ে ভাত চড়িয়েছে। আমি ভাবিলাম, ছেলেমানুষ—কি করেছে দেখে আসি।"

দিদিমা বলিলেন—"তা হ'লেই আজ ভাত খেয়েছিলে আর কি, এক হাঁড়ি জল চড়িয়ে সরা ঢাকা দিয়ে উপরে ব'সে আছে। আমি এসে শুনি—ভাত চড়ানো হয়েছে, তা বলি বেশ হয়েছে, আর আর সব গুছিয়ে গাছিয়ে আসি, নাতবৌকে খাবার দিয়ে আসি—তা ঝি বললে—মা, ভাত হয়ত হয়ে এসেছে, দেখুন দেখি। ও মা, সরা খুলে দেখি, টগবগ ক'রে জল ফুটছে, যেখানকার চাল সেইখানে মজুত আছে। তখন হাঁড়ির জল কতকটা ফেলে চাল দিই—দিয়ে এই উপরে যাচ্ছি। আহা, কতখানি বেলা হয়েছে, খাবার পায় নি—কত ক্ষিদে পেয়েছে। তা যাও দাদা, স্নান ক'রে এস—বেড়ালভাতে ভাত কখনও খাও নি—আজ ভাদ্রবৌ খাওয়াবে।" আমি ত রান্নাঘর থেকে সব শুনিতেছি —ভাশুর মহাশয় বাহিরে গেলে দিদিমাকে বলিলাম—"জল না গরম হ'লে কি ক'রে চাল দিব, তাই জল গরম

করতে দিয়ে গিয়েছিলাম। দিদিমা মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "এক হাঁড়ি জল দিয়েছ, চাল ধরত কোথায়? আজ যে পুড়ে খুন হও নাই, এই রক্ষে।" তার পর আমাকে খাবার দিয়া অবসর-মত আস্তে আস্তে বলিলেন, "শ্বশুর ভাশুরের কারও সাম্‌নে পড়লে ঘোমটা দিয়ে ঘাড়টি হেঁট ক'রে আস্তে আস্তে চ'লে যেতে হয়—যেন মলের শব্দটি না হয়—অমন ক'রে ছুটে যেতে নেই। তোমার শ্বশুরবাড়ীর বড় আঁটাআঁটি—তোমার দাদা-শ্বশুর গোষ্ঠীপতি ছিলেন। শ্বশুর শাশুড়ী ত চিনলে না দিদি, কত বড় ঘরের বৌ তুমি, কিছুই জান না! সে দিন যে বকুনি খেলে, তা ঐ ভাড়াটে গাড়ী চড়েছিলে ব'লে। এ বাড়ীর বৌরা কখনও গাড়ী চড়ে নাই। তোমার শ্বশুরের এমনই রাশভারী ছিল, আর এমন নিয়ম ছিল যে, ৫ বছরের মেয়েটি পর্য্যন্ত বাহির-বাড়ীতে যেতে পেত না। এখন এই দেখ, ১০।১১ বছরের মেয়েরাও স্কুলে যাচ্ছে। তবু তোমরা বৌমানুষ, তোমাদের সাবধান ক'রে দিই। আর খেলাধুলা যা করবে, ঘরে ক'রো—ছাতে উঠো না। জানলা খুলে রেখো না—পাড়া প্রতিবাসী না দেখতে পায়।" দিদিমা কখনও ভর্ৎসনা করিতেন না। মিষ্ট ভাষায় হাসিমুখে এমন করিয়া বলিতেন যে, কষ্ট হইত না, কিন্তু শিক্ষা হইত। দিদিমার দুই চারি দিনের কথা তাই আমার বিশেষ করিয়া মনে আছে। আর একদিন দেশ হইতে ধোপা আসিয়াছে যখন, তখন হেঁসেল উঠিয়াছে, রাঁধুনী বেড়াইতে বাহির হইয়াছে—দিদিমা সবে একটু ঘুমাইয়াছেন—বুড়ো ঝি বলিল—"বৌমা, হাঁড়িতে ভাত তরকারি সব আছে; এস, ধোপাকে চারটি বেড়ে দিবে"—কাজ করিতে বলিলে আমার মহা উৎসাহ—অমনই চলিলাম—গিয়াই যেমন সরাখানা ধরিয়া টানা—অমনই খানিকটা ঝোল গায়ে ফেলা। বেশ মনে আছে, সে দিন একখানি নূতন ধোয়া লাল ভোমরা-পেড়ে সাদা খ'ড়কে ডুরে পরিয়াছিলাম, তাই গায়ে কাপড়ে ঝোলের প্রবাহ বহিয়া যাওয়ায় বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলাম—আধ ঘণ্টা মাত্র পরিয়াই কাপড়খানা ধোপাকে ধুইতে দিতে হইবে—কম দুঃখ! ধোপাকে ত ভাত দিলাম—এমন সময় দিদিমা আসিয়া আমার মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্। মুচকি হাসিয়া বুড়ো ঝিকে বলিলেন—"আমায় ডাকতে হয় মা—ও কি কিছু পারে। দেখ দেখি, এই গা ধুয়ে এসেছে, আবার গা ধুতে চললো—অসুখ না হ'লে হয়।" বুড়ো ঝি বলিল, "তা মা, বৌ ঝি এ-সব না করলে কি

হয়!" দিদিমা বলিলেন, "বয়স হইলেই সব শিখবে, নাতবৌ আমার আদরের মেয়ে কি না, তাই একটু চঞ্চল—জল গড়াতে গেলে ঘরময় জল ঢালে, বেগুন কুটতে হাতে ফালা দেয়,—ও সব সেরে যাবে—বয়স হ'লেই ঘরকন্না ঘাড়ে পড়লেই সব শুধরে যাবে। নাতবৌয়ের সকল কাজে মন আছে, সময়ে সব শিখবে।" আমার মনে আছে, এই দিন হইতে আমি শিখিলাম যে, আমি সকল কার্য্যে অপারক কেন,—কেন আমাকে কোন কাজ দিয়া দিদিমা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না—না আমি ভারি চঞ্চল;—আমি সাবধান হইতে শিক্ষা লাভ করিলাম। আমি যেরূপ অভিমানী ছিলাম, তাহাতে দিদিমা যদি এই ভাবে আমাকে শিক্ষা না দিয়া তিরস্কার করিতেন, তা হইলে উল্টা ফল হইত। আমি বোধ হয় তিরস্কৃত হইয়া প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ করিতাম—নিজের দোষ দেখিয়া লজ্জিত হইতাম না।

তখন দিবসে স্বামীর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া বড় লজ্জার বিষয় ছিল। দিদিমা কিন্তু আমাদের এই নির্লজ্জতায় বিশেষ প্রশ্রয় দিতেন। ছুটির দিনে "নাতিরা" ঘরে থাকিলে, নানা অছিলায় নাতবৌদের ঘরে পাঠাইতেন। "যাও, জল দিয়ে এস—পান দিয়ে এস, ঘর গুছিয়ে এস।" প্রথম প্রথম আমি এক হাত ঘোমটা দিয়া ঘরে "প্রবেশ ও প্রস্থান" করিতাম—ক্রমে ক্রমে বেশ অভ্যাস হইয়া গেল—পান জল দিতে গিয়া ঘণ্টাখানেক কাটিত—ঘর গুছাইতে সারা দুপুর লাগিত। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, অন্য গৃহিণীরা এ জন্য দিদিমাকে তিরস্কার করিতেন —আমার সহজ বালিকা-ভাব দেখে ত তাঁরা "অবাক্" হইতেনই। কেন না, তাঁহাদের নিকট উহাই "বেহায়াপনা।" দিদিমা বলিতেন, "আহা, ওরা দুটিতে হাসে খেলে—আমি দেখে বড় তৃপ্ত হই।" অনেক সময় দিদিমা নিঃশব্দে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেন ও মুচকি মুচকি হাসিতেন—আমি অমনই একহাত ঘোমটা টানিয়া বাহির হইয়া যাইতাম। দিদিমা ও নাতিতে হাসিতেন ও বলিতেন—"ওঃ! কি লজ্জা!" অনেক সময় দরজা খোলা আছে—আমার মাথায় কাপড়ও নাই—স্বামী ঘরে আছেন—দিদিমা, দুধের বাটি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার দিকে আমার দৃষ্টি পড়িলেই ইঙ্গিতে ডাকিবেন;—স্বামী দিদিমাকে দেখিতেছেন ও হাসিতেছেন,—আমি বক্তৃতা করিয়াই যাইতেছি, অকস্মাৎ দিদিমার দিকে দৃষ্টি পড়িল—সর্ব্বনাশ, এঁ কি! দিদিমার মুখে হাসি, মাথা নাড়িয়া

ডাকিলেন। একদিন বলিলাম—"দিদিমা, এ রকম করলে হবে না—আপনি কেন সাড়া দিয়ে আসেন না!" দিদিমা বলিলেন, "তোমরা হাস, কথা কও, আমি যে বড় দেখতে ভালবাসি। আহা, ছোট নাতি, আমার বোনঝির কোলের ছেলে;—মা-হারা হয়ে পর্য্যন্ত বাছা আমার হাসে নি, কথা কয় নি। তোমার সঙ্গে হাসে, কথা কয় দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।" কিন্তু ক্রমে ক্রমে এমন হইল যে, আমি ঘরে প্রবেশ করিলেই বাড়ীর কেহ-না-কেহ "আড়ি" পাতিতেন—এবং আমার ছেলেমানষি সরলতার শত ধারে আলোচনা করিতেন। একদিন গম্ভীর মুখে দিদিমা বলিলেন, "নাতবৌ, যখন ঘরে যাবে, দরজা বন্ধ ক'রে দিও"—বলিয়া আমার ঘরের সমস্ত জানালা দরজার ছিদ্রগুলি পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। এই দিন দিদিমার মুখ-অসম্ভব গম্ভীর দেখিয়াছিলাম। বিরক্ত হইলে দিদিমার মুখের প্রসন্ন ভাবটুকু চলিয়া যাইত। তাহা ব্যতীত কথায় বা ব্যবহারে বিরক্তি প্রকাশ পাইত না। দিদিমা কখনও কাহারও ঘরে "আড়ি পাতিতেন" না। নিঃশব্দে আমার ঘরে যে আসিতেন—কেবল এক নজরে দেখিতেন, আমরা আনন্দে আছি কি না। অন্য কেহ আড়ি পাতিলে তাঁহার ভাল লাগিত না।

এখন আমি বেশ বুঝিতে পারি যে, যদিও দিদিমা সকলকেই সমভাবে দেখিতেন—তবুও যে কারণেই হোক, আমার প্রতি যেন ঈষৎ পক্ষপাতী ছিলেন। আমি ছেলেমানুষ বলিয়া বোধ হয় আমাকে বেশী আদর দিতেন।

আমি পিতামাতার এক মাত্র সন্তান ছিলাম—এ জন্য সাধারণ ভাবে প্রতিপালিত হই নাই। অনেক বয়স পর্য্যন্ত প্রচুর দুধের বরাদ্দ ছিল। "শ্বশুরবাড়ী যাইয়া মেয়ে আমার দুধ পাবে না;"—মাতাঠাকুরাণী এই চিন্তায় কাতর হইয়াছেন শুনিয়া দিদিমা বলিয়া পাঠাইলেন—মাকে ব'লো যে, সে ভাবনা যেন না করেন।

দিদিমা নিঃশব্দে নিয়মিত সময়ে ঠিক আমার মাতার মত দুধের বাটিটা আনিয়া আমার মুখে ধরিতেন। এবং সমস্ত নিঃশেষ করাইয়া তবে ছাড়িতেন। তিনি বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তা না হইলে বিড়াল-বাচ্ছা অর্দ্ধেক ভাগ পাইবে। জলপানি পয়সা আমার হাতে প্রচুর থাকিত, কোন ফেরিওয়ালা হাঁকিলেই সমবয়স্কা ভাশুরঝি ভাগ্নীরা তাহাকে

ডাকিত; আমি পয়সা দিতাম। বাড়ীর মহিলারা, বিশেষ প্রাচীনারা নিন্দা করিতেন—দিদিমা বলিতেন, "আমার নাতবৌ যে 'দো-চোখোর' ব্রত করিয়াছে, তাই যা দেখে তাই কেনে"; বলিয়া একটু হাসিতেন। এই সকল সরল বালিকাসুলভ ব্যবহারে দিদিমা কখনই বাধা দিতেন না।

মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনাকে দিদিমা অতিশয় ঘৃণা করিতেন। সদা-সর্ব্বদা সকলের নিকট বলিতেন, "নাতবৌ আমার মিথ্যা কথা কা'কে বলে, তা জানে না,—নাতবৌয়ের আমার পেটে একখানা মুখে একখানা নেই।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার পিতামাতা বিদেশে থাকিতেন—এবং আমিই এক মাত্র সন্তান। সুতরাং আমি একা একা মানুষ হইয়াছিলাম—সংসারের কোন সংবাদ রাখিতাম না। নিজের পুতুল, ঘুড়ি, ফুলপাতা লইয়া একা একা খেলা করিতাম। দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হইল। এগার বৎসর বয়সে শ্বশুরবাড়ী গিয়া বৎসরেক কাল রহিলাম—এই নিতান্ত বালিকা বয়সে যদি দিদিমার যত্ন না পাইতাম—অন্য অন্য বালিকা বধূদের মত শ্বশুরবাড়ীর কঠোরতার মধ্যে পড়িতে হইত, তবে আমার জীবন বোধ হয় আর এক ধারায় প্রবাহিত হইত। সত্যপ্রিয়তা, সরলতা, চঞ্চলতা, মুখরতা আমার স্বভাবে বিলক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িত। দিদিমা গুণের প্রশ্রয় ও দোষের সংশোধন করিতেন। কিন্তু কখনই তিরস্কার করিতেন না। তাই দিদিমার কথায় বিশেষ ফল হইত।

এগার বৎসরের বালিকার পক্ষে একাদিক্রমে বৎসরেক কাল শ্বশুরালয়ে কালযাপন করা কতখানি কষ্টকর, তাহা বোধ হয় প্রত্যেক মহিলাই বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ আমাদের পশ্চিমাঞ্চলে বাস ছিল বলিয়া বেড়াইবার খুব সুবিধা ছিল। প্রতি দিন সকাল বিকাল মাঠে ও বাগানে বেড়াইতাম; মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, সার্কাস দেখা সদাসর্ব্বদাই ঘটিত। বিবাহের পর একেবারে সে সব বন্ধ। দশ বৎসরের বালিকাকে একেবারে অবগুণ্ঠিতা বধূ হইতে হইল। এই পরিবর্ত্তনে পিত্রালয়েই বিষম কষ্ট হইত—তার পর সুদীর্ঘ এক বৎসর কাল শ্বশুরালয়ে বাস। একদিন বিকাল বেলা অকস্মাৎ তিন চার জন দাস দাসী সন্দেশ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, কমলালেবু, বাদাম, পেস্তা, আঙ্গুর প্রভৃতি লইয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—আমার মা আসিয়াছেন,—কাল

প্রাতে পালকি আসিবে, আমি পিত্রালয়ে যাইব ;—সে কি আনন্দ ! ঝিয়েদের ধরিয়া বসিলাম যে,—কেন এখনই নিয়ে যাবি নে—কেন কালকের কথা বললি ;—মায়ের উপর খুব রাগ করিলাম,—কাঁদিয়া দিদিমাকে বলিলাম, আমাকে এখনই পাঠাইয়া দিন। দিদিমা বুকে টানিয়া লইয়া সজল নয়নে বলিলেন,—"আহা, যাবে বৈ কি—আজ অবেলা, দিন ভাল নয়—পুরুষেরা কেউ বাড়ী নেই—একবার তাদের বলি ;—কাল ভোরেই পাঠিয়ে দেব—কেঁদ না দিদি, চুপ কর। একটা রাত বই ত নয়—আর কি, এই ত চললে—আবার কত দিনে আসবে।" আমি শান্ত হইলে মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "আমার নাতিকে যে ফেলে যাবে—তোমার মন কেমন করবে না?" আমি হাসিতে লাগিলাম—ভাবটি এই যে,—এ কথার কোনই মূল্য নাই। পরদিন তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিতে চাহি—দিদিমার নাতি তাহাতে বাধা দিলেন। বিদায় গ্রহণের সময় দেখিলাম—তাঁহার চোখে জল পড়িতেছে—মনে একটা বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল।

পালকি আসিয়াছে, আমি "জলখাবার" খাইয়া প্রস্তুত হইয়া আছি—দিদিমা গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিলেই পালকিতে উঠিব। নিয়মিত যে সময়ে তিনি আসেন, তাহার অপেক্ষা তাড়াতাড়ি আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন—আমার আর বিলম্ব সহে না—বলিতে লাগিলাম—"দিদিমা ত এখনও আসিলেন না—আমি তবে যাই।" একটি ভাগিনেয়ী যাইয়া বাহির-বাটীতে প্রচার করিল—ছোট মামীমা এখনই চ'লে যেতে চাচ্ছে—ঝি-মা (দিদিমা) এখন কত বেলায় আসবেন, কে জানে! শুনিয়া ভাশুর মশায় বাড়ীর মধ্যে আসিয়া এক ধমক দিয়া বলিলেন—"ছোট বৌমা কি বলছেন—দিদিমা না এলে যাওয়া হবে না—এ-বেলা পালকি ফিরিয়া যাক।" সর্ব্বনাশ! আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।—সেই মুহূর্ত্তে মূর্ত্তিময়ী করুণাস্বরূপ দিদিমা বলিতে বলিতে আসিতেছেন,—"আমি তাড়াতাড়ি ক'রে আসছি, বেলা হয়ে গেলে নাতবৌ আমার ব্যস্ত হয়ে পড়বে—তোরা ওকে আজ কি ব'লে বকলি—আহা, কত দিন মাকে দেখে নি—ব্যস্ত হবে না? আহা, কাঁদছে। দেখ দেখি, আজ কি না কাঁদালি!" ভাশুর মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"কেন, বৌমা কাঁদছেন কেন—আমি বেশী ত কিছু বলি নাই"—বলিতে বলিতে তিনি

সরিয়া পড়িলেন। দিদিমা আমাকে শান্ত করিয়া পালকিতে তুলিয়া দিতে দিতে বলিলেন—"আমার নাতি একলা রহিল—শীঘ্র ক'রে এস,—এই তোমার ঘরবাড়ী। জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে জন্ম জন্ম এই ঘর কর।" দিদিমার চোখে জল পড়িতেছিল।

হর্ষ-বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে চোখে জল, ঠোঁটে হাসি হইয়া পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলাম। মাকে প্রণাম করিয়া মুখ তুলিতেই মা বলিলেন, "তুই কেঁদেছিস? তোর বুঝি আসতে ইচ্ছা ছিল না।" অবরুদ্ধ স্রোত যেমন বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া বাহির হয়—আমি মায়ের কোলে বসিয়া তেমনই করিয়া খুব কাঁদিলাম। মা কেবল বলিতেছেন—"আ রে, এ কি, কাঁদিস কেন?" বলিতে পারি না কেন কাঁদিতেছি বা কাহার জন্য কাঁদিতেছি—অশ্রুস্রোত কিছুতেই রোধ করিতে পারিতেছি না যে। ('ভারতী,' জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র ১৩১৬)

লক্ষ্মীর শ্রী

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার আবশ্যকতা বুঝিলে কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য যাইতে হয় না। মহিলাগণ নিজে নিজেই ঘরে ঘরে সে ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমরা স্বভাবতঃ এক হিসাবে অপরিষ্কার। "বিছানা শেজ" মাসান্তেও ধোপার বাড়ী যায় না, এমন গৃহস্থ বিস্তর। পরিধেয় বসন নিত্য তিন চার বার ধোয়া হয়, কিন্তু মলিনতার দিকে দৃষ্টি আদপে আমাদের নাই। অনেকে বলিবেন যে, "আমরা চব্বিশ ঘণ্টা রান্নাবান্না নিয়া, ছেলেপিলে নিয়া ব্যস্ত থাকি; আমরা গরিব মানুষ—আমাদের মেম সাজিবার অবসরও নাই, অত ধোপার কড়ি দেবার পয়সাও নাই।" এক কথায় ইহা সকলেরই সঙ্গত মনে হইবে। কিন্তু আলোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, অবসর বা অভাবের জন্য যে আমরা সর্ব্বদা অপরিচ্ছন্ন থাকি, তাহা নহে; সে দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই বলিয়াই আমরা অপরিচ্ছন্ন থাকি।

ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছি, রাজকন্যা 'গোসা'-ঘরে গিয়া শয়ন করিয়া আছেন শুনিয়া রাজরাণী অস্থির—"কেন মা, তুমি রাগ করিয়া কাঁদিতেছ কেন?" অনেক সাধ্য-সাধনায় রাজ্‌কন্যা বলিলেন, "আমার ধুলামুঠি কাপড় চাই।" তখন রাজা ও রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব—সাত রাজার ধন এক মাণিক, আর যা চাও তাই দিব, কিন্তু ধুলামুঠি কাপড় দিতে পারিব না।" এই কথার অর্থ এই যে, শিশু খেলা করিতে করিতে অপরিষ্কার হাতে মুঠা করিয়া কাপড় ধরিবে, সেই অপরিষ্কার কাপড় তিনি চাহেন, অর্থাৎ তাঁহার সন্তান হয় নাই, তাই মনঃকষ্ট। অতএব দেখা যাইতেছে, শিশু সন্তান ঘরে থাকিলেই ঘর দ্বার, পরিধেয় বসন প্রভৃতি অপরিষ্কার অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এবং ইহাও সত্য যে, রাজকন্যা যে "ধুলামুষ্টি কাপড়" পরিতেন, তাহা অসচ্ছলতাবশতঃ নহে,—অভ্যাসবশতঃ।

এই যে সর্ব্বদা অপরিচ্ছন্ন থাকা আমাদের অভ্যাস, ইহা আমাদের বহু দিনের। ধনিগৃহেও ইহার প্রচলন খুব বেশী। প্রচুর দাসদাসী থাকিলেও, ঘর দ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও বিছানা বা শিশু সন্তানের

কাপড়-চোপড় বা মহিলাদের বসন সর্ব্বদা মলিন দেখা যায়। অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের এখনও এমন বিশ্বাস যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেই সে "বাবু"—সে "অকর্ম্মণ্য"। সামান্য আয়াসেই যে পরিচ্ছন্ন থাকা যায়—ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। রেলওয়ে ষ্টেশনের ধারে ধারে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীদের বাসা দেখা যায়, তাহা দেখিবা মাত্রই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাতে বাঙ্গালী অথবা ফিরিঙ্গী বসবাস করিতেছেন। সেই একই বাড়ীতে কখনও বাঙ্গালী, কখনও ফিরিঙ্গী বাস করেন—কিন্তু ফিরিঙ্গী হইলেও তাহার শ্রী ও পরিচ্ছন্নতা সকলের দৃষ্টি যে বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই ফিরিঙ্গী যে ধনী এবং তাঁহার দাসদাসী যে অনেক, তাহা নহে—কেবল অভ্যাসবশেই তাঁরা পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারেন। অভাব যদি অপরিচ্ছন্নতার মূল হইত, তবে ধনিগৃহে অপরিচ্ছন্নতা দেখা যাইত না। আমাদের একটি ধনী আত্মীয়া মহিলা সর্ব্বদা দুই তিন সের সোনার গহনা পরিধান করিয়া থাকিতেন—কিন্তু মলিন বস্ত্রের দিকে কিছু মাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না, তথাপি আমি কখনও পরিষ্কার বস্ত্র পরিতে দেখি নাই। কেবল এক দিন কোন নিমন্ত্রণস্থলে প্রচুর অলঙ্কার ও বহুমূল্য বারাণসী বস্ত্রে ভূষিত দেখিয়াছিলাম। আমাদের দেশে অপরিচ্ছন্নতা অর্থাৎ মলিন বস্ত্র পরিধান বিনয়ের লক্ষণ। মহিলাগণ নিমন্ত্রণে বারাণসী, বোম্বাই, সিল্ক প্রভৃতির শাড়ী পরিয়া গিয়াছেন—বসিবার জন্য আসন দিবার অপেক্ষা করিয়া থাকা অসম্ভব; "বড়মানুষি"র পরিচায়ক; অতএব পরিধেয় বসন যতই বহুমূল্য হউক না কেন, "ধুপ্" করিয়া যেখানে সেখানে বসিয়া না পড়িলে নিন্দার ভাজন হইতে হয়। এই সকল ভাবিলে দেখা যায় যে, অপরিচ্ছন্নতা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। আচার অনুষ্ঠানের ক্রুটির দিকে যেমন আমাদের খর দৃষ্টি, অপরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি একেবারেই নাই। উঠানের এক কোণে নিকানো পোঁছানো তুলসীমঞ্চ—আর এক কোণে আবর্জ্জনার রাশি। সে আবর্জ্জনা যদি প্রতি দিন বেড়ার ও-পাঁরে ফেলা হইত, তবে উঠানটি ত পরিষ্কার থাকিত। ইহাতে কিছু মাত্র ব্যয় হইত না। মুষ্টি মুষ্টি আবর্জ্জনা জমা হইয়া এখন একটা ভূতের বোঝা হইয়াছে, এখন আর পয়সা ব্যয় ভিন্ন পরিষ্কার হয় না।

পরিধেয় বসন সর্ব্বদা অল্প আয়াসেই পরিষ্কার যে রাখা যায়, তাহা অনেকেই জানেন। প্রত্যহ নিয়মিত শিশুদের ও নিজেদের কাপড়গুলি যদি শুধু "জল কাচার" পরিবর্ত্তে একটু সাবান দিয়া লওয়া হয়, তবে সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে। যথেষ্ট ময়লা না হইলে সামান্য সাবান ও অল্প সময়েই কাপড় পরিষ্কার হয়। অনেক মহিলাকে দেখা যায়, সন্তানদের জামাটা কিংবা ধুতিখানা লইয়া ছেলেকে দুধ খাওয়াইতে বসিলেন, তার পর তাহাতে দুধ মোছা, কাদা মোছা, শেষে ঘরশুদ্ধ মোছা হইল—তার পর জলে ধুইয়া দেওয়া হইল, পরদিন আবার বালক তাহাই পরিবে। এই প্রকারে যে বস্ত্র ময়লা হয়, তাহা শুধু জলে কেন, ধোপার বাড়ী গিয়াও ভালরূপ সাদা হয় না। অতএব কাপড়গুলি যাহাতে যত কম ময়লা হয়, প্রথমে পরিবারস্থ সকলের সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। জামাকাপড়ে কোন মতেই কাদা ধুলা পোঁছা উচিত নহে। অনেক মহিলার আঁচলে হাত মোছা অভ্যাস আছে। তরকারি খাইয়া, হাত ধুইয়া আঁচলে হাত মুছিলে তেল ঘি হলুদ কাপড়ে মাখামাখি হয়। এ সকল পরিহার করা কর্ত্তব্য। তার পর নিত্য স্নানের সময় নিজ নিজ পরিধেয় বসন ও শিশু সন্তানদের কাপড়গুলি নিয়মিত সাবান দিয়া ধুইয়া দিলে বিশেষ সময় বা পয়সা ব্যয় হয় না। প্রত্যহ এক পয়সার সাবানে চার পাঁচখানা বড় ধুতি ও ছোট ছোট তোয়ালে রুমাল মোজা প্রভৃতি পাঁচ সাতখানা অনায়াসে ধুইয়া লওয়া যায়। ইহাতে ধোপার ব্যয়ও কমানো যায়। যাঁহাদের দাসদাসীর অপ্রতুল নাই, তাঁহারা নিয়মিত দাসদাসীদের দ্বারা সাবান দিয়া কাপড় ধোয়াইতে পারেন। তবে যাঁহারা মনে করেন যে, সাবানের একটা পয়সা থাকিলে মোহনভোগ কিনিয়া দিব, এবং যত ক্ষণ কাপড় ধুইব, তত ক্ষণ একটু গড়াইয়া বাঁচিব, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন এই যে, সাবধানে সাবান খরচ করিলে চারি আনার বার-সোপে এক মাস চালানো যায়। কি ধনী দরিদ্র, ভাত সকল ঘরেই রান্না হয়। এই ভাতের ফেনে একটু সাবান ফেলিয়া গুলিয়া তাহাতে চার পাঁচখানা কাপড় বেশ পরিষ্কার হয়। একটু গরম গরম আছড়াইয়া লইলে শীঘ্র ময়লা দূর হয়।

সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে, যে দিন ধোপা আসে, সে দিন বেশ একটু স্বচ্ছন্দতা অনুভব করা যায়—মনটা প্রফুল্ল হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, মলিনতা অপ্রফুল্লকর।

অতি শিশুকাল হইতে মলিনতার দিকে যদি শিশু সন্তানের ঘৃণা জন্মাইয়া দেওয়া যায়, তবে ক্রমশঃ বয়সবৃদ্ধির সহিত সে আপনিই অপরিচ্ছন্নতা হইতে দূরে থাকিবে। জল ঘাঁটিতে সকল শিশুই ভালবাসে; যে-কোন কিছু আহারের পর হাত ধুইয়া দেওয়া বা হাত ধুইতে বলায় শিশুরা বিরক্ত হয় না। আমরা ভাত ব্যঞ্জনের বাটিটা যদি স্পর্শ করি, তাহা হইলে হাত ধুইয়া ফেলি; কিন্তু দুধের সরটা হাত দিয়া তুলিয়া বা রসগোল্লাটা ছেলেকে খাওয়াইয়া অনায়াসে কাপড়ে হাতটা মুছিয়া রাখিতে পারি। কারণ, তাহা সকড়ি নহে। এই জন্য সচরাচর দেখা যায়, খাবার খাইয়া ছেলেরা হাত ধোয় না। তার পর সেই হাতে দুনিয়ার জিনিস ধরে। কিছু কাল হইতে এই সকলে ঘৃণা জন্মাইলে বালক-বালিকা আপনা-আপনি ধুলাকাদা হইতে পরিধেয় বস্ত্রাদি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। চার পাঁচ বৎসরের বালক-বালিকা স্নানের সময় অনায়াসে নিজের নিজের কাপড় সাবান দিয়া ধুইয়া দিতে পারে।

একজন গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ কর—বাড়ীর গৃহিণী কেমন, তাহা "এক নজরেই" বোঝা যায়। সুগৃহিণী যেখানে, সেখানে যখনই যাও, দেখিবে সমস্তই পরিপাটি। আলনার কাপড়গুলি গোছানো থাকিলে যে ঘরের কতখানি শোভা বৃদ্ধি হয়—বিশৃঙ্খলা কতখানি দূর হয়, তাহা সুগৃহিণী বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। বাড়ীর মধ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরটিই আমাদের শয়নগৃহ—অতিথি যে-কোন মহিলাই সেইখানে অভ্যর্থনা লাভ করেন। সেই ঘরে গিয়া দেখিবে, এক দিকে একখানা খাট, তার আধখানা মশারি ফেলা, আধখানা তোলা, দু-তিনটা বালিশ এলোমেলো ভাবে পড়িয়া আছে—একখানা চাদর জড় করা আছে, একটি ছেলে ঘুমাইতেছে। ও-ধারে জোড়া তক্তা পাতা, তার এক পাশে কতকগুলা লেপ কাঁথা বালিশ স্তূপাকৃতি, এ-পাশে কতকগুলা ছোট বালিশ কাঁথা, ছোট ছেলের জামা ছড়ানো, আর এক ধারে আলনার উপর কর্ত্তার কামিজ কোট, গৃহিণীর ডুরে শাড়ী হইতে ছেলেদের সব কাপড়,—রাশীকৃত ময়লা ফরসা বিবিধ প্রকারের বস্ত্রের বোঝা, আর দিকে আলমারির মাথায় রাজ্যের বাজে জিনিস—ঘরের মেঝেতে দুধের বাটি, ঝিনুক, শালপাতা, খাবারের গুঁড়া, জল কাদা—ইহার মধ্যে কোন মতে আগন্তুকের স্থান হইল। আর যাহাই হউক, ইহা যে অশোভন, তাহা

অস্বীকার করা যায় না। সুগৃহিণীর ঘরে দ্বারে এমন দৃশ্য কোন সময়েই কখনও দেখা যায় না। ঘর দ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, মলিনতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করা যে কেবল মাত্র সুগৃহিণীর গৃহিণীপনায় সাধিত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। “সকড়ির বিচার” ও “শুচির আচারের” সহিত পরিচ্ছন্নতা মিলিত হইলে আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহই সৌন্দর্য্যময় করিতে পারে। একজন দরিদ্র ফিরিঙ্গী মহিলার ঘর দ্বার যে আমাদের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ঘর দ্বারকে ধিক্কার দিতে পারে, ইহা গৌরবের বিষয় নহে। অশোভনতার দিকে দৃষ্টি পড়িলে অল্প আয়াসে ও স্বল্প ব্যয়ে ঘরে ঘরে পরিচ্ছন্নতা আনিতে পারা যায়। ইহাতে লক্ষ্মীর শ্রীও বৃদ্ধি হয়। (‘ভারতী,’ পৌষ ১৩১৭)

দোষ পরিহার

অনেক দিন থেকে আমার ইচ্ছা ছিল যে, শিল্পাশ্রমের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করি, কিন্তু সুযোগ অভাবে ঘটে উঠে নি। আজ আনন্দসভার সম্মিলনে শিল্পাশ্রমের মেয়েদের সঙ্গে দেখাশুনার সুবিধা পেয়ে তাই আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। ভরসা করি, এই রকম মধ্যে মধ্যে মেলামেশা হ'লে শিল্পাশ্রমের সকলের সঙ্গে আমার অধিকতর ঘনিষ্ঠতা জন্মাবে ও আমরা পরস্পরের সঙ্গসুখ লাভ ক'রে চরিতার্থ হব। আমাদের দেশে পাল-পার্ব্বণ ও বিবাহাদি উৎসব ব্যতীত মেয়েদের মেলামেশার কোন ব্যবস্থাই এত দিন ছিল না—আজকাল যে দু-একটি সভা-সমিতি গঠিত হয়ে সম্মিলনের পথ দেখা দিচ্ছে, এটা আমাদের মঙ্গলের বিষয় বলতে হবে। ক্রিয়াকর্ম্মে আমাদের যে সম্মিলন হয়, তাতে আমরা বাস্তবিক মিলনের অবসর বড় কম পাই; কারণ, সাজসজ্জা ক'রে যাওয়া ও খাওয়া ছাড়া কথাবার্ত্তা বড় কমই হয়। বিশেষতঃ বাড়ীর লোকদের বা তাঁহার আত্মীয় কুটুম্ব পরিচিতা মহিলাদের ত দেখাই পাওয়া যায় না; কারণ, তাঁরা নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, কাজেই একটা ঘরে কতকটা সময় অপরিচিত মেয়েদের সাজসজ্জার দিকে খানিক ক্ষণ হাঁ ক'রে তাকিয়ে থেকে, অতিরিক্ত ভোজন ও গাড়ী পালকির জন্য টানাটানি ক'রে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে আমরা বাড়ী ফিরে আসি।

অনেক জন একত্র-বাসের ফলে অনেক সময় মনান্তর কথান্তর ঘ'টে থাকে, সেটা অবশ্য উভয় পক্ষের কারও সুখকর নহে; তাতে মনটা অপ্রফুল্ল বই প্রফুল্ল হয় না, তাই আমরা যদি সকল সময়, আর সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করি, সেটা নিজের পক্ষেই ভাল। অল্প ক্ষণ মেলামেশার বিশেষ সুবিধা এই যে, এতে মনটা বেশ প্রফুল্ল ও প্রশস্ত হয়। অল্প ক্ষণের দেখাশুনায় আমরা পোষাকী কাপড়ের মত আমাদের যেগুলি ভাল (গুণ), তাই ব্যবহার করি—পরস্পরকে মিষ্ট বাক্য ও হাসির সুধা দানে তৃপ্ত করিতে চেষ্টা পাই, এতে সকলেরই মন প্রাণ প্রফুল্ল ও অন্ততঃ' কতকটা সময়ের জন্য সংসারের শোক তাপ দুঃখ দারিদ্র্য, কলহ বিবাদ প্রভৃতি অশান্তিকর ভাবগুলো দূর হয়ে শান্তি লাভ করতে পারি।

সংসারে এমন মানুষ কেহ নাই, যার সমস্তই গুণ বা সমস্তই দোষ। মানুষ দোষে গুণে মিশ্রিত হবেই হবে। তবে কি না শিক্ষা আর সংযমের দ্বারা দোষের পরিহার ও গুণের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায়। আমার মনে হয়, দোষগুলোর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার একটা উপায় এই রকম মেলামেশা করা। এতে বিনয় নম্রতা প্রভৃতি গুণগুলির ব্যবহার হয়—ক্রোধ ঈর্ষা প্রভৃতি কুৎসিত দোষগুলি চাপা প'ড়ে যায়। অব্যবহারে লোহাতে যেমন মর্‌চে ধরে, তেমনই অব্যবহাবে দোষগুলোও নির্জ্জীব হয়ে আসে।

কুটীরবাসিনী কর্ম্মক্লান্তা স্ত্রীলোকের যেমন দিনেব শেষে একটা অবসাদ আসে, অট্টালিকাবাসিনী ধনী মহিলাবও তেমনই নিদ্রালস দীর্ঘ দিনেব অবসানে মনটা অবসন্ন হইয়া পড়ে। তথন মনটা তাজা করিবার জন্য ছটফটানি ধরে। চুল বাঁধিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, পান চিবাইয়া বিকাল কাটানো বিষম মুশকিলের বিষয়। অতএব কি ধনী, কি দরিদ্র মহিলা, সকলেরই এই বৈকালিক অবসরে যদি একটু মেলামেশা, একটু গীতবাদ্য শোনার, একটু সদালাপের সুবিধা থাকে, তবে সকলেরই মেজাজ অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হয় ও তাহার ফলে আত্মীয় প্রতিবাসী জনে সকলেই একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

ক্রোধ প্রভৃতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার আর একটা উপায় এই যে, যখন আমবা অন্যের দোষেব আলোচনা করি বা তার প্রতি বিরক্ত হয়ে ঝঙ্কার ক'রে উঠি, তখন যদি ভেবে দেখি যে, এই অবস্থায় আমি যদি পড়তুম ত কি করতুম, তাতে অনেক সময় নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জিত হয়ে সাবধান হওয়া যায়। এইখানে আমার একটা নিজের কথা বলি। আমাদের একটি ভৃত্য ছিল; তাব নাম রামলাল। তার অশেষ গুণ ও অসীম দোষ ছিল। যখন রবিবাবুর "পুরাতন ভৃত্য" নামক কবিতাটি বাহির হ'ল, আমাদের ছেলেরা বলতো যে, ঠিক আমাদের রামলাল। আমি অত্যন্ত জ্বালাতন হয়ে তাকে তিরস্কার করছি, তখন হয়ত সে তাব ঘরে বেশ নিবিষ্টচিত্তে তামাক খাচ্ছে, নয়ত কোমরে হাত দিয়ে মুখে ডিগ্‌ ডিগ্‌ ডিগ্‌ ডিগ্‌ বলতে বলতে নেচে নিচ্ছে (এ সংবাদ আমি ছেলেদের কাছ থেকে পেতুম)। একদিন আমি স্বপ্ন দেখলুম যে, রামলাল কি একটা দোষ করেছে, অসহ্য

হওয়ায় আমি তাকে মেরেছি। স্বপ্নেই তার ম্লান বিষণ্ণ মুখ পানে চেয়ে আমার এমন কষ্ট হ'তে লাগল যে প্রাণ যায়! অত্যন্ত কষ্টে আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়ে দেখি যে, ঘামে আমার সমস্ত বিছানা ভিজে গেছে —ঘুম ভেঙ্গে আমার বোধ হ'ল যে, একটা স্বপ্ন মাত্র, সত্যি আমি রাগের ভরে এই জঘন্য কাজ করি নাই। সেই থেকে রাগ হ'লে আমি সামলে নিতুম। এখনও সে স্বপ্ন আমার বেশ মনে আছে। তাই বলি, রাগ হ'লে সব চেয়ে সুবিধা—সেই সময়টা চুপ ক'রে যাওয়া। অবিশ্যি যত সহজে ও ঠাণ্ডা মেজাজে আমি এই কথাটা বলছি, কাজটা তত সহজ নয়—কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ কি! আর একটা কথা এই যে, অলস জীবন বড়ই ক্লেশের। শুয়ে ব'সে গল্প ক'রে দিন কাটানো শুনতে বেশ, আর আপাতমনোরম বটে, কিন্তু তাতে প্রথমেই স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়; আর তা থেকে শরীর-মনের উপর যত কিছু অশান্তিজনক ভাবগুলো আধিপত্য বিস্তার করবার অবসর পায়।

কাজের মধ্যে শৃঙ্খলা থাকলে কাজ ক'রেও সুখ আছে, আর তার অবসর সময়টুকু ভাল ক'রে উপভোগ করা যায়। নারী-জীবনের প্রধান কর্ম্ম হচ্ছে সেবা করা। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই আমরা তার পরিচর্য্যা করতে আরম্ভ করি। তা যদি না করতুম, তবে সৃষ্টি এত দিনে লোপ পেয়ে যেত। পিতা, পতি, পুত্র প্রভৃতি আত্মীয় জনের সুখস্বচ্ছন্দতা আগে দেখি, তবে অন্য কাজে হাত দিই—এটা আমাদের স্বাভাবিক, এটা আমাদের সুখের কাজ, এর জন্য চেষ্টা মাত্র করতে হয় না। কিন্তু ভগবানের বিধানে যখন আমাদের মধ্যে অনেককে এই সুখের পরিচর্য্যা হ'তে বঞ্চিত হ'তে হয়, তখন শান্ত হইয়া কাজ করাই কঠিন; তখন চেষ্টা করিয়া কাজ করিতে হয়। তখন শোকে অধীর না হইয়া যদি বিশ্বের সকলকে পর না ভাবিয়া, আপন করিয়া লইতে পারা যায়, তবেই শোক তাপ সহ্য করিবার মত শক্তি পাওয়া যায়। নিজকে অভাগিনী বলিয়া জ্ঞান না করিয়া বরং ভগবানের প্রিয়পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলে অনেকখানি সান্ত্বনা পাওয়া যায়। যিনি জগতের স্বামী, যাঁহার ইচ্ছায় জীবন মরণ চালিত হইতেছে, তিনি যে নারীকে পতিপুত্রাদি হইতে পৃথক্ করিয়া, সীমাবদ্ধ সংসারের কাজ হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বসংসারে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি অধিক কাজ করাইতে ইচ্ছা করেন, ইহাই

বুঝিতে হইবে। তিনি করুণাময় হইয়াও মাঝে মাঝে কেন এমন নির্ম্মম ব্যবস্থা করেন, ইহা আমরা কি বুঝিতে পারি? বুঝিতে পারিও না, বুঝিতে চেষ্টাও করি না। ভগবানের পরিত্যক্তা মনে করিয়া কেবল নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া থাকি। যে ঈশ্বর ক্ষুদ্রতম কীটাণুকীটকেও ভুলিয়া থাকেন না, তিনি কি শোকতাপক্লিষ্টা নারীকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন— কখনই না। অবশ্যই তাঁহার কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে, এই মনে করিয়া শোকতাপকে দূরীভূত করিতে হইবে—নিজকে সর্ব্বশক্তিমানের অংশ জ্ঞান করিয়া সংসারের কল্যাণ সাধন করিতে হইবে। মানুষ বুদ্ধিশক্তির প্রভাবে বনের হিংস্র পশুগুলাকে বশে আনিয়া উঠ্ ব'স্ করাইতেছে। আমরাও ত মানুষ—আমরা ইচ্ছা করিলে যে নিজের দোষগুলাকে বর্জ্জন করিতে পারিব, ইহাতে আর বিচিত্র কি! জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা নিজেকে কর্ম্মকুশলা, সেবাপরায়ণা, মিষ্টভাষিণী, সত্যবাদিনী আদর্শ নারী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিলে জীবন সার্থক হইবে। ইহ জীবনের এই কয়েকটা দিন কয়েক মুহূর্ত্তের মত শীঘ্রই অবসান হইয়া যাইবে। নিজেকে আদর্শস্বরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য সকল চেষ্টার সহিত ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা শক্তি প্রার্থনা করিতে হইবে—ইহাই ভাল হইবার সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম উপায়। ('মানসী,' কার্ত্তিক ১৩১৯)

জীবজন্তুর প্রতি অনুরাগ

পশুপক্ষীর প্রতি বাবা মহাশয়ের আন্তরিক বিশেষ অনুরাগ আছে। তাহাদের প্রতি তিনি অতিশয় যত্ন ও স্নেহ প্রকাশ করেন। শুধু গৃহপালিত পক্ষী বা পশুগুলি নহে, বন্য পশুও তাঁহার পোষ মানে। জীবজন্তুর প্রতি তাঁহার এই স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ আমাদের বাড়ীতে অনেক রকম জন্তু পোষা ছিল। খুব ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে,—আমাদের অনেক পায়রা ছিল, একটি ছাগল ও তাহার দুটি ছানা, একটি গরু, একটি পনি ঘোড়া, এক জোড়া হাঁস, দুইটি কুকুর, একটি টিয়া পাখী, একটি বাঁদর, দুটো খরগোস; আরও কত কি—সব মনে পড়ে না। লোকে বলিত, তোমাদের বাড়ী চিড়িয়াখানা আছে। ইহা ব্যতীত ছোট মনিয়া ও চমুনা এবং বটের আমরা মধ্যে মধ্যে আনিতাম—পুষিতাম। আবার তাহার দু-একটা উড়িয়া যাইত—কাঁদিতাম, মরিয়া যাইত—বাবা মশায়ের কাছে বকুনি খাইতাম। তবু আনিবার লোভ সামলাইতে পারিতাম না। সেখানে এক পয়সায় একটা করিয়া কত ভাল ভাল ছোট পাখী পাওয়া যাইত—তা বল দেখি, সে সব সুন্দর পাখী কি না-কিনে থাকা যায়? জলখাবারের দু-পয়সার এক পয়সা খাইয়া এক পয়সার পাখী কেনা যাইত। আর মায়ের কাছে না চাহিতেও পয়সা পাওয়া যাইত। কারণ, পাছে আমরা না খাইয়া পাখী কিনিতে পয়সা খরচ করি, সেটা বড় তাঁহার ভয় ছিল। "বাপ রে, আহা, খাবার খাস্ নাই, আহা, কত ক্ষিদে পেয়েছে!" ইহা ব্যতীত খাবারের পয়সায় পাখী কিনিয়াছি বলিয়া মায়ের কাছে যে ধমক খাইয়াছি, তাহা ত কই মনে পড়ে না। কিন্তু পাখীগুলি প্রায় অধিক দিন বাঁচিত না, তাহাদের মরণে বাবা বোধ হয় মনে বড়ই আঘাত পাইতেন। এজন্য আমাদের বকিতেন। কিন্তু আমরা তবুও না-শুনিয়া দুই-তিন বার আবার পাখী আনায় একদিন তিনি এক খাঁচা পাখী উড়াইয়া দিলেন ও বলিলেন যে, ইহাকে পাখী পোষা বলে না, ইহাকে নিষ্ঠুরতা বলে। তোমরা যত পাখী আনিবে, আমি তত উড়াইয়া দিব। দেখি, তোমরা কত দিনে নিরস্ত হও। সেই পর্য্যন্ত সে দেশে অনেক লোভনীয় সুন্দর সুন্দর পাখী দেখিয়াও আর আনিতাম না।

পায়রাগুলি এমনই বাবা মশায়কে চিনিত যে, রুটির জন্য তাঁহাকে আপিসের কাপড় ছাড়িতে দিত না। পথের ঘরে পায়রা থাকিত। যেমন বাবা বাড়ী প্রবেশ করিতেন, অমনই উঁচু বাঁশের উপর হইতে, ডিমের উপর হইতে, ছানার নিকট হইতে সবগুলি ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া আসিয়া পড়িত। কেহ কাঁধে বসিত, কেহ বক্‌ বকম্‌ করিয়া নাচিতে নাচিতে সম্মুখে পথ আগলাইত। তিনি বলিতেন, "আ রে সর্‌, কাপড় ছাড়ি।" পরে কাপড় ছাড়িয়া রুটিগুলি লইয়া একখানি কাঁচি দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া ছড়াইয়া দিতেন। কেমন কুপ কুপ করিয়া তাহারা সেই রুটি খেত; কেমন রুটির জন্য বাবার কাছে আসিত, আর তিনি হাত পাতিয়া দিতেন, তাহারা নির্ভয়ে হাত হইতে কাড়াকাড়ি করিয়া খাইত। বাবা যখন ভাত খেতেন, তখন এক ঝাঁক পায়রা তাঁহাকে ঘিরে তাঁহার সহিত ভাত খাইত। কতকগুলিকে ভাত ছড়াইয়া দিতেন, আবার যাদের সাহস বেশী, তারা সেই থালায় খাইত। "বুড়ো সেরাজুর" স্পর্দ্ধা বড় বেশী ছিল। তিনি আবার মাটিতে ব'সে থালার ভাত খেতেন না—বক্‌ বকম্‌ করিতে করিতে থালার উপর উঠিয়া ভাত খাইতেন। বাবা বলিতেন, "আ রে, আমাকে খেতে দেয় না দেখ।" তাহাকে হাত দিয়া ধরিয়া সরাইয়া দিতেন, সে আবার আসিত। সে সব পায়রাকে বক্‌ বকম্‌ করিয়া তাড়াইয়া নিজে সমস্ত আদরটা যেন পেতে চাহিত; তাহার স্বজাতিকে নিজের নির্ভয়তা দেখাইয়া বক্‌ বক্‌ বকম্‌ করিত। পায়রা আমাদের অনেক দিন ছিল; কিন্তু মাঝে মাঝে বেরালে লইয়া যাইত বলিয়া বাবা বড় কষ্ট পাইতেন। যেটাকে বেরালে লইয়া যাইত, তাহার জোড়াটির বিষণ্ণ করুণ স্বর এমন মনে লাগিত যে, আমরা অত ছোট, তবুও আমাদের কষ্ট হইত। শেষে বাবা পায়রাগুলিকে বিদায় করিয়া দিলেন ও বলিলেন যে, এ কেবল কষ্ট পাওয়া মাত্র। দুটো শালিক আমাদের ছাদে বাসা করিয়াছে। বাবা তাহাদের দুধের সর, দুধ-ভাত, দুধ-রুটি খাওয়াইয়া এমনই বশ করিয়াছেন যে, হাত হইতে খাইয়া যায়। তিনি যদি কোন দিন বেলা পর্য্যন্ত ঘুমান, তবে একেবারে বিছানায় বসে ও কট কট শব্দ করিয়া কেমন খাবার চায়। তাঁহাকে অনেক সময় খাবার জন্য ঘুমাইতে দেয় না। একটি বন্ধু একটি মস্ত খাঁচা শুদ্ধ অনেকগুলি নানা রকমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী আমাদের উপহার দিয়াছিলেন। বাবা মহাশয় প্রতি দিন সকালে ভাত খাওয়ার

পর তাহাদের নিজে দুধ-ভাত দিতেন। এইরূপ দিতে দিতে দু-একটি পাখী এমন পোষ মানিয়াছিল যে, খাঁচার দরজা খুলিলেই হাতে আসিয়া বসিত, উড়িয়া পলাইত না। দুধের সর খাইয়া খাঁচায় যাইত। মায়ের একটি টিয়া পাখী ছিল। সে মাকে মা বলিয়া ডাকিত। বিড়ালের ভয়ে তাহাকে খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখা হইত; নইলে মাঝে মাঝে ছাড়া পাইলেও সে কোথাও যাইত না। প্রতি দিন বাবার ভাতের কাছে তাহার খাঁচা আনিয়া দরজা খুলিয়া দেওয়া হইত। সে বাহিরে আসিয়া বাবার সঙ্গে দু-বেলা ভাত খাইত। ভাত খাইয়া মায়ের কাছে যাইত। মা হাতে করিয়া তুলিয়া তাহার মুখ ধোয়াইয়া দিতেন, তাহাকে চুমি খাইতেন। সেও মায়ের মুখে মুখ দিয়া মা মা করিত; আবার বিড়-বিড় করিয়া যেন কি বলিত। শীতকালে রাত দশটা পর্য্যন্ত লেপের ভিতর মায়ের বুকের উপর পড়িয়া ঘুমাইত। তাহার ইচ্ছা হইত না যে, অমন আরামের জায়গা হইতে খাঁচায় যায়; কিন্তু মা তাহাকে বিছানায় রাখিতে সাহস করিতেন না। ক্ষুদ্র প্রাণী, এতটুকু প্রাণ, যদি লেপ চাপা পড়িয়া মারা যায়! সব জন্তুর চেয়ে বাবা কুকুর অধিক ভালবাসিতেন, তাহারাও বাবাকে কি যে ভালবাসিত! ক্রমান্বয়ে আমাদের অনেক কুকুর পোষা হইয়াছিল। এক সময়ে দুইটির মধ্যে একটি বিশেষ প্রিয় ছিল। সে তাঁহার বিছানায় শুইত। সদা-সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে ফিরিত। আপিস থেকে আসিবার সময়টা হইলেই পথ পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিত—হয় জানালায় মুখ বাড়াইয়া, না হয় সিঁড়িতে। ৪টা বাজিলেই কুরিকে দেখা যাইত। আমরা বলিতাম, কুরি ত ঘড়ি দেখিতে জানে না, কেমন করিয়া বুঝিল যে, ৪টা বাজিয়াছে! কুরি জানিত যে, আপিসে তাহার যাওয়া উচিত নয়। বাবার আপিসে যাওয়ার সময় মুখটি বিষণ্ণ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু অন্য সময় যেমন জামাটি বাবার হাতে দেখিত, অমনই এক দৌড়ে গেটের কাছে গিয়া হাজির হইত। অনেক সময় বাবা এমন জায়গায় যাইতেন, যেখানে কুরির যাওয়া উচিত নয়। যেমন কোন সভা-সমিতিতে কিম্বা বিবাহের নিমন্ত্রণে। সে দিন প্রথম হইতে বাবা আমাদের বলিতেন, কুরিকে ধ'রে রাখিস। তিনি জামা হাতে করিবার পূর্ব্বে কুরিকে

ধরিতাম, পরে তিনি জামা হাতে লইয়া বলিতেন, "কুরি, তুমি যাবে না, খবরদার।" কুরি অমনই বিষণ্ণ হইয়া পড়িত। আর সুড়সুড় করিয়া খাটের নীচে গিয়া শুইত। তার পর তিনি চলিয়া গেলে বাহির হইয়া সে সিঁড়িতে গিয়া পড়িত, যত ক্ষণ না ফিরিতেন, তত ক্ষণ উঠিত না বা কিছুই খাইত না। একবার বাবা তিন চার দিনের জন্য কোথায় গিয়াছিলেন। এই তিন চার দিন কুরি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। মা কুকুর ভালবাসিতেন না, কখনও ছুঁইতেন না; কিন্তু এই সময় জীবহত্যা হয় দেখিয়া খাওয়াইবার জন্য কুরিকে ধরিয়া যাদু বাছা করিয়া তাঁহাকে কুরির সাধ্য-সাধনা করিতে হইয়াছিল। অনেক সাধ্য-সাধনায় কুরি সামান্য খাইয়াছিল। কুরির অনেক গুণ ছিল, কিন্তু দু-একটি দোষও যে না-ছিল তা নয়। কদাচিৎ দুষ্ট সরস্বতী ঘাড়ে চাপিত, না কি হইত—কুরি চুরি করিয়া খাইত: কিন্তু খাইয়াই বুঝিত যে, অন্যায় কাজ করিয়াছে, আর কেহ জানিতে পারিবার পূর্ব্বে খুব লুকাইয়া থাকিত। মা বলিতেন, আজ কুরি কোথা গেল রে? তবে নিশ্চয় কি অকর্ম্ম করিয়াছে। শুধু চুরি করিয়া খাওয়া নয়, কখনও কখনও ঘর ময়লা করিয়া ফেলিত, ফেলিয়া লুকাইত। তখন সন্ধান করিয়া জানা যাইত যে, যথার্থ কুরি কিছু অন্যায় করিয়া লুকাইয়া আছে। আমরা ধরিয়া আনিয়া শাস্তি দিতাম —কিন্তু তাহা সে বড় গ্রাহ্য করিত না, গোঁ গোঁ করিত। কিন্তু সে দিন আর সে আপিস-ফেরত প্রভুকে ভাল রকম অভ্যর্থনা করিত না। দেখিয়াই বাবা বুঝিতেন যে, কুরি আজ কি অন্যায় করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন, যথার্থ। তখন কুরিকে ডাকিতেন, "কুরি, এদিকে আয়; কেন চুরি ক'রে খেয়েছিস, খেতে কি পাও না? বাঁদর কোথাকার।" তার পর কান মলিয়া দিতেন। কুরি আমাদের কাছে গোঁ গোঁ করিত, কিন্তু বাবা মহাশয়ের কাছে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত। কেমন মুখের ভাবে বোঝা যাইত যে, সে যেন বলিতেছে— আর করিব না। বাবা বলিতেন—যা, আর করিস না যেন। তখন সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত, কিন্তু সে দিন আর তার তেমন স্ফূর্ত্তি দেখা যাইত না; বড় মন-খারাপ হইয়া থাকিত। কুরির অনেক গল্প আছে। আজ সে সব কথা থাক্। আমরা বড় হইয়া যে একটি কুকুর

পুষিয়াছিলাম, তার দুষ্টুমির কথা শোন। তার নাম ছিল "টাইগার"। তার শরীরটিও ছিল বাঘের মত। বাঘের মত হাঁ দেখিয়াই সকলে ভয় পাইত; কিন্তু স্বভাবটি ছিল নিরীহ। অচেনা অভদ্র রকম মানুষ দেখিলে তেড়ে যেত, কিন্তু কামড়াত না। তার তাড়া খাইলেই মানুষ ভয়ে মূর্চ্ছা যাইত, কামড় খাবার বড় আবশ্যকতা ছিল না। চুরি ক'রে খাওয়া দোষটি বিলক্ষণ ছিল। বিশেষ তাকে মাছ খেতে দেওয়া হইত না, এ জন্য মাছের প্রতি বিশেষ লোভ ছিল। এদিকে যখন তাহার নিজের খাবার দেওয়া যাইত, তখন গ্রাহ্যই কবা হইত না। এমনই করিয়া দূরে ফিরিত, যেন কতই নির্লোভ; খাওয়ার জন্য কত সাধ্য-সাধনা করিতে হইত। আমরা হাতে করিয়া খাওয়াইলে তবে ভোজনপাত্রটি নিঃশেষ হইত, আর আহারটি তৃপ্তি রকম হইত। টাইগার যে দোষ করিয়াছে, তাহা তাহার মুখের ভাবে আমরা বুঝিতে পারিতাম। আমরা অমনই "কি করেছিস বল্, আর করবি বল্" বলিয়া কান মলিতাম। টাইগার অমনই কেঁউ কেঁউ করিয়া খুব চেঁচাইত। আমরা জানিতাম যে, ওটা দুষ্টুমি; কারণ, এক এক সময় কান ধরিতে না ধরিতে এমন চেঁচাত যে, হাসি পাইত। অনেক সময় আমরা কি না তাহাকে শাস্তি দিয়া তখনই আবার আদর করিতাম, তাই আদর পাবার জন্য, যত লাগুক না-লাগুক, লাগার ভান অতিরিক্ত করিত। আমাদের খেলার সাথী, দুঃখের দুঃখী, পরম হিতৈষী কুকুরগুলি ইহ লোকে আর নাই, কেবল তাহাদের স্মৃতি মাত্র আছে।

আমরা বিড়াল বড় ভালবাসিতাম না। বিড়াল পায়রা খাইয়া ফেলিত বলিয়া মারিয়া তাড়াইতাম। যখন আমাদের আর পায়রা নাই, এমন সময় এক দিন শীতকালে আমি খাবার কিনিতে দিব বলিয়া এক জন চাকরকে ডাকিতে লাগিলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়, দিব্য উত্তরে বাতাস দিতেছে—চাকরেরা সে সময় কাজ-কর্ম্মটি শেষ করিয়া ঘরে আগুন করিয়া ঘিরিয়া তামাক খাইতেছে—আমার ডাক শুনিতে পাইল না। কি করি, ক্ষিদেতে পেট জ্বলিতেছে, ভারি রাগ ধরিয়া উঠিল। হাত পা ছুঁড়িবার উদ্যোগ দেখিয়া মা বলিলেন, "লক্ষ্মী, বাপ আমার—যাও, আস্তাবলের ছাতের উপর থেকে কাহাকে ডেকে পয়সা দিয়ে এস।" মাতৃআজ্ঞায় যত না হোক, ক্ষিদের আজ্ঞায় মুখ ভার করিয়া, "বাঁদর-মুখোরা," "কালা

কোথাকারে” প্রভৃতি মিষ্ট কথাগুলি ব্যবহার করিতে করিতে আস্তাবলের ছাতের কপাটটি খুলিলাম। খুলিবা মাত্র একটা “ফ্যাঁস” করিয়া শব্দ হইল। আমি চমকিয়া উঠিলাম—দেখি যে, কপাটের কোণে একটা কালো ভূতের মত বেরাল-বাচ্ছা দাঁত খিচাইয়া ফ্যাঁস ফ্যাঁস করিতেছে, আর তার চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করিতেছে। আমারও বাবার মতন কুকুর বিড়ালের প্রতি একটু আধটু অনুরাগ আছে। এ জন্য বিড়াল-বাচ্ছাকে ধরিতে গেলাম। সেটা এমন এক থাবা মারিল যে, হাত দিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল। এদিকে ক্ষিদের জ্বালা, ওদিকে হাতের জ্বালা—আমার অবস্থাটা বোঝ একবার। তখন আমি আর বেরাল ভায়াকে কিছু না বলিয়া বিশেষ সুন্দর সুন্দর নামে চাকরকে ডাকিলাম—সে সব আর তোমাদের শুনে কাজ নাই—আমার সবগুলি মনে নাই ব'লেও বটে, আর কিছু লজ্জাবোধ হইতেছে, সে জন্যও বটে, তাহা আর পত্রস্থ করিলাম না। যা হোক, চাকরকে পয়সা দিয়ে আবার বেরালটার দিকে মনোযোগ দিলাম। দেখিলাম, সেটা তখনও তেমনই কোণঠাসা হইয়া, তেমনই জ্বলজ্বলে আগুনের মতন চোক দুটো আমার দিকে তুলিয়া, তেমনই দাঁত দেখাইয়া গর্জ্জন করিতেছে। যদিও গর্জ্জন করিতেছে বটে, কিন্তু দারুণ শীতল উত্তরে বাতাসে থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। তখন আমি তাহাকে একটা কাঠির একটু খোঁচা দিলাম, দিতেই এক লাফে পাঁচিলে উঠিয়া বসিল। দেখিলাম, তাহার পেটটি পড়িয়া আছে। বোধ হইল, সে দিন কিছু খেতে পায় নাই। দেখিয়া বড় কষ্ট হইল—আহা, আমার মত উহারও পেট জ্বলিতেছে। উহাকে কিছু দেওয়া উচিত, কিন্তু কি খেতে দিব—দুধ ত ঘরে নাই; এখনও এ-বেলার দুধ আসিয়া পৌঁছায় নাই—কি করি! মনে পড়িল যে, আমাদের দুধের সর আমাদেরই গায়ে মাখাইবার জন্য মা সঞ্চয় করিয়া রাখেন—দেখি ত—আছে বোধ হয়। সকল দিন যে থাকে, তা নয়; কিন্তু ঈশ্বর সে দিন ক্ষুদ্র বেরালের জন্য তাহাই মাপাইয়াছিলেন। আমি সঞ্চয়ের স্থান অন্বেষণ করিতেই অনেকটা সর পাইলাম। মা বলিলেন, “সর নিয়ে কোথা যাস্; তোর খাবার এসেছে, খাবি আয়।” আমি আসছি বলিয়া এক দৌড়ে সেই ছাতে। ভয় হইতে লাগিল, যদি সে চলিয়া গিয়া থাকে। কিন্তু দেখি, তখনও সে তেমনই থর-থর কাঁপিতেছে। আমাকে দেখিয়া আবার গর্জ্জন আরম্ভ করিল। আমি

সরের পাত্রটি মুখে ধরিতেই অতি আগ্রহের সহিত সমস্তটা শেষ করিল। তার পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, আর গর্জ্জন করিল না। তখন আমি আবার তাহার গায়ে হাত দিলাম, এবারে আর থাবা মারিল না। বেরালের আনন্দসূচক ঘড়-ঘড় শব্দ করিতে লাগিল। তাহাকে তৃপ্ত দেখিয়া আমি নিজে তৃপ্ত হইতে চলিলাম। পরদিন বেলা ৪টায় দুধটি খাইয়া আমার পাউডার-পফের মত ঝুপ্‌সি ঝুপ্‌সি লোমযুক্ত ক্ষুদ্র গেনি নামক কুকুরটি লইয়া রান্নাঘরের সম্মুখের ছাতে খেলা করিতেছি, এমন সময় কোথা হইতে ঝুপ করিয়া সেই কালো বিড়ালটি আসিয়া আমার পায়ে মাথা ঘষিতে লাগিল—আর কত রকম করিয়া যে তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহার বর্ণনা করিতে পারিতেছি না—কিন্তু যেন তাহা কালকার ঘটনা, এমনই জ্বলন্ত ভাবে হৃদয়ে অনুভব করিতেছি। গেনিকে সে এক থাবা মারিয়া আমার কাছ থেকে তাড়াবার জোগাড় করিল। কিন্তু গেনি তাতে বিরক্ত না হইয়া বেশ খেলা জুড়িয়া দিল, যেন সে উপহাস ভাবিল। "কে বাপু তুমি কেলে ভূত, হঠাৎ আসিয়া আমার স্থান অধিকার করিতে চাও; কিন্তু যাই কর, তা পাচ্ছ না; তবে একটু থাক, তুমি আমার সমবয়সী, একটু খেলা করিয়া নিই না।" সেই দিন থেকে প্রতি দিন আমি ৪টায় দুধের কিয়দংশ কালো বেরালের জন্য রাখিতাম, ঠিক সময়ে সে আসিত—দুধ খাইত, গেনির সহিত খেলা করিত—আবার ধীরে ধীরে চলিয়া যাইত।

আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ বাবার ধাত পাইয়াছে। রাস্তায় কুকুর-ছানা, বেরাল-ছানা পাইলেই কুড়াইয়া আনিয়া হাজির করে। যখন সে তিন বৎসরের শিশু, একদিন রাস্তা থেকে একটা বেরাল-বাচ্ছা—আধমরা, ধুলাকাদা-মাখা—কুড়াইয়া আনিল। তাহার চাকর বলিল, "মা! দেখুন, আমি এত বারণ করিলাম, আমার কথা মানে না। মরা বেরাল-বাচ্ছা বাবু রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছেন।" বাবু বলিল, "হ্যাঁ, আমি না ওকে দুধ খাওয়াইয়া বাঁচাব—ও আমার পোষা হবে।" চাকর বলিল যে, ও বাঁচিবে না। বাবু বলিল, "তোমার কথায় বুঝি বাঁচিবে না, দুধ পেলেই বাঁচিবে।" যথার্থ তাহার বাঁচবার আকার কিছু মাত্র ছিল না। যা হোক, তাহার মুখে টোসা টোসা করিয়া দুধ দিতে দিতে চুক্ চুক্ করিয়া খাইল। দুই তিন দিন ঐ রকম করিয়া খাইয়া ও বিছানা পাতিয়া শুইয়া থাকিয়া

তাহার জীবনীশক্তি ফিরিয়া আসিল। তখন চামচ করিয়া দুধ খাওয়ানো হইত। ক্রমে সেই অতি ক্ষুদ্র আধমরা বিড়াল-বাচ্ছা কেঁদো হইয়া উঠিয়া একেবারে ঠিক "বাঘের মেসো" হইয়া উঠিল। ভাণ্ডার-ঘরে একটি বাটি সদা সর্ব্বদাই পাতা থাকিত; যে যখন দুধ খাইত, অবশিষ্টটুকু পুষির বাটিতে রাখিত, ক্ষিদে পাইলেই পুষি গিয়া খাইত। পুষির এমন বুদ্ধি ছিল যে, সেখানে আর দশ বাটি দুধ থাকিলেও পুষি মুখ দিত না। নিজের শূন্য বাটির কাছে বসিয়া মিউ মিউ করিত। মায়ের পায়ে মাথা ঘষিয়া দুধ চাহিত। একটু কাঁচা মাংসের প্রতি পুষির বড় লোভ ছিল। যেখানে যে সময়ে মাংস চড়ানো হইত, ঠিক সেই সময়ে সেইখানে পুষি হাজির হবেই হবে। একটু মাংস পাইলেই ভক্ষণ হইত, তার পর মুখটি মুছিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইত। জানিত যে, হাজার মিউ মিউ করিলেও আর দেবে না। পুষির যে সময় দুধ খাবার সময়, সে সময় মাছ দিলে খাইত না। নানা রকম মিউ মিউ শব্দ করিয়া জানাইত যে, এখন আমি মাছ খাব না, দুধ খাব। আবার যখন মাছের সময়, তখন কার সাধ্য পুষিকে দুধ খাওয়ায়! আমরা তাহাকে ধরিয়া এক এক দিন কোঁচা করিয়া ধুতি পরাইয়া, মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া দিয়া, গলায় ফুলের মালা পরাইয়া তাহাকে "বাবু" অথবা "বর" সাজাইতাম—ইহাতে পুষি বড় বিরক্ত হইত—করুণ স্বরে মিউ মিউ করিয়া অনেক মিনতি করিত—তবুও না ছাড়া পাইলে দু-একটা কামড় দিতে চেষ্টা করিত—আর ছাড়া পাইলে দে ছুট্। কিন্তু যা বল, যা কও, ধুতি পরিয়া পাগড়ি বাঁধিয়া পুষি যখন বাবু হইত, তখন কেমন মজার দেখাইত। দুই হাত ধরিয়া কেমন দুই পায়ে হাঁটাইতাম—পাড়ার ছেলেরা তাই দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইত।

আমরা যে-ঘরে শুইতাম, তাহার পাশে একটা বড় মাঠের মত খানিকটা জায়গা ছিল, তাহাতে কতগুলি হাড়ী খোলার ঘরে বাস করিত। আমরা তাহাকে হাড়ীপাড়া বলিতাম। একদিন অনেক রাত্রে কুকুর-বাচ্ছার কেঁউ কেঁউ শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া জানালা দিয়া দেখিলাম—অন্ধকার রাত্রি, কিছুই দেখা গেল না। কেবল বাচ্ছা কুকুরের কাতর কেঁউ কেঁউ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল যে, এখনই উহাকে তুলিয়া আনি; কিন্তু তত রাত্রে কে যাবে! যা হোক, কোন রকমে রাত শেষ হইল, কিন্তু আর শব্দ শোনা গেল না। প্রভাত হইতে দেখিলাম

যে, একটা কালো কুকুর-বাচ্ছা শূকরের ময়লা কাদায় পড়িয়া আছে। চাকরদের আনিতে বলিলাম, তাহারা বলিল, আমরা ছুঁইব না। তখন হাড়ীর একটি ছোট মেয়েকে একটা পয়সা দিয়া আনাইলাম। পরে তাহাকে ধোয়াইয়া মোছাইয়া দুধ দিতে গেলাম, কিন্তু সে দুধ খাইল না—নড়িল না—কেবল প্রাণটুকু ধুক-ধুক করিতেছে। তখন আমি একটি কেরাসিনের বাক্সে কতকটা খড় বিছাইয়া শোয়াইয়া রাখিলাম। মনে করিলাম, যখন খেলে না, তখন নিশ্চয় বাঁচিবে না—সারা রাত কষ্ট পেয়েছে, এখন শান্তিতে মরুক। মরিলে ফেলিয়া দিব। দিনের মধ্যে দশ বার তাহাকে দেখিলাম—না, সে মরিল না, দুধ খাইল। পরদিন প্রাতে গিয়া দেখি, কালো বাচ্ছা মরা দূরে থাক্, তিড়িং তিড়িং করিয়া লাফ দিয়া বাক্স হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে। তখন দুধ দিলাম—কেমন খেলে। তার পর দিব্য একটি মস্ত দিশী "নেড়ী কুত্তো" হইয়া উঠিল। সে আমাকে এমন চিনিত যে, আমার স্বর শুনিলেই পায়ে আসিয়া লুটিয়া পড়িত। ('ধ্রুব,' শ্রাবণ, ভাদ্র ১৩২০)

নারীশিক্ষা ও মহিলা-শিল্পাশ্রম

সে আজ কত দিনের কথা—একদিন সন্ধ্যার সময় আমরা তিন জনে তেতলার ঘরের খাটের উপর কেহ বসিয়া, কেহ শুইয়া গল্প করিতেছিলাম। শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বলিলেন যে, "দেখ, আমার মনে হয়, আমরা চেষ্টা করিলে দেশের ও জনসাধারণের অনেক কাজ করিতে ও করাইতে পারি। মনে কর, তোমার স্বামী ডাক্তার,—কোন দরিদ্র বিনা-চিকিৎসায় কষ্ট পাইতেছে, তুমি স্বামীকে বলিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলে। কাহারও স্বামী ব্যারিষ্টার—স্বামীকে বলিয়া সুবিচারের প্রার্থী কোন দরিদ্রের তিনি কাজটি উদ্ধার করিয়া দিলেন।" সকল কথা মনে নাই, কিন্তু বেশ মনে পড়ে, সে দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে আমরা এই কথাবার্ত্তায় এমন নিমগ্ন ছিলাম যে, কখন সে ঘর চাঁদের আলোতে ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহা জানিতেও পারি নাই। সে দিনের আর সব কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কেবল সেই চাঁদের আলো মনে আছে, আর মনে আছে—তাহার অল্প দিন পরেই শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কর্ত্তৃক সখি-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমাদের কথোপকথন স্থলে সে দিন স্বর্ণকুমারী দেবী উপস্থিত ছিলেন না,—অথচ এই একই সময়ে এই স্ত্রীশক্তির ভাবটি তাঁহার মনে স্বতঃ জাগরিত হইয়া উঠে—এবং আমাদের কল্পনা-জল্পনা তাঁহার যত্নে কার্য্যে পরিণতি লাভ করে। সখি-সমিতি স্থাপিত হয়—১২৯৩ সালের বৈশাখে ;—ইহার উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েতে মেয়েতে আলাপ-পরিচয়, দেখাশুনা, মেলামেশা, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও উন্নতির চেষ্টা—বিধবা রমণীকে সাহায্য করা, অনাথাকে আশ্রয়দান ইত্যাদি।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী অনেক দিন পর্য্যন্ত এই কার্য্যে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। সে সময় শ্রীমতী হিরণ্ময়ী কয়েকটি অনাথা বালিকাকে নিজ গৃহে স্থান দিয়া সযত্নে তাহাদের লালন পালন ও লেখাপড়া শেখানোর ভার লইয়া মাতাকে সাহায্য করিতেন। সে সব অনেক দিনের কথা, বলিতে গেলে অনেক বলিতে হয়। সকল কথা মনেও

নাই; কেবল মনে আছে শিল্পমেলার কথা—সে কি আনন্দ, সে কি উৎসাহ! নানা বিঘ্ন-বিপত্তির মধ্যে অটল ধৈর্য্যের সহিত কাজ করিয়া কয়েক বৎসর পরে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন, আর সখি-সমিতি লোপ পাইল।

আজ কয়েক বৎসর হইল শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী সখি-সমিতির একটি উদ্দেশ্য বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়া মহিলা-শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। এই আশ্রম হিন্দু-বিধবা নারীর উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজকাল ৩০ জন হিন্দু-বিধবা বালিকা ও রমণী হিন্দু আচার ব্যবহারে পালিত হইয়া লেখাপড়া ও শিল্পাদি শিক্ষা করিতেছে। ঝাড়ন, গামছা, শাড়ী, রেশমী কাপড়, মোজা, গেঞ্জি, লেস্ ও সদাসর্ব্বদা ব্যবহারের বস্ত্রাদি তাহারা নিজেরা প্রস্তুত করিতেছে।

এ-কালে আমাদের দেশেও ধনী দরিদ্র ইতর ভদ্র যে-কেহ জামা মোজা গেঞ্জি কোর্ত্তা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে, ইহার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দোকানে দৌড়িতে হয়, যাঁহাদের ঘরে ছেলেপিলে আছে, যাঁহারা সর্ব্বদা দরজীর সহিত কারবার করেন, তাঁহারা জানেন, সে কি বিষম ঝঞ্ঝাট! প্রথম ত দরজী কাপড় না চুরি করিতে পারে, এ জন্য খর দৃষ্টি রাখা দরকার,—দ্বিতীয়তঃ অসম্ভব রকম মজুরি হাঁকিলে তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতে হয়, সবশেষ ও শ্রেষ্ঠ ভাবনা—দরজী কি যে তৈয়ার করিয়া আনিয়া তারিফ করিয়া দেখাইবে, তার ঠিক নাই। যখন জ্যাকেট করিতে গিয়া বালিশের খোলটি হাতে ঝুলাইয়া ভারি প্রশংসার চক্ষে সে দেখে ও দেখায়, তখন হাড়শুদ্ধ জ্বালা করে। অনেকে বলিবেন, ও-সব বিলাসিতা ছাড়িয়া দিলেই জ্বালা ঘোচে।—মেয়েদের বেলায় তা যেন হইল—আমরা যেন মাতামহী পিতামহীদের পরিচ্ছদের দৃষ্টান্ত অনুকরণের জন্য "ফিরে চল্ ফিরে চল্ ভাই" বলিয়া গাইতে গাইতে ফিরিয়া যাইব; কিন্তু মোজা গেঞ্জি পাঞ্জাবী কামিজ চাপকান্ কোট, প্যাণ্ট পুরুষদের নিত্য ব্যবহার্য্য, সকলই ত চাহি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মেয়েরা সেলাইয়ে অভ্যস্ত হইলে সংসারের বিস্তর ঝঞ্ঝাট কমিয়া যায়। ধনী দরিদ্র প্রত্যেক রমণীরই সেলাইয়ে দক্ষতা থাকা যে উচিত, এ কথা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিবেন।

শিল্পাশ্রমে যে কেবল বিধবাদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা নহে ; সধবা বালিকাগণও ইচ্ছা করিলে সেখানে গিয়া প্রত্যহ লেখাপড়া এবং শিল্প-শিক্ষা করিতে পারেন। মহিলা-শিল্পাশ্রমের ছাত্রীগণ তাঁত বোনা হইতে সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত জ্যাকেট ফ্রক রুমাল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে।

এমন যে আবশ্যকীয় শিক্ষা বিস্তারের জন্য আশ্রমটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার আদর কই ?

চিরদিন কল্যাণময়ী নারীর সুকোমল হস্ত ও স্নেহপ্রবণ হৃদয় সেবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের দেশে বিধবা হইলেই আর সে নারীর আদর থাকে না—তখন সেই কল্যাণময়ী সকলের চক্ষে চির অকল্যাণী বলিয়া প্রতিভাত হয়।

যখন বিধাতার নির্ব্বন্ধে কল্যাণী নারী দৃঢ় বন্ধনমুক্ত হইয়া দশ জনের সেবার জন্য নিজের হৃদয় মনকে প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পায়, তখন সেই বিধবা অকল্যাণী বলিয়া আত্মীয় জনের গলগ্রহ ও হতাদরের হইয়া তাহার জীবনকে ব্যর্থ জীবন মনে করিয়া কোন মতে দিন যাপন করিতে থাকে। এই সকল বিধবাদের জীবন যে ব্যর্থ নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের যে কতখানি মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহা অল্প লোকেই বুঝিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এই জন্য অর্থাভাবে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য অগ্রসর হইতেছে না। সামান্য ।০ মাসিক চাঁদা আদায় করিতে কিরূপ কষ্ট পাইতে হয়, তাহা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী ও কর্ম্মকর্ত্রীগণ বিলক্ষণ জানেন। এই পতিপুত্রহীনা বিধবাগুলি যেন তাঁহাদেরই অবশ্যপোষ্য, দেশের আর দশ জনের সহিত যেন কোন সংস্রব নাই। এ যে দশ জনের কাজ—তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব ? একটি ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিলে সে যে তোমাদের দশ জনের কাজ করিয়া নিজে ধন্য হইবে—এই মাতৃস্বরূপিণী বালিকারা যে দেশের দশ জনের স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করিতেছে, ইহা যদি সকলে ভাবিয়া দেখেন, তবে ইহার উন্নতি বিধানে মুক্তহস্ত হইতে কি কুণ্ঠিত হইতে পারেন ? আমরা অবরোধে রাস করি—নিজ নিজ পিতা পুত্র ভ্রাতা ও স্বামীর সংসারই আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র,—তদভাবে নিকট-আত্মীয় যদি স্থান দান

করেন, তবে কোন মতে মান রক্ষা হয় বটে, কিন্তু প্রাণ রক্ষা হয় অনেক কষ্টে!—এই পরের গলগ্রহ আপদ্‌কে কি কেহ স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারে? এ দৃশ্য যে ঘরে ঘরে! এই জন্য ইদানীং অনেক ভদ্রঘরের দরিদ্র বিধবাকে হীন কার্য্যে জীবিকা অর্জ্জন করিতে দেখা যায়। আত্মীয়গণের নিকট দাসীবৃত্তি করিয়াও যখন অনেক স্থলে মিষ্টভাবে আধপেটা জোটে না, তখন অগত্যা পরের ঘরে দাস্যবৃত্তি করিতে যাওয়া ভাল বলিয়া মনে হয়।

পরের ঘরে দাসীবৃত্তি করিতে গেলে ভদ্র অভদ্র বিচার থাকে না, দরিদ্রতা অভদ্রতা নামে অভিহিত হয়, কাজেই হীন ব্যবহারে হীন বৃত্তিতে মনটাও কেমন নীচ হইয়া পড়ে! যে রমণী আজ ভ্রাতৃগৃহে স্থান পাইলে একাহারে অক্লান্ত পরিশ্রমে হাস্যমুখে ধর্ম্মকর্ম্মে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত—সে রাঁধুনী-বৃত্তি গ্রহণে কেমন করিয়া তেলটুকু সরাইব, কেমন করিয়া নুনটুকু সরাইব, এই চেষ্টায় বিব্রত থাকে। বিলাতের কত শত নারী আজীবন কুমারী থাকিয়া নিজ উপার্জ্জনে ধর্ম্মকর্ম্ম, পরের সেবা, কত কত কাজ করিয়া থাকে। কত মহীয়সী নারীর কথা শুনা যায়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কুমারী। আমাদের দেশে তাহা হইবার জো নাই। কিন্তু নাম মাত্র বিবাহ হইয়াছে—বালিকার সে দিনটার কথাও হয়ত মনে নাই, এমন বিধবাও আছে, তবুও তাহারা কুমারী নহে—বিধবা। এই সকল বালিকারা স্বধর্ম্মে মতি রাখিয়া যাহাতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, এই জন্য বিশেষ করিয়া এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে পূর্ব্বে দেখিয়াছি, প্রায় ১৯।২০ জন সধবা বালিকাও প্রত্যহ আসিয়া শিল্পাদি শিক্ষা করিয়া যাইত, তাহাদের জন্য তখন গাড়ীর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু যেখানে প্রত্যহ সহস্রাধিক ছাত্রী আসা উচিত, সেখানে এই ১৯।২০টি মাত্র ছাত্রী! ইহা হইতেই বেশ বোঝা যায় যে, মেয়েদের শিক্ষার জন্য এখনও কেহই তত দূর চিন্তা করেন না। যখন উন্নতি উন্নতি করিয়া দেশের আবালবৃদ্ধ মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, তখনও ইঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, প্রথমে গাছটির যত্ন করিলে তবে ফলটি ভাল পাওয়া যাইবে। এত অল্প ছাত্রীর জন্য যে ব্যয় হইত, তাহা সমিতির পক্ষে সাধ্যাতীত হওয়াতে এখন আর দৈনিক ছাত্রী লইবার গাড়ী নাই। তবে

ইচ্ছা করিলে কেহ নিজের গাড়ীতে গিয়া শিল্প শিক্ষা করিতে পারেন। পূর্ব্বে শিল্পাশ্রম কলিকাতার মধ্যেই ছিল,—এখন ল্যান্সডাউন রোডে উঠিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা করিলে সকলেই গিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন। ('ভারতী,' ফাল্গুন ১৩২০)

শিশুশিক্ষার মূলমন্ত্র

শিশু-সাহিত্য ও শিশুশিক্ষা নিয়ে 'সবুজ পত্রে' যে আন্দোলন উঠেছে, তা বিশেষরূপে ভাববার বিষয়। আলোচনাটি জুড়োতে দেওয়া ঠিক নয় ভেবে আমি আজ লিখতে বসেছি।

আমাদের দেশের শিশুরা মনুষ্য-শাবক ব'লেই মানুষ হয়; অর্থাৎ মনুষ্যাকৃতি লাভ করে। তাদের মানুষ করবার জন্য রীতিনীতি, বিধি পদ্ধতির বালাই নেই। স্তন্য আছে, কাঁদলেই পায়; ধুলোমাটি আছে, গড়াগড়ি দেয়; বছর পাঁচেক হ'তে না হ'তে ছেলেরা লেখাপড়া শিখতে (ঠিক শিখতে নয়,—গিলতে) স্কুলে যায়। তার পর অদৃষ্টের গুণে বা দোষে ডাক্তার, উকিল, ব্যারিষ্টার, কেরানী, মোটর-ড্রাইভার, ট্রাম-কণ্ডাক্টার, ছাপাখানার প্রিণ্টার ইত্যাদি ইত্যাদি যা বল হয়ে —কেউ বা স্বচ্ছন্দে, কেউ বা অস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রে চ'লে যায়। এই হ'ল আজকালকার বাঙ্গালীর জীবন। এই জীবন-যাত্রার গতি ফেরাতে হ'লে মূল ধ'রে ব্যবস্থা করতে হয়। এখন দেখা যাক, এর মূলটা কোথায়।

মনুষ্য-সমাজে শিশুপালনের ভার পিতা ও মাতা উভয়ের হ'লেও, আসলে সেটি মায়েরই কাজ। পিতা জীবিকা অর্জ্জনে ব্যস্ত, তাঁর অবসর নেই—সুতরাং শিশুর সম্পূর্ণ ভার মায়ের উপর পড়ে। কিন্তু আমাদের দেশে সচরাচর বালিকারাই মা হয়ে থাকে। ষোল সতের বৎসরের মেয়ের দুই তিন সন্তান ঘরে ঘরেই দেখা যায়। এই সব বালিকা—এক স্তন্যদান বা বোতলে বিলাতী ফুড খাওয়ানো, ও যতটুকু পরিষ্কার না করলে নয়,—তাই ছাড়া আর কি করতে পারে? তাদের ঘুমন্ত যৌবন কখনও জাগতে পায় না; কৈশোর থেকে যৌবনের ধাপ ডিঙ্গিয়ে তারা প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁছেছে—অথচ ধাপটা আছে। ঠিক বয়সে যৌবন যখন তার আশা-ভরসা সাধ-আহ্লাদ নিয়ে সাড়া দেয়, তখন বালিকা তার শিশুদের সামলাতেই ব্যস্ত,—কাজেই মা কিংবা শিশু কারও মেজাজ ভাল থাকে না। ফলে শিশুদেহ এবং মন, দুয়েরই স্বাভাবিক খোরাক পায় না। বাঙ্গালী শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া

থেকেই যেমন স্তন্যদানের সময় অসময় থাকে না, তেমনই আদর তিরস্কারেরও সময় অসময় নেই। কখনও বা শোন, মা তাকে নাচাচ্ছে—"ও রে আমার টাকার তোড়া, ও রে আমার ধনের ঘড়া"—আবার খানিক পরেই দেখ, সেই অস্ফুটবাক্ শিশুর গায়ে চড়ের উপর চড় পড়ছে—এ দৃশ্য ঘরে ঘরে। অতএব যদি মনুষ্য-শাবককে যথার্থ মানুষ ক'রে তুলতে হয়, তবে শিশুকাল হ'তে শুধু পুত্র সন্তানকে মানুষ করলে হবে না; কন্যা সন্তানকেও সমান যত্ন সহকারে পালন করতে হবে, শিক্ষা দিতে হবে। কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল—শাখ বাজলো না—"ও গো মেয়ে হয়েছে";—এই যে সেই শিশুর প্রতি অবহেলা আরম্ভ হ'ল, তার শেষ হবে শেষ দিনে। আর তিনি যদি ভাগ্যবতী হন, পতি পুত্র রেখে যদি মরতে পারেন, তবে তাঁর আদর হবে তাঁর শ্রাদ্ধের সময়!

মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কন্যাগুলিকে নিরীক্ষণ ক'রে দেখলে সবাই বুঝতে পারবেন—তাদের কি অসহায় ভাব, কি ভীতচকিত মলিন মুখ। তিন বছরের মেয়ে, তিন মাসের ছোট ভাই বোনের পরিচর্য্যায় দীক্ষিত হয়। পাঁচ বছরের মেয়ে, হাতে কাঁকে ছেলে নিয়ে পাড়ায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তা বোধ হয় সকলেই দেখেছেন। তারা যেমন ক'রে নিজেরা 'মানুষ' হয়েছে, বড় হয়ে নিজ নিজ সন্তানকেও তেমনই ক'রে মানুষ করে। এই হ'ল সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থ ভদ্র-ঘরের কথা। ধনী দরিদ্রের ব্যবস্থা আলাদা। ধনীর ঘরে সেকাল এ-কাল চিরকালই শিশুরা চাকর দাসীর কাছে মানুষ হয়। তাদের মধ্যেও পুত্রকন্যার আদর-আপ্যায়নের তারতম্য বেশ লক্ষিত হয়। আমাদের চক্ষের উপর সেকালে এ-কালে—অর্থাৎ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ও পরে, অনেক রকম পরিবর্ত্তন হয়েছে,—কেবল হয় নি মেয়েদের অনাদরের।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শৈশবে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' চলিত ছিল, আমাদের অক্ষর-পরিচয় তাই থেকে হয়। কিন্তু মায়ের একখানা 'শিশুবোধ' ছিল—সেইখানা ছিল আমাদের প্রিয় এবং অবসর-পাঠ্য। তাতে যে সেই ক'য়ে করাত, খ'য়ে খরগোস, গ'য়ে গাধা, ঘ'য়ে ঘুঘু, ঙ'য়ে নোঙরের ছবিগুলি ছিল, তা দেখে দেখে আমাদের আর তৃপ্তি হ'ত না। সেই কালির আঁচড় ও ছোপগুলিতে আমাদের চর্ম্মচক্ষু না হোক, মনশ্চক্ষু

ঠিক জিনিসটি দেখতে পেত এবং চিত্তপটে চিত্রিত ক'রে রাখত। দাতা কর্ণ পড়তে পড়তে প্রাণ কেমন করত; মা কোলে ক'রে বৃষকেতুকে কাটতে নিয়ে চলেছে—হোক সে ছবি হাস্যকর, কিন্তু তখন কই—হাসি ত পেত না? অতএব বীরবল যে বলেছেন, "সেজেগুজে শিশুসাহিত্য লেখবার আবশ্যকতা নেই",—এটা খাঁটি কথা। বড়দের নকল করাই হ'ল শিশুদের স্বভাব। যাদের কাছে কাছে তারা সর্ব্বদা থাকে, তাদের নকল তারা করবেই। আমি পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখেছি, যে-শিশুরা বেশীর ভাগ দাসী চাকরের কাছে থাকে, তারা নিজেরা দাস দাসী সাজতে ভালবাসে—অর্থাৎ নিজেকে দাসী বা বেয়ারা ভেবে নিয়ে পুতুল ছেলে কোলে ক'রে বেড়ায় এবং তাদের শাসন করে। যে-শিশু মায়ের কাছে বেশীর ভাগ থাকে, সে তার মাকেই নকল করে। নকল করার প্রবণতা শিশুদের স্বভাবসিদ্ধ। শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্য স্কুল চাই নে, বই চাই নে—চাই তাদের সামনে নিজেরা সংযত ভাবে চলাফেরা করা, কথাবার্ত্তা কওয়া। আমরা শিশুদের ত গ্রাহ্যই করি নে, তাদের সম্মুখে যা খুশি তাই বলি, যা খুশি অসঙ্কোচে তাই করি—মনে করি, ও কি বুঝবে, ও ত ছেলে! সেটি কিন্তু একেবারেই যে ভুল, তা বলা বাহুল্য। শিশুরা যেমন যা শোনে, তাই বলবার জন্য ব্যগ্র হয়, তেমনই যা দেখে, তাই করতে যায়। শিশুকে নিয়মাধীন করতে হ'লে, ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকেই আরম্ভ করতে হবে। গোড়া থেকে যা অভ্যাস করাবে, তাই হবে। তাই বলছি, বইয়ের শিক্ষা আরম্ভ হবার পূর্ব্বে, তার নিজস্ব স্বভাবটির প্রতি লক্ষ্য রেখে, ধীরে ধীরে রাশটি বাগিয়ে নিতে হবে। শিশুদের প্রত্যেকের যে একটা নিজস্ব স্বভাব আছে, তা ঠিক,—তবে অনুকরণপ্রিয়তা এবং পৈতৃক স্বভাবও পেয়ে থাকে। অতএব যে দিক্ থেকে আর যেমন ক'রেই ভেবে দেখা যায়, মোট কথা এই যে, শিশুকে পিতামাতার,—বিশেষতঃ মাতার স্বহস্তে পালন করা কর্ত্তব্য। এখানে পালন অর্থে শুধু দুধ খাওয়ানো নয়—কিন্তু সংযত ও আদর্শভাবে শিশুর সমক্ষে চলাফেরা করা, তার কাছে অধিক সময় যাপন করা, ইত্যাদি। অবশ্য এ-সব পরামর্শ দেওয়া যত সহজ, করা তত সহজ নয়; কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, যত দিন এ-দেশে বালিকা-মাতার অস্তিত্ব না ঘুচবে, তত দিন সন্তানের যথার্থ আদর ও শিক্ষা কিছুতেই হবে না। মা হবার বয়স হ'লে, তবেই যথার্থ সন্তানের মর্ম্ম বোঝা যায়—তখন

স্বভাবতই তার প্রতি আসক্তি জন্মায়, তার প্রতি যে একটা কর্ত্তব্য আছে, সেটা প্রত্যেক মায়েই প্রাণে প্রাণে অনুভব করতে পারে। মূল ধ'রে শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হ'লে, মায়ের দিকে প্রথমে দেখতে হবে। "মেয়ে হয়েছে" ব'লে হতশ্রদ্ধা ও অবহেলা করলে চলবে না। শাঁখ বাজিয়ে, হুলুধ্বনি দিয়ে, মাতৃরূপিণী ক্ষুদ্র শিশুকে সাদরে প্রসন্নমনে কোলে তুলে নিতে হবে। সকল ঘরের সকল জাতির সকল দেশের কল্যাণময়ী হ'ল নারী। যদি বাঙ্গালীর গৌরববৃদ্ধির কামনা থাকে, তবে "মেয়েটা"কেও আদর যত্ন কর—সেই মঙ্গলময়ী কল্যাণীর আশীর্ব্বাদে জাতির মঙ্গল, দেশের মঙ্গল হবে। ('সবুজ পত্র,' চৈত্র ১৩২৩)

যৌতুক

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবীপুরের জমিদার

দেবীপুর গ্রাম ব্রাহ্মণ-প্রধান—গ্রামের জমিদার ব্রাহ্মণ, বাসিন্দাও অধিকাংশ ব্রাহ্মণ। মুখুজ্যেপাড়া চাটুজ্যেপাড়ায় এত ঘর বসতি যে, সে এক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামে ডিস্পেন্সারি, স্কুল, মুনসেফের কাছারি, কিছুরই অভাব নাই। গ্রামবাসীরা গর্ব্ব করিয়া বলিত, "দেবীপুর কি পাড়াগাঁ, এ ত শহর!" দেবীপুরের ভদ্ররমণীরা নিজের নিজের পাড়ার মধ্যে 'পাড়া বেড়াইতেন' বটে, কিন্তু ভিন্ন পাড়ায় যাইতে হইলে পালকি ব্যতীত যাওয়ার নিয়ম ছিল না; এবং বিভিন্ন পাড়ার মেয়েদের নিমন্ত্রণাদি করার প্রচলনও ছিল না; কারণ, কলিকাতার মত গাড়ী বা পালকি করিয়া নিমন্ত্রিতাদের লইয়া যাওয়ার প্রথাও দেবীপুরে প্রচলিত ছিল না। তবে কন্যা বা বধূ পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরালয়ে এবং শ্বশুরালয় হইতে পিতৃগৃহে কাজে কর্ম্মে পালকিতে যাতায়াত করিত।

জমিদার গাঙ্গুলীরা জ্ঞাতিবর্গে বৃহৎ গোষ্ঠী। মূল তালুকে তাঁহাদের প্রত্যেক পরিবারের অল্পাধিক অংশ ছিল; কাহারও চার আনা, কাহারও বা এক আনা, কাহারও বা এক পাই। তাহার উপর গোষ্ঠীর মধ্যে কেহ উকিল, কেহ কেরানী; কাহারও বা স্বোপার্জ্জিত জমিদারী ছিল। উপার্জ্জন অনুসারে কেহ ধনী, কেহ গৃহস্থ, কেহ দরিদ্র; কাহারও বড় বাড়ী, কাহারও ছোট বাড়ী; কাহারও বাড়ী দুর্গোৎসব হয়, কাহারও বাড়ী জগদ্ধাত্রী পূজা হয়, কেহ বা পুত্রকামনায় কার্ত্তিক পূজা করিতেন—তাই বারো মাসে তের পার্ব্বণে গ্রামে উৎসব ফাঁক যায় না।

গাঙ্গুলীদের মধ্যে মহেশ গাঙ্গুলীর মত ধনী কেহ ছিল না; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে একজন 'রাজা' খেতাব পাইয়াছিলেন, এই জন্য এখনও সকলে তাঁহাদের বাড়ীকে 'রাজার বাড়ী' বলে। দেউড়িতে সিপাহী পাহারা দিত, চারি প্রহরে নহবৎ বাজিত, ঘোড়াশালে গোটা-চারেক ঘোড়া ও হাতীশালে একটা জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ হস্তীও ছিল। শুনা

যায়, হাতীটা মহেশ গাঙ্গুলীর চক্ষুঃশূল—তাহার আহারের ব্যয়টি তিনি নিতান্ত অপব্যয় বলিয়া বোধ করিতেন এবং সর্ব্বদাই তাহার মৃত্যু কামনা করিতেন, তথাপি হাতীটা মরণের নাম করিত না এবং প্রতি দিন অর্দ্ধ মণ চাউল খাইয়া ছোট ছোট বালক বালিকাদের কৌতূহল ও আমোদ বৃদ্ধি করিত। প্রাতে কিছু মুড়ি মুড়কি আঁচলে লইয়া ও-পাড়া সে-পাড়া হইতে দলে দলে ছেলে মেয়েরা হাতীর চাল খাওয়া দেখিতে আসিত। ভিন্ন গ্রাম হইতে—এমন কি, কলিকাতা হইতে কেহ আসিলেও "রাজার বাড়ী হাতী দেখবে চল" বলিয়া বালকবৃন্দ পথপ্রদর্শক হইয়া নবাগতকে লইয়া গিয়া হাতী দেখাইয়া বিশেষ গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিত।

রাজার বাড়ী পূর্ব্বকালে দুর্গোৎসবের সময় পনর দিন ধরিয়া উৎসব চলিত—যাত্রা, নাচ, কবিগান, হাফ্ আখড়াই প্রভৃতি কিছুই বাদ যাইত না। এখন কেবল পূজার তিন দিন যাত্রা ও নাচ হয়। গ্রামের লোকেরা এই জন্য বিশেষ আক্ষেপ করে এবং কৃপণ বলিয়া প্রাতঃকালে কেহ মহেশ গাঙ্গুলীর নাম করিতে চাহে না।

চক্রবর্ত্তীদের সিদ্ধেশ্বরী কালী বড় জাগ্রত দেবী—এই দেবীর নাম হইতেই গ্রামের নাম দেবীপুর হইয়াছে। বৎসরে একবার করিয়া সিদ্ধেশ্বরীতলায় ভারি মেলা হয়, মেলা তিন দিন থাকে। এই সময়ে সকলে দেবীর নিকট মানস করিতে আসে এবং যাহার মানস সিদ্ধ হইয়াছে, সে পূজা দিয়া যায়। চক্রবর্ত্তীরা সিদ্ধেশ্বরীর সেবায়েৎ—যাঁহার যখন পালা পড়িত, তিনি তখন পূজার্চ্চনা করিতেন ও প্রণামী আদি পাইতেন। দেবীর দেবোত্তর সম্পত্তি ও প্রণামী প্রভৃতির আয়ে অনেক চক্রবর্ত্তীর অন্ন-বস্ত্র চলিত। যে চক্রবর্ত্তী তাহার উপর চাকুরি করিতেন, তাঁহার অবস্থা সচ্ছল, আর যিনি দেবীর উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন, তাঁহার কোন প্রকারে দিনযাপন হইত। চক্রবর্ত্তীপাড়ায় অন্য কোন প্রতিমা পূজা হইত না—পার্ব্বণে পার্ব্বণে সিদ্ধেশ্বরী দেবীরই পূজায় জাঁকজমক হইত। কেহ যদি পূজার সময় আমোদ-প্রমোদ বা পূজার্চ্চনায় কিছু ব্যয় করিতে চাহিতেন, তবে তাহা সিদ্ধেশ্বরীতলায় করিতে হইত।

এই সুবৃহৎ ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠী ব্যতীত কয়েক ঘর ধনী কায়স্থও গ্রামে বাস করিতেন। গ্রামে প্রবেশ করিতেই তাঁহাদের বড় বড় অট্টালিকা, পুষ্পোদ্যান, উদ্যানে ঘাট-বাঁধানো পুষ্করিণী ও মর্ম্মর প্রস্তরের পুত্তলিকা

দেখিলে বলা যায়, দেবীপুরবাসীরা যে শহর বলিয়া দেবীপুরের গর্ব্ব করে, তাহা অসঙ্গত নয়।

দেবীপুরের বাজারে ভাল সন্দেশ বারো মাস পাওয়া যায়। বাড়ীতে কুটুম্ব আসিলে গৃহিণীদের নারিকেল নাড়ু ও রসকরার অনুসন্ধানে শিকা হইতে হাঁড়ি পাড়িতেই হইত না। কচুরি, জিলাপি, গজা, মিঠাই হইতে সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতুয়া, দই—যাহা চাও, তাহাই বাজারে প্রস্তুত থাকে, তবে ক্ষীরের আবশ্যক হইলে পূর্ব্বে ফরমাইশ দিতে হইত। মাছ তরকারি দুধ প্রতি দিন প্রাতঃকালে পাওয়া যাইত।

গ্রামের প্রান্তদেশ দিয়া রেলপথ গিয়াছে। যাঁহারা কলিকাতায় কর্ম্ম করেন, তাঁহারা অনেকে প্রতি দিন রেলে যাতায়াত করিয়া থাকেন; কাহারও কাহারও কলিকাতায় বাসা আছে, তাঁহারা প্রতি শনিবারে বাড়ী আসেন। গ্রামে দলাদলি বড় একটা নাই—কাজে কর্ম্মে, সম্পদে বিপদে নিজ নিজ পাড়ার সকলেই পরস্পরকে সাহায্য করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেবীপুরে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী মহেশ গাঙ্গুলী, তিনিই গ্রামের জমিদার—রাজা নামে অভিহিত। তাঁহার এক মাত্র পুত্রের বিবাহের জন্য তাঁহার পারিষদবর্গ আত্মীয় কুটুম্ব সকলে আজকাল বড় ব্যস্ত। মনের মত পাত্রী পাওয়া যাইতেছে না—পাত্রী পাওয়া যায় ত সমান ঘর পাওয়া যায় না। সমান ঘর অর্থে দুই প্রকারের, কুল এবং ধন মান। দরিদ্রের ঘরে সুন্দরী ও কুলের মিল পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু দরিদ্রকে বেহাই বলিয়া তাঁহার সহিত একত্রে ভোজনাদি করিতে কর্ত্তার মানের খর্ব্বতা হয়, এ জন্য এত খোঁজাখুঁজি হইতেছে।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুত্রটি দেখিতে তেমন সুশ্রী নহে। মোটাসোটা কালোকোলো—বুদ্ধিখানিও শরীরের অনুরূপ, লেখাপড়ায় মন নাই; সুতরাং যাঁহাদের দু-পয়সা সংস্থান আছে এবং মেয়েটিও সুন্দরী, তাঁহারা আবার পাত্রটি পছন্দ করেন না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর কর্ত্তা বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। পাত্রের দর হাঁকিয়াছিলেন—নগদ পাঁচ সহস্র মুদ্রা এবং অলঙ্কার দানসামগ্রীতে পাঁচ সহস্র;—কিন্তু বিলম্ব দেখিয়া অন্তঃপুরে মেয়েরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে—এও কি একটা কথা যে, মেয়ে পাওয়া যায় না! অগত্যা কর্ত্তাকে পাত্রের দর খাটো করিতে হইয়াছে।

কর্ত্তা আহারান্তে অন্তঃপুরে বিশ্রাম করিতেছেন, মাতা আসিয়া নিকটে বসিলেন। বুড়ীর রং টুক্‌টুকে, চুলগুলি সাদা; একটু কুব্জ হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু দাঁত এমন শক্ত যে, এখনও চাল কড়াই ভাজা কড়মড় করিয়া চিবাইয়া সকলকে বিস্মিত করিতেন, কাহাকেও কখন ছুঁচে সুতা পরাইয়া দিবার জন্য ডাকিতেন না। তাঁহার কাঁথার কারুকার্য্য দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া থাকিত।

মাতা। বাবা, নন্দলালের বিয়ের কি করলে?

কর্ত্তা। চারি দিকে ঘটক পাঠিয়েছি ত, তা মনের মত পাচ্ছি কই!

মাতা। ভাল বামনের মেয়ে হ'লেই হ'ল। বামনের মেয়ে কি হাড়ী বাগদীর মত কুৎসিত হবে, বামনের মতই হবে, তাও কি তুমি পাচ্ছ না?

কর্ত্তা। অত ব্যস্ত হ'লে চলবে কেন, আমার ত আর কন্যাদায় নয়!

মাতা। আর বাবা, কবে আছি, কবে নেই, বুড়ো হয়েছি, ব্যস্ত হব না? নন্দর বৌটি দেখে যাই, তা যে রকম তোমার ধনুকভাঙ্গা পণ, তাতে আর আমার অদৃষ্টে বৌ দেখা নেই!

কর্ত্তা। ধনুকভাঙ্গা পণটা কি? বাবা যেমন পছন্দ ক'রে বউ এনেছিলেন, সকলের পছন্দ ত আর তেমন নয়!

মাতা। কেন বাবা, আমার বৌমা কি মন্দ? ধবধবে রংই নয়, কেমন লক্ষ্মীশ্রী! রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাব? অমন গুণের বৌ কি পাওয়া যায়, অমন পয়মন্ত বউ ক'জনের ঘরে আসে? বৌমা ঘরে আসতে দুধ ওথলানোর সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার সংসার উথলে উঠল, আরও কি চাই বাছা?

কর্ত্তা। বিয়ের কথা তোমরা মেয়েমানুষ কি বুঝবে—বললেই কি হয়? শুধু ত সুন্দরী মেয়ে হ'লে হবে না, এখনকার যেমন দেনা-পাওনা হয়েছে, সেগুলো ত বুঝে সুঝে নিতে হবে!

মাতা। লক্ষ্মী তোর ঘরে অচলা থাকুন, একটা বই ছেলে নয়, তোর কিসের অভাব—পাওনা নাই হ'ল। দেখ বাবা, ও-পাড়ার হরিশ চাটুজ্যের দিব্যি মেয়ে আছে, সেইটির সঙ্গে ঠিক ক'রে ফেল—আমি মেয়ে দেখেছি, দিব্যি মেয়ে।

কর্ত্তা। তুমি কেমন ক'রে দেখলে?

মাতা। আমার সই এয়ো-সংক্রান্তির ব্রত করেছিলেন, তার মাকে 'সধবা' করতে এনেছিলেন, মেয়ে দুটি সঙ্গে এসেছিল, দিব্যি মেয়ে দুটি!

বড়টির সঙ্গে তুই ঠিক কর্—তার মুখ দেখে আমার এমনি হ'ল যে, কোলে ক'রে ঘরে আনি।

কর্ত্তা। মা, কি যে বল তার ঠিক নেই! হরিশ চাটুজ্যে মোক্তারি ক'রে দু-পয়সা আনে নেয় খায়, তার কি ক্ষমতা—আমার সঙ্গে কুটুম্বিতা করে?

মাতা। হোক না মোক্তারি করে—ও-পাড়ার চাটুজ্যেরা বনেদী ঘর, সদ্‌ব্রাহ্মণ, মস্ত কুলীন, আমাদের করণীয় ঘর, পয়সাই না হয় কম, তার সঙ্গে কুটুম্বিতা করা যায় না? আমি ত বাবা গরিবের ঘরের মেয়ে, আমাকে কি তোমার ঠাকুরদাদা আনেন নি?

কর্ত্তা। সেকালে আর এ-কালে? এখন আমার ছেলে যদি শুধু ক'নেটি নিয়ে ঘরে আসে, তবে কি আমার মান-মর্য্যাদা বজায় থাকে!

মাতা। এত ধনের মানুষ হয়ে তোমরা যদি পাওনা পাওনা করবে, তবে গরিবের মেয়ের কি বিয়ে হবে না?

কর্ত্তা। মা, এখন যাও, তুমি খাওয়া-দাওয়া কর গে; বলছি ও-সব তুমি বুঝতে পারবে না। আমি কি চেষ্টার ত্রুটি করছি? উপযুক্ত যৌতুক পেলেই বিবাহ দিব।

"নাঃ, নন্দর বৌ দেখা আমার কপালে নেই"—বলিয়া মাতা ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন

মাতা। কি বাবা, শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হ'ল?

কর্ত্তা। (দালানে ভূমিতে বসিয়া পড়িয়া রাগত ভাবে) তখনই তোমাদের বলেছিলুম, হরিশ চাটুজ্যের কর্ম্ম নয় আমার সঙ্গে কুটুম্বিতা করা—সে কথায় কেউ কান দেবে না, কেবল বৌ বৌ বৌ!

মাতা। (সভয়ে) কেন বাবা, কি হয়েছে?

কর্ত্তা। হয়েছে আমার মাথা! জানি তখনই আমি, বেটা মোক্তার, সতের রকম জুচ্চুরি বুদ্ধি মাথায় খেলছে; বেটা আমাকে ঠকালে—আচ্ছা, দেখতে পাবেন, আমাকে ঠকাবার ফল হাতে হাতে পেতে হবে,

নাকের জলে চোখের জলে করব। অমন কত মোক্তার আমার পায়ের কাছে প'ড়ে ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, আজ উনি আসেন আমার হাত ধ'রে সমভাবে কথা কইতে!

কর্ত্তা পুত্রের বিবাহ দিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিতেই অন্তঃপুরের মহিলারা হাস্যমুখে শুভ সংবাদ জানিতে আসিয়া তাঁহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া বিষম মুশকিলে পড়িয়াছে। মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল, তাহারা বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল—কাহারও হাতের চুড়ির শব্দটি করিতেও ভরসা হইতেছে না।

কর্ত্তা। হরিশ চাটুজ্যে এত বড় ছোটলোক, ছু-হাজার টাকা নগদ দেবার কথা, এখন কি না বারো-শ টাকা দিলে—বলে কি না, ভাগ্নে বড় বিপদে পড়েছে, তাকে দিতে হ'ল। 'আপনি পায় না, শঙ্করাকে ডাকে'—নিজের মেয়ের বিয়ে হয় না, ভাগ্নেকে দান দাতব্য করে! আমার এই সব অপমান কেবল তোমাদের জন্যে; মেয়েদের কথা শুনে কাজ করতে গেলেই যত আপদ্ ঘটে, তা আমি চিরকাল জানি।

মাতা। এই কথা! ছু-হাজার টাকা পুরো দিতে পারে নি, তাই এত রাগ? বলি শুভ কর্ম্ম ত সম্পন্ন হয়ে গেছে?

কর্ত্তা কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিতে চলিয়া গেলেন।

নন্দলালের মাতা আসিয়া শ্বশ্রূকে বলিল, "মা, বোধ হয় না-খেয়ে চ'লে এসেছেন: আমরা ত জিজ্ঞেস করতে পারবো না, তুমি মা আস্তে আস্তে খোঁজ কর, আমি যাই, খানকতক লুচি ভাজাই গে—না খান, না হয় ফেলাই যাবে।"

কর্ত্তা হাত মুখ ধুইয়া আসিলে মাতা বলিলেন, "ছিঃ বাবা, আজ মঙ্গলের দিনে কি রাগ করতে আছে?"

কর্ত্তা। মঙ্গল কি তোমাদের জন্যে হবার জো আছে! আজ নন্দর বিয়ে দিয়ে কোথায় দশ হাজার টাকা ঘরে আনব, না নগদে গহনায় দানসামগ্রীতে বড়-জোর ছু-হাজার দিয়েছে—যা দেবে ব'লে স্বীকার হয়ে গেল, তাও দিলে না।

মাতা। না দিলে নাই দিলে—আমি তোকে কাল সকালে উঠেই হাজার টাকা দেব এখন, তুই ঠাণ্ডা হ।

কর্ত্তা। বাঃ, সে কার টাকা তুমি কারে দেবে! সে ত আমারই টাকা, আমাকে ভোলাচ্ছ—আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছ, না?

মাতা। বাবা, তোমার যতই বুদ্ধি হোক, তুমি যতই বিদ্বান্ হও, আর তোমার যতই বয়স হোক, তুমি আমার ছেলে ত, আমি ত তোমার মা! আমার কাছে চিরদিনই তুমি ছেলেমানুষ। ছি বাবা, রাগ ক'রো না, খাবার খাও, রাত হয়েছে। ও বৌমা, খাবার আন।

কর্ত্তা। আমার খাবার তৈরি হ'ল কেন? আমার ত খেয়ে আসবারই কথা, আমি যদি খেয়ে আসতুম ত এগুলো নষ্ট হ'ত! যত অলক্ষ্মী জুটে আমার সর্ব্বনাশ করলে!

মাতা। না বাবা, নষ্ট হবে কেন; কাল সকালে ওরা জল খাবে, তারই লুচি। আর কি জান, তুমি কর্ত্তাব্যক্তি মানুষ, তুমি যদি না খেয়েই আস, ঘরে কিছু রাখতে হয়।

কর্ত্তা আহারে বসিলেন; ভরসা করিয়া মাতা আর বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতে সাহস করিলেন না। পরিবারবর্গের মধ্যে যাঁহারা বরযাত্রী হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা আসিলে কর্ত্তার মাতা বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল কি না, সে সংবাদ লইলেন; শুনিলেন, শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু ঠিক নির্ব্বিঘ্নে হইয়াছে, এমন বলা যায় না। প্রবাদ বচন আছে, 'লক্ষ কথা ব্যতীত বিবাহ হয় না,' গণনা করিলে এই বিবাহে চারি লক্ষ কথার কম হয় নাই, এত কথা হইয়াছে।

পরদিন অতি প্রত্যূষে কর্ত্তা উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে ডাকিলেন—"জয়লাল।" জয়লাল তাঁহার সহোদর ভ্রাতার পুত্র নহে; জ্যেষ্ঠতাত বা খুল্লতাত ভ্রাতার পুত্র বা এমনই একটা কিছু।

জয়লাল তখনও নিদ্রাগত ছিল, কর্ত্তা ডাকিতেই তাড়াতাড়ি তাহার স্ত্রী তাহাকে জাগাইয়া দিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে জয়লাল আসিয়া নতমস্তকে বলিল, "আজ্ঞে ডাকছেন?"

কর্ত্তা। এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম! আমার হাত মুখ ধোয়া পর্য্যন্ত হয়ে গেল, তুমি এখনও পর্য্যন্ত ঘুমুচ্ছিলে! বলিয়া কট্‌মট্ করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন।

নাকে নথ এবং অঙ্গে বিস্তর অলঙ্কার-পরিহিতা গৃহিণী স্বল্প অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে বলিলেন, "ওরা কাল অনেক রাত্রে শুয়েছে, তাই উঠতে একটু বেলা হয়েছে।"

কর্ত্তা। দেখ, শীঘ্র হাতী পালকি সব নিয়ে যাও, এখনই বর ক’নে নিয়ে এস। হাতীর আজকের খোরাক সেইখান থেকে খাইয়ে এনো।

জয়লাল। আজ্ঞে, গ্রামভাঁটি বারোয়ারি শয্যাতোলানি—এ সব কি রকম দেওয়া-টেওয়া হবে—কাঙ্গালী বিদায় আছে—

কর্ত্তা। হরিশ চাটুজ্যে যখন বাকি টাকা শোধ করবে, তখন সে সব দেওয়া যাবে, এখন এক পয়সা নয়—দিতে হয় হরিশ চাটুজ্যে দিগ্ গে, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে বর ক’নে আমার বাড়ী দেখতে চাই।

কর্ত্তা উঠিয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন।

জয়লাল। কাকীমা, আমি বর আনতে যেতে পারবো না।

গৃহিণী। পারবো না বললেই ত ছাড়ান পাবে না বাছা, ডাক দেখি তোমার ঠাকুরমাকে।

এমন সময় কর্ত্তার মাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

জয়লাল। কি হবে ঠাকুরমা?

মাতা। কেন, কি হয়েছে?

জয়লাল। কাকামশায় ত একটা পয়সা দিলেন না, ব’লে দিলেন—বর ক’নে নিয়ে এস গে। গ্রামভাঁটি, বারোয়ারি, এ সব না দিয়ে বর আনবার জো কি! আমি গিয়ে কি খালি মাথা-ফাটাফাটি ক’রে আসব? এদিকে আবার হাতী ঘোড়া উট সব নিয়ে যেতে হুকুম হয়েছে—জমিদারী বড়মানুষি কি শুধু হাতী দেখিয়ে বজায় রাখা যায়? কাকামশায় কর্ত্তাদের নাম ডুবুলেন—এমন রাগী মানুষ যে, রাগ হ’লে আর জ্ঞান বুদ্ধি থাকে না। কাল রাত্রে যে কেলেঙ্কার—বর নিয়ে চ’লে আসেন আর কি! শেষে সত্যি সত্যি ব্রাহ্মণ পায়ে ধরলে, তবে স্থির হন।

মাতা। ক’নের বাপ এমন গরিব যে, এই কটা টাকা জোগাড় ক’রে দিতে পারলে না?

জয়লাল। কি জান ঠাকুরমা, ক’নের বাপের দোষ নেই—টাকা ঠিক ছিল, কিন্তু দু-তিন দিন আগে তার এক ভাগ্নে হাজার টাকার জন্য জেলে যায়। কি করে, বিয়ে-বাড়ীতে কান্নাকাটি ক’রে এসে পড়লো—তাকে রক্ষা করতে টাকা দিয়েছিলেন, সে বলেছিল যে, বিয়ের দিন দেবে—তা কি করবে—এত শীঘ্র জুটিয়ে উঠতে পারে নি আর কি। আহা, এমন বৌ হয়েছে ঠাকুরমা, যেন সোনার প্রতিমা! আমাদের এমন

আমোদের দিন কাকামশায় বড়ই মাটি ক'রে দিয়েছেন। যাক, এখন কি করি, তুমি বল ; আমি শুধু-হাতে যেতে পারবো না—কর্ত্তা নিজে যান।

মাতা। (হাসিয়া) যা না, তুই গিয়ে বল্, আমি যাব না, তুমি যাও।

জয়লাল। ও রে বাপ রে! আমার চৌদ্দ পুরুষ এলেও পারবে না। ঠাকুরমা, দেরি হয়ে যাচ্ছে, এখনই গালাগালি খেতে হবে গো। আজ বৌয়ের মুখ দেখে উঠেছি, কপালে অনন্ত দুর্দ্দশা আছে দেখছি।

মাতা। আয় আমার ঘরে, দু-শ টাকা নিয়ে বর ক'নে আন্ গে যা।

গৃহিণী। তুমি ব'লো, হরিশ চাটুজ্যে তাদের থামিয়েছে, তুমি দিয়েছ শুনলে রক্ষে থাকবে না।

জয়লাল। কথা কি ছাপা থাকে কাকীমা, না ওঁর বুঝতে বাকি থাকবে? ঠাকুরমা, তুমি ব'লো যে, তুমি দিয়েছ, তোমায় কিছু বলতে পারবেন না। বংশের মানসম্ভ্রম ত বজায় রাখতে হবে! পাঁচ বছর হয়ে এল, সেই আমার বিয়ে হয়েছে, তার পর আর এ বংশে কোন কাজ হয় নি—গ্রামের লোক শুনবে কেন?

কর্ত্তা। (আসিয়া) জয়লাল এখনও এখানে ব'সে কি পরামর্শ আঁটছ? আমার কথা বুঝি গ্রাহ্য হ'ল না, হতভাগা ছেলে!

মাতা। আহা, সকালে উঠেই গাল দাও কেন বাছা—তুমি ত হুকুম দিয়ে চুকেছ, তার পর কথাটা ভেবে চিন্তে দেখতে হবে ত।

কর্ত্তা। ভাবা চিন্তা আবার কি?

মাতা। শূন্য হাতে কি কেউ বর আনতে যেতে পারে? টাকা টাকা ক'রে তুমি বংশের মান-মর্য্যাদা ভুলে গেছ। আমি ত এখনও বেঁচে আছি, আমি যেমন ক'রে পারি, শ্বশুরের নাম রক্ষে করবো। আয় রে জয়লাল, মহেশ না দেয় না দিক, আমি টাকা দিচ্ছি—দেখিস, কৃপণতা করিস নে, সবাইকে সন্তুষ্ট ক'রে আসিস, কেউ যেন আমার নন্দলালকে শাপ গাল না দেয়।

কর্ত্তা। তুমি যেমন ঘরের মেয়ে, তেমনি তোমার নজর! ঘর থেকে টাকা দিয়ে কি ছেলের বিয়েও দিতে হবে না কি? মেয়েদের বিয়েতে তোড়া তোড়া টাকা দেব, আবার ছেলের বিয়েতেও দেব?

মাতা। (রুক্ষস্বরে) বাছা, তুমি চুপ কর। আমি তোমার মা, আমি সদ্‌ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমি রাজার বৌ, আমার টাকা আমি নিজে

খরচ করবো, তোমার কি? আমার শ্বশুর রাজা ছিলেন, আমি যত ক্ষণ আছি, তাঁর নাম বজায় রাখতে প্রাণপণ করবো! তোমা হ'তে ত তাঁর নাম ডুবতে বসেছে—একটা ছেলের বিয়ে দিচ্ছ, তাও কি না সুশৃঙ্খলে হ'তে দিলে না! যাও বাছা, আর রাগারাগি ক'রো না। (নম্র সুরে) তোমার একমাত্র বংশধর ঘরের লক্ষ্মী নিয়ে আসছে; ছিঃ, অমন ক'রে থাকতে আছে বাবা! (পুত্রের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) নন্দকে লোকে অভিশাপ দেবে, সেটা কি ভাল? আমার প্রাণে কি তা সয়!

কর্ত্তা। কলিকালে অভিশাপ ফলে না, সবই টাকা।

—বলিয়া কর্ত্তা কিছু নরম হইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। জয়লাল ঢাকাই ধুতি, গরদের কোট ও তদুপরি গার্ড-চেন ঝুলাইয়া হাসিতে হাসিতে টাকা লইয়া ঠাকুরমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর ঠাকুরমা, যেন নির্ব্বিঘ্নে বর ক'নে নিয়ে আসতে পারি। যে ভয় হয়েছিল, তুমি না থাকলে আজ কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারতো না। ভাল কথা! কাল ত বৌমার গহনা দেওয়া হয় নাই, সে যে কাকামশায় ফিরিয়ে এনেছেন।"

মাতা। এত ক্ষণ বললি নে কেন? আবার চাইতে যায় কে?

কর্ত্তা। (আসিয়া) জয়লাল এখনও বের হ'তে পারলে না? সিপাই সান্ত্রী সবাই প্রস্তুত রয়েছে, বাবুর আর হয় না যে!

মাতা। মহেশ, নাতবৌয়ের গহনার বাক্সটা কা'র হাতে দিলি?

কর্ত্তা। (মনে মনে গহনা দিতে ইচ্ছুক হইয়া) হরিশ চাটুজ্যের বাড়ী দশ পনর হাজার টাকা আমি কোন্ সাহসে দিই বল। সে একটা জোচ্চোর—আবার কে তার কখন জেলে যাবে, সে তাকে ঐ গহনা দিয়ে রক্ষা করতে যাবে। এখানে এনে বৌকে গহনা দিলেই হবে।

জয়লাল। বেলা হয়ে গেল, তা হ'লে আমি যাই।

মাতা। খাজাঞ্চির কাছ থেকে গহনার বাক্সটা নিয়ে যা, ক'নে কি নেড়া বোঁচা হয়ে আসবে? আজকের দিনেই ত সবাই দেখবে।

কর্ত্তা। দেখো হে, সাবধান—যে জোচ্চোরের পাল্লায় পড়া গেছে!

কর্ত্তা আবার বাহিরে চলিয়া গেলেন। আজ তিনি কিছু অস্থির।

মাতা। মহেশকে রাগেই খেলে! না হ'লে সত্যি কি আর টাকার জন্যে অমন করছে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আলোচনা

পুকুরঘাটের ভিড় আজ ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। ঘাটে আজ আমদানি বড় বেশী, রপ্তানি বড় কম। রমণীকুলের স্নান আর শেষ হইতেছে না।

জয়া। তখনি বলেছিলুম, বলি হরিশ—বড় ঘরে কাজ করতে যাচ্ছ, তাল সামলাতে পারবে ত?

বিজয়া। তা দিদি, হরিশের দোষ কি? বিন্দুদিদির জন্যেই ত এই কেলেঙ্কারটা হ'ল। মা গো! গায়-হলুদের দিন একেবারে দড়াস্ ক'রে উঠানে আছাড় খেয়ে প'ড়ে হাজার টাকার জন্যে মড়া-কান্না জুড়ে দিলে। হরিশ বেচারা ভালমানুষ, কি করবে, দিতে হ'ল। আবার কেমন— বিয়ের দিন দেব ব'লে দিব্যি করলে, আর আজ কি না মায়ে পোয়ে স'রে গেছে!

জয়া। তা হোক্ গে বাপু! না হয় আট-শ টাকা কমই হয়েছে— মিন্‌সে অতবড় জমিদার, এই ক'টা টাকার জন্যে তখনি বর তুলে নিয়ে যায়! হিঁদুর হিঁদুয়ানি আর রইল না, ছিঃ!

লক্ষ্মী। বরটা কি ভাই, না জানে কথা কইতে, না মুখে একটু হাসি আছে। এমন গোম্‌ড়া-মুখো বর কখনও দেখি নি। কান ম'লে দিলুম, তা একটু হুঁ করলে না—ভাল বাসর জাগতে এসেছিলুম!

সরস্বতী। বর, ভাই, কেমন ও-বাড়ীর মেনীর বর! যেমন দেখতে শুনতে, তেমনি কথাবাত্রা—কত থ্যাটারের গান গাইলে।

লক্ষ্মী। আ রে, সে যে কলকাতার ছেলে।

সুশীলা। তা হোক ভাই, বাবা বলেছেন, মেনীর বর মায়ে-তাড়ানে বাপে-খ্যাদানে ছেলে, কেবল থিয়েটারে থিয়েটারে ঘুরে বেড়ায়। মনোরমার বর রাজার ঘরের ছেলে, ভারিক্কি মেজাজ।

সরস্বতী। রাজার ছেলে হ'লে বুঝি আর হাসতে হয় না! বরের বাপ যে রাজ-কায়দা দেখালে, তারা না হাসুক, আমরা খুব হেসে নিয়েছি। মিন্‌সে এই হুম্‌কে যায় ত এই হুম্‌কে যায়!

জয়া। হ্যাঁ ভাই, বরেরা কি গয়না দিলে? ক'নের গায়ে ত কিছু দেখলুম না।

বিজয়া। কই, কিছু ত দেয় নি—

জয়া। সে কি, ঢের গয়না দেবে শুনেছিলুম যে?

লক্ষ্মী। আহা, গয়নার বাক্স যে ফিরিয়ে নিয়ে গেল, এনেছিল না কি মস্ত একটা বাক্স।

জয়া। তা হ'লে দেবে—বাড়ী নিয়ে গিয়ে দেবে।

বিজয়া। বিয়ের দিন যদি না দিলে, তবে দিলে কি না-দিলে, কে দেখতে যাচ্ছে গা?

লক্ষ্মী। বর কি না ভাই, একটা কথা কইলে না!

জয়া। আহা, ছেলেমানুষ কি এত কথা কইবে রে? তোরা যে গায়ে পড়া মেয়ে, গড় করি তোদের পায়ে!

সুশীলা। কেন, আমার সঙ্গে ত অনেক কথা কয়েছে। তোরা গান গান ক'রে ব্যস্ত করছিলি, তাই একবার বললে—গান জানি নে, তার পর চুপ ক'রে রইল।

লক্ষ্মী। ছেলেমানুষ—কচি খোকা! ২৪।২৫ বছর বয়স হবে।

জয়া। ও মা! কি বলিস গো! ও যে আমাদের জানা ছেলে, আমার হরির বয়সী, আমি জানি নে? এই উনিশ বছরে পড়েছে—ভোগের শরীর, তাই অমন মোটাসোটা।

লক্ষ্মী। মা গো, ছিঃ! ক'নের যুগ্যি বর হয় নি বাপু, তা যা বল না কেন।

এমন সময় একজন রমণী আসিয়া ডাকিলেন, "ওলো, তোরা কি আজ আর ঘাট থেকে উঠবি নে? বর-ক'নে নিতে এসেছে যে।"

কালী। ভোর না হ'তে হ'তেই বর-ক'নে নিতে আসা, সব বিশ্রী!

তারা। বড়মানুষি দেখানো।

মানদা। না লো না, রাগ হয়েছে কি না, তাই।

ক্ষমা। রাগ নিয়ে ধুয়ে খান।

শ্যামা। শয্যাতোলানি টাকা দিন, কত বড়মানুষ, তা বোঝা যাবে।

হরি। তোরা ঘাটে জটলা কর্, ওদিকে বর-ক'নে নিয়ে তারা চ'লে যাক, তখন শেজতোলানি নিস্ গিয়ে—মরণ আর কি!

। সত্যি ত বটে! ও ভাই, তুই আগে যা, আমি যাচ্ছি, এই আমার হ'ল ব'লে।

হরিশ বাবুর কন্যা মনোরমা যেই শুনিল, 'বর-ক'নে নিতে এসেছে,' অমনই কাঁদিয়া ফেলিল; তাহার মাতা তাহাকে সান্ত্বনা করিতে গিয়া চোখের জলে নিজের বুক ভাসাইয়া দিলেন। মহিলারা গহনার বাক্সটি পাইয়া অলঙ্কারের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

জয়া। দেখ বৌ, বাউটি জোড়াটা শাশুড়ীর, নইলে এত ভারি বাউটি কি ক'নে-বৌকে দেয়—চন্দ্রহার ছড়াটাও তাই।

হরিশ বাবুর খুড়ী। ওদের অভাব কি ভাই, তাও আবার মেয়েকে দিচ্ছে না, দিচ্ছে বৌকে—একেবারে ভাল ক'রেই দিচ্ছে।

লক্ষ্মী। মা গো! ও ত গয়না নয়, সোনার ঢিপি; এখন কি আবার বাউটির রেওয়াজ আছে না কি? কত রকমের চুড়ি উঠেছে—

বিজয়া। ও-সব ঘরে ছিল, তাই দিয়েছে।

খুড়ী। এই যে চুড়িও দিয়েছে; এ আবার কি চুড়ি?

সরস্বতী। ওকে চেন্ চুড়ি বলে। এই যে আবার হীরের চুড়ি, হীরের চিক্—সবই প্রায় সেকেলে।

হরিশ বাবু। (আসিয়া) ও গো, মেয়ে সাজিয়ে দাও, বাইরে তাড়া করছেন।

লক্ষ্মী। কি এত তাড়া করা! ভোর না হ'তে আসতে বলেছিল কে? দু-কোশ যাবে না, ন-কোশ যাবে না, গাঁয়ের বর, খাইয়ে-দাইয়ে ধীরে সুস্থে নিয়ে যাবে, তা নয়, কাক পক্ষী না ডাকতেই এসে হাজির!

সরস্বতী। তাও আবার ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে এসেছে! কাকা, বল গে যাও, এ-বেলা আমরা বর-ক'নে পাঠাব না।

খুড়ী। না না, হরিশ, তা ক'রো না—একে বরের বাপ রেগে আছে! এই যে হ'ল ব'লে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মেয়ে বাঁধা

হরিশ বাবু মোক্তারি করিয়া বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন করেন; পৈতৃক সম্পত্তিও এমন আছে, যাহাতে অন্নের চিন্তা করিতে হয় না। পরোপকারী

মানুষ—যেমন আয় তেমন ব্যয়, সে জন্য কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন না। কেহ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া জানাইলে, যেমন করিয়া পারেন, উদ্ধার করেন। পুত্রসন্তান হয় নাই, দুইটি মাত্র কন্যা—মনে ভাবেন, উহারা ত পরের ঘরে যাইবে, এত ব্যয়সঙ্কোচের প্রয়োজনই বা কি ! সময়ে সময়ে অর্থের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় বটে, কিন্তু হাতে টাকা আসিলেই সে কথা বড় একটা মনে থাকে না।

হরিশ বাবু কন্যাদ্বয়কে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং সর্ব্বদাই তাহাদিগকে কাছে রাখেন, তাহাদের সকল আবদার সহ্য করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা মনোরমা সবে মাত্র দশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে ; এত তাড়াতাড়ি তাহার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প ছিল না, কিন্তু যখন গ্রামের মধ্যেই ধনীর গৃহ হইতে তাহার সম্বন্ধ আসিল এবং অন্তঃপুর হইতে তাঁহারা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন নিজের তত ইচ্ছা না থাকিলেও আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে বিবাহে সম্মতি দান করিতে হইল।

শুভ দিনে অশুভের ছায়াপাতে তাঁহার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—প্রাণাধিকা কন্যাকে বিদায় দিয়া আসিয়া তিনি শয্যায় শুইয়া পড়িয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। বিবাহ-সভায় যখন তাঁহার ভাগিনেয় প্রতিশ্রুত টাকা লইয়া উপস্থিত হইল না, তখন তাঁহার মনে এই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, ভাগিনেয় পুনর্ব্বার কোন বিপদে পড়িল, না কি হইল ! তার পর তিনি যখন তাঁহার বেহাই মহেশ বাবুর হাতে কিয়দংশ টাকা দিয়া ভাগিনেয়ের বিপদাশঙ্কার কথা জানাইলেন, তখন মহেশ বাবুর সহানুভূতি পাইবেন, ইহাই জানিতেন। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যখন মহেশ বাবু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বাকি টাকা তখনই বুঝিয়া না পাইলে বর লইয়া চলিয়া যাইতে আজ্ঞা করিয়া প্রস্থানের উদ্‌যোগ করিলেন, তখন হরিশ বাবু বিস্মিত ও অপমানিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। এত বড় ধনী ব্যক্তি যে এই সামান্য টাকার জন্য এত দূর অভদ্রোচিত ব্যবহার করিতে পারেন, ইহা তাঁহার স্বপ্নের অগোচর ছিল। তিনি তখনই পত্নীর অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া টাকা আনিতে পাঠাইলেন এবং লগ্নভ্রষ্ট হইয়া যায় বলিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ করাইলেন। মহেশ বাবু বিবাহে অনুমতি দিয়াই বাড়ী চলিয়া গেলেন—এক মাত্র পুত্রের

বিবাহ তিনি হাস্যমুখে দিতে পারিলেন না। কন্যাযাত্রী বরযাত্রী সকলেই বিষণ্ণবদনে আহারাদি করিয়া চলিয়া গেলেন।

বিবাহের পর মনোরমা কয়েক মাস মাত্র পিত্রালয়ে বাস করিতে অনুমতি পাইয়াছিল, তাহার পর হইতে মধ্যে মধ্যে আসিয়া এক দিন বা এক বেলা মাত্র পিত্রালয়ে কাটাইয়া যাইত। হরিশ বাবু মুক্তহস্তে সকল পাল-পার্ব্বণে উত্তম উত্তম বস্ত্রাদি ও প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যাদি দিয়া তত্ত্বতল্লাস করিতেন বলিয়া বেহাই মহেশ গাঙ্গুলী তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং সাক্ষাৎ হইলে হাস্যমুখে বাক্যালাপ করিয়া বেহাইকে পরম আপ্যায়িত করিয়া দিতেন।

এই ভাবে দুই বৎসর একরকম সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইবার পর, হরিশ বাবুর এক জ্ঞাতি-ভ্রাতা মহেশ গাঙ্গুলীর নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া হরিশ চট্টোপাধ্যায়কে বিষম বিপদে ফেলিলেন। জ্ঞাতি-ভ্রাতা অঙ্গীকার অনুযায়ী টাকা দিতে না পারায়, মহেশ গাঙ্গুলী মনোরমাকে পিত্রালয়ে পাঠানো বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

মনোরমার এই বিবাহে তাহার মাতার বিশেষ আগ্রহ ছিল; কারণ, তিনি শুনিয়াছিলেন যে, মহেশ গাঙ্গুলী নিজে কৃপণস্বভাবের লোক হইলেও তাঁহার পত্নী অতিশয় শান্তস্বভাবা, এবং যদিও বৃহৎ পরিবার, তথাপি পরিবারস্থ মহিলাদিগের মধ্যে কোন প্রকার মনোমালিন্য নাই। মহেশ বাবুর মাতাকে সকলেই যথোপযুক্ত সম্মান করিত; তিনিই বাটীর গৃহিণী এবং যেমন তেজস্বিনী, তেমনই বুদ্ধিমতী। তাঁহার সুব্যবস্থায় মহেশ বাবুর অন্তঃপুরে কেহ কখনও কলহ হইতে শুনে নাই। মহেশ বাবু সকল বিষয়েই মাতার অনুরোধ উপরোধ রক্ষা করিতেন না; সে জন্য মাতাও তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে সহজে কোন অনুরোধ করিতেন না।

মনোরমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবার জন্য তিনি যথেষ্ট অনুরোধ করিয়া উপেক্ষিত হওয়ায় নিতান্ত মনস্তাপ পাইয়া ইদানীং চুপ করিয়া ছিলেন এবং ঐ বিষয়ে আর কোন কথা কহিতেন না। মনোরমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবার জন্য যতই সকলে কর্ত্তাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, ততই তাঁহার জিদ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ফলে এই হইল যে, সুদীর্ঘ দুই বৎসর কাল মনোরমার ও তাহার পিতামাতার সুখশান্তির নাম মাত্র ছিল না। ক্রমে হরিশ বাবুর মনে এমন ধিক্কার জন্মিল যে, তিনি

নিজে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কন্যাকে আনিবেন, সে চেষ্টাও আর করিলেন না। মনোরমাও পিতাকে কোনরূপ অনুরোধ করে নাই—কিন্তু ছোট বোনটির বিবাহ, আর মাতা কাঁদিতেছেন শুনিয়া আর মনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। সে কেবলই ভাবিতেছে, 'এই ছু-হাজার টাকা কি বাবা কোন মতে সংগ্রহ করিয়া আমায় লইয়া যাইতে পারেন না?' তাহার ধনী শ্বশুরালয়ে তুই সহস্র টাকা যৎসামান্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং ইহা সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা নাই মনে করিয়া হরিশ বাবুকে দরিদ্র ভাবিয়া সকলে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন, কিন্তু এই সামান্য অর্থের জন্য তাঁহারা নিজে যে কত দূর অভদ্র ব্যবহার করিতেছেন ও বধূকে মর্ম্মপীড়া দিতেছেন, তাহা একবার মনেও ভাবিয়া দেখেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বামী-স্ত্রী

"সারা দিন খেটে খুটে শুতে এলুম, আর তুমি ঘ্যান্-ঘ্যান্ আরম্ভ করলে?"

"দেখ, কবে আমি এমন ক'রে তোমাকে বলেছি বল দেখি? নিতান্ত প্রাণের দায়, তাই তোমাকে এত ক'রে বলছি। আমি নিজের জন্যে যত না বলছি, মা'র জন্যে বলছি—মা অনবরত কাঁদছেন।"

"আমি কি করবো?"

"তুমি ঠাকুরকে বললেই তিনি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।"

"তোমার বাবা তোমাকে বাঁধা রেখেছেন, সে কথা মনে আছে?"

"মানুষ আবার বাঁধা রাখে, এ কথা ত জন্মে শুনি নি—আর বাঁধা যদি রাখতে হয় ত বাবা আমাকে কেমন ক'রে বাঁধা রাখবেন? আমাকে ত তিনি দান করেছেন।"

"দেখ, বাজে ব'কো না। তোমার বাবাকে ব'লে পাঠাও, তুটি হাজার টাকা দিয়ে তোমাকে নিয়ে যান—তোমার মা'র কান্না থামুক, তোমার বক্তৃতাও থামুক।"

"তু-বছর হয়ে গেছে, তোমরা আমাকে পাঠাও নি, আমি কবে তোমাকে বলেছি যে, আমাকে পাঠিয়ে দাও? আজ বলছি—বোনটির বিয়ে ব'লে।

একটি দিনের জন্য তোমরা দয়া ক'রে আমাকে পাঠিয়ে দাও, তোমার পায়ে পড়ি, আমার মাথা খাও। পারলে কি বাবা ঐ টাকা দিতেন না? এই দেখ প্রিয়তমার বিয়ে, কিছু না হবে ত বাবার চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ হবে। বাবা ত বলেছেন যে, প্রিয়র বিয়েটা হয়ে যাক, আমিই ও-টাকা যেমন ক'রে পারি শুধবো।"

"হ্যাঁ, তা ত দু-বছর শুনে আসছি, এক দিন আধ দিন নয়।"

"বাবা ত তোমাদের মতন জমিদার নন, দিন আনেন দিন খান, তার উপর এই সব বিয়ে-থাওয়ার খরচপত্র আছে। এখনও তিন বছর হয় নি আমার বিয়ে দিয়েছেন, তোমাকেই ত নগদ দু-হাজার টাকা দিয়েছেন, আর গহনাপত্র দানসামগ্রী সবই ত দিয়েছেন। আবার দেখ, দু-বছর না যেতে যেতে এই মেয়ের বরের খোঁজ পড়েছে—কি করবেন বল?"

"যার নিজের ক্ষমতা নেই, সে পরের কথায় কথা কইতে যায় কেন? টাকা বুঝি অমনি আসে?"

"বাবা পর-উপকারী মানুষ; দোষই বল, গুণই বল, কেউ ধরলে তাকে যেমন ক'রে পারেন উদ্ধার ক'রে দেন।"

"তা মেয়ে বাঁধা রেখেই হোক, আর স্ত্রী বাঁধা রেখেই হোক!"

"ছিঃ ছিঃ! অমন ক'রে ব'লো না। আমার মা বাবা গরিব হোন, দুঃখী হোন, তোমার পূজনীয় ব্যক্তি, অমন ক'রে অমান্যের কথা বললে প্রাণে লাগে।"

"বেশ বেশ, এখন ঘুমুতে দাও।"

"বল না—তুমি কাল ঠাকুরকে বলবে বল। যাতে আমাকে পাঠানো হয়, তা করবে বল? বাবা ত আর টাকা ধার নেন নি, ধার নিয়েছে অপরে—তিনি উপরোধে প'ড়ে খালি তাকে সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন বই ত নয়!"

"আমাদের এক কথা—কথার নড়চড় হ'লে আমাদের এক দিন চলে না। তোমার বাবাকে ব'লে পাঠাও, তিনি যখন মধ্যে আছেন, যা হোক্ অন্য একটা কিছু বাঁধা ছাঁদা রেখে, দুটি হাজার টাকার জোগাড় ক'রে তোমাকে খালাস ক'রে নিয়ে যান।"

"তোমরা জমিদার মানুষ—শুনেছি লক্ষ টাকার বেশী তোমাদের আয়—দু-হাজারে তোমাদের কি এসে যাবে? না হয় দু-হাজার টাকা

গেলই—না হয় মনে করলে একজনকে দান করলে—তোমাদের কি ক্ষতি হবে বল ?”

“এ সব কথা তোমার মুখে আদপে ভাল শোনায় না। যার বাপের ঘরে এক-শ টাকা কখনও একসঙ্গে আসে নি, সে দু-হাজার টাকা ফস্ ক’রে দান ক’রে ফেলে—দাতা কর্ণ !”

“বাপের একসঙ্গে এক-শ না রইল, আমি ত আর আইবড় মেয়ে নই —আমার শ্বশুরের ঘরে ত লক্ষ লক্ষ টাকা আছে, তা আমি কি আর দু-হাজার দশ হাজার দান করতে বলতে পারি নে ? এই দু-হাজার টাকা যদি বাবাকে গুনগার দিতে হয়, তাঁর হয়ত সারা জীবন যাবে ঐ ঋণ শোধ করতে, তাঁর হয়ত অন্নকষ্ট পেতে হবে—কিন্তু দু-হাজারে তোমাদের লোহার সিন্দুকের এক কোণও জানতে পারবে না যে, টাকা কমেছে।”

“টাকা কি আমার ? টাকা ত বাবার—আমি কি করবো ? তাঁর অটল প্রতিজ্ঞা,—টাকা না পেলে তোমাকে বাপের বাড়ী পাঠাবেন না।”

“আচ্ছা, এক কাজ কর না কেন ! তোমার নিজের ত টাকা আছে, প্রজাদের কাছে সুদে খাটে—তাই থেকে তুমি দু-হাজার টাকা কেন বাবাকে ধার দাও না ? বাবা আপাততঃ সেই টাকা ঠাকুরকে দিলে, তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিবেন।”

“জেনে শুনে আমি হাড়কাঠে গলা দিতে যাই আর কি ! তোমার বাপের যত কথার ঠিক, তা ত দেখা গেল। আমার বাবার যে অত বড় প্রতাপ, যে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়—তাঁকেই ঠকালে—আমি ত নিরীহ প্রাণী, আমার টাকা নিয়ে উনি আবার ফিরে দিবেন !—হাঃ হাঃ—”

“তুমি নিরীহ প্রাণী, না তুমি পিশাচ !”

“আমি পিশাচ, না তুমি পিশাচী ? মায়া নেই, দয়া নেই, শুতে এলুম—রাত দুপুরে ঝগড়া, কান্নাকাটি—ছোটলোকের ঘরের মেয়ে আর কত ভাল হবে !”

এবার মনোরমা কাঁদিয়া ফেলিল। মান অভিমান তুচ্ছ করিয়া এত ক্ষণ সে স্বামীকে অনুনয় বিনয় করিতেছিল—যদি বাপের বাড়ী যাইতে পায়—কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, শেষে তাহাকেই হার মানিতে হইল। স্বামী তাহার রোদনে বিন্দু মাত্রও বিচলিত না

হইয়া, ভাল করিয়া পাশ-বালিশ আঁকড়াইয়া, হাই তুলিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিল এবং অবিলম্বে নাসিকার ধ্বনিতে বুঝাইয়া দিল যে, সে ঘুমাইয়াছে।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনোরমা আপনিই চুপ করিল—বিনিদ্র নয়নে আর বিছানায় পড়িয়া থাকিতে ভাল লাগিল না, উঠিয়া গিয়া জানালার পাশে বসিল। জানালা দিয়া খিড়কি, বাগান, পুকুর দেখা যায়—অন্ধকারে গাছগুলাকে ভূতের মত বোধ হইতেছে, যেন রাজ্যের যত ভূতের মাথাগুলা পুকুর-ধারে বাসা করিয়াছে।

মনোরমার শ্বশুর ব্রাহ্মণ—গ্রামের ধনী জমিদার—সকলেই তাঁহাকে ভয় করে—তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। সৎকুলীন ও সুন্দরী বলিয়া গৃহস্থের ঘরে এক মাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। তাঁহার পুত্রটি কালোকোলো, মোটাসোটা, বুদ্ধিটি শরীরের অনুযায়ী—লোকে বলিত 'বড় ভাল মানুষ, একেবারে গোবেচারা।' বাস্তবিক নন্দলাল অধিক কথা কহিত না বা কাহারও সহিত মিশিত না—যদিও সে ধনীর সন্তান, তথাপি তাহার পারিষদের উৎপাত ছিল না; তাহার অকাল-গাম্ভীর্য্যে কেহ তাহার কাছে ঘেঁষিত না।

সম্প্রতি তাহার পিতা তাহাকে জমিদারীর কাজ শিক্ষা দিবার জন্য নিয়মিত কাছারিতে নিজের কাছে বসাইয়া রাখেন, ইহাতে সে মনে মনে কিছু গর্ব্ব অনুভব করিতেছে—এবং মায়ের নিকট ও স্ত্রীর নিকট তাহার খাটুনির পরিচয় মধ্যে মধ্যে দিয়াও থাকে। তাঁহারা পিতা পুত্রে রাত ১০টার পর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, কর্ত্তা হাত মুখ ধুইতে গেলে তবে লুচি ভাজা হয়। পিতা পুত্রে একত্রই আহার হয়, তাঁহাদের আহার শেষ হইলে তবে অন্তঃপুরের মহিলারা আহারাদি করেন, সুতরাং মনোরমা রাত ১২টা ১টার পূর্ব্বে কোন দিনই শয়নগৃহে আসে না। আসিয়া হয়ত দেখে, স্বামী ঘুমাইতেছে, নয়ত দেখে, হাই তুলিতেছে। দুই একটা কথা কোন দিন হয়, কোন দিন না-হয়। আজ সে স্বামীকে জাগ্রত দেখিয়া বাপের বাড়ী যাইবার জন্য ধরিয়াছিল, তাহার ফলে আজ জানালার পাশেই তাহার রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। সে ভাবিতেছে—টাকা যদি দীন দুঃখীকে না দিবেন, তবে কি হবে টাকায়? বাবা গরিব মানুষ, কিন্তু মা বলেন, যদি

জমাতেন ত তিনিও বড়মানুষ হ'তে পারতেন। বাবার কাছে চাইলে তিনি না দিয়ে থাকতে পারেন না। পূজার সময় গ্রামের লোক আমাদের বাড়ী সবাই খেতে যান, কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়ী ত কেউ আসেন না—কি জানি, এঁরা টাকা নিয়ে কি করবেন! যাক গে, আর কাউকে সাধবো না, হোক—এইখানেই আমার হাড় মাটি হোক! কেন যে বাবা এখানে আমার বিয়ে দিলেন!—মেয়ে সুখে থাকবে ব'লে দিলেন—আমার সুখটা কি? ছুটি ছুটি খেতে পাই। গরিবের মেয়ে ব'লে যেন সকলেই একটু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন—বাবা যদি সমান ঘরে দিতেন!—

ভোর হইয়াছে দেখিয়া, একটি গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনোরমা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—ঘুমন্ত স্বামীর দিকে চাহিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। ঠাকুরঘরের কাজ তাহাকে করিতে হয়; সে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া একখানি লাল রঙের চেলীর শাড়ী পরিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে সাষ্টাঙ্গে নারায়ণ-শিলাকে প্রণাম করিল—তার পর করজোড়ে ঊর্দ্ধমুখে 'হরি দয়া কর, বাবা মাকে ভাল রাখ, বাবাকে অপমানের হাত হ'তে রক্ষা কর' বলিয়া বার বার প্রণাম করিল। তার পর চন্দন-পিঁড়ি লইয়া চন্দন ঘষিতে আরম্ভ করিল। প্রতি দিন তাহাকে দশ বারোখানি পুষ্পপাত্র সাজাইতে হয়; দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, তুলসীপত্র, সমস্ত পরিষ্কার করিয়া সাজাইতে অনেক সময় যায়। সকলের পুষ্পপাত্র সাজাইয়া নিজে মহাদেব পূজা করিয়া যখন সে ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইল, তখন তাহার শাশুড়ী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়াছেন—পুত্রবধূর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এর মধ্যে তোমার মহাদেব-পুজো হয়ে গেছে? কত ভোরে উঠেছ? এ কি বৌমা—আজ তোমার মুখ এত শুক্নো কেন? অসুখ করেছে না কি?"

মনোরমা একটু হাসিয়া, "না মা, অসুখ করবে কেন"—বলিয়া নৈবেদ্যের চাল কলা কাক পক্ষীদের দিতে ছাদে চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ফর্দ্দ

"চালের বস্তাগুলো এখনও এখানে প'ড়ে রয়েছে, ভাঁড়ারে তোলা হয় নি?"

"কি করবো, মালী বাজারে গেছে, এখনও ফেরে নি; হারাণে কি একলা এত বড় বস্তা তুলতে পারে? এত চাল আনিয়েছ কেন?"

"বিয়ে-বাড়ীতে চালের খরচ কত! এত চাল আর কই, আরও আসছে। মনোরমার বিয়েতে এর চেয়ে ঢের বেশী চাল লেগেছিল; তা ছাড়া চাল ত আর নষ্ট হবার জিনিস নয়—বেশী হয় ভালই ত; জিনিসপত্র কম হওয়া লজ্জার বিষয়, বেশী হ'লে নষ্ট হবে না, মানুষকে প্রাণ ভ'রে খাওয়ানো যায়।"

"বেশী হ'লে নষ্ট হবে না, তা ত জানি—বেশী হ'লে পয়সা যে বেশী লাগে—পয়সা থাকে তবে ত?"

"অত ভাবতে গেলে চলে না। আবার কাঁদছিলে বুঝি? এমন অবুঝ তোমার মত আর দুটি দেখি নি!"

মনোরমার মাতা অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিল, "কি করবো, আমি যে চোখের জল থামাতে পারছি নে; এই সব আয়োজন দেখে সর্ব্বদা মনোরমার মুখ মনে পড়ছে, আর হু হু ক'রে চোখে জল আসছে। তাই জন্যেই ত বলছি যে, বুঝে সুঝে খরচপত্র কর—যা না করলে নয়, তাই কর—পয়সা রাখতে শেখ। আজ যদি দু-পয়সা রাখতে, তা হ'লে কি মেয়েটা দু-বছর ধ'রে সেখানে প'ড়ে থাকে?"

"ও-সব কি জান, অদৃষ্ট! আর তাও বলি, ধন দেখে তুমি ভুলে গেলে, তোমার জিদেই দিতে হ'ল; তা না হ'লে ওদের ঘরে কি আমি মেয়ে দিতে চেয়েছিলুম? আমি জানতুম যে, ওদের সঙ্গে আমার বনবে না।"

"দেখ দেখি কথা! আমি কি ধন দেখে ভুলেছিলুম? আমি মনে করলুম, গাঁয়ের ভিতর বিয়েটি হ'লে মেয়েটাকে নিত্যি নিত্যি দেখতে পাব। ষষ্ঠীপূজো হোক,-মাকাল পূজো হোক, বাছাকে আনতে পারবো—তাতেই জিদ করেছিলুম—তেমনি উল্টো হয়েছে।"

"হুঁ, অমন স্বর্ণপ্রতিমা মেয়ে, বর হ'ল যেন অসুর—যেমন আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি! সে কি বাপকে দু-কথা বলতে পারে না?"

"আহা, বেঁচে থাক্, তার দোষ কি? সে ছেলেমানুষ—সে কি বাপের উপর কথা কইতে পারে?"

"হোক ছেলেমানুষ, তবু বাপের ন্যায়-অন্যায় বুঝিয়ে দেবার বয়স হয়েছে।"

"তাও বলি, তোমারও বিলক্ষণ অন্যায় আছে। কোথাকার এক মিন্‌সে জোচ্চোর, তার কথায় তোমার কথা কইবার কি দরকার ছিল?"

"আহা, লোকটা দু-হাজার টাকার জন্যে সর্ব্বস্বান্ত হয়, কেঁদে এসে পড়লো, তাই বেয়াইকে গিয়ে বললুম; বেয়াই যে সব ঝোঁক আমার উপর ফেলবেন, তা কি আমি জানি? বেয়াই হাসতে হাসতে বললেন, 'আচ্ছা, দিচ্ছি টাকা, কিন্তু টাকা না পেলে বৌমাকে বাপের বাড়ী পাঠাচ্ছি নে'; আমিও ঠাট্টা ক'রে বললুম, 'হ্যাঁ, আমার মেয়ে বাঁধা রইল'—তা থেকে যে এত দূর হবে, তাই বা কে জানে! আর উদয়চাঁদ যে এমন ব্যবহার করবে, তাই বা কে জানতো! আপনার জন—"

"সে কি বলে?"

"কি আর বলবে? কল্‌কাতায় গিয়ে লুকিয়ে ব'সে আছে; নালিশ ফৈরেদ করলে যদি আদায় হয়।"

"তাই কেন কর না?"

"তাই করতে হবে দেখছি। কি জান—হাজার হোক জ্ঞাতি—আপনার জন—এক ঘর, এক দোর বললেই হয়—লজ্জা করে।"

"তোমার ত লজ্জা করে, আমার যে প্রাণ যায়। মনোরমা না এলে আমার কিছুই ভাল লাগবে না। তুমি একবার গিয়ে বেয়াইয়ের হাতে পায়ে ধর গে না—ও গো, তাই যাও।"

"ঘরে ব'সে বললেই ত হয় না 'ও গো যাও।' 'ও গো' কবে না যাচ্ছে, কবে না বলছে? হাতে পায়ে ধরা সব হয়ে গেছে, সে আশা ছেড়ে দাও। (ছল-ছল নেত্রে) তুমি ত মনোরমাকে দু-বছর দেখ নি—বাছার মুখ মলিন হয়ে গেছে—তা দেখে আমাব প্রাণ যে কেন ফেটে বের হয় নি, তা বলতে পারি নে। আমি কি তাকে আনবার জন্যে কম চেষ্টা করেছি? তারা কসাই, তাদের দয়ামায়ার লেশ নেই!"

"আবার এ মেয়ে যে কাদের ঘরে যাচ্ছে, তা মা-দুর্গাই জানেন! কেন যে মেয়েগুলোর জন্ম হয়!"

"না গো, এরা খুব ভাল লোক। বরের বাপ বলেছেন, তিনি কিছু চান না, আমি যা দেব, তাইতে সন্তুষ্ট হবেন। আমি বলেছি যে, বড় মেয়েকে যা দিয়েছি, একেও তাই দেব।"

"ব'লে ত এলে! তাকে ত নগদ দু-হাজার দিয়েছিলে, একে দেবে কোথা থেকে? নগদ হাতে কিছু আছে?"

"কিছু আছে, আর কিছু বিনোদ আমাকে ধার দেবে বলেছে। সে কাল বললে, 'মামা, তোমা হ'তেই আমার সব; কুলীনের ছেলে, বাপকে কখনও চিনিও না; তোমার এখন দরকার—আমার যা জমেছে, তুমি নাও'।"

"বরের বাপ ত বলছেন কিছু নেব না, মা কিন্তু মস্ত ফর্দ্দ পাঠিয়েছেন। আজ নাপ্‌তে-বৌ গিয়েছিল, তার হাতে এই ফর্দ্দ পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর অনেক কথা ব'লে দিয়েছেন।"

"কি, কি, কি বলেছেন? কই দেখি, ফর্দ্দ দেখি।"

"ঐ যে নাপ্‌তে-বৌ খুড়ীমার সঙ্গে কথা কইছে; তুমি ওর মুখে সব শোন গে, আমার অত মনে থাকে না। ফর্দ্দে অনেক চেয়েছেন।"

"তাতে আর ভয় কি—আমি যা যা দিচ্ছি, তা দেখে সবাই ভাল বলছেন, তাঁহাদের কি আর মনে ধরবে না? দেখে আসি ফর্দ্দটা।"

মনোরমার পিতার খুড়ী বর্ত্তমান, তাঁহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই; তিনি ঘরকন্নার কিছুর মধ্যে থাকেন না; স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করেন; নিজের পূজা অর্চ্চনা করেন, মালা জপেন, পাড়া বেড়ান, গল্প করেন—দিন কাটিয়া যায়।

মনোরমার পিতার সাড়া পাইয়া, "কি রে হরিশ, বাড়ী এসেছিস, এই নাপ্‌তে-বৌ তোর জন্যে ব'সে আছে"—বলিতে বলিতে তিনি নাপ্‌তে-বৌকে লইয়া আসিলেন। খুড়ী দালানের থামে পৃষ্ঠদেশ স্থাপন করিয়া বসিয়া মালা জপ করিতে লাগিলেন; নাপ্‌তে-বৌ হরিশ বাবুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার নিকটেই ভূমিতে উপবেশন করিল। দালানে একখানি তক্তাপোশ ছিল, হরিশ বাবু তাহার উপর বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, "কি গো নাপিত-বৌ, খবর কি?"

নাপিত-বৌ। (একটু ঘোমটা টানিয়া, মৃদু হাসিয়া) আপনকার কন্যের বিয়া, তাই বলি যাই, কাজকর্ম্ম আছে, তাই জানতে এলাম। আর বাবু দেখেন, বরের বাড়ী হ'তে আজ আমাকে ডাকতে এসেছিল, দুটো ভাত মুখে দিয়ে তাড়াতাড়ি গেনু—গিন্নী ঢের কথা কইলে।

হরিশ বাবু। কি বললেন? বরের বাড়ী আর কাউকে দেখলে?

না-বৌ। দেখেন গা বাবু, বরের মা অত-শত জানে না, পাড়াগেঁয়ে মানুষ, বামনের মেয়ে, হেলাখেলা আছে। ঐ যে বরের খুড়ী দেখলুম, বয়স এমন বেশীও নয়, তায় বাপের বাড়ী কল্‌কাতায়, সেই বাবু এই ফর্দ্দ দিলে। বরের খুড়ো কলকাতায় চাকরি করে, বরও খুড়োর কাছে থেকে পড়াশুনো করে। বরের খুড়ীর বাবু একেবারে নাকে কথা কয় চোখে কথা কয়। বললে যে, দেখ নাপিত-বৌ, বেন্‌কে ব'লো, কত্তা কিছু চাইছেন না ব'লে যেন তিনি রুলি-হাতে মেয়ে পার না করেন; এখনকার যে রকম দেওয়া হয়েছে, তা ত তিনি জানেন, একটি মেয়ের বিয়ে ত দিয়েছেন। ডাক্তারি পাস-করা ছেলে, দেখতে সোনার চাঁদ, রূপে গুণে আলো-করা। আর দেখ, বাপ-খুড়ো চারি দিকে জাজ্বল্যমান, ভাত-কাপড়ের দুঃখু নেই—সব যেন বিবেচনা ক'রে দেখেন। আমি বললুম, সে মা আর বলতে হবে না, তাঁরা গরিব দুঃখীকে যে দয়া করেন, নিজের মেয়েকে সাধ্যিমত দেবেন, তা কি আর বলতে হবে? আমার ছেলেটার বে বলতে গেলে দাদাঠাকুরই দিলেন। দাদাঠাকুর আলাদা দিলেন, মা-ঠাকরুণ আলাদা দিলেন, বৌ-ঠাকরুণ নুকিয়ে আবার কত দিলেন, এ গাঁয়ে তাঁদের মত দিতে কে পারে মা? তা বললেন, তা বই কি, তা বই কি, ভদ্দরনোক দেবেন বই কি, তা হাঁ গা, তুমি কি তাঁদের বাড়ী পেরায় যাও? আমি বললুম, পেরায় কি মা, সেই ত আমার ঘরবাড়ী, যা ঘরে নেই, তাই তাঁদের ঘর থেকে আনতেছি; অদ্দেক দিন ত সেখানে পেসাদ পেয়ে থাকি। তার পর বললেন যে, ব'লো বেন্‌কে, খাটখানি যেন দেনো খাট না হয়, ছেলে যেন শুতে পারে, এমন দেখে দেন। আমি বনু, মা আপুনি নেখে দেন, আমি নিয়ে যাই, সব কথা কি মনে থাকে? তাই এই নেখন দিয়েছেন।"—নাপিত-বৌ ফর্দ্দ অঞ্চল হইতে খুলিয়া দিল।

হরিশ বাবু। বাস্ রে, এ যে লেখা ফর্দ্দ, তাই তো! হ্যাঁ গা, বরের মাকে কেমন দেখলে-বলো—দেখতে কেমন?

নাপিত-বৌ। বরের মা বেশ বাবু—গিন্নীবান্নীর মত মোটাসোটা, নাকে একটি নৎ, হাসিটুকু মুখে নেগে আছে। তিনি আরও বললেন, ছোটবৌ, ফর্দ্দ পাঠাচ্ছিস্, কর্ত্তা শুনলে রাগ করবেন; তা খুড়ী বললেন, এমন অন্যায় রাগ করলে চলবে কেন? তোমাদের কি বল, পাড়াগাঁয়ে থাক, কলকাতার কি জান? শুধু-হাতে বৌটি নিয়ে সেখানে গেলে সবাই যে ছি ছি করবে! ছেলের ঘর সাজাতে খাট বিছানা, আলমারি, চেয়ার ডেক্স, এ সব কোথা পাব? সংসার করতে গেলে দিদি, সব রকম চাই, অত ভালমানুষ হ'লে চলবে কেন? আরও ব'লে দিলেন যে, ক'নের গহনার টাকা যেন নগদ দেওয়া হয়, তাঁরা সব গহনা কল্‌কাতা থেকে গড়িয়ে এনেছেন।

হরিশ বাবু। আমিও তাই মনে করেছি যে, মেয়ের গহনার টাকা নগদেই দেব। বরের বাপ বলেছেন—কিছু দিতে হবে না, আমি তা কেন শুনবো, দেব বই কি। মেয়ের আইবড় বেলার যে বালা, তাগা, হার, মল গায়ে আছে, তাই দেব, আর নগদ দু-হাজার দেব, আর বরকে খাট বিছানা, রূপোর বাসন, ঘড়ি, চেন, আংটি, এই সব দেব। তুমি নাপিত-বৌ, একবার গিয়ে তাদের এই কথা তবে ব'লে এস।

না-বৌ। আজ বেলা গেল, আজ আর যাব না, কাল ভোরে উঠে ব'লে আসবো।—বলিয়া নাপিত-বৌ সকলকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

খুড়ীমা। কি কি চেয়েছে হরিশ?

হরিশ। তা বিলক্ষণ! কাটরার জিনিস কত রকমের। খাট, আলমারি, আলনা, আয়না, টেবিল, ডেক্স, চেয়ার—বাপ রে, দেখে আর বাঁচি নে! বামনপণ্ডিতের ঘরে টেবিল চেয়ার—কালে কালে কতই হবে!

খুড়ী। আ রে, তোর জামাই ত আর বামনপণ্ডিত রইল না, ছত্রিশ জাতের মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে ওর আবার বামনাই রইল কোথায় বল্! কাজেই ঐ সব চাই।

হরিশ। চাই বললেই আমি পাই কই? ও-সব জিনিস এ পাড়াগাঁয়ে পাবই বা কোথা? ঐ টাকা ধ'রে দেব, যা ইচ্ছা হয়, মনের মত দেখে শুনে কিনে নিন্।

খুড়ী। হ্যাঁ রে, মন্নুকে আনবার কি হবে ?

হরিশ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) তারা পাঠাবে না খুড়ীমা।

খুড়ী। উদয়ের কি ব্যাপার দেখ্! এক মাসের কড়ারে টাকা নিয়ে দু-বছর হয়ে গেল !

হরিশ। সে দিন পেড়াপিড়ি করেছিলুম ব'লে কল্‌কাতায় গিয়ে পালিয়ে ব'সে আছে।

খুড়ী। আজ ঘাটে উদয়ের মায়ের সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হয়ে গেল।

হরিশ। না না খুড়ীমা, এখন আর কিছু ব'লো না; জ্ঞাতিশত্রু বড় খারাপ, এই বিয়েতেই পারে ত ভাংচি দেবে।

খুড়ী। আ রে, গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করলে আমি কি করবো বল্ ? আমি সারদার মা'র সঙ্গে কথা কইছি, বলছি বলি, মন্নুকে তারা পাঠাবে না কোট ক'রে বসেছে, বৌমা কেঁদে কেঁদে সারা হ'ল, অন্ন জল ত্যাগ করেছে। কোথায় ছিল উদয়ের মা, অমনি ফোঁস ক'রে উঠেছে। বলে, বৌ অন্নজল ত্যাগ করেছে, তা আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলা কেন ? আমার বেটা কি টাকা দেবে না যে, আমার বেটাকে শাপ-গাল দেওয়া ? আমি বললুম, বাঃ, আমি কখন্ তোমার বেটাকে শাপ গাল দিলুম যে, তুমি ফোঁস ক'রে উঠলে ? সারদার মা টাকার কথা মোটে জানতো না, সে বললে, কিসের টাকা ভাই ? তখন আমার কিন্তু বড্ড রাগ হয়েছিল, আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলুম—শুনে সবাই ছি ছি করতে লাগলো। উদয়ের মা কত গা'ল দিলে—সে এক কাণ্ড !

হরিশ। টাকার কথাটা না বললেও চলতো খুড়ীমা; একে ত ও-টাকা আদায় হওয়া দায়, তার উপর লোক-জানাজানি হ'লে লজ্জা ভেঙ্গে গেলে আর কি দেবে ?

এমন সময় হারাণের ভৃত্য শশব্যস্তে আসিয়া বলিল, "বাবু, মুখুজ্যে মশাই এসেছেন।"

হরিশ বাবু ত্রস্তে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কে ? বরের বাপ মুখুজ্যে মশায় ?"

হারাণে। আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁর মেজাজ কেমন গরম গরম দেখলুম, আমাকে দেখে বললেন, "তোদের কত্তাকে শীগ্‌গির ডেকে দে।"

হরিশ বাবু তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইয়া দেখিলেন, তাঁহার ভাবী বেহাই উঠানে বেড়াইতেছেন। তিনি যাইতেই মুখুজ্যে মহাশয় নমস্কারান্তে বলিলেন, "আ রে বেহাই, এই সব কি বল দেখি? দেশে যে আর টিকতে দিলে না! গিন্নীরাই যদি কর্ত্তা হলেন, তবে কর্ত্তারা যান কোথা?"

হরিশ। (ব্যাপারটা অনুমানে বুঝিয়া) কেন মশায়, কর্ত্তারা গিন্নীর পদে অভিষিক্ত হবেন। ঘরকন্নার কাজে আমরা থাকলে তবু রোদে টো টো ক'রে মাথার চাঁদি ফাটে না, সে এক রকম ভালই হবে। এখন ব্যাপার কি বলুন—আগে ঘরে চলুন, তামাক ইচ্ছে করুন।

মু-মশাই। সন্ধ্যে হয়েছে, এখন আর তামাক নয়। একটা কথা বলতে এলুম, ব'লে যাই। বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বেয়ানকে বুঝিয়ে দিন যে, তিনি গিন্নী, তিনি এখনও কর্ত্তা হন নি, ফর্দ্দ-টর্দ্দ আর যেন চেয়ে না পাঠান। আ রে বেয়াই, হাঁ ক'রে আছ যে? ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? তোমার গিন্নী আজ নাপিত-বৌকে পাঠিয়েছিলেন আমার গিন্নীর কাছে এই ব'লে যে, তোমাদের কর্ত্তা ত কিছুই নিতে চান না, তা আমার হ'ল এই শেষ কাজ, আমি কি ডোমের চুপড়ি ধুয়ে মেয়ে দেব? সোনা দানা না দিয়ে কন্যাদান করলে কি দানের ফল হয়? —তা ভাই, শাস্ত্র যত তিনি জানেন, আমরা অত জানি নে, আমার গিন্নীটি সেকেলে মানুষ, অত-শত বোঝেন না: ছোট বৌমা এ-কালের মেয়ে, তিনিই ফর্দ্দটা দিয়েছেন। তোমার গিন্নীকে বল, ও-সব মতলব রাখ, তোমার মেয়ে তোমার জামাই, যখন যা জুটবে দেবে, যখন যা অভাব হবে দেবে, এখন অত ঘটা ক'রে সভা সাজিয়ে দেবার আবশ্যক কি? গরিব ব্রাহ্মণ-সন্তানের বিবাহ, দশ জনকে দু-মুটো খেতে দিতে পারলেই ঢের ঘটা হ'ল। দেখ বেয়াই, আমার কথা শোন ভাই তুমি, যদি দেওয়া-থোয়ার আড়ম্বর কর, তবে এই আমি চললুম, তোমার সঙ্গে কুটুম্বিতা করার সুখ আমার অদৃষ্টে নেই রে ভাই। আমি গরিব ব্রাহ্মণ, বড়মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতা আমার পোষাবে না।

হরিশ বাবু। (সাশ্রুনয়নে ভাবী বৈবাহিককে আলিঙ্গন করিয়া) বেয়াই, কিছু মনে ক'রো না, মেয়েলী কথায় আমাদের কান দেবার আবশ্যক নেই। আমি যেমনটি চাই, ভগবান্ আজ আমাকে তাই মিলিয়ে দিয়েছেন। তুমি পালাবে কোথা!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মনোরমার চিঠি

হরিশ বাবুর খুড়ী মালা জপ করিতে করিতে বলিলেন, "এমন মানুষ আজকালের বাজারে দেখা যায় না। ছেলের বিয়েতে টাকা নেবে না, শুধু তা নয়; টাকা যদি দেয়, তবে বিয়ে দেবে না—এ মানুষ নয়, এ দেবতা!"

হরিশ। তিনি বলেন, দিতে হয় তুমি তোমার মেয়ে জামাইকে সাধ্যমত পরে দিও, এখন কোনও আড়ম্বরের দরকার নেই।

খুড়ী। দেখ্ হরিশ, বৌমা ত কেঁদে কেঁদে সারা হ'ল, ঐ টাকাটা তবে তুই কেন মনুর শ্বশুরকে দিয়ে মনুকে নিয়ে আয় না!

হরিশ। সে কি, তা কেমন ক'রে হবে? আমি বাসী বিয়ের দিন ঐ টাকায় তু-খানা কোম্পানীর কাগজ কিনে বর ক'নেকে যৌতুক করবো। মনুকে যা দেবার, তা ত বেশ ক'রে দিয়েছি; এঁরা অতি ভদ্রতা করছেন ব'লে কি আমি প্রিয়কে ফাঁকি দিতে পারি?

খুড়ী। প্রিয়কে কি ফাঁকি দিতে বলছি? বলছি, বলি তাকে না-হয় দশ দিন পরে দিবি, তার আর কি।

হরিশ। শরীরগতিক কখন্ কি হয় বলা যায় কি? ও টাকাটা কি রাখতে আছে? তা ছাড়া এর পর আবার পাবই বা কোথা—এই ত ছেলেমানুষ বিনোদের টাকা নিচ্ছি। উদয়ের কাছ থেকে আদায় করা—সে বড় সোজা কথা নয়।

হরিশ বাবু শয়ন-গৃহে আসিতেই তাঁহার স্ত্রী ধরিয়া পড়িলেন, "তুমি ঐ টাকা দিয়ে মনুকে আন; বিয়ে-থা চুকে গেলে উদয়ের নামে নালিশ করলেই সে টাকা আদায় হবে। নাপ্‌তে-বৌ আজ মনুকে দেখতে গিয়েছিল, সে এসে বললে যে, সে মেয়ে আর নেই! স্বর্ণলতা একেবারে কাজললতা হয়ে গেছে। আর তার শ্বাশুড়ীও ব'লে দিয়েছে যে, বেন্‌কে ব'লো—গুছিয়ে গাছিয়ে মেয়েকে নিয়ে যেতে—আমি কর্ত্তাকে এত বলছি, তা কর্ত্তা ত শুনবেন না, কি করবো বল। এদিকে বৌমা আমার একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে—তিনি ত মা, তিনি কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত আছেন!"

হরিশ। মনুই কি তোমার মেয়ে—প্রিয়র মুখ পানে চাইতে হয় না? তার টাকা নিই কি ক'রে! মুখুজ্যে মশায় খুব ভাল লোক, কিন্তু তাঁর বাড়ীতে আরও পাঁচ জন ত আছে, তারা যখন পাঁচ জনে পাঁচ কথা কইবে, তখন আবার ঠিক এমনি ক'রে কাঁদতে বসবে, আমি কোন্ দিক্ রাখি বলো?

মনুর মা। মনু যে প্রাণ ত্যাগ করতে বসেছে। জানই ত, সে ছেলেবেলা থেকে কেমন অভিমানী। দু-হাজার টাকা আমাদের দেবার ক্ষমতা নেই, এই লজ্জায় আর শ্বশুরের গঞ্জনায় সে কি বাঁচবে?

হরিশ বাবু খুড়ীর অনুরোধ এক কথায় উড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর অশ্রুসিক্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় ভৃত্য আসিয়া একখানি পত্র তাঁহার হস্তে দিল। মনোরমা লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,

বাবা—প্রিয়র বিয়েতে আমাকে নিয়ে যাবে না? কোন উপায় হয় না কি বাবা?

তোমার মনু।

হরিশ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিলেন—

হ্যাঁ মা, উপায় হয়েছে। আমি কাল তোমাকে আনতে যাব।

তোমার গরিব বাপ।

পত্রখানি পাঠাইয়া দিয়া তিনি বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। মনুর মা নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, কি হয়েছে গা, কোথাকার চিঠি?"

হরিশ বাবু। মনুর চিঠি—প'ড়ে দেখ।

মনুর মা। (পত্র পাঠান্তে) তুমি কি জবাব দিলে গা? বাছা আমার বড় দুঃখে লিখেছে। এই যে একাদিক্রমে দু-বছর সেখানে রয়েছে, এক দিনও নিয়ে আসতে বলে নি।

হরিশ বাবু। আমি কাল তাকে আনতে যাব। তার পর প্রিয়র যা হবার তা হবে—আর ভাবতে পারি নে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মায়ের কোলে

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া হাসিতে হাসিতে মনোরমা আসিয়া ঠাকুরমাকে ও মাতাকে প্রণাম করিল। তার পর মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মেয়ে যত কাঁদে, মাও তত কাঁদে; ঠাকুরমা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, "আর কেন কান্না, এই ত এলি, চুপ কর্, আর কাঁদে না।"—তিনিও চক্ষু মুছিতেছিলেন।

জমিদার-বাড়ীর পালকি, বেহারা, দরোয়ান, দাসী প্রভৃতি বাড়ী সরগরম করিয়া বসিল, তাহাদের আদর অভ্যর্থনা চলিতে লাগিল। চর্ব্ব্য চোষ্য ভোজনান্তে দাসী বলিল, "মা-ঠাকরুণরা, তবে আমরা আসি। মা-ঠাকরুণ ব'লে দেছেন, ও-মাসে ভাল দিন দেখে ব'লে পাঠাবেন, বৌ-ঠাকরুণকে যেন পাঠানো হয়। ঘরের মধ্যে একটি বৌ—তিনি না থাকলে ঘর ভাল লাগে না।"

হরিশ বাবুর খুড়ী বলিলেন, "হ্যাঁ, তা যাবে বই কি, জন্ম জন্ম সেই ঘর করুক—তবে কি না, এই অনেক দিন পরে এল, দু-মাস রাখলেই ভাল হয়; আজ হ'ল এ-মাসের বিশে, মাস ত ফুরলো, দিন আর কই? ও-মাসটা রাখলে তবু দু-দিন রইলুম ব'লে বুঝবে। কচি মেয়ে—তাই বলা, এর পর ছেলেপিলে হ'লে ঐ নিজেই আর থাকতে চাইবে না।"

কুটুম্ব-বাড়ীর লোকজন সকলে চলিয়া গেলে মনোরমার মাতা এক ধামা ডাল লইয়া আসিয়া দালানে ঢালিয়া দিয়া সকলকে ডাল বাছিতে অনুরোধ করিলেন। মনোরমার মাতা, পিসি, ঠাকুরমা ও নাপিত-বৌ ডাল বাছিতে প্রবৃত্ত হইল; মনোরমাও বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার পরিহার করিয়া, একখানি সূক্ষ্ম ঢাকাই ডুরে পরিয়া আসিয়া তাহাদের সহিত কার্য্যে যোগদান করিল। সঙ্গে সঙ্গে গল্প চলিতে লাগিল।

খুড়ী। কেমন রে মনু, তোর শাশুড়ী খুব লক্ষ্মী—না?

মনু। হ্যাঁ ঠাকুরমা, শাশুড়ী খুব ভাল। তাঁর আপনার বৌ কেবল আমি, কিন্তু বাড়ীতে আরও পাঁচ জন আছেন, তাঁদের সবাইকে তিনি খুব যত্ন করেন।

খুড়ী। তোর শ্বশুর এত জনকে ভাত দেয় যে বড়? পয়সা খরচ হয় না?

মনু। কেন, আমার শ্বশুরের অভাব কি? আর যাঁরা বাড়ীতে আছেন, তাঁরা ত আমাদের আপনার। আমার শ্বশুরের মত অত ধন তাঁদের নেই বটে, কিন্তু জমিদারীতে তাঁদেরও ভাগ আছে ত!

নাপিত-বৌ। আজ মনু-মাসিকে যখন আনতে গেছি, ঠাকরুণ মনু-মাসির অনেক সুখ্যাত করলেন, বললেন, (এমন সময় হরিশ বাবু হুঁকা হাতে করিয়া আসিয়া নিকটস্থ তক্তাপোশের উপর উপবেশন করিয়া ধূম পান করিতে লাগিলেন) বৌটি আমার বড় লক্ষ্মী—আমার যেমন পাঁচটার ঘর, বৌটি তেমনি মিশুনে। ওর ছেলেটা কেঁদে সারা হচ্ছে, বৌমা গিয়ে শান্ত ক'রে দুধ খাইয়ে দিলেন; ওর ছেলেটা ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে, বৌমা গিয়ে তাকে ধুইয়ে মুছিয়ে কোলে ক'রে বেড়াতে লাগলেন; ওর চুল-বাঁধা, ওকে ঘুম-পাড়ানো, কিছুতে মা'র আমার আলিস্যি নেই। সবাই ব'লে দিলেন 'বৌমা, বেশী দিন সেখানে থেকো না।'

হরিশ বাবু বসিয়া তামাক টানিতেছেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা প্রিয়তমা তাঁহার পাশে বসিয়া দুই একটি পাকা চুল তুলিয়া দিতেছিল। মনোরমা তাহাকে বলিল, "আয় না ডাল বাছবি।"

প্রিয়। ক'নে মানুষে কাজ করে না।

খুড়ী। কি মেয়ে বাবা!

মনু। হ্যাঁ রে, তোর বরকে দেখেছিস?

প্রিয়। দেখেছি।

মনু। কেমন দেখতে?

প্রিয়। খুব সুন্দর।

খুড়ী। কি বেহায়া মেয়ে, একটু লজ্জা নেই! লক্ষ্মী মেয়ে মনু, তাই এত দিন মুখটি বুঁজে শ্বশুর-ঘর ক'রে এল।

হরিশ বাবু। (হাসিতে হাসিতে) মাসি, তুই শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে ক'দিন থাকবি?

প্রিয়। আমি তিন চার দিন থাকবো বাবা।

হরিশ বাবু। তিন চার দিন বাদে তারা যদি না পাঠায়?

প্রিয়। তা হ'লে তুমি যে দিন আমাকে আনতে যাবে, তোমার হাত ধ'রে অমনি চ'লে আসবো। ঈস্! দিদির মত আমাকে আর ধ'রে রাখতে হয় না!

খুড়ী। আহা, কি গুণের মেয়ে!

মনু। হ্যাঁ রে, তোর বরকে কেমন ক'রে দেখলি?

প্রিয়। কেন, আমি যে ছেলেবেলা বাবার সঙ্গে মুখুজ্যেপাড়ায় বেড়াতে যেতুম; সে আমায় কত চাঁপাফুল পেড়ে দিত।

খুড়ী। তোর না বাপ এখানে ব'সে আছে—একটু লজ্জা নেই?

প্রিয়। শুনলে বাবা, আমার দোষ হ'ল? ঐ মনেই ত দুষ্টু মেয়ে, দেখ না হাসছে; আমাকে ও-সব কথা জিজ্ঞেস করছে কেন? জিজ্ঞেস করলে কি চুপ ক'রে থাকা যায়?

খুড়ী। এ থগ্‌বগে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কি করবে গা,—লজ্জার নাম নেই—কত নিন্দা করবে, তাই ভাবছি।

প্রিয়। সে ভাবনা ভাবতে হবে না ঠাকুরমা। কেমন ক'রে ঘোমটা দিতে হয়, আমি বুঝি জানি নে, হ্যাঁ বাবা?

হরিশ বাবু। মাসি আমার বুদ্ধিমতী—সেখানে গিয়ে চুপ ক'রে থাকবে। হ্যাঁ মাসি, আমার মাকে বুঝি এখনও দিদি বলবি নে, এখনও 'মনে' বলিস?

প্রিয়। না, এখন দিদিই বলি; এখন ঠাকুরমা আমাকে রাগিয়ে দিলেন, তাই একবারটি 'মনে' বললুম।

খুড়ী। হরিশ, তোর আদরেই পিরির অত বাড়। মেয়েমানুষ, পরের ঘরে যাবে যে!

প্রিয়। হ্যাঁ বাবা, বাড়টা কি হ'ল? বলছি সেখানে গিয়ে ঘোমটা দেব, চুপ ক'রে থাকবো—তবু ঠাকুরমা বুঝবেন না!

খুড়ী। হ্যাঁ রে হরিশ, বৌমার হার আর চুড়ি যে কাদের দিলি আট দিনের কড়ারে, আর এক মাস হয়ে গেল, এখনও ত ফিরে আনলি নে? বিয়ে-বাড়ী—বৌটা পাঁচখানা পরবে ত—এখন এনে দে।

হরিশ বাবু। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ত, তাই ত, দেখি পাওয়া যায় কি না! পরশু গেছলুম খুড়ীমা, তারা বললে, মেয়ে এখনও শ্বশুরবাড়ী থেকে আসে নি।

খুড়ী। তোর কি সব-তাতে ঐ রকম! ঘরকন্নার সামগ্রী ত ঘরে কিছু রাখবি নে—আজ আনবি, কাল বিদেয় দিবি! গয়না ক'খানা, তাও ঘরে থেকে বার ক'রে দিলি—আজ বে-বাড়ী পরে কি? হ্যাঁ রে, আর-বছর যে জরির শালখানা কা'কে দিছলি, এনেছিস?

প্রিয়। তা বুঝি জান না ঠাকুরমা—সে শাল আবার বাবা ফিরে আনবেন! মা ক'দিন বলেছিলেন ব'লে বাবা রাগ ক'রে মা'র সঙ্গে দু-দিন কথা কন নি—সেই অবধি মা আর বাবাকে শালের কথা বলেন না। তুমি আবার বলছ, বাবা এবার তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে দেবেন।

হরিশ বাবু। দূর বেটী! ঘরের কথা ফাঁস ক'রে দিচ্ছিস?

খুড়ী। হরিশ, সত্যি বলছি—ঐ তোর বড় দোষ! জিনিসপত্র, টাকাকড়ি, সব বিলিয়ে দিবি, আর পেড়াপীড়ি করলে রাগ ক'রে জিতবি?

হরিশ বাবু। তা ছাড়া আর উপায় কি আছে খুড়ীমা? দেখছ যে সেটা গেছে, তবু তোমরা আন্ আন্ ক'রে বকবে—কাজেই মুখ বন্ধ ক'রে দিতে হয়।

খুড়ী। তবু ত শিক্ষা হ'ল না—

হরিশ বাবু। শিখতে শিখতেই আমার দিন শেষ হয়ে আসবে খুড়ীমা, বুঝে বুঝে কাজ করবার সময় আর থাকবে না।

মন্নু। বাবা, প্রিয়কে কি দিতে হবে গা?

হরিশ বাবু। তোমাকেও যা দিয়েছি মা, ওকেও তাই দেব। শুনেছিস মন্নু, বর কি বলেছে? বলেছে, 'হরিশ বাবুর মেয়ে যদি হয়, তবেই সে এখন বিয়ে করবে, আর না হ'লে এত তাড়াতাড়ি দরকার নেই।'

খুড়ী। আহা, কি গুণের মেয়ে, বর টের পাবেন এর পর—মুখের চোটে বরকে উড়িয়ে দেবে।

নবম পরিচ্ছেদ

বাসর

প্রিয়তমার শুভ বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। বর দেখিতে সুশ্রী, প্রসন্নমুখ; মেয়েরা বাসরে তাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে, বর উত্তর দিতেছে—দেখিয়া শুনিয়া সকলে মহা সন্তুষ্ট।

মনোরমার শ্বশুর নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ তাঁহার পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন, নিজে আসেন নাই। বিবাহের পর বর-ক'নে বাসরে আসিলে, সকলে জ্যেষ্ঠ জামাতাকে বাসরে আনাইবার জন্য অনেক ডাকাডাকি করিল, কিন্তু সে কোন মতেই আসিল না। ইহাতে রমণী-মহলে তাহার সম্বন্ধে নানা প্রকার সমালোচনা হইয়া গেল এবং নূতন জামাতার মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি হইল।

বেচারা মনোরমা এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত শ্বশুর ও স্বামী সম্বন্ধে সকলের মন্তব্য শুনিতেছে। তাহার স্বামী এ পর্য্যন্ত কোন দিন শ্বশুরবাড়ীতে রাত্রিবাস করে নাই; বৎসরে বৎসরে সে জামাইষষ্ঠীর দিন শ্বশুরবাড়ীতে আসিত এবং আহার করিয়াই চলিয়া যাইত। পূজার সময় বিজয়া দশমীর পরদিন প্রণাম করিতে আসিত মাত্র। শাশুড়ী তাহাকে বৎসরে এই দুইটি দিন দেখিতে পাইতেন। জামাই বেশী কথা কহিত না; 'আজকের দিনটি থাকিয়া যাও' বলিলে, বলিত, 'বাবা বিরক্ত হইবেন,'—শুনিয়া শাশুড়ী নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিরস্ত হইতেন। স্বগ্রামেই মনোরমার বিবাহ হওয়াতে বড় সাধ, বড় আশা করিয়াছিলেন যে, মেয়ে-জামাইকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইবেন—সে আশায় ছাই পড়িয়াছে। এখন কেবল মনে মনে কামনা করেন, 'হে হরি, দেখতে পাই আর না-পাই, আমার নন্দ আর মনু যেন বেঁচে বর্ত্তে থাকে।' মনোরমা পাছে ব্যথা পায়, এ জন্য মাতা পিতা তাহার সমক্ষে তাহার শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করিতেন না—কিন্তু অপরে যাহার যাহা বক্তব্য, অবাধে বলিয়া যাইত; তাহা মনোরমার শ্রুতিকটু বলিয়া পিত্রালয়ে এত দিন পরে আসিয়াও সে সুখী হইতে পারিতেছিল না—মন তিক্ত হইয়া রহিয়াছে।

বাসর-ঘরে তাহার ভগিনীসম্পর্কীয়ারা মিলিয়া দুইটি বর-শয্যা পাতিয়াছে—একটিতে বর-ক'নে বসিবে এবং একটিতে মনোরমা ও তাহার স্বামীকে বসাইবে। তাহারা মনোরমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া চন্দন ও পুষ্পমাল্য পরাইয়া 'ক'নে' সাজাইয়াছে। লজ্জা ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইহাতে মনোরমার অন্তরটি প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু শত সহস্র ডাকাডাকিতেও যখন তাহার স্বামী অন্তঃপুরে আসিল না, সঙ্গিনীগণ নিতান্ত উৎসাহহীন ও নিরানন্দ হইয়া যখন 'বেরসিক, ভুঁদো, এমন রত্নের মূল্য কি জানবে' বলিয়া মনোরমার দিকে করুণনেত্রে চাহিয়া দেখিল, তখন তাহার মনে

হইল, 'হে পৃথিবি, দ্বিধা হও।' লজ্জায় অপমানে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অশ্রুরোধ হয় না—তথাপি তাহাকে হাসিয়া বলিতে হইল, "বেশ হয়েছে, যেমন আমাকে এত ক্ষণ জ্বালালি, এখন মর্, তোরা জ্ব'লে মর্।" সমবয়সীরা তবুও ক'নের বেশে তাহাকে বাসর-ঘরে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল, কিন্তু এবার সে প্রাণপণে খাট আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল ; তাহার গায়ে যেন অসুরের বল !

সখীদের এত জল্পনা-কল্পনা সব মাটি হইয়া গেল ; টানাটানি হইতে নিরস্ত হইয়া তাহারা বিষণ্ণ মনে বাসরে ফিরিয়া গেল, গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত হইয়া রহিল। দেখিল, সে দ্বিতীয় বর-শয্যাটিতে বরের বাপ ও ক'নের বাপ দুই জনে বসিয়াছেন—ক'নের মুখে ঘোমটা নাই ; বর-ক'নে মৃদু মৃদু হাসিতেছে—বরের বাপের হাঃ হাঃ হাসিতে বাসর সরগরম। দুই বেহাইয়ের অবস্থিতিতে রমণীগণ যদিও একটু আধটু ঘোমটা টানিয়া একটু জড়সড় ভাবে রহিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই তাহাতে অপ্রসন্ন হন নাই। বরের বাপ ক'নের বাপের গলা ধরিয়া জোর করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছেন। নবীনার দল বাসরে প্রবেশ করিয়াই এই যুগল-মূর্ত্তি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। একটি ছোট মেয়ে বলিয়া উঠিল, "ও মা, এ কি !" বলিয়া সে অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। বরের পিতা তাহাকে টানিয়া আনিয়া কোলে বসাইয়া বলিলেন, "কেন গা লক্ষ্মি, নূতন কি দেখলি গা ? ঐ দেখ্, আমাদের দু-ভাইয়ের বাবা আর মা দু-জনে চক্‌চকে বিছানায় ব'সে আছে—আমরা হচ্ছি কোলের ছেলে, আমাদের কি চক্‌চকে বিছানায় বসতে সাধ যায় না ? মায়েরা সব হেসে অজ্ঞান হলি যে—আয়, মা সব আয়—ব'স্—সবাই আমার মাকে আর বাবাকে ঘিরে ব'স্, আমি একবার ভাল ক'রে দেখি। এমন দিন আর আমার হবে না।"—বলিয়া তিনি গান ধরিলেন—

'আনন্দরূপিণী গৌরী কোথায় মা লুকায়ে ছিলি !'

তিনি আগমনী গাহিতে লাগিলেন—তাঁহার মুদ্রিত চক্ষুর্দ্বয় হইতে জল ঝরিতেছে—তিনি নিজের গানে নিজে মুগ্ধ হইয়া গানের পর গান গাহিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া দিলেন। বাসরে আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রবাহ বহিয়া বর-ক'নে ও মহিলাগণের মন প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

বরের পিতার সঙ্গীতে সকলে এমন তন্ময় হইয়াছিলেন যে, বরকে আর কেহ গান করিতে অনুরোধ করে নাই। ইতিপূর্ব্বে অনুরুদ্ধ হইয়া বর বলিয়াছিলেন যে, তিনি ত গাহিতে জানেন না, জানিলে গান করিতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না। ইহাতে রমণীকুল ক্ষুব্ধা হইয়া উঠিয়াছিলেন—এক্ষণে তাঁহাদের সকল ক্ষোভ দূর হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

বিদায়

বাসর-রাত্রি প্রভাত হইল—সকলের মনেই একটা বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। আজ বাসী বিয়ে—বাসী ফুলের মত সকলেই ম্লান, শুষ্ক। বিবাহের উৎসাহে কয়েক দিন সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়াছেন, শরীরকে শরীর জ্ঞান করেন নাই, মনের বলে কাজ করিয়াছেন —আজ আর শরীর বহে না, মনে বল নাই।

সুপ্তোত্থিতা মনোরমা শুনিল, তাহার স্বামী আসিয়াছেন, তাহার সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিতে অন্তঃপুরে আসিতেছেন।

নন্দলাল আসিয়া খাটে বসিলেন। মনোরমা একটু ঘোমটা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার স্বামী হাসিয়া বলিল—"ব'স না।" এই অপ্রত্যাশিত আদর পাইয়া মনোরমা কিছু বিস্মিত হইল, ইহা কদাচিৎ তাহার ভাগ্যে ঘটিত। সে খাটের ধারে দাঁড়াইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এমন সময় এসেছ কেন?"

নন্দ। বাবা পাঠিয়ে দিলেন; বর-ক'নেকে যৌতুকের জন্যে কিছু দেওয়া হয় নি, তাই এই চারটি টাকা দিলেন।

মনু। চারটি টাকা!

নন্দ। বাবা দিলেন—(স্ত্রীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অপ্রতিভ ভাবে) তা আমি আর চারটে টাকা দিচ্ছি, তা হ'লেই ত যথেষ্ট হ'ল।

—বলিয়া নন্দলাল হাসিল। মনোরমা স্বামীর হাসি-বিরল মুখে হাসি দেখিয়া, ব্যাপারখানা কি বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তা তুমি কেন এসেছ?"

নন্দ। তোমার গহনার বাক্সটা দাও, আমি নিয়ে যাই। তোমার বাবা দু-হাজার টাকা নিশ্চয় এখনও পান নি, এখনি আবার তোমার

গহনাগুলো বাঁধা দিয়ে বসবেন। এদিকে একটি পয়সা নেই, বড়মানুষিটুকু আছে! তোমার বোনের শ্বশুর এত ক'রে বলেছেন যে, টাকা চাই না, উনি তবু দু-হাজার টাকা আশীর্ব্বাদী দেবেন, ওঃ! তাই বাবা বললেন, 'গহনার বাক্সটা নিয়ে এস গে যাও, যদি আবার বাঁদা ছাঁদা পড়ে, কে তখন থানা পুলিস করবে বলো'।"

অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত মনোরমার মুখে কথা বাহির হইল না। তাহার সুন্দর মুখখানি লজ্জায়, অপমানে, ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ভাবগতিক দেখিয়া তাহার স্বামীও চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে মনে মনে মনোরমাকে একটু ভয় করিত। পিতৃআজ্ঞায় নন্দলাল গহনার বাক্স লইতে আসিয়াছে বটে, কিন্তু কাজটা যে সহজ নয়, তাহা সে বুঝিয়াছিল।

অনেক ক্ষণ পরে নন্দলাল বলিল, "এই নাও টাকা, আমি আর বসতে পারি না।"

মনোরমা টাকা লইয়া বলিল, "আমার একটি বোন, আমি রাজার বৌ, দু-চার টাকা যৌতুক দেওয়া কি আমার ভাল দেখায়! আমি প্রিয়কে এক ছড়া মুক্তোর মালা আর বরকে একটি হীরের আংটি যৌতুক দেব। মালা ছড়াটি আমার, আর আংটি এখানে আসবার সময় ঠাকুরমা যৌতুক দেবার জন্যে দিয়েছেন। ঠাকুরমা ব'লে দিয়েছেন, ভাল রকম যৌতুক না দিলে ঠাকুরের নিন্দে হবে।"

নন্দ। (অত্যন্ত ব্যস্তভাবে) সর্ব্বনাশ! তুমি বল কি—মুক্তোর মালা আর হীরের আংটি! আমাদের বাড়ীতে ত হাজার টাকার কম দামের আংটিই নেই। আর মালার দাম যে কত হবে, তার ঠিক নেই। ও-সব সেকালের জিনিস, এখনকার দিনে পাওয়াই যায় না। দেখ, বাবা শুনলে এমন চ'টে যাবেন যে, জন্মে আর এ-মুখো হ'তে দেবেন না; যদি বাপের বাড়ী আসার ইচ্ছে থাকে, তবে এমন কাজ ক'রো না। দাও, গহনার বাক্সটা আমাকে দাও, বাবা যা দিয়েছেন, তাই দাও গে।

মনোরমা বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দেখ, আমি জানি যে, ঐ মালা আর আংটি দিলে এ-জন্মের মত আমার বাপের বাড়ীতে আসা আমার অদৃষ্টে আর ঘটবে না; কিন্তু যখন ঠাকুরমার অনুমতি পেয়েছি, তখন আমি ঐ যৌতুকই দেব। গহনার বাক্স আমি এত

লোকের সাক্ষাতে দিতে পারি নে—লোকে বলবে কি! আর তোমাদের ভয় নেই, বাবা টাকা পেয়েছেন।"—বলিয়াই সে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

গৃহস্থেরা সকলে বুঝিয়াছিল যে, মনোরমার স্বামী যৌতুকের সামগ্রী লইয়া আসিয়াছেন। আশীর্ব্বাদের সময় সকলে উৎসুক নেত্রে মনুর প্রদত্ত যৌতুক দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল ও বলিল, "মনুর শ্বশুরের আক্কেল বিবেচনা আছে—যেমন দিতে হয়, তেমনি দিয়েছেন।"

বৈকালে বরের পিতা বর-ক'নে লইতে আসিয়াছেন। আশাতীত 'শয্যাতোলানি' পাইয়া রমণীগণ মহা সন্তুষ্ট। গ্রামভাঁটি, বারোয়ারি, স্কুলের চাঁদাওয়ালারা প্রভৃতি সকলে 'জয় বর-ক'নের জয়, হিপ্ হিপ্ হুরে' করিতে করিতে হাস্যমুখে রাস্তা মাতাইয়া চলিয়া গেল। দুঃখী কাঙ্গালীরা 'ভগবান্ বর-ক'নেকে বাঁচিয়ে রাখুন' বলিয়া দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিল। ইতর ভদ্র সকলেই একবাক্যে বলিল যে, বরের বাপ অতি সজ্জন, অতি ভদ্র।

হরিশ বাবুর খুড়ী আসিলে তাড়া দিয়া বলিলেন, "তোদের যে ক'নে সাজানো হয় না গো। ভর্ সন্ধ্যাবেলা কি বর-ক'নে বিদেয় দিতে আছে!" মনোরমা বলিল, "এই যে, আমার হয়েছে ঠাকুরমা, খালি কাপড় পরালেই হয়, তুমি যাত্রার উদ্যোগ করতে বল গে, আমি ক'নে নিয়ে যাচ্ছি।" এই কথা শুনিবা মাত্র প্রিয়তমার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল দেখিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "ও কি প্রিয়, ও কি দিদি, এই যে তুমি বলেছিলে, তুমি হাসতে হাসতে যাবে, মনুর মত কেঁদে হাট পাকাবে না?" ইহা শুনিয়া প্রিয়তমা মনোরমার বুকে মুখ লুকাইয়া আরও কাঁদিয়া উঠিল। মনোরমার রুদ্ধ অশ্রু আর বাধা মানিল না, দুই ভগিনীতে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিল। সমবেত সকলের চক্ষেই অশ্রুর প্রবাহ ছুটিয়া বাহির হইল। কোথায় সে বাসরের আনন্দ-কোলাহল, কোথায় সে হাসি খুশি!

প্রিয়তমা অধিক কথা কহিত বলিয়া কেহ তাহাকে বলিত 'থগ্‌বগে,' কেহ বলিত 'দজ্জাল মেয়ে' ইত্যাদি। কাল হইতে তাহার মুখে আর কথা নাই; সুন্দর বর, স্নেহময় শ্বশুর, আনন্দ-কোলাহলময় বিবাহসভা ও বাসরের উচ্ছ্বসিত আনন্দের মধ্যেও তাহার মুখে বিষাদের ছায়া

পড়িয়াছে। সে যে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না যে, আজ সে জন্মের মত পর হইয়া গিয়াছে!

বিদায়ের সময় উপস্থিত—এবার বিদায় দিতে হইবে। মাতা কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন—কন্যা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। একজন প্রবীণা রমণী আসিয়া বর-ক'নেকে 'যাত্রা' করাইতে বসিলেন—কপালে দধি, সিন্দূর ও চন্দনের ফোঁটা দিয়া, পরে সিদ্ধি বিল্বপত্রের ঘ্রাণ লওয়াইয়া তাহা ক'নের অঞ্চলে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। তখন ক'নের ঠাকুরমা, মা, খুড়ীমা, জেঠাইমা, পিসিমা, মামীমা প্রভৃতি সকলে একে একে বরের হাতে ক'নেকে সমর্পণ করিয়া দিয়া বলিলেন—"এত দিন আমাদের ছিল, আজ হ'তে তোমার হ'ল, প্রিয়তমার সকল দোষ তুমি ঢেকে নিও"—বলিতে বলিতে সকলেরই চোখ দিয়া জল উছলিয়া পড়িতে লাগিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক'নের সুন্দর মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, চন্দন মুছিয়া যাইতেছে, কেহই তাহাকে শান্ত করিতে পারিতেছে না।—সাশ্রুনয়নে হরিশ বাবু আসিয়া বলিলেন, "আর দেরি নয়, এবার এস—বাঁ পা আগে বাড়াও মা—দুর্গা দুর্গা।"

সোনার ঝিনুক

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুন্দর বাংলা

আরায় রেলপথের ধারে দিব্যি বাংলাখানি। বাড়ীর চারিদিকে বাগান, বাগানে সুরকি-ফেলা লাল লাল রাস্তা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাগান—বারো মাস ফলে ফুলে, তরি-তরকারিতে ভরা থাকিত। রেলযাত্রী ভাল করিয়া বাগানখানি দেখিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিত, অপরিচিত পথিকগণ পথ চলিতে চলিতে বলাবলি করিত, 'বোধ হয় কোন সাহেবের বাংলা।'

বাস্তবিক কিন্তু বাগানখানিতে বাঙ্গালী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বরদাকান্ত বাবু বাস করিতেন। বাগানে তাঁহার বড় সখ। রাশি রাশি ফুলের গাছ লাগাইয়া তিনি বাগানের শোভা বাড়াইয়াছেন। তাঁহার বাগানের তরকারির সুস্বাদ আরার প্রত্যেক বাঙ্গালীর রসনাকে তৃপ্ত করিয়া থাকে। তিনি নিজে বাগানের তত্ত্বাবধারণ করেন, মালীর সঙ্গে মালী হইয়া কাজ করেন, তাই বাগানখানি এমন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন।

বাংলার মধ্যে একটি বড় ঘর। বড় ঘরের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে মাঝারি মাঝারি চারিটি ঘর ও ছোট ছোট দুটি ঘর। উত্তর ও দক্ষিণে মোটা মোটা থামওয়ালা দুইটি বারান্দা। লম্বা লম্বা বারান্দা-জোড়া চার পাঁচটি সিঁড়ি দিয়া বাগানে নামিতে হয়। দক্ষিণে বাহির-বাড়ী, উত্তরে অন্তঃপুর। দক্ষিণ-পূর্ব্বের ঘরটিতে তক্তাপোশ পাতা, ঢালা বিছানা করা, তাহাতে ছোট বড় মাঝারি কতকগুলি তাকিয়া, চার-পাঁচটি হুঁকা বৈঠকে বসানো, তাস পাশা, এক জোড়া বাঁয়া-তবলা, একটা তানপুরা, একটা বাক্স হারমোনিয়ম, একটা সেতার। এইটি বাবুর খাস বৈঠকখানা। প্রতি দিন সন্ধ্যায় দুই-দশ জন প্রবাসী বাঙ্গালী এইখানে আসিয়া গান বাজনা করিতেন। শনিবারে মজলিস কিছু জমকাল রকম হইত। প্রায় প্রতি শনিবার রাত্রে ডেপুটি বাবু ভোজ দিতেন। বৈঠকখানার পাশের ঘরটি বরদা বাবুর শয়ন-ঘর। একখানি খাট, একটি দেরাজ, একখানি আরাম-চৌকি ও তাহার পাশে একখানি ছোট টুল। দেরাজের উপর একটি জুয়েল ল্যাম্প, একটি ঘড়ি,

একটি পানের ডিবে, একটা কলম, একটা দোয়াত, একখানা খাতায় কয়েকখানা চিঠির কাগজ, এক টুকরা ব্লটিং, তু-চারখানা বাঙ্গালা বই সর্ব্বদাই থাকিত। শয়ন-ঘরের পাশের ছোট ঘরটিতে হাত-মুখ ধোয়া ও স্নান হইত। একটা দড়িতে তুই একখানা গামছাও ঝুলিত।

পশ্চিম দিকের দক্ষিণের ঘরটিতে একটি টেবিল, তিন-চারখানা চেয়ার, তু-তিন আলমারি চকচকে ঝকঝকে বই। টেবিলের উপর দোয়াত কলম কাগজ প্রভৃতি সজ্জিত আছে। এই ঘরে ডেপুটি বাবু লেখাপড়া করেন। অনেক সময় দেখা যায়, যখন বাবুরা খাস বৈঠকখানায় তাস পাশা লইয়া ব্যস্ত, তখন বরদা বাবু পড়িবার ঘরের দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া একখানি চকচকে নূতন বই লইয়া মনোযোগ সহকারে পড়িতেছেন। তাস পাশায় তাঁহার অনুরাগ ছিল না। তিনি নিজে সুকণ্ঠ এবং গান বাজনা শুনিতেও ভালবাসিতেন। এই ঘরে তুইটি ফুলদানিতে ফুটন্ত ফুল সাজানো থাকিত। বরদা বাবুর স্ত্রী নিজের হাতে তু-বেলা ফুল সাজাইয়া দিতেন।

বরদা বাবুর পড়িবার ঘরের পাশের ঘরটিতে তাঁহার মাতা শয়ন করেন। এক কোণে একখানি নেয়ারের খাটিয়া পাতা, দিনের বেলা বিছানাটি গুটানো থাকিত। এক কোণে একটি পিতলের পিলসূজ, এক দিকের কুলঙ্গিতে একটি পঞ্চপাত্র ও একটি ছোট পিতলের কলসীতে কিছু গঙ্গাজল সঞ্চিত থাকিত। দেওয়ালে লাগানো গোঁজ-আলনায় একখানি তসর কাপড়, খান তুই তিন থান, একখানি আসন ও হরিনামের মালা ঝোলানো। প্রাতে ও সন্ধ্যায় তসর কাপড়খানি পরিয়া, আসন ও পঞ্চপাত্রটি পাড়িয়া বরদা বাবুর মাতা সন্ধ্যা আহ্নিক করেন।

এই ঘরের পাশের ছোট ঘরটি ভাঁড়ার-ঘর। সে ঘরে চাল ডাল প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী হাঁড়ি কলসীতে ভরা ভরা আছে। কোলঙ্গায় আচার, বড়ি। এক কোণে বঁটি, কুরুনি, জাঁতা, চুপড়িতে তরি-তরকারি ইত্যাদি থাকে।

মাঝের বড় ঘরটির এক কোণে কয়েকটা টিনের ট্রাঙ্ক, একটা আলনা, তাহাতে বাবুর আপিসের কাপড় থাকে, আর এক পাশের দেওয়ালে একখানা আয়না ও ব্র্যাকেটে চিরুনি ব্রুশ। আর একটা দেওয়ালে একটা গোঁজ-আলনা, তাহাতে ডেপুটি বাবুর স্ত্রীর শাড়ীগুলি কোঁচানো থাকে। এক কোণে একটা মাতুর, এক কোণে খানকত আসন, একটা চৌকিতে

কয়েকটা কাঁসার রেকাবি ও গেলাস ইত্যাদি আসবাব। এই ঘরে ডেপুটি বাবু আহার করেন।

দক্ষিণের বারান্দায় কয়েকখানা বেঞ্চি, টুল, চেয়ার আছে—বাবু ও তাঁহার বন্ধুবান্ধব, আমলা প্রভৃতিরা সেখানে বসিয়া বাগানের সৌন্দর্য্য ও দক্ষিণের বাতাস উপভোগ করেন। উত্তরের বারান্দায় কয়েকটি পাখীর খাঁচা ঝুলিতেছে, তাহাতে টিয়া, ময়না, লালমনিয়া, যমুনা প্রভৃতি পাখীগুলি সর্ব্বদাই ঝটপট, কিচিমিচি করিতেছে। এগুলি ডেপুটি বাবুর স্ত্রীর বড় যত্নের ও আদরের সামগ্রী। উত্তরে কতকটা জমি বেড়া দিয়া ঘেরা, সেখানে কতকগুলি ফুল ও তরকারির বাগান, গোটা দুই আমগাছ, একটা পেয়ারাগাছ, একটা লেবুগাছও আছে। দিনের অধিকাংশ সময় ডেপুটি বাবুর স্ত্রী এই বাগানটুকুতেই সময় অতিবাহিত ও গাছগুলির পরিচর্য্যা করিত এবং ফলের সময় লবণ-সংযোগে ফলগুলির যথাযোগ্য সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত থাকিত।

এই ভূমিখণ্ডের পশ্চিমে ঘেরার মধ্যে গোটা দুই তিন ঘর, তাহার একটাতে আমিষ রান্না হইত। একজন ব্রাহ্মণ সকালে ও বিকালে রাঁধিত এবং দুপুর বেলা ডেপুটি বাবুর কাছারিতে চাপরাসীর কাজ করিত। ডেপুটি বাবুর প্রায় কোন ভৃত্যকেই বেতন দিতে হইত না; তাহারা সরকারী চাপরাসী, তিনি বকশিশ বা খোরাকি দিয়া আবশ্যকমত কাজ পাইতেন। একজন দাসী তাঁহার নিজস্ব ছিল—সে রান্নাঘরের কাজ করিত ও দুপুর বেলা আমগাছ-তলায় বা বারান্দার সিঁড়িতে পা ছড়াইয়া বসিয়া "বহুমা"কে তাহার গ্রামের কথা, তাহার সন্তানদের কাহিনী বলিত। সেই এক কথা শুনিয়া শুনিয়া শুনিয়া, বলিয়া বলিয়া বলিয়া শ্রোতা বা বক্তা কাহারও এ পর্য্যন্ত বিরক্তি বোধ হয় নাই।

রান্নাঘর দুইটির একটিতে পাঁড়ে রাঁধিত, একটিতে ডেপুটি বাবুর মাতা স্বহস্তে নিরামিষ পাক করিতেন। তাঁহার মাতা যদিও বৃদ্ধা ও দিন দিন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, তথাপি তিনি স্বপাকে আহার করিতেন এবং পুত্র, পুত্রবধূ ও নিজের বৈকালিক জলযোগের খাবারও নিজের হাতে প্রস্তুত করিতেন।

বরদা বাবুর স্ত্রীর বয়স পনর-ষোল। বৎসর চার হইবে বিবাহ হইয়াছে, শাশুড়ীর বড় আদরের বউ। ইদানীং মা রাঁধিতে গিয়া প্রায় ছেঁকা

লাগাইতেন; চোখে ভাল দেখিতে পান না, ছানি পড়িয়াছে, তাই বউ বায়না করিয়া বিকালের খাবার তৈরি করিতে চাহিত। খাবার করা লইয়া প্রত্যহ শাশুড়ী বৌয়ে বচসা হইত—বউ বলিত, মা, তুমি লুচিগুলো মেখে বেলে দাও, আমি ভাজি। শাশুড়ী বলিতেন, তোমার মাখতেও হবে না, ভাজতেও হবে না, শুধু বেলে দাও, তা হ'লেই হবে।

বৌ। মা, আমি ত এখন বড় হয়েছি, এখন ত আমি লুচি ভাজতে শিখেছি, তবে তুমি আমাকে ভাজতে দেবে না কেন? বিশেষতঃ আজকাল ত প্রায় তোমাব হাতে ছেঁকা লেগে যায়।

শাশুড়ী। তুমি যে মা পোয়াতী মানুষ, একে অমনিতেই মাথা ধরে, আরও অসুখ করবে। ডাক্তার বলেছেন যে, এই শীতকালে ছানি তুলে দিলে আমি বেশ দেখতে পাব—তবে তুমি কেন কষ্ট করবে, একটা চোখেতে আমি এখনও ঝাপসা ঝাপসা দেখছি।

বৌ। তা হোক—আমাকে কি করতে নেই? এখন বলছ পোয়াতী মানুষ, এর পর বলবে কচি ছেলে কোলে, তবে আমি কবে করবো!

শাশুড়ী। আমি ম'রে গেলে তুমি ক'রো—যত দিন আছি, তোমরা খেয়ে খেলিয়ে নাও। চোখের জন্যে কত দেবতার দোর ধরেছি, চোখ হ'লে পূজা দিতে হবে। চোখ না থাকলে মিথ্যা মানুষ, তোমাদের গলগ্রহ হয়ে কি থাকবো?

তাঁহার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, অনেকগুলি সন্তান নষ্ট হইয়া শেষ সন্তান ডেপুটি বাবু—অনেক যত্নে ও কষ্টে ইহাকে মানুষ করিয়াছেন। এখন ডেপুটি বাবুর বয়স ৩০।৩২, নিজে উপার্জ্জনক্ষম হইয়া একটু বেশী বয়সে বিবাহ করিয়াছেন। বৌটি লক্ষ্মী—মাতা ও পুত্র উভয়েরই মনের মত। এই চারিটি বৎসর তাঁহাদের বড় সুখে ও শান্তিতে দিন কাটিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আয়োজন

ডেপুটি বাবু আহারে বসিয়াছেন, মা সম্মুখে পাখা হাতে করিয়া বসিয়া মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে কথা কহিতেছেন। বৌ মায়ের

পিছনে দাঁড়াইয়া আছে, যেন কেবল শাশুড়ী কখন কি দিতে বলেন, সেই অপেক্ষাতেই আছে—যেন বড় অনুগত বধূ—কিন্তু বাস্তবিক যে নিরীহ ভালমানুষটির মত দাঁড়াইয়া আছে, তা নয়! কখনও ইঙ্গিতে বরদাবাবুকে আরও মাছ খাইতে অনুরোধ করিতেছে, অনুরোধ রক্ষা না করিলে কিল দেখাইতেছে, কখনও রাগ করিতেছে, কখনও মায়ের সম্মুখে অপ্রতিভ করিবার জন্য নানারূপ মুখভঙ্গি করিতেছে। বরদা বাবু তাহার ছেলেমানুষি দেখিয়া যখন নিতান্ত হাসি রাখিতে না পারেন, তখন মায়ের একটা সামান্য কথার ছল ধরিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠেন—বৌ নিজের কীর্ত্তিতে হাসি না রাখিতে পারিলে সরিয়া পড়িতেছে। শাশুড়ী এ সবের কিছুই জানেন না; তিনি বৌকে "দুধের বাটি দাও গো, মিষ্টি দাও গো, জল দাও গো" বলিয়া আদেশ করিতেছেন, তখন ঘোমটা দিয়া লক্ষ্মী বৌটি শাশুড়ীর আদেশ পালন করিতেছে।

বরদা বাবুর মা বলিলেন, "বাবা, বৌয়ের ত ন-মাস পড়ে, ও-মাসের ৮ই দিন করেছি, সাধ দেব। তুই সব গোছগাছ ক'রে দে।"

বরদা। তা মা, কি করতে হবে বল। বেনারসী কাপড় আর চুড়ি ত দু-এক দিনের মধ্যেই এসে পৌছবে—আর কি চাই?

মাতা। ইচ্ছা আছে, এখানকার বাঙ্গালী মেয়েগুলিকে সেই দিন আনবো। আড়াই বছর হয়ে গেল এখানে আছি, কাকেও ত কখন খাওয়াই নি, লোকের বাড়ী খেয়েই আসি। এই উপলক্ষ্যে পাঁচ জনকে আনবো মনে করছি।

বরদা। কিন্তু মা, তুমি একে একলা মানুষ, তাতে আজকাল চোখে ভাল দেখতে পাও না, সকলকে এনে যদি ভাল ক'রে যত্ন আদর না করতে পার, তবে বড় নিন্দে হবে। তার চেয়ে মা, কাউকে না আনা ভাল। বিশেষ সাধে আবার কাপড় দেওয়া আছে—লোকের দণ্ড করা বই ত নয়।

মাতা। তা বাবা, সে ত সব-তাতেই আছে, তা ব'লে কি সাধ-আহ্লাদ করব না? একটি বৌ, ওরও ত একটা আমোদ আহ্লাদ করতে ইচ্ছে যায়। আদর-যত্নের অভাব হবে না, বাঁড়ুজ্যেদের গিন্নীকে ভাঁড়ারে রাখবো এখন—আর তাঁর বৌয়েরা আর মেয়ে পরিবেশন করবেন এখন, পাঁড়ে আর তার ভাই লুচি-টুচি ভাজবে। আমি সবাইয়ের সঙ্গে কথা কইব এখন। সকালে পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত রেঁধে পাঁচটি এয়ো নিয়ে নেমকর্ম্মটি

করব। বিকেলে দশ জন আসবে, লুচি-টুচি খাবে—লুচির যজ্ঞিতে তত লেঠা নেই, ভাতের যজ্ঞির বড় লেঠা। বাঁড়ুজ্যেদের দুই বৌ আর মেয়েকে সকালে খেতে বলবো, আর বৌমার মাসিকেও বলবো, তারা মায়ে ঝিয়ে আসবে—এই ক'জন সকালে খাবে। বৌমার মাসি পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত রাঁধবেন।

বরদা। আবার তাঁদের কষ্ট দেবে? পাঁড়ে যেমন প্রত্যহ রাঁধে, তেমনি সকালে রাঁধুক না!

মাতা। না বাবা, এতে দোষ নেই—এতে জ্যেচপোয়াতীকেই রাঁধতে হয়; পোয়াতীদের মধ্যে যে জ্যেচ, তার আদর কত—অনেক ভাগ্যে প্রথম সন্তান রক্ষা পায়; তা বৌমার মাসি আহ্লাদ ক'রেই এ কাজ করবেন, সে জন্য তুই ভাবিস নি।

বরদা। কত লোক হবে?

মাতা। কতই আর হবে—ছেলেপিলে নিয়ে ৬০।৭০ জন হবে। এই ঘরে সবাই বসবে, আর দালানে জন কুড়ি ক'রে খেতে বসলে তিন চার বারে হয়ে যাবে। সকাল সকাল উজ্জুগ করবো, যেমন জন কুড়ি জুটবে, অমনি খেতে বসিয়ে দেব। খাওয়া হ'লেই চ'লে যাবে, এমন কিছু ভিড় হবে না।

বরদা। আমি সেরেস্তাদার পরেশকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিব এখন, সে-ই ফর্দ্দ ক'রে হাট বাজার ক'রে দেবে। কত ধানে কত চাল, আমি ত কিছু জানি না, সে-ই সব ঠিক ক'রে দেবে—আমিও নেমন্তন্নের মত খেতে আসবো, তবে কি না, তোমার বৌ সব খেয়ে না ফেললে বাঁচি! তা হ'লে কাছারি থেকে এসে অন্ধকার দেখতে হবে।

বৌ এত ক্ষণ নানা ভঙ্গিতে বরদা বাবুকে জ্বালাইতেছিল, বরদা বাবু অবসর বুঝিয়া এক হাত লইলেন।

মাতা হাসিয়া বলিলেন, "আমার বৌ কত ক'টি খায়, তা কি জানিস নে যে, তোর এক মণ ময়দার লুচি খেয়ে ফেলবে?"

এই কথাটা শুনিয়াই বৌ দুড়্ দুড়্ করিয়া দৌড়িয়া পলাইল। পায়ের দুপ্ দুপ্ শব্দ ও চুট্‌কির ঝুন্ ঝুন্ রবে শাশুড়ী বুঝিলেন—বৌ ছুটিয়াছে, বলিলেন—"ও মা, অত ক'রে ছুটো না। (হাসিয়া) বৌ মানুষের অত দৌড়তে নেই।" বৌ তখন স্নানের ঘরে ঢুকিয়া, বরদা বাবু হাত ধুইতে

গেলে কি করিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে নির্যাতন করিবে, তাহাই ভাবিতেছে, বিলম্ব সহিতেছে না—কত ক্ষণে তিনি আসেন, উঁকি মারিয়া দেখিতেছে ও যেমনি চোখোচোখি হইতেছে, হাত দিয়া ইঙ্গিতে শাসন করিতেছে ও অস্ফুট স্বরে বলিতেছে—"এস না।" বরদা বাবু টিপিটিপি হাসিতেছেন ও হাতে নুন ও নেবুর খোসা রগড়াইতেছেন। মা বলিলেন, "ওঠ্ না, আঁচা গে যা—আপিসের বেলা হ'ল যে।"

বরদা। "ডালে বড় ঘি দিয়েছ, তাই হাতে নেবু ঘষছি"—বলিয়া সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইলেন।

স্নানঘরে প্রবেশ করিতেই বৌ ডেপুটি বাবুর পরিষ্কার আঁচড়ানো চুলটি উষ্কখুষ্ক করিয়া দিয়া বলিল, "আর বলবে যে, বৌ এক মণ ময়দার লুচি সব খেয়ে ফেলবে, বলবে—অ্যাঁ, বলবে ?"

ডেপুটি বাবু একটু জল বৌয়ের গায়ে ছিটাইয়া দিয়া বলিলেন, "মা দেখ, তোমার বৌ আমার চুল নষ্ট ক'রে দিলে।"

মা নিজের ঘর হইতে বলিলেন, "কি রে, কি বলছিস ?"

বরদা। না, কিছু নয়—বলি আজ কি পরেশকে ডেকে দিব না কি ?

মাতা। আজ হয়, কাল হয় দিস্।

বৌ। (মৃদু স্বরে) ও মা, তোমার দুষ্টু ছেলে এই দেখ আমার কাপড় ভিজিয়ে দিলে।

কথাগুলা অবশ্য মাকে শুনাইবার জন্য বলা হয় নাই—যাঁহাকে শুনাইবার জন্য বলা হইল, তিনি যথাযোগ্য সমাদর করিলে, বৌ ঘোমটা দিয়া পান আনিতে গেল। মাঝের ঘরেই মসলার বাক্স, ডাবরে পান ও ডিপায় সাজা পান থাকে।

শয়ন-ঘরের আরাম-চৌকিখানিতে ডেপুটি বাবু আরাম করিতেছেন, চাকর গুড়গুড়িতে কলিকাটি বসাইয়া দক্ষিণের ঘর দিয়া বাহির হইয়া গেল। বরদা বাবু অবিলম্বে ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন। বৌ পান লইয়া আসিল। একটি পান বরদা বাবুকে দিয়া ডিপাটি আলমারির উপর রাখিয়া টুলখানিতে বসিয়া বলিল, "ঐ জন্যে ত রাগ ধরে, কেবল ভুড়ুর ভুড়ুর ক'রে তামাক খাওয়া—পান আনতে গেছি, তা দেরি সইল না—ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হয়ে আছে, মানুষের মুখ দেখবার জো নেই।"

বরদা। বল না কেন, পূর্ণচন্দ্র মেঘে ঢাকা প'ড়ে গেছে।

বৌ। তাই ত! আবার গন্ধ দেখ, উঃ—

বরদা। (সস্নেহে) মায়া, তোমার যদি তামাকের গন্ধ ভাল না লাগে, আমি অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারি—

মায়া। না না, এখন আর আমার একটুও খারাপ লাগে না। আগে আগে একটু একটু গা বমি বমি করতো, কিন্তু এখন এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, অন্য কারও বাড়ী যদি এই রকম তামাকের গন্ধটা পাই, অমনি মনে হয়, তুমি বুঝি এসেছ; এখন আমার বরং ভালই লাগে।

বরদা। আমার সঙ্গে সঙ্গে তা হ'লে তুমিও তামাকখোর হয়ে উঠছ! ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন!

গুন গুন করিয়া কথায় বার্ত্তায় ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করিয়া বরদা বাবু কাছারি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে মাঝের ঘরে গেলেন। চাকর আসিয়া কাপড়-চোপড় দিল। মা একবার আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেন। আপিসের সাজে সজ্জিত হইয়া শয়ন-ঘরে স্ত্রীর সহিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া বাবু আপিসে চলিয়া গেলেন। যত ক্ষণ তাঁহাকে দেখা যায়, তত ক্ষণ খড়খড়ির পাখি তুলিয়া মায়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল, তার পর শাশুড়ীর সন্ধানে আসিল। শাশুড়ী তখন বাঁট্‌লোই করিয়া ঝালের ঝোল চড়াইতেছেন। মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আজ ডাল রাঁধবে না?"

শাশুড়ী। না মা, রোজ আর ডাল ভাল লাগে না।

মায়া। আমার গাছের যে বেগুনটা তোমাকে দিয়েছি, সেটা তবে ঝোলেই দাও—যাই আনি গে।

শাশুড়ী। পাগলি, সে বেগুন আনতে হবে না। সেটি বিকেলে ভেজে দিব, তোমরা লুচি দিয়ে খাবে।

মায়া। আমি ত খাব না, তুমি খাবে।

শাশুড়ী। নূতন সামগ্রী, তোমাদের না দিয়ে আমি খাব বই কি! আর-বছর এমন দিনে যখন তোমার বেটাবেটী খেতে শিখবে, তখন তুমি তার মুখের মাছ ভাত থাবা থাবা ক'রে খেয়ে ফেলো।

মায়া। (মৃদু স্বরে) এ বুঝি মাছ ভাত—এ ত গাছের বেগুন, বেগুন কত পাওয়া যায়।

শাশুড়ী। পাঁড়ে, বৌমার ভাত দিয়ে যাও।

পাঁড়ে ভাত দিল। শাশুড়ী বলিলেন, "যাও মা, মাখন জল নুন দুধ সব আন গে। পিঁড়িখানা পেতে ব'স—মাটিতে বসে না, ছিঃ—"

মায়া। এখন ভাত ঢাকা দিয়ে রাখি, তোমার সঙ্গে খাব।

শাশুড়ী। ভাত জুড়িয়ে যাবে যে, তুমি খেয়ে নাও, আমার দেরি আছে।

মায়া। আমি তোমার হাতের ঝোল খেতে বড্ড ভালবাসি।

শাশুড়ী। ঝোল ত হ'ল ব'লে, তুমি খেতে ব'স। যাও—জল থাল আন গে—এমন বৌও দেখি নি, নিত্যি নতুন বাহানা! যাও মা, এই বেলা খেয়ে নাও, তুমি ভাত খেয়ে কাপড় কেচে আমাকে মাখম-টাকম দেবে, তবে ত আমি বসতে পাব—তুমি যত দেরি করবে, আমারও তত দেরি হবে।

শুনিয়াই ভারি খুশি হইয়া বৌ "আচ্ছা" বলিয়া নিজের মাখম নুন প্রভৃতি আনিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল।

শাশুড়ী। দেখ, তাড়াতাড়ি ক'রে খেতে হবে না, আমার ঢের দেরি আছে—ওল ভাতে দিব, ওল সিদ্ধ হ'তে অনেক দেরি। ভাতগুলি সব খাও।

বৌ। ঝোলটা বেশ হয়েছে, আমি এ মাছ আর খাব না, এই ঝোল দিয়ে খাই।

শাশুড়ী। আর একটু ঝোল দেব?

বৌ। না না মা, আর দিতে হবে না—এই যে এখনও আমার বাটিতে কত আছে!

এইরূপ কথায় বার্ত্তায় দুই শাশুড়ী বৌয়ের আহারাদি শেষ হইল। শাশুড়ী তাঁহার খাটিয়াতে শতরঞ্চখানি পাতিয়া বালিশটি মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িলেন; মায়া তাঁহার পাকা চুল তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। অল্প ক্ষণ পরে শাশুড়ী বৌয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "যাও মা, তুমি একটু শোও গে—ভরা পোয়াতী পেটে ছেলে ঠেলে ধরবে, শোও—আমার কাছেই না হয় শোও।"

মায়া। না মা, শোব না,—শুলেই ঘুমিয়ে পড়বো। দিনে ঘুমলে আর রাত্রে ঘুম হয় না, ছটফট করতে হয়। আমি যাই, দাইয়ের কাছে যাই।

মায়া দাইয়ের কাছে গেল; দাই তখন ঘর নিকাইতেছে।

মায়া। দাই, তোর বাসন মাজা হয়ে গেছে ?

দাই। হাঁ বহুমা, সব কাম হয়ে গেছে, খালি কাপড় কেচে মা-জীর দু-কলসী জল আনবো, তার পর বসবো।

তখন মায়া পাখীর খাঁচা পাড়িয়া, কাহাকেও জল ছোলা দিল, কাহাকেও কাংলিদানা দিল, দিয়া "রাম রাম বল পাখী, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল" বলিয়া পাখী পড়াইতে আরম্ভ করিল। একটা বড় চন্দনার দরজা খুলিয়া দিল, সেটা বাহিরে আসিয়া মায়ার কোলে আরামে বসিয়া রহিল। মায়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া কত কি বলিয়া আদর করিতে লাগিল—পাখীটা মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া "মায়া মায়া" করিয়া ডাকিতে লাগিল। এটা মায়ার বাপের বাড়ীর পাখী—তাহার বিশেষ আদরের। গৃহকার্য্য শেষ করিয়া দাই আসিয়া "আঃ, সেই ভোরে উঠেছি, আর এই বেলা বারো বাজে, এখনও বসতে পাই নি। আঃ, নন্দন বেহারাটা এমন দুষ্ট, দুই কলসী জল চান ক'রে দিতে পারে না ? এমন দুষ্ট চাকর আছে ?"

মায়া। দাই, তোর ছেলের ক'টি মেয়ে, ক'টি ছেলে বল্ না।

দাই। বহুমা, একটা মেয়ে আর দুটা ছেলে। মেয়েটা এমন ভাল, চার বছরের মেয়ে ঘরের কেৎনা কাম করে। লুটিয়া ভর ভর পানি আনে, আটা সানে। আমার গাঁও এখানসে তিন কোশ—ছোট মেয়া এৎনা দূর চলতে পারে না। মা-জী বলিয়াছেন, হামকো আপনার সাধের সমে ছুটি দিবেন, হামি এক্কা ক'রে হামার বহু আর নাতি নাতনীদের আনবে। মা-জী খরচা দিবেন। সাধের দিন খুব পুরি-উরি খেয়ে তার পর যাবে।

মায়া। দাই, তোর নাতিরা কি করে ?

দাই। (সগর্ব্বে) বাপকে সাথ ক্ষেতের কাম করে। হাঁ, আট বছরের ছেলে চাষবাস সব কুছ শিখিয়েছে।

দুপুর বেলা প্রতি দিন মায়া দাই এবং পাখী লইয়া কাটায়, আর যত বার রেলগাড়ী হুস হুস করিয়া যাওয়া আসা করে, মায়া ছুটিয়া যাইয়া বেড়ার ধার হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখে। কোন কোন দিন পুতুলের বাক্সটা বাহির করিয়া বসে। কোন দিন কোন আলাপী রমণী যদি তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসেন তবে তাহার বড় আনন্দ হয়।

শাশুড়ীও আর ঘুমাইতে পান না, খুব গল্প জমিয়া যায়। বিকালের দিকে গাছে জল দেওয়া, গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, ঘাস উঠানো তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। কাপড় ভিজাইয়া, ছিঁড়িয়া, কাদা মাখাইয়া, মুখ লাল করিয়া যখন সে টব-হাতে বেড়ায়, তখন তাহাকে ঠিক পাগলীর মত দেখায়—তাই শাশুড়ী তাহাকে পাগলী নাম দিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাধভক্ষণ

দেখিতে দেখিতে সাধের দিন আসিল। কা'ল সাধ—বাঁড়ুজ্যেদের গিন্নী ও মায়ার মাসি ও মাসতুতো ভগিনী আসিয়াছেন—সকলে এক একখানা বঁটি পাতিয়া মাঝের ঘরে বসিয়াছেন। আজ সব তরি-তরকারি কুটিয়া রাখা হইতেছে, কি কি রান্না হইবে, তাহার আলোচনা হইতেছে। মায়া আসিয়া একখানা বঁটি পাতিয়া বসিয়াই বেগুন কুটিতে গিয়া হাত কাটিয়া রক্তপাত করিল ও হাতে ভিজা ন্যাকড়া জড়াইয়া শাশুড়ীর গায়ে ঠেস দিয়া, একটু ঘোমটা টানিয়া বসিয়া রহিল। শাশুড়ী তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন—"দেখ বৌমা, যখন পাঁচ জন বাড়ীতে আসবেন, তখন দুরন্তপনা ক'রো না—ভাল ক'রে ঘোমটা দিও।" মায়া একটু চঞ্চলপ্রকৃতির মেয়ে, আস্তে আস্তে চলিতে পারে না, ঘোমটা—এমন কি, মাথার কাপড়টা পর্য্যন্ত ঘণ্টায় সাড়ে সতের বার পড়িয়া যায়। শাশুড়ী অপরাধ গ্রহণ করেন না, কিন্তু অন্য লোক পাছে নিন্দা করে, এ জন্য কেহ বাড়ীতে আসিলে (বিশেষ বাঁড়ুজ্যেদের গিন্নী) তাহাকে সাবধান করিয়া দেন—দুরন্তপনা করিও না, ঘোমটা দিও। বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী এ-কালের মেয়েদের অসৈরণ দেখিতে পারেন না; তাঁর বৌয়েরা কখনও ঘোমটা খুলেন না, অথবা তাঁদের পায়ের মলের শব্দ হয় না (পায়ে মল কিন্তু বারো মাস পরা থাকে)।

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী। হ্যাঁ গা বরদার মা, বৌটিকে যে কাজকর্ম্ম শেখাচ্ছ না, ঘরকন্না করবে কেমন ক'রে? তুমি কি আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে এসেছ? বয়স হ'ল, তীর্থ ধর্ম্ম কি করতে হবে না? খালি গলায়

সংসার বেঁধে ব'সে থাকবে? সংসার কি তোমায় তরাতে পারবে? দেখ দেখি, একটা বেগুন কুটতে এসেই বৌ কি না হাত কুটে ব'সে রইল!

বরদার মা। (হাসিয়া) আর বোন, তুমিও যেমন, কাজকর্ম্ম শেখাব আর কি, ঘাড়ে পড়লে আপনিই সব করবে, আমি রয়েছি যত ক্ষণ, করি। বৌমা আমার পাগলী, সব কাজ করতে জানে, সব কাজ করতে আসে, ছেলেমানুষ—তাই একটু দুরন্ত। ঘরে পাঁচ জন নেই যে, একটি কথা কয়, আপনার মনের আনন্দে আপনি হেসে খেলে বেড়ায়, আমি আর তাতে কি টিক্ টিক্ করবো?

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী। (গম্ভীর ভাবে) না না, ওটা এখন তোমরা বুঝতে পারছো না—বৌকে অত বাড়তে দিতে নেই, দাবনে রাখতে হয়, এর পর তোমাকেই মানবে না। কলিকালের মেয়েদের অন্ত পাওয়া ভার, এর পর তোমাকে গোয়াল-কুড়ুনি ক'রে রাখবে। এই বেলা দাবো।

বরদার মা অপ্রতিভ বৌয়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "আমার বৌমার মন বড় সরল। ষেঠের ষোল বছরেরটি হ'ল, এখনও যেন কচি—আমাকে গোয়াল-কুড়ুনিই করুক, আর পাত-ঝেঁটুনিই করুক, ওরা আমারই।"

মায়ার মাসি দেখিলেন, মায়ার চোখ ছল ছল করিতেছে, মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে: বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে বলিলেন, "বেয়ান, এই খান-পাঁচ-ছয় শিম বুঝি তোমাদের বাগানের, আর খানকতক হ'লে সুক্তনিতে দেওয়া যেত। গোটা-আষ্টেক ঢেঁড়সও রয়েছে, এ ক'টার আর কি হবে? বেশী হ'লে ভাজতে দিতুম।"

বরদার মা হাসিয়া বলিলেন, "ভাগ্যিস বললে বোন, দাওতো ভাই ও ক'টা ভাজতে, ও আজই পাঁড়ে ভেজে দিগ্। আর ঐ শিম ক'খানি দিয়ে একটি বেগুন দিয়ে গোটা-চার আলু দিয়ে চচ্চড়ি করতে দাও, তোমরা সবাই খাবে—ও আমার বৌমার বাগানের। আজ যখন বাজার এল, পাগলী আমার বলছে কি, জান—'আহা হা, মা, আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলে না, এত তরকারি বাজার থেকে আনালে, আমার বাগানে যে কত তরকারি হয়েছে।' আমি বললুম, 'হাঁ তাইতো, বড় ত অন্যায় হয়েছে, তা হোক, তোমার বাগানে কি হয়েছে আন দেখি।' বৌমা বললেন, 'আমার বাগানে সব নূতন তরকারি হয়েছে—আচ্ছা

আনছি।' ব'লে ভাই, একটি ছোট চেঙ্গারি নিয়ে গিয়ে গোটা-পাঁচ ছয় শিম, গোটা-আষ্টেক ঢেঁড়স, গোটা-দুই মুলো, একটা কাঁচা কুমড়ো, দুটো বেগুন, ঐ বড় লাউটা এনে দিলে।—হাসছ কি ভাই, এতে ৬০।৭০ জনের যজ্ঞি না হোক, গেরস্তের এক দিনের বাজার ত? দেখ দেখি, কেমন লক্ষ্মী বৌ আমার—আপনি মাটি খোঁড়ে, আপনি গাছে জল দেয়, আপনি সব করে।"

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী। বলি বরদার মা, তোমার ছেলে যেন একেলে, তার সবতাতেই খৃষ্টানী মত, সাহেবী মেজাজ, সাহেবী সখ—লোকে বলে, বরদা বাবুর যেমন সাহেবী মেজাজ, তেমনি সাহেবের মতন বাগান করেছে—কিন্তু তা ব'লে কি তুমিও বামুনের মেয়ে হয়ে খৃষ্টান হ'লে? ভরা পোয়াতী বৌ, তাকে তুমি কি ব'লে আনাচে কানাচে যেতে দাও?—গাছতলায় সাঁচতলায় কি যেতে আছে? বৌকে কি আদর দিলেই হ'ল! তাকে সহবত শেখাবে না, তাকে গেরস্থালি শেখাবে না, সে যা খুশি করবে, নেচে নেচে বেড়াবে, কিছু বলবে না? তার ভাল মন্দ ত দেখবে! কি ব'লে বাগানে যেতে দাও?

বরদার মা। আমি তা বলেছিলুম, যে এখন আর বাগানে ঘুরে কাজ নেই। কিন্তু যা বললে ভাই, ওদের সাহেবী মত—বরদা বললে, 'মা, এ সময় যত চলাফেরা করবে, ততই ভাল, চুপচাপ ব'সে থাকা ভাল নয়।' দিন পনর হ'ল বৌমার জ্বর হয়েছিল, তা সুবোধ ডাক্তার এসে বললে কি যে, বাগান করা, বাগানে বেড়ানো খুব ভাল। ডাক্তার যা বলবে, তাই হবে—এখন ত ডাক্তারী মতেই সব—আমি আর কি করবো?

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী। তবে তুমি গিন্নী কিসের? এ সব কাজে আবার ডাক্তার কি করবে, এ সব মেয়েদের কাজ, ডাক্তার আবার কেন? কালে কালে কত হবে! আমাদের পাড়ার উকিলের বৌয়ের ছেলে হ'ল, ১৬ দিন ধ'রে একটা দাই আর ডাক্তার নাগাড় রইল। আঁতুড়ে ছেলেটাকে দু-বেলা নাওয়ানো—না তাপ, না ঝাল, রকম দেখে অবাক্ হয়ে থাকতে হয়। আঁতুড়-খরচই কত—বাবা, এখনকার একটা আঁতুড়ের খরচে আমাদের সেকালের এক বছর সংসার চ'লে যেত। বিচার আচারের নাম নেই, শোবার ঘরে বৌ প্রসব হয়েছে, ছিষ্টি ছুঁয়ে নেপে একাকার।

আমি আর ওদের বাড়ী জল গ্রহণ করছি নে।—তোমার বৌ কোথায় প্রসব হবে গা ?

বরদার মা। মনে করছি, সাধটি হয়ে গেলে এই ঘরের পশ্চিম ধারে বেড়া দিয়ে আঁতুড়-ঘর বেঁধে দিব। আমার ঘরের দরজার কাছটিতে হবে, দেখবার শোনবার সুবিধা হবে। দালানের ঐ দোর পর্য্যন্ত ঘিরে দেব, দাই আনাগোনা করবে—কেন, তা হ'লে বেশ হবে না ?

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী। (নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া) হ্যাঁ, এক রকম হবে! তার চেয়ে ঐ দালানে দিলেই ত বেশ হয়—ঘরের ভিতরটা বেড়াই যেন দেওয়া, দাই ত ঢুকবে !

বরদার মা। কি করব বোন. বাইরে কেমন ক'রে দিই ? নূতন হিমের সময় ; বেড়া দিয়ে ঘেরা বই ত নয়—চারি দিকে বাগান, শেয়াল কুকুর আছে, সাপ ব্যাং আছে, সেটা ভরসা হয় না।

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী। আমরা সেকালে কি প্রসব হই নি ? আমার ত দশটি সন্তান হয়েছে, সবাই সেই উঠানে—যে বার বর্ষাকালে হ'ত, সে বার শুতে ঠাঁই পেতুম না, ছেলেটি কোলে ক'রে ব'সে আছি—জলে ভাসতে হ'ত—তাপ ঝালের জোরে বেঁচে উঠতুম। এখনকার মেয়েরা হ'লে গ'লে যেত।

বরদার মা। তা কি করব বল, যখন যেমন, তখন তেমন ; আজকালের যা রেওয়াজ হয়েছে, তাই করতে হবে। তাপ ঝাল আর নেই, একেবারে যে উঠে গেছে, কাজেই সাবধানে রাখতে হবে।

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী। ও প্রভার মা, আর এখন আলু ছাড়িও না, এই থাক্—এক কড়া তরকারি, এইতে ঢের হবে ; দরকার হয় তখন কা'ল কুটে দেওয়া যাবে, রেঁধে ফেলে দিলে কি হবে ? বেগুনভাজা গুণে দেখ, ২৫ গণ্ডা হয়েছে কি না। (মায়াকে লক্ষ্য করিয়া) যাও না মা, তোমার বোনের সঙ্গে কথা কও গে না ; এখনও চুল বাঁধ নি ? যাও, চুল বাঁধ গে।

মায়া ভারি উৎসাহে তরকারি কুটিতে আসিয়াছিল, হাত কাটিয়া লাঞ্ছনা খাইয়া অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া ছিল—বাঁড়ুজ্যে-গিন্নীর আদেশে মাসতুত ভগিনীর হাত ধরিয়া উঠিয়া গেল। এই মাসিটি মায়ার যে আপনার মাসি, তাহা নয় ; গ্রাম-সম্পর্কে তাহার মায়ের কি-রকম ভগিনী হন, কিন্তু এই বিদেশে আসিয়া যখন পরিচয়াদি হইয়া একটা সম্বন্ধ বাহির

হইল, তখন হইতে ইঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আত্মীয়তার দাবী রাখিতেন। বাগানের তরকারি প্রথমে ইঁহাদের বাড়ী যাইত, বরদা বাবুর মায়ের ব্রতাদিতে মায়ার মাসির বাড়ী জলপানি আর সকল বাড়ী হইতে বেশী করিয়া দেওয়া হইত। মায়ার মাসিও জামাই-ষষ্ঠীতে জামাইকে আশীর্ব্বাদী কাপড় দিতেন ও নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া আদর যত্নে খাওয়াইতেন; তবে বরদা বাবু যাহা প্রণামী দিতেন, মাসির জামাই-ষষ্ঠীর খরচ খরচা বাদে কিছু লাভও থাকিত। পূজার সময়ও উভয় পক্ষে কাপড়-চোপড় দিয়া কুটুম্বিতা রক্ষা করা হইত। শনিবারে শনিবারে প্রায়ই বরদা বাবুর বাড়ী ভোজ হইত, মাসি আসিয়া আয়োজন করিতেন। মায়ার মেসো একটি সামান্য চাকরি করিতেন—অবস্থা খুব যে সচ্ছল ছিল, তা নয়—বরদা বাবু তাহা জানিতেন ও পয়সা কড়ি দিয়া, বাগানের তরি-তরকারি দিয়া সাহায্য করিতেন। মায়ার মাসি ইঁহাদের সংসারে নানা প্রকারে পরিশ্রম করিয়া সে ঋণ পরিশোধ করিতেন, সুখে দুঃখে মায়ার আপনার মাসির মতই ব্যবহার করিতেন এবং মায়াকে ভালবাসিতেন।

মায়ার ভগিনী চুল বাঁধিয়া দিতেছে, মায়া চুলের গোড়ার ফিতাটা দুই হাতে ধরিয়া আছে, এমন সময় বরদা বাবু আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া একেবারে শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মায়া ফিতা ছাড়িয়া দিয়া ঘোমটা দিতে ব্যস্ত হইল, কিন্তু কাপড় এমন চাপিয়া বসিয়াছে যে, না উঠিলে আর মাথায় কাপড় চড়ে না; মায়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। মায়ার দিদি বলিল, "নে, আর লজ্জা করতে হবে না, থির হয়ে ব'স্—লজ্জা ত কত! ধর্ ফিতেটা—দেখ্, গোড়াটা ধস্কে গেল যে!" মায়া মাথায় কাপড় তুলিতে না পারিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়াছিল, দিদির তাড়নায় ফিতা ধরিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল। বরদা বাবু হাসিয়া উঠিলেন—হাসির শব্দে, "বরদা এসেছিস" বলিয়া মাতা ঘরে প্রবেশ করিলেন—বৌ তখন জোর করিয়া অর্দ্ধ-সমাপ্ত বিননিটা দিদির হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া পাশের ঘরে পলাইল।

দিদি। দিলে গো, সব নষ্ট ক'রে দিলে—সাধে কি লোকে নিন্দা করে!

বরদার মা। বৌমা, পালালে কেন? নাও, চুল বেঁধে নাও। বরদা, তুই বাছা বাইরে কাপড় ছাড়্‌গে যা, হাত মুখ ধুয়ে আয়, আমি খাবার

আনি। মাঝের ঘরে কুটনো হচ্ছে, তুই এই ঘরে খা। ও বৌমা, শীঘ্র বিউনিটা জড়িয়ে নিয়ে ঠাঁই ক'রে দাও।

শাশুড়ী বলিবা মাত্র বৌ আসিয়া আবার চোখ বুজিয়া বসিল, শাশুড়ী খাবার আনিতে গেলেন। বরদা বাবু শালীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বস্থন তবে, কাপড়টা ছেড়ে আসি। দিদিমণি দেখুন, মায়া নিজে চোখ বুজে মনে করছে, তাকে আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না।"

দিদি। জঙ্গলে খরগোসগুলো মুখ লুকিয়ে যেমন মনে করে যে, আমাকে আর কেউ খুঁজে পাবে না—মায়াময়ীর সেই দশা হয়েছে।

বরদা বাবু চলিয়া গেলে, মায়া চোখ খুলিয়া বলিল, "দিদিমণি, দেখ তোমার কি অন্যায়, তুমি আমার বোন্ হয়ে ওঁর দলে গেলে! যাও ভাই, তোমার সঙ্গে আমার আড়ি।"—বলিয়া মায়া দাড়িতে হাত দিয়া আড়ির চিহ্ন দেখাইয়া উঠিয়া পড়িল; দিদি হাত ধরিয়া "না না, রাগ করিস নে, মনে মনে আমি তোর দিকে—ভগিনীপতিকে মিষ্টি কথা বলতে হয়"—বলিয়া ভাব করিল।

মায়া। রোস ভাই, চট ক'রে কাপড়টা ছেড়ে নিই—ঠাঁই ক'রে দিয়ে যাই।

মায়ার এই দিদিটি মায়ার অপেক্ষা যে বয়সে বেশী বড়, তা নয়—বয়স হিসাব করিয়া মায়ার অপেক্ষা এক বৎসরের বড় সাব্যস্ত হইয়াছে—কিন্তু মায়ার ছেলেমানুষিতে, পাতলা ছিপ্‌ছিপে গঠনে, তাহার সরল অমায়িক মুখখানিতে, সরস পাতলা টুক্‌টুকে ঠোঁট দুখানির ফিক্ ফিক্ হাসিতে তাহাকে তাহার দিদির অপেক্ষা অনেক ছোট দেখাইত। দিদির গোলগাল মুখ, মোটাসোটা শরীর; দুই তিন সন্তানের জননী হইয়া ইতিমধ্যেই নিজেকে সে প্রৌঢ়ার দলে অভিষিক্ত করিয়া লইয়াছিল। মায়াকে যেন বাৎসল্যের চক্ষে দেখিত এবং অন্তরের সহিত ভালবাসিত। দিদির স্বামীও এই দেশে কাজ করেন, সুতরাং সে মায়ের কাছেই থাকে—তাহার স্বামীটি ভাল মানুষ এবং বরদা বাবুর গাইয়ে-বাজিয়ে দলের মধ্যে একজন।

মায়া ঠাঁই করিয়া কাপড় ছাড়িয়া আসিতে না আসিতে বরদা বাবু আসিলেন। মাতা খাবার দিলেন। তিনি জলযোগ করিতে করিতে শ্যালিকার সহিত রহস্যালাপ করিতে লাগিলেন। শালীর সহিত বরদা বাবুর বিশেষ যে রহস্যালাপ হইত, তাহা নহে—শালীটি ঠাট্টায় একেবারে

অপটু—'এ কেমন আছে, সে কেমন আছে, তুমি কেমন আছ'—এই পর্য্যন্ত তাঁহাদের আলাপ—তবে মায়াকে সম্মুখে পাইলে দু-একটি সরস কথা হইত। আহারের সময় মায়াও উপস্থিত নাই, মাতাও সম্মুখে—সুতরাং শালী ভগিনীপতির কথাবার্ত্তার মত সরস কথাবার্ত্তা কিছুই হইতেছে না। আগামী কাল কি প্রকার বন্দোবস্ত করা হইবে, তাহারই আলোচনা হইতেছে। মায়া স্নানগৃহের দরজা দিয়া মধ্যে মধ্যে উঁকি মারিতেছে—প্রথমে অভ্যাসমতে ইঙ্গিতাদি করিয়াছিল, কিন্তু আজ আর অবাধে তাহার কারবার চলিল না, দিদির চক্ষের সামনে বার দুই ধরা পড়িয়া, লজ্জায় দোকানপাট বন্ধ করিয়া লুকাইয়াছে। থাকিতে পারিতেছে না, তাই এক এক বার উঁকি মারিতেছে।

বরদা বাবু জলযোগান্তে মাসশাশুড়ী ও বাঁড়ুজ্যে-গিন্নীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "এই যে, আপনারা এসেছেন—আপনাদের ভরসাতেই মা এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আমি আর কি বলব, যাতে সুপ্রতুল হয় করবেন, কিছুতে সঙ্কোচ বোধ করবেন না—নিজের কাজ ব'লেই ভাববেন, দেখবেন যেন কোন ত্রুটি হয় না। লোকজনের অভাব ব'লে আমার ইচ্ছা ছিল না যে, কোন প্রকার আড়ম্বর করা হয়, কিন্তু মায়ের একান্ত ইচ্ছা।

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী। কেন বাবা, অত ক'রে বলছ? আমার পেসন্ন আর তুমি কি ভিন্ন? পেসন্ন বললে, 'মা, আজ তুমি সেখানে গিয়ে থাক গে, দেখো, যেন তাঁদের কোন কষ্ট হয় না।' আমি বললুম, না, আমার থাকতে হবে না, আমি সব গুছিয়ে তখন রাত ক'রে বাড়ী এসে শোব। এ ক'টাই বা লোক—আমরা বামুনের মেয়ে, আমরা পাঁচ-শ লোকের ভাত রেঁধে যজ্ঞি তুলে দিতে পারি—ভয় কি!

বরদা বাবু বাহিরে দক্ষিণের বারান্দায় আলবোলাটি মুখে দিয়া আরাম করিতেছেন; একে একে তাঁহার অনেকগুলি বন্ধুবান্ধব আসিয়া জুটিলেন।

জনৈক বন্ধু। কি মশাই, কাল না কি আপনার বাড়ী মস্ত ভোজ? লুচির গন্ধটা পেয়ে ছুটে এসেছি, বলি আমাদের কেন স্মরণ করেন নি, খোঁজটা নিয়ে আসি।

আর একজন। তোমারও ঐ দশা? আমি আপিস থেকে বাড়ী এসে দেখি, গিন্নীটি সাবান দিয়ে হার, বালা, তাগা মাজতে ব্যস্ত—ব্যাপার

কি—না ডেপুটি বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ। হায় হায়, হতভাগা আমরা—আমাদের কেউ নাম করে না!

আর একজন। আমি মশাই অত হা-হুতাশের মধ্যে নেই—যা কর্ত্তব্য, তা স্থির ক'রে ফেলেছি।

ডেপুটি বাবু। সে কি রকম?

ঐ বাবু। গিন্নীকে বলেছি, তোমার মল জোড়াটি আর চেলীর কাপড়খানি ঘণ্টা কতকের মত ধার দিও। নাপিতকেও খবর দিয়েছি, সকালে গোঁপজোড়াটা ফেলে দিব—তার পর গৃহিণীর সহচরী হয়ে এসে, পাঁচ এয়োর একজন হয়ে একটা পাতা নিয়ে ব'সে পড়বো। ঘোমটার ধুম দেখে এ-কালের মেয়েরা অবাক্ হয়ে যাবেন, সেকালের গিন্নীরা ধন্য ধন্য করবেন।

একজন বাবু। মশাই, লুচি কি এমনি লোভনীয় যে, তার জন্য এত আদরের গোঁপ ফেলে দেবেন?

আর একজন। এঃ মশাই, এমন বেরসিক! বুঝলেন না, লুচিটা হচ্ছে কথার কথা, উপলক্ষ্য মাত্র—আসল মনের কথাটা তা নয়—এখন বুঝলেন ত?

বাবুরা গল্প করিতেছেন, তামাক চলিতেছে, এদিকে মায়া ভগিনীর সহিত মাঝের ঘরের খড়খড়িতে দাঁড়াইয়া গল্প শুনিতেছিল। একজন বাবু গোঁপ কামাইয়া নিমন্ত্রণে আসিবেন শুনিয়া ভগিনীকে বলিল, "ও ভাই, কি হবে ভাই দিদিমণি, বাবুরা যদি সত্যি সত্যি আসেন, তবে কি হবে? ও মা, আমার সাধে কাজ নেই—ছিঃ ছিঃ—মাকে ব'লে আসি, বাবুরা এই সব পরামর্শ করছেন, মা সবাইকে খুব ব'কে দেবেন এখন।"

দিদি। পাগল কি আর গাছে ফলে? একেই বলে পাগল! (হাত ধরিয়া) দৌড়ে যাস্ কোথা? এত তাড়াতাড়ি বলতে হবে না, সবাই গেলে বলিস এখন।

মায়া। মিছে কথা—না? বুঝেছি—সত্যি আর মেয়ে সেজে আসতে হয় না, ও-সব ঠাট্টা আমি কি আর বুঝতে পারি নে?

দিদি। তবে লাফালাফি করছিস কেন?

মায়া। কি জানি দিদি, যদি সত্যি কেউ এসে পড়ে—ও মা, কি লজ্জা—ছিঃ ছিঃ—

আজ সাধ। মায়ার মাসি ও দিদি ভোরে আসিয়াছেন। মাসিমা রাঁধিতেছেন, দিদি মায়াকে সাজাইতে ব্যস্ত। শাশুড়ী নূতন চুড়ি দিয়াছেন, মায়ার বাপের বাড়ী হইতে সাপ প্যাটার্ণের নেকলেস আসিয়াছে। শাশুড়ী নূতন অলঙ্কার দুইখানি তাহাকে পরাইয়া দিয়া দেবতা প্রণাম করিতে বলিলেন। দেবতা প্রণাম করিয়া শাশুড়ী, মাসি ও দিদিকে মায়া প্রণাম করিল—তাঁহারা 'জন্মএয়োস্ত্রী হও, বেটা এসে হোক, ভালয় ভালয় দু-জনে দু-ঠাঁই হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সাধ ভক্ষণের সময় মায়াকে নূতন ও পুরাতন সমস্ত অলঙ্কারগুলি ও একখানি লালপেড়ে শাড়ী পরাইয়া, পায়ে আলতা, মাথায় সিন্দূর, কপালে চন্দন দিয়া দিদি সকলকে প্রণাম করিতে বলিয়া দিল। ৭।৮ খানি কলাপাতা দিয়া মাঝের ঘরে ঠাঁই হইয়াছে, মধ্যে আলপনা-দেওয়া একখানি পিঁড়ি পাতা; ঘরের এক কোণে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। মাসি রৌপ্য-পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জনগুলি সাজাইয়া মায়ার জন্য লইয়া আসিলেন; আর আর সকলকে কলাপাতায় অন্নব্যঞ্জনাদি দেওয়া হইয়াছে।

দুই তিনটি বালক বালিকা ও পাঁচটি এয়োস্ত্রী লইয়া, সকলকে প্রণাম করিয়া, উদ্দেশে দেবতা প্রণাম করিয়া, শুভ লগ্নে একটি ছোট ছেলে কোলে করিয়া মায়া সাধ ভক্ষণে বসিল।

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী। বৌমা, আগে পিঠে পরমান্ন মুখে দাও, কলার বড়া মুখে দাও।

মায়া আদেশ পালন করিল—শাশুড়ী শাঁখ বাজাইলেন, দুই গিন্নীতে উলু দিলেন।

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী। বৌমা, সব সামগ্রী একটু একটু মুখে দাও, নইলে ছেলের লাল পড়বে। দেখ বরদার মা, তোমার বৌটি ভাই বড় সুশ্রী, যদি ঘোমটা দিয়ে না-ব'সত তবে বোঝা যেত না যে, এ সাধের ক'নে—যেন আইবুড়ভাতের ক'নেটি—ন-মেসে পোয়াতী তা কিছু জানবার জো নেই। ঘোমটা টানো কেন বাছা, খেতে ব'সে অত ঘোমটা দিতে নেই, ঘোমটা কমিয়ে দাও। খাও মা, ভাল ক'রে খাও। (বরদার মায়ের চক্ষের জল মুছাইয়া) ছিঃ দিদি, চক্ষের জল ফেলো না, মঙ্গলের দিনে কি অমঙ্গল করতে আছে!

বরদা বাবুর মা বধূকে আন্তরিক অত্যন্ত ভালবাসেন—মাঙ্গলিক শঙ্খবাদ্যে তাঁহার অন্তর আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল, বধূর প্রশংসা শুনিয়া উথলিয়া উঠিল, অন্ধ চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, “আজ আমার কি আনন্দের দিন যে, তা কি বলিব দিদি—আমার আট সন্তানের মধ্যে ঐ বরদা, তার বৌ আমার বুকের ধন—সে আমার রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—বিধাতা এমন ধন আমাকে দিয়েছেন বটে, কিন্তু আমি বড় অভাগিনী, জানি নে কপালে কি আছে!

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী। ষাট্ ষাট্, অমন কথা বলতে আছে? ভয় কি, ব্যথা হ’লেই আমরা আসবো। হরিকে ডাক, হরিল্লুট মানো, তিনি রক্ষা করবেন।

রান্নাঘরে তরকারি চড়িয়াছে। একে একে নিমন্ত্রিতারা সুসজ্জিতা হইয়া আসিতেছেন। গাড়ীর ঘড় ঘড়, মলের ঝম্ ঝম্, ছেলেদের জুতার খটখট, রান্নার ছ্যাঁক ছোঁক শব্দে যজ্ঞি-বাড়ী বেশ গুলজার। মায়া এক গা গহনা ও লালপেড়ে শাড়ী পরিয়া যে দশ জনের মধ্যে বিশেষ একজন হইয়া বসিয়া আছে, এটা তাহার তেমন ভাল লাগিতেছে না। কি করে —আজ বসিয়া থাকিতেই হইবে।

দালানে কতকগুলি হিন্দুস্থানী মেয়ে ঢোলক বাজাইয়া গান করিতেছে ও একটি ৪।৫ বৎসরের বালিকা বাজনার সহিত নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে তালে তালে নাচিতেছে—এইটি দাইয়ের সেই আদরের নাতনী। এই গীতবাদ্যের আয়োজন দাইয়ের অনুরোধে করিতে হইয়াছে; দাই বলে— মঙ্গলকার্য্যে মঙ্গল গান অবশ্য কর্ত্তব্য—এই জন্য সে ইহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। তাহারা ঢোলক বাজাইয়া যে গান করিতেছে, সে তাহারাই বুঝিতেছে এবং দাই বুঝিতেছে। মায়ার ইচ্ছা হইতেছে যে, তাহাদের কাছে গিয়া বসে, কিন্তু আজ এ স্থান হইতে উঠিতে শাশুড়ী নিষেধ করিয়াছেন, কাজেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহাদের গীতবাদ্য শুনিয়া বাঙ্গালী রমণীরা কেহ হাসিতেছেন, কেহ কান ঝালাপালা হ’ল বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন—গায়িকারা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না, সমান উৎসাহে গানের পর গান করিতেছে।

বেলা শেষ হইয়া আসিতেছে। দালানে পাতা করিবার আয়োজন হইল, কাজেই গীতবাদ্যকারিণীদের উঠাইতে হইল। দাই সযত্নে তাহাদের

উঠানের এক ধারে বসাইল এবং "গাও গাও" করিয়া গাহিতে অনুমতি দিল। এদিকে আহার চলিতে লাগিল, ওদিকে গানও চলিতে লাগিল—কিন্তু অনেক রমণী নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশ করায় মায়ার শাশুড়ী দাইকে বলিলেন, "আর এখন গানে কাজ নেই, এই মিষ্টি নিয়ে যা, ওদের জলটল খেতে দে।" মিষ্টি দিয়া তাদের গান বন্ধ করা হইল।

বড় উকিল বাবুর পরিবার আসিতেছেন শুনিয়া, রমণী-সমাজ কিছু বিচলিত হইয়া উঠিলেন—সকলেই উৎসুক নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিলেন

উকিল বাবুর পরিবার সচরাচর কাহারও বাড়ী যান না এবং যাঁহাদের সহিত তাঁহাদের আলাপ আছে, তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা খুব সুন্দর ও সৌখীন। তাঁহাদের নূতন ফ্যাশনের যে-সব গহনা আছে, তাহা এই আরা জেলায় দূরে থাক্, কলিকাতা শহরেও দুর্ল্লভ। তাঁহারা একে বনিয়াদী ঘরের ঘরণী, তাহাতে উকিল বাবুর আরায় বিস্তর মান সম্ভ্রম—যার তার বাড়ী পরিবার পাঠানোতে সম্মানের হানি হয়, এমন তাঁরা মনে করেন; সুতরাং সকলেই উৎসুক নেত্রে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উকিল বাবুর মা প্রৌঢ়া, অনেক অলঙ্কার পরিয়াছেন, একটি নত নাকে, গায়ে জামা, একখানি সরু কালাপেড়ে শাড়ী পরা। তাঁহার বধূরও সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার, মাথায় একটা ঝাপটা, তার উপর একখানি পাতলা গোলাপী রঙের ওড়না, পরিধানে ফিরোজা রঙের বেনারসী ডুরে শাড়ী। উকিল বাবুর ভগিনীর বয়স বছর ২৫ বৎসর, রং বেশ ফরসা, মোটাসোটা—পরিধানে একখানি সুন্দর ও মিহি ঢাকাই শাড়ী ও লেসযুক্ত গোলাপী সিল্কের জ্যাকেট—হাতে কোল্যাপ্‌সেব্‌ল ব্রেসলেট ও হীরার বালা এবং ফারফোর তাগা, গলায় মুক্তার কণ্ঠী ও হীরার নেকলেস, কানে হীরার পিন্। শাড়ীখানির আঁচলটি একটি ব্রোচ দিয়া কাঁধে জ্যাকেটের সঙ্গে আটকানো।

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী ব্যতীত আর কাহারও সহিত তাঁহাদের আলাপ ছিল না। বরদার মা তাঁহাদের হাত ধরিয়া আনিয়া বসাইলেন ও নিজে নিকটে বসিলেন।

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী। এই যে জগতের মা, ভাল আছ ত? ছেলেপিলে ভাল ত?

উকিল-মাতা। (প্রণাম করিয়া) হ্যাঁ ভাই, ভাল আছি, তোমরা ভাল আছ? আমরা বলি, বলি পেসন্নর মা আমার মেয়েকে এক দিনও দেখতে এলেন না কেন?

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী। মনে করি একদিন যাব, তা ভাই যেতে পারি নি, ঘরের কাজকর্ম্ম আছে। (উকিল বাবুর ভগিনীর দিকে চাহিয়া) এখন থাকা হবে?

উকিল বাবুর ভগিনী নিশ্চল ভাবে স্থির নেত্রে এক দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন, একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া বলিলেন, "এই মাসখানেক আছি।" তাঁহার মা বলিলেন, "সুরেন্দ্র, তোমার বামুন মাসিকে প্রণাম কর।" সুরেন্দ্রবালা একটু উঠিতে চেষ্টা করিলে বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী বলিলেন, "থাক্, অমনিই ভাল।" তিনিও অমনি মাথায় হাত তুলিয়া সেইখানেই প্রণাম সারিলেন; বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী "জন্ম-এয়োস্ত্রী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বরদার মা। (উকিল বাবুর মায়ের প্রতি) মেয়ের ছেলেপিলে কি?

উকিল বাবুর মাতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ছেলে কোথা পাব ভাই? মেয়ের ছেলে হয় নি। এত ধন, এত সম্পত্তি, ভোগ করবার লোক নেই—ভেবে ভেবে মেয়ে আমার আধখানি হয়ে গেছে, অমন যে ইহুদীর মত বর্ণ, কালি হয়ে গেছে। মাথা ধরা, অম্বলের ব্যারাম—কত দেশ-বিদেশে জামাই আমার ওঁকে হাওয়া খাইয়েছেন—দু-চার দিন একটু থাকে ভাল, আবার যে সেই। এবার বলি আমার কাছে আয়, আমি ওষুধ-বিষুধ করি। ছেলে ছেলে ক'রেই ত মনে সুখ নেই।

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী। দেখ, এখানে সেই যে চুনিয়া দাইয়ের ওষুধ আছে, একবার তাই খাইয়ে দেখ কি হয়। সে ওষুধ খুব ভাল।

উকিল-মাতা। আমিও তাই মনে করছি, সেই ওষুধ খাওয়াব। কত মাদুলি, কত ওষুধ করা গেছে, কিছুতেই মা-ষষ্ঠীর কৃপা হয় না যে।

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী। ভগবানের বিড়ম্বনা! যেখানে খেতে পাবে না, সেইখানে নুড়ো নুড়ো ছেলে। দেখ নি, আমাদের পাড়ার মুচীদের ঘরে ৭।৮টা ছেলেতে মেয়েতে, আহা, তারা পেট ভ'রে খেতে পায় না। পাড়ার বাবুদের বাড়ী বাড়ী থেকে পাতের ভাত নিয়ে ছেলেদের খাইয়ে বাঁচায়।

উকিল-মাতা। আহা, কালো হোক, কোলো হোক, তাদের মতও যদি আমার বাছার একটি ছেলে হ'ত! অদৃষ্ট অদৃষ্ট!

আদর অভ্যর্থনা করিয়া উকিল বাবুর পরিবারদের আহারাদি করানো হইল। ক্রমে ক্রমে নিমন্ত্রিত মহিলারা বিদায় হইলেন।

গভীর রাত্রে সকলে শ্রান্ত হইয়া শয়ন করিলে বরদা বাবুকে মায়া বলিল, "চল, দক্ষিণের বারান্দায় একটু বসি গে।" মায়া আসিয়া একটি থামে হেলান দিয়া অলস ভাবে সিঁড়িতে পা ছড়াইয়া বসিল। গলায় সেই নূতন নেকলেসটি, হাতে চুড়ি কয়গাছি, পায়ে টুকটুকে আলতা, লালপেড়ে শাড়ী পরা—সর্ব্বাঙ্গে ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্না পড়িয়া তাহার পরিপূর্ণ দেহখানিতে লাবণ্য তুলিয়াছিল। বরদা বাবু অতৃপ্ত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া ছিলেন। ভাবিতেছিলেন—মায়া সুন্দর বটে, কিন্তু মায়ার কি এত রূপ!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কল্পনা-জল্পনা

আজকাল মায়ার বড় ভাবনা হইয়াছে যে, 'ছেলে হ'লে শোবে কোথায়।'—দাই বলিল, "বাবু বাহিরের ঘরে শোবেন—কচি ছেলে কাঁদলে তিনি বিরক্ত হবেন কি না। তুমি খোকা খুকী (যে হবে), তাকে নিয়ে খাটের উপর থাকবে, আমি নীচে বিছানা ক'রে শুয়ে থাকব, ছেলে কাঁদলে বা কোন কিছু আবশ্যক হ'লে তখনি আমি উঠব। তুমি কি কচি ছেলে নাড়াচাড়া করতে পার? বাবুর প্রথম সন্তান, আমার কত আদরের ধন—আমি তাকে মানুষ করব, তোমার কোন কষ্ট হবে না। মা-জী বলেছেন যে, ঘরের কাজের জন্যে দোস্‌রা দাই রাখবেন, আমি কেবল ছেলের জন্যে থাকব। আমি দাই ঠিক করেছি, এই মাসকাবারে তাকে এনে কাজ বুঝিয়ে দিব।"—মায়া সব শুনিল, সব কথা মনঃপূত হইল, কিন্তু ঐ যে কথাটি দাই বলিল, "বাবু বাহিরের ঘরে শুইবেন," তাই বা কি ক'রে হবে? আর কচি ছেলেই বা সে নাড়াচাড়া করে কেমন ক'রে? তাহার দিদির কচি ছেলে সে কোলে করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু এমন ভয় করে, পাছে হাত থেকে প'ড়ে যায়। তা ছাড়া আরও অনেক গোলমাল আছে—সে যে কি করিবে, তাই বড় ভাবনায় পড়িয়াছে। নানা কল্পনা-জল্পনা করিয়া সে একদিন বরদা বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, তুমি

ঠিক বল দেখি, আমার ছেলে হ'লে শোবে কোথায়? তুমি কি তা হ'লে বাইরের ঘরে শোবে? ছেলে কাঁদলে তোমার ঘুম হবে না সত্যি?” হাসিয়া বরদা বাবু বলিলেন—“এ সব কথা এখন কেন? এখনও ত দেরি আছে মায়া, সে ব্যবস্থা সময়মত হবে।”

মায়া। না না, শোন না, আমার বড় যে ভাবনা হয়েছে, কি ক'রে ছেলে মানুষ হবে? মা চোখে কম দেখেন, মা কি তাকে মানুষ করতে পারবেন? আচ্ছা, একটা কাজ করা যাবে এখন, আমি দিনের বেলা নিয়ে থাকব, দুধ খাওয়াব, কাপড় ছাড়িয়ে দেব, আর রাত্রে সে মা'র কাছে শোবে এখন, আর আমরা যেমন শুই, তেমনি শোব, কেমন?”

বরদা বাবু মায়ার অজ্ঞতায় হাসিয়া বলিলেন, “আর রাত্রে যখন ছেলে তোমার দুধ খাবার জন্যে কাঁদবে, তখন মা কি করবেন?”

মায়া। তাই ত! আমি না হয় তখন উঠে যাব। মা ডাকলে তুমি আমাকে জাগিয়ে দিতে পারবে না?

বরদা বাবু সস্নেহে বলিলেন, “মায়া, সে জন্যে কিচ্ছু ভাবনা নেই। সন্তান মানুষ করবার ক্ষমতা ভগবান্ তোমাকে দেবেন। আর আমি কি আমার সন্তানের কান্নার জন্যে বিরক্ত হয়ে তোমাকে একলা ফেলে পাশের ঘরে আরাম ক'রে শুতে যাব? না না, আমাকে তেমন স্বার্থপর ভেবো না। তুমি ছেলেমানুষ, তুমি যা না পারবে, তা আমি করব। কিন্তু ও-সব কথা এখন থাক্ মায়া—তুমি আগে সুস্থ হয়ে ওঠ, পরে সে সব ঠিক হবে।”

মায়া। কেন, আমার আবার কি হয়েছে যে আমি সুস্থ হয়ে উঠব, আমি ত বেশ আছি।

বরদা বাবু বলিলেন, “তাই ত বলছি যে, আগে ছেলেই হোক—কি জানি, যদি সেকালের রাণীদের মত একটি কাঠের পুতুলই হয়, তা হ'লে কি মজা! কাঁদবেও না, দুধও খাবে না, কেমন মজা!” মায়া তখন “যাঃ-ও” বলিয়া প্রসন্নমনে ঘরের কাজকর্ম্ম করিতে চলিয়া গেল।

তখন বরদা বাবু ভাবিতে লাগিলেন, “মায়ার যে কতখানি সঙ্কটসময় আসিতেছে, সে তাহার কিছুই জানে না। তাহার আজকাল রূপের জ্যোতিঃ এমন অলৌকিক ভাবে ফুটিয়াছে যে, আমার কেমন মনে আশঙ্কা হয়। আমি অধিক ক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারি না। কত

যে আশঙ্কা, কত যে ভাবনা হয়, জানি না কি ঘটিবে।" এই সব ভাবিতে ভাবিতে 'ভগবান্ রক্ষা করেন রক্ষা পাইবে, আমাদের হাত কি ?' বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, বাগানে বাহির হইয়া পড়িলেন।

মায়ার বড়ই উল্লাসে দিন কাটিতেছে। প্রায় প্রতি দিন দুই এক বাড়ী হইতে খাবার ও কাপড় আসিতেছে। শাশুড়ী প্রত্যেক কাপড়খানি মায়াকে পরাইয়া, সেই খাবার হইতে কিছু কিছু একটি পাত্রে সাজাইয়া বধূকে জলযোগ করিতে দেন। মায়া বলে, "মা, সব কাপড় আমি কেন পরব, এখন থাক্ না, দু-চারখানা যদি কাউকে দিতে-থুতে হয়, সব প'রে নষ্ট না করলুম।" শাশুড়ী বলেন, "না, তা হ'তে পারে না—তোমার কাপড় তুমি পর মা।"

একদিন মায়ার মাসির বাড়ী মায়া নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিল ; একদিন বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী নিমন্ত্রণ করিলেন ; একদিন উকিলবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ হইল। সকলেই সযত্নে মায়াকে নূতন বস্ত্র পরাইয়া, আহারাদি করাইয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রতি দিনই প্রায় পার্শেল আসিতেছে—মায়ার ঠাকুরমা, দিদিমা, মা, খুড়ী, জেঠাই, পিসি, সকলেই মায়ার জন্য সাধের বস্ত্রাদি পাঠাইতেছেন। মায়া সাত আদরের ধন। মায়ার মাতা তাহার মাতামহের এক মাত্র সন্তান—আবার মায়া পিতামাতার প্রথম সন্তান। মায়ার পরে তাহার মাতার ছয়টি সন্তান হইয়াছে, এক্ষণে তিনিও সন্তানসম্ভাবিতা। তাঁহার বয়স অল্প, অকালে অনেক সন্তানের জননী হওয়াতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়ায় তিনি নিজ পিত্রালয়ে রহিয়াছেন। মায়ার জন্য তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছে, কি অনেক বিবেচনা করিয়া সকলে স্থির করিয়াছেন যে, মায়া শাশুড়ীর কাছে অধিকতর যত্ন লাভ করিবে, অতএব মায়া সেইখানেই থাকুক। মায়ার দিদিমাও নিজের কাছে মায়াকে আনিবার জন্য আগ্রহ করেন নাই। মায়ার পিত্রালয়ে বহু পরিবার—প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণের সময় যে মায়াকে শ্বশুরালয়ে থাকিতে হইল, পাছে সে তাহাতে মনে কোন প্রকার ক্লেশ বোধ করে বা অভিমান করে, তাই প্রত্যেকেই তাহাকে বিশেষ সমাদরে সাধের বস্ত্রাদি পাঠাইতেছেন। ঠাকুরমা দিদিমা প্রত্যেকে অলঙ্কার ও মূল্যবান্ বস্ত্রাদি পাঠাইয়াছেন, আর সকলে সামর্থ্যমত পাঠাইতেছেন। মায়ার আহ্লাদের অবধি নাই। মায়া স্বভাবতঃ নিরভিমানী। কোন প্রকার

খুঁটিনাটি তাহার চক্ষে ঠেকে না—সে আপন মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। স্বামী শাশুড়ী যে ব্যবস্থা করেন, তাহাই তাহার শিরোধার্য্য। বড় ভাবনা হইয়াছিল যে, সে কেমন করিয়া ছেলে কোলে করিবে; এখন স্বামী যখন বলিলেন যে, সে জন্য ভাবনা নাই, তিনি সে ভার লইবেন—তবে আর কি!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিরুপায়ের উপায়

কয়েক দিন হইতে বরদা বাবুকে কিছু বিমনা দেখা যাইতেছে। তাঁহার হাস্যপ্রফুল্ল গোলগাল মুখখানি বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক। তাঁহার মাতা চক্ষে কম দেখেন, সুতরাং তিনি পুত্রের ভাবান্তর লক্ষ্য করেন নাই। মায়ার আঁতুড়-ঘর বাঁধা হইতেছে—আঁতুড়ের জন্য লেপ, তোশক, ভাঁড়, খুরি, সুতা, কাঁচি প্রভৃতি গোছানো হইতেছে, পার্শেলের পর পার্শেল খোলা হইতেছে, নূতন দাই আসিয়াছে—এই সব লইয়া সে বিশেষ ব্যস্ত, কাজেই এ পর্য্যন্ত বরদা বাবুকে বিষণ্ণতার কৈফিয়ৎ দিতে হয় নাই।

একদিন মায়া নিমন্ত্রণে গিয়াছে, অবসর বুঝিয়া আহারের সময় বরদা বাবু মাতাকে বলিলেন, "মা, বড় মুশকিলে পড়েছি, বোধ হয় চাকরি বা ছাড়তেই হয়।"

মাতা। কেন বাবা, আবার কি হয়েছে? এখন ছেলেপিলে হ'তে চললো, সংসারী হয়েছ, এখন কাজ ছাড়লে চলবে কেন? তোমার ত কখনই চাকরিতে মন নেই, কিন্তু তোমার দাদাশ্বশুর জোর ক'রে কাজ নেওয়ালেন—নিয়ে ইস্তিকই ছাড়ি ছাড়ি করছো; তখন হ'লে যা হয় হ'ত, এখন কি ছাড়া উচিত?

বরদা। বদলির হুকুম এসেছে যে—কি করি বল দেখি? তাও আবার তিন মাসের জন্যে। আমাদের কি বিপন্ন অবস্থা, তা জানিয়েছিলুম, তাতে হুকুম এসেছে যে, এই তিন মাস যদি অন্যত্র কাজ ক'রে দিই, তা হ'লে এইখানে অনেক দিন থাকতে পাব, তা না হ'লে এখন আমি ছুটি নিতে পারি এবং তিন মাস পরে যেখানে ইচ্ছা পাঠাবে। কোন ওজর আপত্তি তখন আর চলবে না; তখন হয়ত কোন্ একটি বিশ্রী জায়গায়

যেতে হবে—এই সব ভাবনায় ব্যাকুল হয়েছি ; তাই ভাবছি, কাজ ছেড়ে দিই। এইখানে থাকবো, স্বাধীনভাবে ওকালতি করবো। চাকরি আমার পোষাবে না, তখনি আমি জানি। দাদাশ্বশুর যত্ন চেষ্টা ক'রে কাজটা জোগাড় ক'রে দিলেন, কাজেই তাঁর কথা অমান্য করতে পারলুম না। তিনি বললেন, "ওকালতিতে কত দিনে পসার জমবে, কাজ নেই ও চেষ্টায় ; এখনও আমার একটু ক্ষমতা আছে, এ কাজটা পেতে পারবে, অতএব উপস্থিত ছাড়তে নেই।"—তাই ত মা নিতে হ'ল।

মাতা। তবেই ত বাবা, হঠাৎ কাজ ছাড়লে তাঁরাই বা কি ভাববেন ? আর দু-মাস আগে হ'লে বৌমাকে নিয়ে আমি দেশে চ'লে যেতুম, না-হয় বৌমার বাপের বাড়ীতে আমিই গিয়ে কয়েক দিন থাকতুম—এ সময় আর মান অপমান কি ? কিন্তু এখন আর ত সময় নেই। তাই ত বাবা, এখন উপায় কি হয়, তুমি এখানে না থাকলে, আমি কার ভরসায় থাকব ? বৌমা শুনলে ভেবে সারা হবেন এখন।

মাতাপুত্র উভয়েই স্থির করিলেন, উপস্থিত এ কথা মায়ার নিকট প্রকাশ করিয়া কাজ নাই, পরে বিবেচনা করিয়া যাহা হয় স্থির করা যাইবে।

পরদিন কাছারি হইতে আসিয়া বরদা বাবু চাপকানের বোতাম খুলিতে খুলিতেই মাতাকে ডাকিলেন। মাতা আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আর-না-কালী কে মা ? সে আমাকে চিঠি লিখেছে।"

মাতা। আর-না-কালীর কথা তোর মনে নেই ? সেই যে রে, সেই ও-বাড়ীর মেজদাদার ছোট মেয়ে, মনে পড়ছে না ? খুব বড় বড় চোখ, রং ফরসা, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। মস্ত মেয়ে—অনেক বয়েস অবধি বিয়ে হয় নি—মেজদাদা কি করবে বল্, সাত আটটা মেয়ে, ঐ সামান্য আয়, পেটে খেতে কুলোয় না, তা মেয়েদের বিয়ে দেবে ! সবগুলোকে ধ'রে ধ'রে একটা যার-তার হাতে দিত। এ মেয়েটা আর পার হয় না, শেষে একটা দোজবরে জোটালে, সে বর আবার পত্তরের দিন ২০০৲ টাকা চেয়ে বসলো। বলে, ২০৲ টাকা হাতে নেই, তার আবার ২০০৲ টাকা—দেবে কোথা থেকে ? সে সম্বন্ধও ত ভেঙ্গে গেল, শেষে আমাদের পাড়ার সেই যে হলধর ছেলেটাকে তোর মনে পড়ে কি ? তার হাতে পায়ে ধ'রে আর্নীকে তার গলায় গেঁথে দিলে।

বরদা। সে হলধর কি করে মা ?

মাতা। সে ছেলেটা করবে আর কি, মূর্খ বই ত নয়! তবে স্বভাবটি বড় ভাল, পরোপকারী, মানুষের আপদে বিপদে বুক দিয়ে পড়ে, যে যা ফরমাশ করবে, ঝড় হোক, জল হোক, তখনি তা করবে। সামান্য কিছু জমিজমা ছিল, তা তাও বোধ হয় রাখতে পারে নি, খাজনার দায়ে বিকিয়ে গেছে। কেন বাবা, তারা কি চিঠি লিখেছে? তোমার কাছে চাকরি চেয়েছে বুঝি?

বরদা। দেখ মা, ভগবান্ নিরুপায়ের উপায়। কয়েক দিন থেকে যে আমার কি ভাবনা হয়েছিল, তা বলতে পারি না—ঠিক এই সময় এই চিঠিখানা এল, একটা উপায় হ'তে পারে। শোন মা, আর-না-কালী কি লিখেছে :—"শত কোটি প্রণাম নিবেদনমিদং শ্রীচরণেষু, দাদা, আপনি বোধ হয় আমাকে চিনিতে পারিবেন না—কিন্তু পিসিমার অবশ্যই আমার কথা মনে আছে। তিনি যত্ন না করিলে এ দুঃখিনী বোধ হয় এত দিন অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিত। তাঁহার অনেক খাইয়াছি, অনেক লইয়াছি, তিনি এ অভাগিনীকে ভালবাসেন, এজন্য সাহস করিয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। আমি বড় অভাগিনী, ইতিপূর্ব্বে আমার তিনটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ও এক বৎসর বয়স হইতে-না-হইতে একে একে আমাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছে। দাদা, আমি বড় অভাগিনী, আমার প্রাণের ধনগুলি ঔষধ পথ্য অভাবে মারা পড়িয়াছে। হরি এত দুঃখ দিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই, আজ ২০ দিন হইল আবার একটি পুত্র হইয়াছে, ইহাকে কেমন করিয়া বাঁচাইব, তাহা ভাবিয়া কোনই কূলকিনারা না পাইয়া আপনার শরণাগত হইতেছি। আমার এ ছেলেকে তোমার পায়ে ফেলে দিলাম, রাখতে ইচ্ছা হয় রাখ; মারতে ইচ্ছা হয় মার। দাদা, দয়া ক'রে যদি আপনার ভগিনীপতিকে একটু কাজ ক'রে দেন, তবে খেয়ে প'রে তিনটে প্রাণ বাঁচে। কাজকর্ম্ম না থাকায়, আর রোগে শোকে ব'সে ব'সে খেয়ে যা কিছু জমি-জমা ছিল গেছে, এখন অনাহারে প্রাণ যায়। পিসিমাকে আমাদের শত কোটি প্রণাম জানাবেন, বৌদিদিকে আমার প্রণাম ও ভালবাসা দিবেন। অধিক আর কি লিখিব। আপনার হাতে তিনটি প্রাণ, এই কথা অবশ্য মনে করিয়া উত্তর দানে আমাদের রক্ষা করিবেন। ইতি শ্রীমতী আর-না-কালী দেবী।"

মাতা। আহা, আরনীর এমন দুর্দ্দশা হয়েছে! মেয়েটা খুব বুদ্ধিমতী ছিল, আমার অনেক কাজকর্ম্ম ক'রে দিত। কাছে কাছে থাকতো, আমি এটা-সেটা দিতুম, আহা, তাইতে কত খুশি হ'ত। তা বাবা, কাজ একটু ক'রে দিতে পারবে কি? হলধর বড় ভাল ছেলে। মাথার উপর কেউ ছিল না, মা দুঃখু কষ্ট ক'রে ছেলেটাকে মানুষ করতো। লেখাপড়া ভাল ক'রে শিখতে পারে নি, তবে একটু আধটু ইংরাজী জানে।

বরদা। মা, আমি মনে করেছি যে, একটি মুহুরিগিরি কাজ খালি আছে, সেইটে হলধরকে ক'রে দিই। ওদের কিছু টাকা পাঠিয়ে দু-জনাকেই এখানে আসতে লিখে দিই। আর, তিন মাসের জন্য আমি মুঙ্গের যাই, ধাই ডাক্তার সব ঠিক আছে, মাসিমারা আছেন—হলধর আর তার স্ত্রী তোমাদের কাছেই থাকবে, তা হ'লে মা, তোমার সাহস হবে না কি?

মাতা। তা বাবা হ'তে পারে বটে। আমার যদি চক্ষের দোষ না ধরতো, তা হ'লে আর কিছুই ভাবতুম না—চিরদিনই ত আমি ভগবান্‌কে স্মরণ ক'রে বুক বেঁধে আছি। সত্যিই ভগবান্ নিরুপায়ের উপায়। ওরাও মারা পড়তে বসেছে, আমাদেরও এই সঙ্কট সময়, তা না হ'লে হয়ত ওদের আনবার জন্যে চাড় হ'ত না। তবে কি না এই ভাবছি, পাছে আবার অ-বনিবনাও হয়—তারা গরিব মানুষ, যত্নের ত্রুটি হ'লে সহজেই মনে অভিমান হ'তে পারে। আর্‌নী আবার বড় অভিমানী মেয়ে, সমস্ত দিন যদি উপবাসী থাকতো ত কখনও জানতে দিত না; সন্তানের মায়ায় মাথা নত ক'রে তোমাকে লিখেছে। আমি ত তেমন যত্ন করতে পারবো না, আর বৌমাও ছেলেমানুষ।

বরদা। মা, তাদের হাতেই যখন সমস্ত সংসারের ভার দিয়ে যাচ্ছি, তখন উপস্থিত কোন ভাবনার কারণ নেই। মায়া শুনলে আরও খুশী হবে এখন: আমি দূরে থাকবো শুনে ততটা কষ্টবোধ করবে না, তুমি দেখো।

মাতা। তা সত্যি। পাগলী আমার মানুষ পেলে ব'ত্তে যান। আহা, একলাটি থাকে কি না! তবে বাবা, তাই তবে ঠিক হ'ল—শীঘ্র তাদের কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রেলের গাড়ী

অগ্রহায়ণ মাস—হু হু করিয়া বাতাস বহিতেছে। রাত্রি প্রায় ১টার সময় বর্দ্ধমান রেলষ্টেশনে একখানা মস্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছাড়ি-ছাড়ি করিতেছে। দুই বার ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে, যাত্রীরা সকলেই উঠিয়াছে, ধপাস্ ধপাস্ করিয়া গাড়ীর কপাট প্রায় সবগুলি বন্ধ হইয়াছে, গার্ড নিজের গাড়ীর দিকে চলিয়াছে, ষ্টেশনমাষ্টার তৃতীয় ঘণ্টার হুকুম দিলেই গাড়ী ছাড়িয়া যায়—এমন সময় একটি বৃদ্ধা রমণী ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ষ্টেশনের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন এঞ্জিন ফোঁস্ ফোঁস্ করিতেছে, তার আর বিলম্ব যেন সহে না। বুড়ীর কোমরে একটি ছোট বুঁচকি, হাতে একটি ঘটি, গায়ে একখানি ছাই রঙের লুই। বুড়ী ট্রেনের দিকে দৌড়িতে দৌড়িতে বলিল, "ও বাবা, বানারসের গাড়ী কৈ বাবা?" একজন কনষ্টেবল বুড়ীর ঘটি ধরিয়া বলিল, "এ বুড়ী কাঁহা যাতা? গাড়ী আভি ছুট্ যাতা হ্যায়।" বুড়ী বলিল, "ও বাবা, তা হবে না, আজ এই গাড়ীতে আমাকে যেতেই হবে; আজ একাদশী, কাল আমি বিশ্বেশ্বর দর্শন ক'রে তবে জল খাব। ও বাবা, আমাকে ছেড়ে দে বাবা—ও বাবা, ও সাহেব বাবা, তুমি বেঁচে থাক বাবা, আমাকে গাড়ীতে উঠিয়ে দাও বাবা, তোমার ভাল হবে বাবা।" ষ্টেশনমাষ্টার নিকটেই ছিলেন, ফিরিয়া দেখেন যে, কনষ্টেবলটা বুড়ীর হাত জোরে ধরিয়া আছে, আর বেচারী বুড়ী ছাড়িয়া দিবার জন্য কাকুতি মিনতি করিতেছে—"ও বাবা, আমি অনেক দূর থেকে আসছি বাবা। আজ একাদশী, উপবাসী আছি, কাল বাবাকে দর্শন ক'রে গঙ্গাস্নান ক'রে জলগ্রহণ করবো।"

সাহেব বাঙ্গলা বুঝেন, তিনি সক্রোধে কনষ্টেবলকে বলিলেন, "ছোড়্ দেও।" বুড়ী ছাড়া পাইয়া ছুটিতে ছুটিতে ট্রেনের দিকে চলিল। সাহেব তাহাকে, "ইধার আও মায়ী" বলিয়া একখানা স্ত্রীলোকের গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। বুড়ীর আশীর্ব্বাদ-বাক্য শেষ হইতে না হইতে ট্রেন ছাড়িয়া দিল। বুড়ী গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিতে ব্যস্ত ছিল—এক্ষণে নিজের পায়ের কাছে ঘটি ও পুঁটুলিটি

রাখিয়া বেঞ্চিতে বসিল। একে বুড়া মানুষ, তাহাতে রাত্রিকাল, মিট-মিটে আলোতে ভাল দেখিতে না পাইয়া বেঞ্চিতে বসিতেই, "আ ম'লো, কে রে" বলিয়া একজন লোক, বুড়ীকে একখানা পায়ে ঠেলিয়া দিল। সেই বেঞ্চিতে একটি নীল রঙের র‍্যাপার মুড়ি দিয়া এক স্ত্রীলোক শুইয়া ছিল, বুড়ী তাহার পায়ের উপর বসিতেই সে পায়ের ঠেলা দিয়াছিল। বুড়ী বলিল, "ও মা, আমি গো, আমি বুড়ো বামনের মেয়ে মা, কাশী যাচ্ছি বাবাকে দর্শন করবো ব'লে। সারাদিন বড় কষ্ট গেছে—দে একটু ঠাঁই দে, একটু বসি; উঠে ব'স্ গো উঠে ব'স্।" সে কোন কথা কহিল না, অল্প পা সরাইয়া লইল মাত্র। তখন বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বলিলেন, "ও মা, উঠলি নে মা? আমি যে বুড়ো মানুষ, বামনের মেয়ে, তোর পায়ের কাছে বসলে যে তোমার অকল্যাণ হবে মা! তুমি ঘুরে শোও মা, আমি তোমার শিওরে ব'সে যাব এখন—একটু ঠাঁই দে মা, আমার গা কাঁপছে মা, ও-বেঞ্চিতে মোটে ঠাঁই নেই, তুই মা শুয়ে আছিস, তাই বলছি।" তখন স্ত্রীলোকটি বলিল, "অকল্যাণ হয় আমার হবে, তোমার তাতে কি?" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "ও কথা কি বলতে আছে? ষাট্ ষাট্!" এমন সময় একটি ক্ষুদ্র শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন, "ও মা, তোর বাছাটি বেঁচে থাক্ মা, আমার যত চুল, এত পরমায়ু হোক, আমায় একটু ব'সতে ঠাঁই দে।" তখন "ভাল জ্বালা" বলিয়া স্ত্রীলোকটি উঠিয়া বসিয়া শিশুটিকে শান্ত করিতে লাগিল। এত ক্ষণে বৃদ্ধা একটু স্থান পাইয়া, বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতে পাইলেন।

উঠিয়া বসায় স্ত্রীলোকটির মুখের আবরণ মুক্ত হওয়াতে বৃদ্ধা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি অল্পবয়স্কা, বড় বড় চোখ, তীক্ষ্ণ নাসিকা, রং ফরসা। মোটের উপর তাহাকে যে-কেহ সুন্দরীই বলিবে। কিন্তু কেহ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, সে মুখের ভাব কঠিন, তাতে স্ত্রীজাতিসুলভ কোমলতার অভাব। এক্ষণে বৃদ্ধার প্রতি বিরক্তিতে আরও ভীষণ দেখাইতেছিল। বৃদ্ধা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ও মা, রাগ করিস নে, রাগ করতে নেই। ছেলেমানুষ, কারও শাপমন্নি কুড়োতে আছে কি? দেবতা বামনে শ্রদ্ধা করতে হয়, তা হ'লে ভগবান্ তোর ভাল করবেন। হ্যাঁ মা, তুই কোথা যাবি গা? সঙ্গে আর কে আছে? কোলে উটি কি—

খোকাটি বুঝি ? আহা বেঁচে থাক্, কোল জোড়া হয়ে থাক্, তোর প্রাণ ঠাণ্ডা হোক। মা গো, নাড়ীর জ্বালা বড় জ্বালা—সব যমকে দিয়েছি মা, সব যমকে দিয়েছি। চার বেটা, তুই মেয়ে নাতি নাতনী যমের জন্যে হয়েছিল, সব যমকে দিয়েছি। আমার মরণ নেই, চার কাল বেঁচে থাকবো, যাই—বিশ্বনাথের চরণে যদি ঠাঁই পাই, দেখি যদি সেখানে এ জ্বালা জুড়োয়।”

বৃদ্ধা উত্তরের অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজেই অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে তন্দ্রায় তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিল, তিনি ঢুলিতে লাগিলেন। শোকাতুরার শোক-কাহিনী শুনিতে শুনিতে মেয়েটির মুখের কঠোর ভাব দূর হইল, কোমল ছল ছল নেত্রে বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া বলিল, “হ্যাঁ গা, একটু শোও না গা—আহা, শোকাতুর মানুষ, শোও শোও।”—বলিয়া সে যে বালিশটা নিজে মাথায় দিয়াছিল, তাহা বেঞ্চির মাঝখানে রাখিয়া এক পার্শ্বে বৃদ্ধাকে শয়ন করিতে দিয়া অপর পার্শ্বে শিশুটি বুকে করিয়া নিজে শয়ন করিল।

ভোর হয়-হয়, এমন সময় গাড়ীর গতি মন্দ হইয়া একটা ষ্টেশনে প্রবেশ করিল—কুলীরা হাঁকিতেছে ‘আরা-আ-আ।’ অমনি মেয়েদের গাড়ীর পাশের গাড়ী হইতে একটি পুরুষ নামিয়া আসিল, এবং “অনু, শীঘ্র নাম, আরায় এসেছি যে” বলিয়া মেয়েদের গাড়ীর দরজার চাবি খুলাইল। শিশুটিকে বুকে করিয়া তাড়াতাড়ি সে নামিয়া আসিবার সময় বৃদ্ধার পদধূলি লইয়া বলিল, “মা, অপরাধ নিও না, আমার খোকাকে আশীর্ব্বাদ ক'রো।” গাড়ী চলিতে লাগিল—“বেঁচে থাক্, তোর খোকা বেঁচে থাক্”—বলিয়া বৃদ্ধা তুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গাড়ীর সহিত অদৃশ্য হইয়া গেল। ষ্টেশনের যাত্রীরা কুলীর মাথায় পোঁটলা পুঁটুলি চাপাইয়া, যে যাহার গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অরুণ

আজ রাত্রে মায়ার ঘুম হয় নাই—ভোরের গাড়ীতে ঠাকুরঝি আসিবেন। ঐ বুঝি ভোর হইল—গাড়ীর সময় হইয়াছে, ঐ বুঝি গাড়ী

এল! সে পূর্ব্বে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিবে, নহিলে ঠাকুরঝিকে পালকি হইতে তুলিবে কে? রাত্রের মধ্যে দুই-তিন বার উঠিয়া উঠিয়া ঘড়ি দেখার পর সময় হইল—গাড়ী আসিল। খিড়কির দ্বারে পালকি নামিতে-না-নামিতে চঞ্চলা মায়া কপাট খুলিয়া, যেন কত কালের পরিচিতার মত "এস ঠাকুরঝি, দাও ভাই খোকাকে; আহা, পথে তোমাদের কত কষ্ট হয়েছে!" ইত্যাদি বলিতে বলিতে খোকাকে তাহার মায়ের কোল হইতে উঠাইয়া লইল। ক্ষুদ্র শিশুকে কোলে করিতে তাহার যে সঙ্কোচ ও ভয়, আজ মনের আবেগে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে—কাপড়-চোপড় মোড়া শিশুকে লইয়াই সে "মা গো, কি বাতাস, খোকার ঠাণ্ডা লাগবে" বলিয়াই ঘরে চলিয়া গেল; ঠাকুরঝিকে অভ্যর্থনা করার কথা মনেও নাই। সে একেবারে বরদা বাবুর কাছে গিয়া বলিল, "দেখ দেখ, কেমন খোকাটি দেখ! তোমাকে একটি কথা বলি—আমি মনে করেছি কি জান? আমার খোকা হ'লে তার নাম রাখবো অরুণ, কিন্তু তা আর হ'ল না—আজ এই ভোরে ঠিক অরুণোদয়ে এই খোকা এসেছে, এরই নাম থাক্ অরুণ—আমার যদি খোকা হয়, তবে তার নাম হবে এখন তরুণ।"

বরদা বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আর যদি খুকী হয়?"

মায়া বলিল, "সে ঠিক করা আছে গো আছে—তার নাম হবে অরুণা, অরুণা—বুঝলে!"

অনু আসিয়া তাহার পিসিমা ও বরদা বাবুকে প্রণাম করিল। পরে মায়াকে প্রণাম করিতে আসিলে, সে তিন হাত সরিয়া দাঁড়াইল। অনু বলিল, "পিসিমা দেখুন, বৌদিদি প্রণাম নিলেন না।"

পিসিমা বলিলেন, "ও পাগলী—ওকে আর প্রণাম করতে হবে না।" বলিতে বলিতে অনুর হাত ধরিয়া বলিলেন, "মা, ওকে তোর ছোট বোন মনে করিস, কোন দোষ ঘাট গ্রহণ করিস নে; ওর মনে মুখে এক, আপন আনন্দে আপনি বেড়ায়, সংসারের কিছুই জানে না। আমি ত চোখে ভাল দেখি নে, এ ঘর-সংসার সকলই মা, তোমার ব'লে দেখো শুনো, দিয়ো থুয়ো—তুমিই বাড়ীর গিন্নী।"

মায়া বলিল, "ও মা, খোকা যে দুধ খাবে, কাঁদছে।" হাঁ, খোকা মায়ার অনভ্যস্ত হাতে কাঁদিতেছে। তাহার মা তাহাকে দুগ্ধ দানে শান্ত করিতে

বসিলে, বরদা বাবু বাহিরে গিয়া হলধরের সহিত চা পান ও আলাপাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিপ্রহরে মায়ার দিদি ও মাসি আগন্তুকদের দেখিতে আসিলেন। মায়া আজ উৎফুল্ল—তাহার ঠাকুরঝি কি সুন্দরী! সে তাহাকে নিজের এক জোড়া সোনার চুড়ি ও এক ছড়া হার পরাইয়া দিয়াছে, পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরাইয়াছে!—"মাসিমা, এই আমার ঠাকুরঝি। এই দেখুন কেমন খোকা—ওর নাম অরুণ—কেমন দিদি, বেশ নামটি না ভাই?"

দিদি ও মাসিই এত দিন ছিলেন মায়ার নিকটতম আত্মীয়া, সুতরাং মায়ার নূতন আত্মীয়াটিকে তেমন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অনু মায়ার মাসি ও দিদিকে প্রণাম করিল। মাসিমা বলিলেন, "তাই ত, তোমার ননদ ত দিব্যি সুন্দরী। চুড়িগুলি আর হাব ছড়াটি দেখছি তোমার —মা আমার পাগলী কি না, আসতে না আসতে ননদকে সাজানো হয়েছে।" বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া, সস্নেহে মায়ার চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজ হস্ত চুম্বন করিলেন। অপ্রতিভ হইয়া সঙ্কোচে মায়ার মুখ লাল হইয়া উঠিল। অনুর ঠোঁটের হাসিটুকু মিলাইয়া গিয়া, চক্ষু ছলছল করিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি "খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া আসি" বলিয়া সন্তান লইয়া তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে চলিয়া গেল।

মায়া মাসির উপর বিরক্ত হইয়াছে, কি বলিবে, কি করিবে, ভাবিয়া পায় না। তাহার বড় আনন্দে বাধা পড়ায় হাস্যপ্রফুল্ল মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। মাসি বলিলেন, "ও মা, তোমার ননদ যে দেখি বড় অভিমানী! বাপ রে, মেয়ে একেবারে যেন ফোঁস ক'রে উঠে চ'লে গেলেন।"

মায়া বলিল, "মাসিমা, গয়নার কথা তুমি কেন বললে? ওতে ত লজ্জা হবারই কথা। ওর এখনও তোরঙ্গ খোলা হয় নি, তাই আমি পরিয়ে দিয়েছি, তাতে দোষ কি কিছু হয়েছে?"

মাসি অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, গহনা ত অষ্টাঙ্গের সবই আছে, কেবল বের ক'রে পরার অপিক্ষে! খেতে পায় না, ছেলেটা দুধ অভাবে যেমন পেট থেকে পড়েছে, তেমনি আছে; হাত পাগুলো জড়ানো জড়ানো, কে বলবে এক মাসের ছেলে।"

মায়া বলিল, "চুপ কর মাসিমা, উনি শুনতে পাবেন যে! উনি এসেছেন—আমাদের অসময়ে কত যে উপকার হ'ল।"

প্রায় সকল কথাই অনু ঘরের মধ্য হইতে শুনিতেছিল। তাহার মুখের ভাব কঠিন হইয়া আসিল, চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ক্ষণ-পরে চক্ষু মুছিয়া, ছেলেকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল, "তোর জন্যে, তোকে বাঁচাবার জন্যে আমি সব—সব সইব। আমি গরিব, আমার পয়সা নেই—কেন তোরা আমার ঘরে আসিস? বাছা আমার, তোকে বাঁচাবার জন্যে আমি সকল দুঃখ, সকল লজ্জা, সকল অপমান সহ্য করবো, যেমন ক'রে পারি তোকে বাঁচাবো।"

সন্তানটির মুখ চুম্বন করিয়া সে ধীরে ধীরে তাহাকে শয়ন করাইয়া দিয়া, সোনার চুড়ি খুলিয়া রাখিল। পরিধানের সূক্ষ্ম বস্ত্র ছাড়িয়া একখানি মোটা কাপড় লইয়া পরিয়া, ছেলেটির পায়ের দিকে বসিয়া তাহার ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কত ক্ষণ যে সে এমন হতচেতন ভাবে বসিয়া ছিল, তাহা সে জানে না—মায়ার কণ্ঠস্বরে তাহার যেন চেতনা ফিরিয়া আসিল। "ঠাকুরঝি, মাথা খাও, হার চুড়ি তোমাকে পরতেই হবে, আমার উপর রাগ ক'রো না ভাই! লোকের কথায় কি হবে? আমি তোমার ছোট বোন। অরুণ কখন দুধ খাবে ভাই? অনেক ক্ষণ যে খেয়েছে!" বলিয়া চুড়িগুলি হাতে পরাইয়া, হার ছড়াটি গলায় পরাইয়া দিলে, অনু মুখ ফিরাইয়া সদ্য উছলিত চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া শিশুকে কোলে তুলিয়া লইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দুর্য্যোগ

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—ভোর হইয়াছে, তবু অন্ধকার ঘুচে নাই; হু হু করিয়া উত্তরে বাতাস বহিতেছে, মাঝে মাঝে টিপি টিপি বৃষ্টিও পড়িতেছে। আজ এখনও দাস দাসী কেহই উঠে নাই। বরদা বাবুর মাতা "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া শয়ন-ঘর হইতে দালানে বাহির হইলেন। পূর্ব্বে যে ঘরটি ভাঁড়ার ছিল, নিজের ঘর অনুদের জন্য দিয়া তিনি সেই ঘরটি নিজের জন্য গুছাইয়া লইয়াছেন, রান্নাঘরের পাশে ভাঁড়ার-ঘর হইয়াছে।

বরদা বাবু নূতন কর্ম্মস্থলে গিয়াছেন। ঘরে আসন্নপ্রসবা বধূ, তাঁহার দৃষ্টি ক্ষীণ, দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইলে, সকল দুঃখহরণ হরি স্মরণ করিয়া

বরদা বাবুর মাতা অন্তরে বাহিরে শক্তি লাভ করেন। আজি প্রকৃতির এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষণ্ণ প্রভাতে তাঁহারও মনের বিষণ্ণতা দূর হইল না। তাঁহার সাড়া পাইয়া অনু বাহিরে আসিয়া বলিল, "পিসিমা, এত ভোরে উঠেছেন?"

তিনি বলিলেন, "খুব ভোর নয় মা, ৬টার গাড়ী অনেক ক্ষণ চ'লে গেছে। মেঘ ক'রে রয়েছে যে। তাই ভাবছি মা, আজ যদি বৌমার বেদনা হয়, তবে কি ক'রে কি যে হবে!"

অনু বলিল, "না পিসিমা, কোন ভাবনা নেই, কেন আপনি ভাবছেন? আমরা সবাই আছি, উপরে ভগবান্ আছেন, ভয় কি?"

পিসিমা বলিলেন, "তাই বল মা, তাই বল।"

বরদা বাবুর মাতা যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাই ঘটিল। দ্বিপ্রহরে মেঘ আরও ঘনাইয়া আসিল; বেগে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, হু হু শব্দে বায়ু বহিতেছে, এমন সময় মায়ারও বেদনা বাড়িতেছে—আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার কষ্টক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া, দাই গিয়া সকলকে জানাইয়া দিল যে, এখন ধাত্রী ও ডাক্তারকে সংবাদ দিবার সময় উপস্থিত।

নূতন দাইয়ের নিকট তাহার শিশুকে সমর্পণ করিয়া, অনু আসিয়া মায়াকে সস্নেহে কোলে তুলিয়া লইল। বাতাস বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া তাহার স্বামী হলধর, ধাত্রী ডাক্তার প্রভৃতি আনিয়া উপস্থিত করিল। সকলেই উদ্বিগ্নচিত্তে আগন্তুকের আগমনের প্রতীক্ষায় ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে মায়ার পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে, শঙ্খধ্বনি হইল। পরে জানা গেল, মায়ার জ্বর হইয়াছে। যথাকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া, 'কোন ভয় নাই' বলিয়া অভয় প্রদান করিয়া ডাক্তার ও ধাত্রী তখনকার মত বিদায় হইলেন। কিন্তু যখন দিনের পর দিন যাইতেছে এবং জ্বর না ছাড়িয়া তাহার সহিত অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল, তখন 'কোন ভয় নাই' এ কথা বলা রহিত হইল।

অর্দ্ধচেতন অবস্থায় মায়াকে তাহার শয়নগৃহে লইয়া যাওয়া হইল। সদ্যোজাত শিশুটিকে অনুর হাতে সমর্পণ করিয়া, সকলেই মায়াকে লইয়া ব্যস্ত। নূতন দাসীর সাহায্যে অনুই যমজ সন্তানের মত দুটি শিশুকে পালন করিতে লাগিল।

কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বরদা বাবু চলিয়া আসিয়াছেন। যে গৃহ হাস্যমুখী মায়ার প্রফুল্লতায় আনন্দপুরী ছিল, আজ সে গৃহ উদ্বেগে, ডাক্তারে, নার্সে, ঔষধপত্রে নিরানন্দময়।

দ্বিপ্রহরে মায়াকে দেখিতে দুই চারি জন করিয়া মহিলার সমাগম হইয়া থাকে। গৃহিণী তাহাতে একটু অসুবিধায় পড়েন। একে দুশ্চিন্তায় কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে মন চায় না, তাহার উপর মায়ার পথ্যাদি, শিশুদের তত্ত্বাবধান—অনেক সময় এমন হয় যে, নিজের রন্ধনের সময় পান না। তাঁহার দিনগুলি প্রায় অর্দ্ধাশনে কাটিতেছে। অনেক সময় মায়ার ঘরে এমন ভিড় হয় যে, অগত্যা নার্সকে বলিতে হয়, এমন করিলে রোগীকে রক্ষা করা ভার হইবে। তাহার পর হইতে ব্যবস্থা হইল যে, আর কেহ রোগীর ঘরে প্রবেশ করিতে পাইবেন না, বাহির হইতেই সংবাদ লইতে হইবে। ইহাতে মহিলারা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন ও বলিলেন, "ভালই হ'ল ঘরে ঢুকতে দেয় না। মা গো, যে অনাচার, একেবারে খ্রীষ্টানী কাণ্ড! আঁতুড় মাথায় উঠেছে, সব একাকার। ওদের বাড়ী থেকে এসে এই শীতে রোজ বিকেলে নেয়ে মরি—আমার কি দেখতে যাওয়া না কি অমনি হয়? গাড়ী পালকি ভাড়া চাই, ঘর-সংসারের কাজ ফেলে ছুটে যেতে হয়। তা কি করি, না গেলে নয়, তাই যাওয়া—তা আবার এমনি সাহেবী ব্যবহার যে, কাউকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না!" এমনি করিয়া গৃহিণীগণ পরস্পরে অসন্তোষ প্রকাশ ও যথারীতি আনাগোনা করিয়া বরদা বাবুর বাড়ীতে একটি ছোটখাট গল্পের মজলিস জমাইয়া তুলিলেন।

এক-এক দিন মায়ার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে, আবার আশা হয়। এই ভাবে আশা নিরাশায় মাসখানেক পরে আশারই জয় হইল। হৃষ্টমুখে ডাক্তার বলিলেন যে, প্রাণের আশঙ্কা আর নাই, তবে সম্পূর্ণ জ্বর ত্যাগ ও সুস্থ সবল হইতে সময় লাগিবে।

মায়ার পরিবর্ত্তে নবজাত শিশুকে লইয়া অম্বু ষষ্ঠীতলায় শয়ন করাইল, চুল দিয়া ষষ্ঠীতলা পরিষ্কার করিয়া শান্তিজল গ্রহণ করিল। উৎসবাদি কিছুই হইল না। পাড়ার গৃহিণীরা বলিলেন, "মা গো, ওদের হিঁদুয়ানির রকম দেখে গা জ্বালা করে। পোয়াতীকে নাওয়ানো নয়, ধোওয়ানো নয়, শুধু শান্তিজল দিলেই কি আঁতুড় উঠলো! আর ওদের বাড়ী পাত

পাড়বো না, জল স্পর্শ করবো না। কেন, অসুখ কি কারও হয় না? এই যে সেদিনে ললিতের বৌ প্রসব হ'ল। কাঠ ঘুঁটে রাখবার ঘরখানা পরিষ্কার করিয়ে দিয়ে আঁতুড় হয়েছিল; পাঁচুটের পর তক্তায় একখানা কম্বল, কাপড়-চোপড় দিলে। সেই দিনই তোমার গিয়ে বৌয়ের জ্বর—ডাক্তার এসে বললে, ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে। ঘরে নিয়ে যেতে বললে—তা ললিতের মা সদ্‌ব্রাহ্মণের মেয়ে, সে কি ঘর-সংসারে অনাচার করতে পারে? কিছুতে রাজী হ'ল না, সেই আঁতুড়েই বৌ রইল—ভাল কি হ'ল না? আঁতুড় কি নাড়তে আছে গা! সাহেবের মেমেরা কি না করে, তা ব'লে হিঁদুর ঘরে এত অনাচার! কালে কালে কত হবে, কত দেখবো! আমি যদ্দিন আছি, আমার বৌদের আমার মতে চলতে হবে। তাপ, সেক, ঝাল খাওয়া, এ সব আমার কাছে থাকলে করতে হবে ব'লে বৌরা সব বাপের বাড়ীতেই প্রসব হ'তে যান—কলিকাল কি না!"

নবম পরিচ্ছেদ

তরুণ

মায়াকে আজ একখানি চওড়া লালপেড়ে শাড়ী পরানো হইয়াছে; ষষ্ঠীতলা হইতে শিশুকে কোলে করিয়া অনু একবার তাহাকে মায়ার কোলে দিতে লইয়া আসিল। পুরোহিত শান্তিজল ও সিন্দূর লইয়া আসিলেন—নার্স মায়াকে একটুখানি তুলিয়া বসাইলে তাহার শাশুড়ী সিন্দূর পরাইয়া দিলেন। অনু শিশুকে তাহার কোলে দিলে সে ঈষৎ হাসিয়া দুই হাতে তাহাকে কোলের উপর ধরিয়া রহিল। পুরোহিত শান্তিজল ও প্রসাদী পুষ্প তাহার মাথায় স্পর্শ করাইলে, মায়া সেই অর্দ্ধ-শয়নাবস্থায় জোড়হস্তে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, পরে শাশুড়ীকে প্রণাম করিল।

তাহাকে আর চেনা যায় না; কেবল হাসিটুকু দেখিয়া মনে হয়—হুঁা, সেই মায়ার ছায়াটা বটে। পুরোহিত ও শাশুড়ী যথাকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া গেলে অনু খোকাকে তুলিয়া লইল। মায়া বলিল, "মনে আছে ঠাকুরঝি, ওর নাম তরুণ! ঠাকুরঝি, এ খোকাও ভাই তোমার—আমি হয়ত বাঁচবো না—দেখো ভাই, একে তুমি ফেলে যেন যেও না।" বলিতে

বলিতে তাহার বড় বড় চোখ ছলছল হইয়া উঠিল, সে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না, তাহার শীর্ণ গণ্ড দিয়া গড়াইয়া পড়িল। নার্স তাড়াতাড়ি মুছাইয়া দিয়া তাহাকে শয়ন করাইয়া বলিল, "আজ এঁর শরীর ও মনের উপর যে অত্যাচার হ'ল, এতে জ্বর বেড়ে যেতে পারে। আপনি তা হ'লে এখন খোকাকে নিয়ে যেতে পারেন—আপনাদের অনুষ্ঠানের আর কিছু বাকি ত নেই?"

অনু বলিল, "বৌ ভাই, অমঙ্গলের কথা ব'লো না। তোমার খোকা আমার কাছে গচ্ছিত রইল, মা সর্ব্বমঙ্গলার কৃপায় ভাল হয়ে তোমার ধন তুমি নিও। কোন ভাবনা নেই দিদি, তুমি ভাল হবে।"

মায়ার যে এত দূর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা মায়ার পিত্রালয়ে বা মাতুলালয়ে জানিতে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং ষষ্ঠীপূজার দিন এক বৃহৎ পার্শেলে মায়ার ষষ্ঠীপূজার লালপেড়ে শাড়ী, খোকার প্রচুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামা, ফ্রক, টুপি, মোজা, কাঁথা, লেপ, বালিশ, গায়ের তোশক, দুই তিনটি ছোট বড় রূপার বাটি, এবং আর আসিয়াছে সোনার ঝিনুক! ইহা সমস্তই পাঠাইয়াছেন মায়ার দিদিমা। লিখিয়াছেন, "মায়ি, এত দিন পুতুল নিয়ে খেলা করেছিস, এখন এই সব লেপ কাঁথা, বাটি ঝিনুক পাঠাই—সোনার খোকাকে নিয়ে খেলা কর্।"

বরদা বাবুর মাতা এই পত্র ও জিনিসগুলি মায়াকে দেখাইতে চাহিলে ডাক্তার ও নার্স তাহাতে বাধা দিলেন; বলিলেন যে, না—আজ আর তাঁহারা রোগীকে উত্তেজিত হইতে দিতে পারেন না। ক্ষুণ্ণমনে তিনি অনুকে সব তাহার শয়ন-ঘরে লইয়া উঠাইয়া রাখিতে ও খোকার জন্য ব্যবহার করিতে বলিয়া দিলেন। খোকার জন্য আর একটি জিনিস আসিয়াছে—ছোট সোনার হারে গাঁথা একটি ছোট সোনার মাদুলি, তাহার মধ্যে বাবাঠাকুরের ফুল আছে। ইহা মায়ার ছিল, এত দিন একে একে মায়ার সব ভাইগুলির শিশুকালে ছয় মাস বয়স পর্য্যন্ত গলায় দেওয়া হইয়াছে, এবার মায়ার নবজাত সন্তানের জন্য ইহা পাঠানো হইয়াছে। এটি বড় জাগ্রত দেবতার ফুল—বড় মঙ্গলময়—মায়ার মাতার এ পর্য্যন্ত কোন সন্তান নষ্ট হয় নাই, সকলেই সুস্থ ও সবল—তাই ইহা মায়ার সন্তানের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। নবজাত শিশু তরুণের গলায় তাহার পিতামহী হরি স্মরণ করিয়া সেই হার পরাইয়া দিলেন।

আজ দ্বিপ্রহরে প্রতিবেশিনী মহিলাদের অনেকেই বিনা নিমন্ত্রণে বরদা বাবুর বাড়ী আসিয়াছিলেন এবং সকলেই সাধ্যমত দুই-একটি মুদ্রা দিয়া তরুণকে কোলে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনু টাকাগুলি পিসিমাকে দিতে গেলে তিনি বলিলেন, "আমাকে কেন মা? ও ত তোমারই—ছেলের আশীর্ব্বাদী মায়েতেই নেয়; ওর ব'লে যা-কিছু, সে-সবই মা তোমার। কেবল এই বল মা—যে, আমার বৌমা যেন প্রাণে রক্ষা পান। সাধ-আহ্লাদের আশা আর আমি করি নে; তোমাদের দশ জনের হয়ে খোকা বেঁচে থাক্, সেই আশীর্ব্বাদ সবাই কর।"

তখন গৃহিণীর দল একত্রে বলিয়া উঠিলেন, "ও মা, তা বই কি, তা বই কি, তা করব বই কি। আহা দিদি, তুমি যে মাটির মানুষ, তোমার ভাল হবে না ত কা'র হবে? আহা, গ্রহের ফের—তাই বৌমাটির এত এত ভোগ হ'ল—ভাল হবে বই কি!"

এইরূপে একবাক্যে ও প্রাতঃবাক্যে সকলের আশীর্ব্বাদ করা শেষ হইলে বাঁড়ুজ্যে-গৃহিণী বলিলেন, "দেখ বরদার মা, তোমাকে একটি কথা বলি শোন—একজন দুধালী দাই তল্লাস ক'রে আন—বুকের দুধ না হ'লে ছেলে মানুষ করা কঠিন।"

বরদার মা বলিলেন, "এ সব কথা হয়েছিল, কিন্তু ডাক্তার বলেন, ঝি-দাইদের দুধ খাওয়াতে আবার অনিষ্ট আছে; তিনি বলেন, তার চেয়ে ঘরে গরু রেখে তার দুধ দেওয়া হোক। আর দিদি, আমার অনু বড় লক্ষ্মী মেয়ে, অনু দুটিকে সমান ক'রে দুধ দিচ্ছেন, দুটিই যেন ওঁর নিজের।"

মায়ার মাসি। কৈ, নিয়ে আয় না গো, তোর খোকাকে আমরা সবাই দেখি। দে বাছা, এ খোকাটি আমার কোলে দে।

অনু তাঁহার আজ্ঞামত তরুণকে তাঁহার কোলে দিয়া অরুণকে লইয়া আসিল। অরুণকে আনিতে তাহার একটু সঙ্কোচ হইতেছিল; কেন না, বরদা বাবুর মাতার আদেশে সে অরুণ ও তরুণকে একই প্রকারের টুপি, জামা ও মোজা পরাইয়াছে। এখানে নবজাত শিশুর জন্য যে-কোন পোষাক বিছানাদি আনানো হইয়াছে, তাহা দুই প্রস্থ করিয়াই হইয়াছে। অভিমানিনী অনুর মনে পাছে অভিমান জাগিয়া উঠে, এই ভয়ে তিনি শঙ্কিত থাকিতেন। শুধু তাহা নহে, তাহার সহিত কৃতজ্ঞতাও মিশ্রিত ছিল—এ বিপদে অনু যে অনেক করিয়াছে!

অনুর খোকা দেখিয়া মাসি বলিলেন, "ও মা, এ যে যমজের মতই দেখাচ্ছে! এক সাজ, এক সজ্জা, কেবল আমার মায়ার খোকার গলায় এই বাবার মাদুলিটুকু আছে তাই।"

আর এক গৃহিণী কহিলেন, "হ্যাঁগা, তা ও-খোকা ত এর চেয়ে মাস-দুয়েকের বড় না?"

মাসি বলিলেন, "হ্যাঁ, তা বড় হ'লে কি হয়, সবার গড়ন কি সমান? ওরা যে দিন এল, আমি ত দেখেছিলুম, এতটুকুখানি যেন পুতুল। এই আজ ত দেখছি মানুষের মতন হয়েছে; এখানকার ঘরের খাঁটি দুধ খাচ্ছে, কাঁথা কানিতে শুতে হচ্ছে না, ভাল লেপ বালিশ তোশক! আমার বরদা সদাশিব—খোকার ব'লে যা ঘরে আসছে, দেখছি সকলই দুই প্রস্থ। ওদের যেমন কপাল—এমন আশ্রয়ে এসেছেন, এখন এঁদের বৌটি ভাল হ'লে হয়। মায়া আমার এমনি পাগলী, ননদকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। নিজের গয়না কাপড় সব দিয়ে ননদকে সাজানো, ছেলেকে দুধ খাওয়ানো, করা কর্ম্মা, সে আর একমুখে কত বলবো। এই ক'দিনে অনুরই বল, আর খোকাটিরই বল—বলতে নেই—তা চেহারা ফিরেছে।"

অনু তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরে চলিয়া গেল। বরদা বাবুর মাতা বলিলেন, "অনু আমার পেটের সন্তানের অধিক হয়েছে; আজ সে না এলে এ বিপদে কি ক'রে উদ্ধার পেতুম ভেবে পাই নে।"

মাসি কহিলেন, "তা বেয়ান, আমি রয়েছি, আমার মেয়ে ভগবতী রয়েছে, আমরা এসে বুক দিয়ে পড়তুম। তোমরা কি আমাদের পর? এ ত পাতানো সম্পর্ক নয়—মায়ার মা আমার দিদির আপন জা—বলতে গেলে আপন বোনই। এ বিদেশে সবারই সবাইকে দেখতে শুনতে হয় বই কি!"

অনু আসিয়া তরুণকে লইয়া গেল। নানা কথা শুনিতে বা বলিতে তাহার ভাল লাগে না।

বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী বলিলেন, "তা বই কি বরদার মা, আজ না হয় অনুরা তোমার এসেছে—এই যে এত দিন ওরা ছিল না, দিন কি যায় নি? এই যে তোমার বৌটির সাধের দিন—কে ভাই করলে, আমরাই ত?"

এইরূপ মন্তব্যে অপ্রতিভ হইয়া বরদা বাবুর মাতা বলিলেন, "না দিদি, সে কথা কি আর আমি জানি নে? সংসারে আমি বহু দিনই একা

হয়েছি, আপন বলতে তোমরা দশ জনেই আমার আপন। তবে অনু ছেলেমানুষ, যে কষ্ট ক'রে বাছা আমার খোকাটিকে যত্ন করেছে, তা ত আমি দেখছি—বাছার সময়ে খাওয়া নেই, সময়ে শোওয়া নেই, রাত্রে ঘুম নেই, তাই বলছি ভাই। তোমাদের মায়া-দয়ার কথা কি মুখে ব'লে জানাতে পারি! তোমাদের সবাইকে ছাড়তে হয় ব'লেই ত এক রকম বরদা কাজটাই ছেড়ে দিলেন। এমন আত্মীয় স্বজন আমরা আবার কোন্ দেশে পাব?"

দশম পরিচ্ছেদ

বচসা

তরুণ সর্ব্বদাই বোতলে দুধ খায়, এক এক সময় কেবল তাহাকে ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়ানো হয়, অভ্যাস রাখিবার জন্যই। অরুণ বোতল মুখে ধরিল না। আজ অরুণের পিতলের ঝিনুকখানা খুঁজিয়া না পাওয়ায়, তরুণের সোনার ঝিনুকে মা তাহাকে দুধ খাওয়াইতেছিল দেখিয়া ঝি দাই কটাক্ষ করিয়া বলিল, "আ রে বাপ রে, সোনার ঝিনুকে দুধ খাওয়ানো! অঙ্গে সোনা কখনও চড়ে নি, সোনার ঝিনুকে ছেলেকে দুধ খাওয়ায়!"

শুনিয়া অনুর শরীর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বরদা বাবুর মাতা শুনিতে পাইয়া দাইকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "মনিবের কথায় বা কাজে তুই কথা ক'স্ কেন?"

দাই বলিল, "মা-জী, মনিবের কাজে কি আমি কিছু বলতে পারি? আন্ মানুষের বে-আক্কেল কাম দেখলে কি ক'রে চুপ ক'রে থাকি! আপন আপন ইজ্জৎ বাঁচিয়ে যদি সকলে চলে, তবে আমার সাধ্য কি যে, কিছু বলতে পারি? বৌমা রইলেন প'ড়ে, আমার খোকা বাবুকে কে দেখে, কে শোনে, সবাই আপন নিয়ে মত্ত—তার ঝিনুক, বাটি, লেপ, কাঁথায় দশ জনের ছেলে মানুষ হচ্ছে। আমি না থাকলে আমার খোকা দুধ অভাবে, যত্নের অভাবে, শুকিয়ে মারা পড়ত।"

বরদা বাবুর মা জানিতেন, দাই অত্যন্ত মুখরা এবং অনুকে বিশেষ ঈর্ষা করে। অনুর হাতে যে তরুণকে অর্পণ করা হইয়াছে, ইহা তাহার

মনঃপূত হয় নাই। সে আশা করিয়াছিল, প্রথম প্রসূতি মায়ার সন্তানকে পালন করিয়া সে এ গৃহের সর্ব্বময়ী হইয়া আধিপত্য করিবে; পুত্রের জন্মোপলক্ষে সোনার হার পাইবে। তাহার বড় আশায় ছাই পড়িয়াছে। মায়া অসুস্থ, অনু সন্তান পালনে দক্ষ, এবং সে বরং নূতন দাসীর সাহায্য গ্রহণ করে, তবু ঝি-দাইকে কোন আদেশ করে না। ঝি-দাই সময় নাই অসময় নাই, তরুণকে কোলে করিয়া, "আমার সোনা, আমার বাপ" ইত্যাদি বলিয়া আদর করে—বরদা বাবুর কাছে, মায়ার কাছে লইয়া যায়। অনু তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়, কিন্তু বাধা দেয় না। বরদা বাবুর মাতা শান্তপ্রকৃতির, তিনি মাঝে মাঝে বিরক্ত হইয়া বলেন, "ঝি, খোকাকে অমন ক'রে কোলে রাখিও না, বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া এস।"

ঝি কি করে, তাঁহার কথা অমান্য করিতে পারে না; "খোকা বাবুর নরম গা, বিছানায় শুয়ে শুয়ে দরদ হবে" বলিয়া গজ্ গজ্ করিতে করিতে শয়ন করাইয়া দিয়া আসে। আজও এইরূপ আদেশে পূর্ব্ব হইতেই তাহার মেজাজ খারাপ ছিল; অনুকে সোনার ঝিনুক ব্যবহার করিতে দেখিয়া আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না। মুখরার মুখ খুলিলে যাহা হয়—ন্যায় অন্যায় জ্ঞান রহিল না। অনেক দিনের রুদ্ধ মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। শুনিয়া বরদা বাবুর মাতা ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দাই, তোমার এত দূর স্পর্দ্ধা যে, অনুর কাজে তুমি কথা কও—তাকে মনিব ব'লে মনে কর না? আমি তোমাকে জবাব দিলাম—অনু যদি তোমাকে রাখে, তবেই তুমি এখানে স্থান পাবে।"

এত দূর হইবে, দাই তাহা মনে করে নাই, কিন্তু অনুর প্রাধান্য তাহার অসহ্য; সে "আচ্ছা মা-জী, বহুত আচ্ছা। আজই ঘর যাইব, হামারা হিসাব হুকুম করিয়া দাও। আমি তোমার দাসত্ব করবো, আর কাহারও করিতে পারিব না।"

অপমানে অভিমানে অনুর মুখ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পিসিমার সদয় ব্যবহারে তাহার রাগ জল হইয়া পড়িল। সে উঠিয়া দাইয়ের হাত ধরিয়া বলিল, "দাই, কিছু মনে করিস নে—নে এই ঝিনুক নে—ধুয়ে ঘরে রেখে আয়।"

দাই সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া ঝঙ্কার করিয়া বলিল, "তোমরা ধোও গে—সোনা চাঁদি আমি কখনও দেখিও নাই, স্পর্শও করি না।

আমার ঘরে গম আছে, পিষিব, রোটি বানাব, তরকারি না জোটে, নুন দিয়া খাইব—কাহারও বাক্যবাণ ত সইতে হবে না।” সে একেবারে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল এবং বরদা বাবুর কর্ম্মচারীর নিকট হইতে হিসাবপত্র চুকাইয়া লইয়া, প্রথমে সে মায়ার মাসির নিকট যাইয়া হা-হুতাশ করিয়া যথাযথ সহানুভূতি পাইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিল এবং খোকার অন্নপ্রাশনের সময় অবশ্য অবশ্য সংবাদ দিতে অনুরোধ করিল। সে যাইতেছে সত্য, কিন্তু তাহার ন্যায্য পাওনা যাইবে কোথায়! এখন দশ জনের কথায় মা-জী তাহার উপর অসন্তুষ্ট, বহুমা'র অসুখ, কাজেই এখন পাওনার কথা উত্থাপন করা যায় না। ভগবান্ সকলকে ভাল রাখুন, অন্নপ্রাশনে সে আসিবে। মাসি বলিলেন, “তা বৈ কি, তা আসবি বৈ কি, তা আসবি বৈ কি—তোর পাওনা পাবি বৈ কি। কে জানে বাপু, বেয়ানের কি রকম মতিগতি হয়েছে, অন্ন বলতে অজ্ঞান। আমরা যেমন আপনার মনে ভেবে স্নেহ যত্ন করি, ওরা কি তা করতে পারে? ওরা এসেছে আপনার সুখের জন্যে!” ইত্যাদি অনেক প্রকার মনের মতন কথা শুনিয়া, পরিচিত গৃহে গৃহে তাহার প্রতি যে অবিচার হইয়াছে, তাহা বিবৃত ও কান্নাকাটি করিয়া, দাই তাহার গ্রামে চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দুশ্চিন্তা

দাই চলিয়া যাওয়াতে ঘর-সংসারের কাজকর্ম্মে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। সে অনেক দিনের দাসী, এ গৃহের আবশ্যকমত সকল কাজ শিখিয়াছিল। বিশেষতঃ স্নানাদি করিয়া শুদ্ধ বস্ত্রে সে গৃহিণীর হবিষ্যান্নের জোগাড় করিয়া দিত; উনানে হাঁড়িটি চড়াইয়া, চালগুলি পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া বরদা বাবুর মাতাকে সে সংবাদ দিত এবং তাঁহার হাতের কাজ ফেলাইয়া লইয়া গিয়া ভাত নামাইয়া লওয়াইত, এবং যত ক্ষণ না তাঁহার আহার হয়, সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া জল, নুন, দই, দুধ প্রভৃতি যোগাইত। গৃহিণীর দৃষ্টি ক্রমেই ক্ষীণতর হইতেছে, সকল জিনিস গোছাইয়া না দিলে রন্ধনাদি ও অন্যান্য কাজকর্ম্মে তিনি অশক্ত হইয়া পড়িতেন; দাই ইদানীং সকলই সম্পন্ন করিত। নূতন দাসী আর একজন রাখা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বিশৃঙ্খলা বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

অনু দুইটি শিশু লইয়া বিব্রত, সে তাহাদের পরিচর্য্যা ছাড়া অন্য কিছু করিতে পারে না। প্রত্যহ গৃহিণীর আহারের সময় অনু একটি শিশু কোলে করিয়া উপস্থিত হয়, আবার সকল দিন পারেও না। শিশুরা ত গৃহস্থের অবসর অনবসর বুঝিয়া জাগে না, ঘুমায় না, হাসে না, কাঁদে না। এই প্রভুদের মনস্তুষ্টি, সুখ স্বচ্ছন্দতা, আরাম বিরামের জন্য তাহাদের আত্মীয়বর্গ সদাই প্রস্তুত। সুতরাং অনু অবসর পাইলে তবে গৃহিণীর কাছে আসিয়া তাঁহার কর্ম্মভার লাঘব করে।

দাই কয়েক দিন চলিয়া যাওয়ার পর অনু বলিল, "পিসিমা, ঝি-দাই আমার উপর রাগ ক'রে গেছে, যদি তাকে আসতে বলেন, তবে সে এখনই কিন্তু আসে। আপনার খাওয়া হয় না, কাজকর্ম্মে কত বিশৃঙ্খলা হচ্ছে—আমার জন্যে আপনার এত দিনের লোকটা চ'লে গেল, পাড়ার সকলেই বিরক্ত, নানা কথা বলছেন—পিসিমা, এতে আমার বড় লজ্জা করে। আমি বলি পিসিমা, বৌ ভাল হয়ে উঠলে আমাকে বরং দেশে পাঠিয়ে দেবেন। উনি এখানে কাজ করেন করুন, কিছু কিছু পাঠিয়ে দিলে আমরা খেতে পাব। আমার জন্যে যে সবাই নানা কথা বলেন, আপনারও লোকজন অভাবে এত কষ্ট, এতে আমি মরমে ম'রে যাচ্ছি।" পিসিমা বলিলেন, "মা অনু, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, কিন্তু একটু অধৈর্য্য বাছা! সংসারে কত দুঃখ, কত কষ্ট আছে, শুধু কি মা পয়সার অভাবই কষ্টের? তা নয়—কত অসুবিধা, কত বিশৃঙ্খলা, কত রোগ শোক তাপের মধ্যে দিয়ে যে সংসার চালিয়ে নিতে হয়, তা তোমার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে জানতে পারবে। অধীর হয়ো না মা। আমার মেয়ে নেই, তুমি আমার মেয়ে—যে দাসী তোমার উপর স্পর্দ্ধা করবে, হাজার বিশৃঙ্খলা হ'লেও আমি তাকে রাখতে পারি নে মা। তবে তুমি যদি এখানে না থাকতে চাও, সে স্বতন্ত্র কথা। বৌমা পথ্য পেলে সে বিষয়ে বিবেচনা করা যাবে, এখন থেকে উতলা হ'য়ো না।" দরিদ্রাভিমানিনী অনু সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত, সে কেবল চিন্তা করে—কি করি!

মায়া ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতেছে, এখন আর রাত্রে নার্সকে রাখা হয় না, বরদা বাবুই তাহার ঘরে শয়ন করেন; দিনে নার্স থাকে, যদি ঝি-দাই থাকিত, তবে নার্স না হইলেও চলিত।

গভীর রজনী, সুপ্ত ধরণী নিঃশব্দ নিস্তব্ধ নিস্পন্দ। খুব শীত পড়িয়াছে। দাসী দুই জন হলঘরে কম্বল মুড়ি দিয়া নিদ্রামগ্ন। বরদা বাবুর পড়ার ঘরে হলধর শয়ন করেন; অনুর শয়ন-ঘরে দুইটি শিশু ও অনু। বিনিদ্র অনু অরুণকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে, ভাবিতেছে, "তরুণের গলায় যে বাবাঠাকুরের ফুল আছে, ঐ ফুল কি আমার অরুণের জন্যে পাওয়া যায় না? আমার যাদু, আমার প্রাণের ধনকে বাঁচাতে কি পারব না? কোথা পাব বাবার প্রসাদী ফুল! আচ্ছা, ঐ মাদুলিটি নিয়ে খোকাকে দিলে ত হয়। তা কি ক'রেই বা হবে, সবাই জানতে পারবে যে। আর একটা মাদুলি গড়িয়ে নিতে পারলে হয়—কে বা এখানে গড়িয়ে দেবে! হুঁ, অদৃষ্ট দেখ—আমার যাদুর গলায় একটু সুতোয় গাঁথা তামার মাদুলি! বাঘের নখটাও তামায় বাঁধানো, একটু রূপোও জোটে নি। আর এই ছেলে জন্মাতে না জন্মাতে সোনার হার মাদুলি! শুধু তাই—সোনার ঝিনুক! রূপোর ঝিনুকই বড়মানুষের ঘরে দেখেছি; এদের আবার এত আদর—সোনার ঝিনুক! ভগবান্ পয়সা দিয়েছেন, তাই যা সাধ যাচ্ছে, তাই করছে। আমার খোকা কি আদরের নয়? আমার কি সাধ যায় না যে, আমি ওকে সোনার হার পরাই, সোনার ঝিনুকে দুধ খাওয়াই? সবাই বলে ভগবান্ মঙ্গলময়—যার মঙ্গলময়, তার মঙ্গলময়—আমার কি? কেন, আমি কি করেছি যে, আমার এত অভাব? খেতে পরতে পাই নে —কেন—কেন—কি অপরাধ করেছি? আমার সাধ্যমত সবারই আমি ভাল করি; পয়সা নেই, গতর দিয়ে করি, তার জন্যে আবার দশ কথা শুনতে হয় কেন? দূর হোক্ গে, দশ কথা শুনতে পারি নে—দেশে চ'লে যাই। দেশে চ'লে ত যাব, খোকাকে খাওয়াব কি? যদি বাঁচে ত খরচ বাড়বে বই কমবে না—চাকরির ত ভারি ভরসা! মূর্খের হাতে পড়েছি— এরা সহায় ব'লে তাই একটু কাজ জুটিয়ে দিয়েছেন; আমি থাকলে তবু এদের সময় অসময়ে উপকারে লাগব—ওঁকে শুধু একলা পুষবেন বা কেন? আহা, এরা কিন্তু আমাদের খুব যত্ন খাতির করছেন। পাছে মনে ব্যথা পাই, পিসিমা সে জন্যে সকল অসুবিধে নীরবে সইছেন। দুই ছেলের সমান পোষাক—এই হাড়ভাঙ্গা শীতে দেশে থাকলে কি আমি খোকার গায়ে একটা গরম জামা দিতে পারতুম? কারও কাছে চাইতে পারি নে, তাই ত আমার বাছারা না খেতে পেয়ে, শীতে হিমে ঠাণ্ডা লেগে

লিভার হয়ে, ওষুধ পথ্যি না পেয়ে আমার বুক ভেঙ্গে দিয়ে চ'লে গেল।" তাড়াতাড়ি সে সন্তানকে বুকে চাপিয়া ধরিল, বার বার তাহার মুখচুম্বন করিয়া আবার চিন্তা করিতে লাগিল—"ঐ হার মাতুলি যদি খোকার গলায় পরিয়ে দিই, কে দেখতে আসছে? খোকার এই স্নুতোয় গাঁথা তামার মাতুলি তরুণের গলায় দিই। বাঘের নখটা ওতে আছে, থাক্ গে বাঘের নখ—ওতে কি হয়েছে? তাদের গলায় ত দিয়েছিলুম, কিছুই ত হয় নি! তরুণের গলার মাতুলিতে যে ফুল, সে বড় জাগ্রত ঠাকুরের! তা হ'লে তরুণকে ত সবাই অরুণ মনে করবে। তা করুক—আমার যাতুর জন্যে তা হ'লে ত ভাবতে হবে না—সোনার হার প'রে সোনার ঝিনুকে তুধ খেয়ে আমার বাছা মানুষ হবে, আমি দেখে তৃপ্ত হব। তাই হোক—আজ থেকে অরুণ হোক তরুণ—তরুণ হোক অরুণ। তা হ'লে আর দশ জনে দশ কথা কইতে পারবে না। আমার বাছা যে তরুণ হয়ে মানুষ হচ্ছে, সে কেবল আমিই জানব, আমিই তৃপ্ত হব—এতে আর ক্ষতি কার? এদের ছেলেকে ত আর আমি অযত্ন করি নে—তা ব'লে আমার প্রাণের ধনের মত যত্ন আসবে কেন!"

দাসী ডাকিল, "দিদিমণি, আজ এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে রয়েছ, দেখ, তোমার খোকা কত কাঁদছে; একে তুধ খাওয়াও।"—অনিদ্রায় সারা রাত্রি থাকিয়া ভোরে অন্নুর তন্দ্রা আসিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া দাসীর ক্রোড়স্থিত শিশুটির প্রতি চাহিয়া ঈষৎ চমকাইয়া উঠিল। তাহার গলায় স্নুতার মাতুলি! এই কি তাহার খোকা?—এই কি তাহার অরুণ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিনিময়

দিনের পর দিন যাইতেছে—বরদা বাবু ওকালতি করিতেছেন, পসার ক্রমে জমিয়া আসিয়াছে। মায়া সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে—নিরানন্দ গৃহ আবার আনন্দময় হইয়াছে। বরদা বাবুর ইচ্ছা আছে, যদি কোন বাধা-বিঘ্ন না ঘটে, তবে পূজার সময় সপরিবারে কলিকাতায় গিয়া মাতার চক্ষু চিকিৎসা করাইবেন। মায়ার পুত্রকে দেখিবার জন্য তাহার আত্মীয় স্বজন

উৎসুক হইয়া আছেন, তাঁহাদেরও বাসনা পূর্ণ হইবে। মায়া পূর্ব্বের মতই হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়; তাহার বুকের দুধ শুকাইয়া গিয়াছে, শিশুকে স্তন্য পান করাইতে হয় না; ইচ্ছা হইলে আদর ক'রে কোলে করে মাত্র। সে এখন শাশুড়ীর অপারকতায় গৃহস্থালির কাজে অধিকতর মনঃসংযোগ করিয়াছে। সন্তান সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত—ঠাকুরঝি তাহাকে পালন করিতেছেন।

অনু অরুণের অপেক্ষা তরুণকে অধিকতর যত্ন করে, সুতরাং নিজ সন্তান বলিয়া তরুণের প্রতি কোন প্রকার স্নেহ প্রকাশ করিতে মায়ার লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হয়; তাই সে অনেক সময় অরুণকেই আদর করে। বিশেষতঃ অরুণ হৃষ্টপুষ্ট, শান্ত, খুব হাসে, বিছানায় শুইয়া খেলা করে, রাত্রে কাঁদিয়া বিরক্ত করে না—সুনিদ্রায় তাহার রাত্রি প্রভাত হয়। কিন্তু তরুণের মেজাজ খিট্‌খিটে, সে সর্ব্বদাই কোলে থাকিতে চায়—রোগা। শিশিতে দুধ খাইতে চাহে না, সর্ব্বদাই অনুকে জড়াইয়া থাকিবে ও স্তন্যের জন্য কান্না জুড়িয়া দিবে। মায়ার মাসি বলেন, "বাছা, তোমার সন্তানকে কেন তুমি নিজের কাছে রাখ না?" মায়া বলিল, "কি করব মাসিমা, আমার কাছে আসতে চায় না, আমার দুধ ত ধরেও না। রাত্রে কাছে যদি রাখি, তা হ'লে আর রক্ষা আছে কি—কেঁদে রসাতল করবে।" মাসি বলিলেন, "জানি নে বাছা, এ তোমাদের কি রকম ব্যবস্থা হ'ল? অসুখ হয়েছিল, তার পর সারলে, আপনার সন্তান ত আপনার কাছে নিতে হয়—তা নয়, সকল ভার ঠাকুরঝির উপর! আচ্ছা মায়া, যখন বাপের বাড়ী যাবি, তখন কি ননদকে ছেলের দুধ-দেওনী ক'রে নিয়ে যাবি না কি? তখন কি হবে? এখন বলছি বাছা, নিজের সন্তান নিজে পালন কর, নইলে এর পর তোমার কাছে আর আসবে না। এই যে তোমার ননদ, এত যত্ন করে বল—তা ছেলের গায়ে ত মাস লাগে না! দেখ দেখি, তোমার ভাগ্নেটি কেমন মোটাসোটা। যত্ন ত করে, তোমরাও ত সন্তুষ্ট, কিন্তু ছেলে ত দেখছি দিন দিন ঘিন্‌ঘিনে হচ্ছে, তেমন বাড়ও নেই। অরুণটি দেখ না যেন সুঁদির চুল!" মায়া বলিল, "তা মাসিমা, অরুণ যে আমার খোকার চেয়ে মাস-দুয়েকের বড়, তাই তাকে বড় দেখায়।" মাসি বলিলেন, "হ্যাঁ, বড় বটে, তা তোমার খোকার ত এদিকে বেশ ঘাড় শক্ত হয়েছে, কেবল গায়েই মাস নেই। যাই বল বাছা, এ তোমাদের কাজ ভাল হচ্ছে না।"

অনু সব শোনে—মাঝে মাঝে বলে, "বৌ, ভাই, দেখ না, যদি রাত্রে তোমার কাছে রাখতে পার।" কিন্তু মায়া তাহাতে কর্ণপাত করে না। অনু যে তরুণকে নিজ সন্তান অপেক্ষা অধিক যত্ন করে, ইহা সকলেই জানিতেছেন। কাঁত্বনে তরুণকে লইয়া রাত্রে অনেক সময় অনুকে কোলে লইয়া বসিয়া থাকিতে হয় দেখিয়া প্রথম প্রথম মায়া তাহাকে লইতে আসিত, কিন্তু সে তাহাতে শান্ত না হইয়া আরও কাঁদিত, কাজেই সে আর চেষ্টা করে না।

একদিন মায়া বলিল, "এ ছেলেটা ভারি দুষ্টু, ও তোমাকেই চায়; ওকে তুমিই নাও, তোমার অরুণকে আমায় দিয়ে দাও—কেমন ভাই, সে বেশ হয় না? বেশ ছেলে বদলা-বদলি হয়ে যাক!" শুনিয়া অনুর মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—সে ক্ষণেক স্থিরনেত্রে মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাড়াতাড়ি নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া ঠোঁটে হাসি আনিয়া বলিল, "তা নাও না ভাই, ও তা হ'লে খেয়ে প'রে বাঁচবে। আমরা ভাই দরিদ্র, যে ক'দিন তোমরা দয়া করবে, সে ক'দিন অন্নবস্ত্র জুটবে; তার পর কি যে হবে জানি নে। তাই জন্যে বৌ, আমার খোকাকে অত ক'রে জুতো মোজা টুপি এঁটে রেখো না—অত রকম পোষাক দিয়ে ঢেকো না, যে ধুলোয় প'ড়ে মানুষ হবার অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছে, তার আবার দু-দিনের জন্যে খাট পালং কেন?" বলিতে বলিতে তাহার মুখ মলিন ও চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। "বাবাঃ, ঠাকুরঝির সঙ্গে একটু ঠাট্টা করবারও জো নেই, কি কথায় কি হ'ল—একেবারে চোখে জল!" বলিয়া মায়া ত্রস্তে ব্যস্তে শাশুড়ীর নিকট চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে অরুণের অন্নপ্রাশনের সময় উপস্থিত—ছয় চাঁদ পূর্ণ হইয়াছে। তরুণের এখনও মাসখানেক বিলম্ব আছে। মায়া ধরিয়াছে, 'অরুণের ঘটা ক'রে ভাত দিতে হবে।' অনু ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "তা হ'তেই পারে না।" তখন গৃহিণী মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা এখন থাক্, তরুণের ছয় চাঁদ পূর্ণ হ'লে দুই ছেলের একত্রে মুখে ভাত দেওয়া যাবে। ঘটা আর কি, ব্রাহ্মণ স্বজনকে খাওয়ানো বইত নয়, তা ঐ একেবারেই হবে।" অনু তাহাতেও সম্মত নহে। সে বলে, "ওর আবার অন্নপ্রাশন কেন? যখন বড় হবে, দাদার পাতের ভাত কুড়িয়ে খাবে!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অন্নপ্রাশন

আজ অরুণ তরুণের অন্নপ্রাশন। স্থানীয় কালীবাড়ীতে পূজা পাঠাইয়া দিয়া প্রসাদী চাউল আনানো হইয়াছে। ভোরের সময় রোশন-চৌকির বাঁশীর মঙ্গল সুরে সকলে জাগিয়া উঠিল। মায়ার মাসি পরমান্ন রাঁধিয়া ছুইটি রূপার বাটিতে ঢালিয়া রাখিলেন। এখানে ছুই শিশুর জন্য সোনার হার বালা, রূপার মল এবং ছুইটি রূপার বাটি গড়ানো হইয়াছে। পরিচিত বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে—দিনের বেলা মেয়েদের ও রাত্রে পুরুষদের নিমন্ত্রণ। ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা কালী-বাড়ীতেই করা হইয়াছে; কাঙ্গালী-বিদায়ও সেইখানেই করা হইবে।

মায়ার পিত্রালয় হইতে তাহার ভাই অন্নপ্রাশনের উপচার লইয়া আসিয়াছে; সঙ্গে একজন সরকার ও ভৃত্য। এক স্যুট রূপার ভোজন-পাত্র, মায় রূপার ডাবর গাড়ু। গলায় মোতির মালা, সোনার চাঁপকলি, চুড়ি ইত্যাদি আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলঙ্কার—পিতল কাঁসার তৈজসপত্র। দেখিয়া শুনিয়া বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী বলিলেন, "বরদার মা সার্থক বেটার বিয়ে দিয়েছে ভাই, সজ্জনের ঘর বটে—যেমন দিতে হয়, তেমনি দিয়েছেন।" ললিতের মা বলিলেন, "তা দিদি, পয়সা থাকলে দিতে আর কি? নিজের মেয়েকেই ত দেওয়া!" বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী বলিলেন, "তা ভাই, থাকলেই কি সবাই দিতে জানে? এমন ক'রে গুছিয়ে যত্ন ক'রে দেওয়াই দেওয়া। কেমন বিবেচনা, মামা এসেছে মুখে ভাত দিতে। কোন খুঁত রাখে নি, এমন কুটুম নইলে কি সুখ হয়? আমার মেজ বৌমার বাপেরা এই যে বড়মানুষ—দিলেন, না কি দিলেন—নগদ টাকা দিলেন—সাজিয়ে দিলে দশে দেখতো।" মায়ার মাসি বলিলেন, "তা ভাই একরকম ভাল; বিদেশ বিভুঁই ব'লে মেলা জিনিসপত্র দিতে তুমিই বারণ করেছিলে না?" বাঁড়ুজ্যে-গিন্নী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "হাঁ তা, তা বটে—এ দেশে ছু-দিনের জন্যে বইত নয়—তা ত সত্যি!"

বরদা বাবুকে তাঁহার মাতা বলিলেন, "তুই অরুণের মুখে ভাত দিস্।" তিনি তখন তাড়াতাড়ি কাছারি যাইতেছেন—তখনও আভূতি হয় নাই, সুতরাং তাহা আর ঘটিল না; তরুণের মামাই অরুণ তরুণ ছুই জনেরই

মুখে পায়স দিয়া, দুই শিশুকে দুইটি গিনি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। অবশ্য ইহা মায়ারই গোপন ইঙ্গিতের ফল। পরে দুই ভাইকে একখানি পালকিতে বসাইয়া সঙ্গে হলধর চলিলেন এবং একজন ভৃত্য সম্মুখে খই, কড়ি এবং পয়সা ছড়াইতে ছড়াইতে, বাজনা বাজাইতে বাজাইতে কালীবাড়ীতে চলিল। সেখানে দেবতা প্রণাম করা হইলে আবার বাদ্যভাণ্ড সহিত সকলে ফিরিয়া আসিল। অরুণের মুখে হাসি ধরে না, সে বাজনার সঙ্গে হাতে তালি দিতে দিতে চলিল, কিন্তু তরুণ ক্ষণেক পালকিতে বসিয়াই খুঁত খুঁত করিতে লাগিল, সুতরাং দাসী তাহাকে কোলে করিয়া লইল। অনু তাহার সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারের বোঝা চাপাইয়াছে। মায়া নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু অনু তাহা গ্রাহ্য করে নাই—'আজকের দিনে পরবে না ত কবে পরবে' বলিয়া মাতুলালয়ের সমস্ত অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিয়াছিল বলিয়া তরুণ আরও ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া কাঁদিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে বাড়ী আসিলে মায়া তাহার অলঙ্কার বস্ত্রাদি খুলিয়া দিয়া তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিল—সে শান্ত হইল না, হাত বাড়াইয়া অনুর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল দেখিয়া মায়া হাসিতে লাগিল এবং অরুণকে কোলে লইয়া তাহার হাসিমাখা মুখে বারম্বার চুম্বন করিয়া মাতৃহৃদয় পরিতৃপ্ত করিল। তরুণকে শান্ত করিয়া ঘুম পাড়াইয়া অনু মায়ার কোল হইতে নিদ্রিত অরুণকে লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিয়া আসিল।

নিমন্ত্রিতা মহিলাগণ বলিতে লাগিলেন, "বরদার মা, বেশ বাছা তোমার ঘরে কানাই বলাই এসেছেন। আহা, বেঁচে থাক্ ছেলে দুটি—দেখলে চক্ষু জুড়োয়! কিন্তু তোমার বরদার খোকাটির কাহিল সারলো না। হাজার হোক, মা'র দুধ ত পেলে না, তাই এত যত্নেও গায়ে সারছে না।"

তরুণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে নিমন্ত্রিতা মহিলাগণ সকলে তাহাকে যৌতুক করিলেন; কিন্তু অরুণের সন্ধান করিলে তাহার দেখা পাওয়া গেল না। দাসীর কোলে দিয়া অনু তাহাকে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। অনুর বিশ্বাস, তাহার সন্তানকে যৌতুক করাকে মহিলারা দণ্ড দেওয়াই মনে করিবেন—প্রসন্নমনে যৌতুক দিতেছি মনে করিবেন না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যর্পণ

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে—অরুণ তরুণের অন্নপ্রাশনের পর দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। বরদার বাগানে স্বহস্তে রোপিত ফলের গাছগুলি ফলবান্ হইয়াছে। প্রস্ফুটিত ফুলের বাগানের অদূরে ফলভারাবনত গাছগুলির ছায়াময় পথগুলি যেমন সুশীতল, তেমনই শোভনীয়।

জ্যৈষ্ঠ মাস—আমগাছগুলি পাকা আমে ভরা। গ্রীষ্মের ছুটিতে অরুণ তরুণকে সর্ব্বদাই সেই গাছের ছায়ায় ঘুরিতে দেখা যায়। তাহারা রৌদ্র মানে না, বৃষ্টি মানে না, অনুর চক্ষুর অন্তরাল হইলেই বাগানে যাইয়া উপস্থিত হয়। ফুল ছিঁড়িতে, ফল পাড়িতে, গাছে চড়িতে, অপচয় ও দুরন্তপনায় তরুণ সিদ্ধহস্ত। তাহার দুষ্টামিতে ভৃত্যগণ তটস্থ, স্কুলের মাষ্টার পণ্ডিত ক্রুদ্ধ; মায়া লজ্জিত—বরদা বাবু বিরক্ত। কেবল অনুই তাহার প্রতি সদয়, তাহার সকল দৌরাত্ম্য অম্লান বদনে সহ্য করে। অরুণকে সে দাদা বলিয়া ডাকে বটে, কিন্তু দাদার সম্মান তাহাকে দেয় না; তাহাকে ছোট ভায়ের মতই আজ্ঞাবহ করিতে চায়। কিন্তু অরুণ সব সময়ে তাহার কথামত চলিতে চাহে না। ঢিল দিয়া পাখী মারিতে, ফুল ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া দিতে সে অসম্মত, অথচ তরুণের সহায়তা না করিলে সে তাহাকে মারে, ভীরু বলিয়া অবজ্ঞা করে—তখন সে গিয়া হলধরের আশ্রয় লয়। হলধরই অরুণকে পালন করিয়াছেন; অনু ত তরুণকে লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। শিশুকাল হইতেই সে অরুণকে হলধরের কাছেই অধিক সময় রাখিয়া দিত। হলধর তাহার স্নেহময় সাথী, তাহার সুমিষ্ট আধভাষার শ্রোতা, তাহার 'কেন'র উত্তরদাতা। প্রভাতকালে সূর্য্যোদয়ে, সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের সময় যখন তরুণের আব্দারে কান্নায় বাড়ীর লোক বিব্রত, তখন অরুণ ও হলধরকে পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া মনের কথায় মগ্ন থাকিতে দেখা যাইত।

যথাসময়ে হাতে খড়ি দিয়া বাড়ীতে মাষ্টার রাখিয়া এবং পরে স্কুলে পাঠাইয়া লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। তরুণের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি মন নাই, আগ্রহ নাই, যত্ন নাই; তাহা লইয়া মাষ্টার পণ্ডিত অধিক

শাসন করিতে পারেন না—প্রধান উকিলের পুত্র—তিনিই আবার ইস্কুলের সেক্রেটারী—বেশী বকাবকি সঙ্গত নহে। অরুণ তাহার শ্রেণীর উৎকৃষ্ট ছাত্র, বৎসরের পর বৎসর পুরস্কার পাইতেছে। অনুকে কিন্তু তাহাতে বিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিতে দেখা যায় না। সে বলে, "দেখ ভাই, গরিবের ছেলে, মন দিয়ে পড়াশুনা করেন, নিজেরই মঙ্গল—দু-পয়সা এনে খেতে পারবেন।" মায়া বলে, "তুমি যেন ভাই কি! অরুণ কচি ছেলে, সব সময়ে ওকে কেবল খাওয়ার কথাই বল। যা-কিছু ভাল, তা তরুণকে বেশী ক'রে দাও, ওকে দেবে সামান্য, আবার তুমি ভাই এমন যে, কখনও ওর হাতে আগে দেবে না, এতে কি ওর মনে ব্যথা লাগে না? আহা, ও আমার সদানন্দ—এমনি ওর অভ্যাস হয়েছে, সে দিন আমি আম কেটে ওদের দিচ্ছি, আগে ওর হাতে দিতে গিয়েছি, অমনি বললে, 'মায়ি, ভাইটিকে আগে দাও।' কি মধুর স্বভাব ওর হচ্ছে! তা যা বল ভাই ঠাকুরঝি, আমার পেটের ছেলে তরুণ বটে, কিন্তু আমার ভাল লাগে ভাই অরুণকে। বড় সুবোধ হচ্ছে ভাই; যেমন দয়া মায়া, তেমন বুদ্ধি বিবেচনা। সে দিন তরুণ এক ছোকরা-চাকরকে এমন ছিপটির এক ঘা বসিয়ে দিলে—আহা, ছেলেটা কেঁদে ফেললে; আমি ছড়িগাছটা কেড়ে নিলুম, তরুণ কাঁদতে কাঁদতে তোমার কাছে গেল। এখনও সেটা দিই নি ব'লে রোজ আসে, 'মায়ি, ছড়িটা দাও।' যা জব্দ আমার কাছে।" অনু বলিল, "বৌ, সে দিন তুমি এমন কান ম'লে দিয়েছিলে যে, ছেলে অভিমানে সারা রাত কাঁদলে, তার পরদিন মাথা ধ'রে জ্বর হয়ে পড়ল।"

মায়া কহিল, "তা ঠাকুরঝি, ও তোমার দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছে কি না, তাই তোমার মত অভিমানী হয়েছে। কারও কোন কথা সইতে পারে না। দেখ, তোমার দাদা কত দুঃখ যে করেন—বলেন, 'কেন যে অমন হচ্ছে—একত্রে মানুষ হচ্ছে, দেখ অরুণের কেমন সুবুদ্ধি হচ্ছে, আর দিন দিন ওর এমন দুর্বুদ্ধি কেন হচ্ছে? অনুর জন্যে ওকে শাসন করার জো নেই, সে-ই আদর দিয়ে ওর সর্ব্বনাশ করলে।"

শুনিয়া অনুর মুখ লাল হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল; বলিল, "তুমি বৌ, যখন প্রসবের পর অসুস্থ হয়ে তিন মাস শয্যাগত রইলে, আমার যা সাধ্য করেছিলুম, সে জন্যে অনেক কথা সইতে হয়েছিল। আমি তখন বার বার ক'রে পিসিমাকে বলেছিলুম

যে, 'পিসিমা, দশ জনের দশ কথা সয় না, আমাকে দেশে পাঠানো হোক।' তা ভাই, তখন সবাই মিলে যেতে দিলে না, এখন আমায় দুষলে কি হবে? কচিটি থেকে মানুষ করেছি, ছেলে শাসন করতেও পারব না, তোমরা যে মার ধর করবে, তা দেখতেও পারব না। তার চেয়ে তোমাদের ছেলে তোমরা নাও, আমি বরং স'রে যাই, তোমরা যা জান কর।"—বলিয়া হাতে মুখ ঢাকা দিয়া সে হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মায়া তখন "ছি ভাই, ও কি ভাই" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া, শেষে মূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। অনু অনেক ক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল, পরে চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহে চলিয়া গেল। তরুণের স্বভাব, কি শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিলে সে এইরূপ কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হয়, কাজেই সকলে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করেন।

ভীষণ গরম পড়িয়াছে—জ্যৈষ্ঠের শেষ—একটু মেঘের চিহ্ন মাত্র নাই। এ বৎসর প্রচুর আম ফলিয়াছে, গরিব দুঃখী আম খাইয়া দিন কাটাইতেছে, এমন সময় শহরে দুরারোগ্য রোগ দেখা দিল। অরুণ তরুণের হাতে কর্পূর বাঁধা হইল; তাহাদের দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ছুটাছুটি, আম খাওয়া একেবারে নিষেধ করা হইল। অরুণ কথার বাধ্য, সে চুপচাপ ঘরে বন্ধ থাকে, কিন্তু তরুণ অনুকে অসতর্ক দেখিলেই বাগানে আম পাড়িতে যায়, খায়, ছড়ায়, আবার অনুর ডাকাডাকিতে ছুটিয়া আসে। ছেলেদের জন্য অনু সদাই শঙ্কিতা। মায়ারও ভয় হইয়াছে, কিন্তু দুর্ভাবনায় অধীর হওয়া তাহার স্বভাব নহে। মাঝে মাঝে দুঃসংবাদ ও ক্রন্দনের রোল তাহাদের কানে আসিয়া শঙ্কা বাড়াইতেছিল। বাড়ীতে সকল রকম সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে, কিন্তু হায়—সকলই বিফল! তরুণ সেই কাল রোগে আক্রান্ত হইল। দাস দাসী, আত্মীয় স্বজন হাহাকার করিতে করিতে বলাবলি করিতে লাগিল, "আহা! বাবুর এক সন্তান, এত আদরের ধন—আহা, ভগবান্ কি বেছে বেছেই ভালর দিকে ফিরে দেখেন? হায়, কি হ'ল, কি হবে! আহা, মা-জী আমাদের দয়াময়ী, বৌমা আনন্দময়ী, বাবু মহাদেব—এঁদের উপর কি ভগবান্ এমন বজ্রাঘাত করবেন!"

অরুণকে একেবারে ভিতর-বাড়ী হইতে সরাইয়া হলধর নিজের কাছে রাখিল, এবং 'ভাইটি ভাল হবে, ভয় কি?' বলিয়া তাহাকে সাহস দান ও নানাপ্রকার গল্পস্বল্প দ্বারায় ভুলাইয়া রাখিল।

ডাক্তার, নার্স, ঔষধ, পথ্য, সকলই আসিয়াছে, তবু এক মুহূর্তের জন্য অনুকে কেহ রোগীর গৃহ হইতে সরাইতে পারিতেছে না। দুই দিন পরে ডাক্তারের একটু ভরসা হইল, বুঝি বা রোগী রক্ষা পাইবে—কিন্তু না—তৃতীয় দিনে আবার অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল—চতুর্থ দিনে তরুণ যেন ঘুমাইয়া পড়িল।

ডাক্তার অনুকে বলিলেন, "দেখুন, এখন আর কিছুতেই আপনার এখানে থাকা হবে না; বিকাল নাগাদ রোগী সুস্থ হইলে তখন আপনি আসবেন। ওখানে বৌমা বড় কাতর হয়েছেন, তাঁকে বরং আপনি সান্ত্বনা করলে ভাল হয়। ধন্য আপনি—যে রকম সেবা করলেন, তাতে আপনার আপসোসের কারণ কিছুই নেই। আমাদের যথাসাধ্য আমরা করেছি, এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

অনু অনেক ক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর নির্জ্জীবপ্রায় বালকটির মুখ চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরের বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, পরিবারস্থ সকলেই ম্লানমুখে বড় ঘরের ভূমিতে বসিয়া আছেন। মেয়েরা চক্ষু মুছিতেছেন, বরদা বাবু স্থির গম্ভীর, হলধরের গলাটি জড়াইয়া অরুণ।

অনুর সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বাবুও আসিলেন। বলিলেন, "আপনারা ভগবান্‌কে স্মরণ করুন—সকলই তাঁর ইচ্ছা—মনে করলে তিনি মৃতকে জীবিত করতেও পারেন।"

অনুর চক্ষে জল নাই—দেখিতে দেখিতে তাহার মূর্ত্তি উন্মাদিনীর মত ভীষণ হইয়া উঠিল। সে বলিতে লাগিল, "শোন, তোমরা সকলে শোন—বৌ, তুমি শান্ত হও, কেঁদ না—কেঁদ না—আমার পাপের ফল আমি একাই ভোগ করবো। যে আজ চ'লে যাচ্ছে, ঐ আমার বত্রিশ নাড়ী-ছেঁড়া ধন—সে-ই আমার বাছা, সে-ই আমার অরুণ, সে কেবল আমার! তাকে বাঁচাবার জন্যে, তাকে দারিদ্র্যের দুঃখ থেকে রক্ষা করবার জন্যে আমি ছেলে বদল করেছিলুম। জানতুম—বাবার ফুল বড় জাগ্রত, বাবা তাকে রক্ষা করবেন, তাই এখনও সে হার, সে মাদুলি খুলতে দিই নি।" বলিয়া সে আসল তরুণের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া মায়ার কোলে বসাইয়া দিয়া বলিল, "বৌ, এই নাও তোমার ছেলে, তুমি শান্ত হও; এর গলা থেকে সোনার হার মাদুলি খুলে নিয়ে তাকে পরিয়েছিলুম, বড় জাগ্রত

প্রসাদী ফুল ব'লে! সোনার ঝিন্নুকে দুধ খাওয়াতুম! হায় হায়, কিছু হ'ল না, হ'ল না, রাখতে পারলুম না—পারলুম না—"

বলিতে বলিতে অন্নু ছিন্ন লতার মত মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

('মানসী ও মর্ম্মবাণী'—ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩২৮)

ভারতীর ভিটা

যদিও শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নামটি কখনও 'ভারতী'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 'ভারতী' জ্যোতিবাবুরই মানস-কন্যা। আমি পঞ্জাব হইতে আসিয়া শুনিলাম যে, একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের কল্পনা জল্পনা চলিতেছে ; প্রবন্ধাদি রচিত ও সংগৃহীত হইবার আয়োজন হইতেছে। একটি হল্‌দে রঙের বাক্স হইল 'ভারতী'র ভাণ্ডার ; প্রথমে সেটি জ্যোতিবাবুর কাছেই থাকিত, পরে কোন এক সময়ে সেই ভাণ্ডারটি আমাদের মাণকতলা ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র ঘরের তাকের উপর রাখা হয়। সেই বাক্স ও কয়েকটি পরিত্যক্ত প্রবন্ধ অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার সাথের সাথী ছিল—অল্প কিছু দিন হইল বিসর্জ্জন দিয়াছি।

সে সময় প্রতি রবিবারে জ্যোতিবাবু ও রবীন্দ্রনাথ ভারতীর ভাণ্ডার লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া 'ভারতী' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও পরে "তাঁহাকে"[১] লইয়া ৺বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে যাইতেন এবং সেখান হইতে জোড়াসাঁকো ফিরিয়া যাইতেন।

কোন কোন দিন বৈকালে আমরা ৺জানকীবাবুর[২] রামবাগানস্থ বাড়ীতে যাইতাম—সেখানে ন-বৌঠাকুরাণী, নতুন বৌ[৩], জ্যোতিবাবু, রবিবাবু প্রভৃতিও আসিতেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী তখন শেক্সপিয়ার পাঠ করিতেন—আমি যখনই যাইতাম, অধিকাংশ সময়ই দেখিতাম, তিনি শেক্সপিয়ার পড়িতেছেন, আবার কখন দেখিতাম, সেতার শিক্ষা করিতেছেন, কখন বা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছেন বা ভাঁড়ার দিতেছেন। লেখাপড়া করিতেন বলিয়া তিনি কখনও গৃহস্থালিতে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন না—ইহা তাঁহার বিশেষ গুণপনার কথা।

সকলে মিলিত হইলে 'ভারতী'র জন্য রচিত নূতন প্রবন্ধাদি পাঠ, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের গান হইত, পরে আহারাদি সমাপনান্তে বাড়ী ফিরিতে রাত্রি ১০।১১টা বাজিয়া যাইত।

১। কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী   ২। জানকীনাথ ঘোষাল

৩। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী

'ভারতী'র জন্মস্থান ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন ভবনটি তখন ভারতী-উৎসবে নিত্য মুখরিত। জ্যোতিবাবুর তেতলার ছাদে টবের গাছ সাজাইয়া বাগান করা হইয়াছিল, "তিনি" নাম দিয়াছিলেন 'নন্দন-কানন'। সন্ধ্যার সময় পরিবারস্থ সকলেই সেখানে নিত্যনিয়মিত মিলিত হইতেন। তখন মহর্ষির সাত পুত্র, পাঁচটি পুত্রবধূ, চারিটি কন্যা, পাঁচটি জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র গুণসম্পন্ন গুণেন্দ্রনাথ[৪] বিদ্যমান; এতদ্ব্যতীত পৌত্র, দৌহিত্র, পৌত্রী, দৌহিত্রী মিলিয়া ৩৪।৩৫ জন ছিলেন। ৺গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও তাঁহার সহোদরাদ্বয়ের সন্তানাদিও অনেকগুলি।

নিত্যনিয়মিত গীত বাদ্য বিদ্যালোচনার মত মাঘোৎসব. জন্মোৎসব, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ব্যাপারও তখন নিত্যকর্ম্মের মধ্যেই ছিল। তা ছাড়া নাট্যাভিনয়, বিদ্বজ্জন-সমাগম, বসন্তোৎসব, এমন কি, হোলি-খেলারও বিরাম ছিল না। তেতলায় পরিবারস্থ বয়স্কদিগের মেলা এবং বাগানে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা, ছুটাছুটি। তখন ছিল শুধু হাসিখেলা, শুধু মেলামেশা।

দেখিতে দেখিতে শ্রাবণ মাসে একদিন 'ভারতী' প্রকাশিত হইল। অনেক গবেষণার পর আর্ট ষ্টুডিয়োর দেবী সরস্বতীর ছবির অনুকরণে ভারতীর মলাটের ব্লক প্রস্তুত হয় এবং তখনকার পক্ষে ছবিখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই সকলে মানিয়া লইয়াছিলেন।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হইলেন 'ভারতী'র সম্পাদক। প্রতি মাসেই সম্পাদক মহাশয়ের, জ্যোতিবাবু, রবিবাবু ও "তাঁহার" রচনা কিছু-না-কিছু প্রকাশিত হইতই। ছোট গল্প প্রথমে যেটি প্রকাশিত হয়, তাহা রবিবাবুর, পরে তাঁহার একটি গল্প ধারাবাহিক-রূপে বাহির হইতে থাকে। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতি প্রায়ই থাকিত। 'ভারতী' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার 'দীপনির্ব্বাণ' উপন্যাস বাহির হয়; তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক 'ছিন্নমুকুল' বোধ হয় 'ভারতী'র তৃতীয় বৎসরে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন সকলের কি উৎসাহ! পূজনীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বোম্বাই হইতে প্রতি মাসেই রচনা পাঠাইতেন। 'ভারতী'র

৪। অবনীন্দ্রনাথের পিতা

খোরাকের অভাব কখনও হইত না; বাহিরের প্রবন্ধাদি বড়-একটা আবশ্যক হইত না। এই সময় রবীন্দ্রনাথ বিলাতে, অসুস্থতাবশতঃ শ্রীযুক্ত জ্যোতিবাবু সস্ত্রীক দীর্ঘকালের জন্য ষ্টীমারে জলযাত্রা করিলেন, তখন 'ভারতী' পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার "তাঁহার" উপর ন্যস্ত হইল। অনেক সময় দেখিয়াছি, প্রবন্ধের জন্য প্রেসের লোক বসিয়া রহিয়াছে, "তিনি" তাড়াতাড়ি কিছু লিখিয়া দিলেন। বাল্যকাল হইতে "তাঁহার" কবিতা লেখা অভ্যাস ছিল, কিন্তু প্রবন্ধ ও গদ্য রচনা বোধ হয় 'ভারতী'র জন্যই প্রথম রচিত হইয়াছিল। তখন 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র চিহ্ন মাত্র ছিল না, 'বঙ্গদর্শন' মধ্যাহ্ন-আকাশ হইতে ঢলিয়া পড়িয়াছে, আর 'আর্য্যদর্শন' ধূমকেতুর মত বোধ হয় ছয় মাস বা নয় মাস অন্তর কদাচিৎ দেখা দিত। এমন সময় 'ভারতী' যখন নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন সাহিত্য-সমাজে যে আন্দোলন ও তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহা এখনও থামে নাই। এখনও 'ভারতী'র পাঠক ও সেবকের অভাব হয় নাই।

ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে-বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে, তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি-পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল—'ভারতী'র সেবকেরা আর ফুল তোলেন না, মালা গাঁথেন না, 'ভারতী' ধুলায় মলিন। এই দুর্দ্দিনে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর পালন-শক্তির পরিচয় দিলেন। ধুলা ঝাড়িয়া সস্নেহে 'ভারতী'কে কোলে তুলিয়া লইলেন; সেই সঙ্কটকালে তিনি রক্ষা না করিলে আজ 'ভারতী'র নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ও "তিনি" যে-'ভারতী'র ভিত্তি স্থাপনা করেন, সেই 'ভারতী' আজ চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিল, ইহা অপেক্ষা আমার অধিক আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে! গত বৎসর হইতে 'ভারতী' নবীন সম্পাদকের যত্নে নব উৎসাহে প্রকাশিত হইতেছে—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, 'ভারতী' যেন জন্মভিটায় চিরদিন বিরাজ করে। আষাঢ় ১৩২৩। ('বিশ্বভারতী পত্রিকা,' কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫১)

সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ও আশ্রয়াকাঙ্ক্ষা লইয়া স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের বিশেষত্ব

২৬ সংখ্যা প্রস্তাব* সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পুরুষই যে কেবল সৌন্দর্য্যে মোহিত হন, আর মেয়েরা একেবারেই তাহা হন না, তাহা আমি মনে করি না। তবে পুরুষে শারীরিক সৌন্দর্য্যে চট্ ক'রে মোহিত হয়ে পড়েন, মেয়েরা মানসিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন। যেমন পুরুষেরা হয়ত পটলচেরা চোখ, বাঁশীর মতন নাক দেখে মুগ্ধ হলেন, কিন্তু মেয়েরা তা হন না বটে— তাঁরা একটু কথাবার্ত্তা হাবভাবে অন্যান্য ভিতরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন। ভাল ভাব কি সৌন্দর্য্য নহে? তার পর আশ্রয় পাইয়াই মেয়েরা নিশ্চিন্ত নহে। যদি আশ্রয় পাইয়াই সন্তুষ্ট হইবে, তাহা হইলে অনেক স্থলে ভালবাসা পাইবে না জানিয়াও ভালবাসে কেন এবং সেই ভালবাসা কেন হৃদয়ে পোষণ করে? মেয়েরা শুধু যে আশ্রয় চায়, তাহা ত আমার মনে হয় না, আশ্রয় দিবার ভাবটাই বোধ হয় আশ্রয় পাবার চেয়ে বেশী। শারীরিক বলে অবিশ্যি আশ্রয় দিতে পারে না, কিন্তু ভালবাসার আশ্রয় তারা বেশী দিতে পারে। যাহাকে ভালবাসে, কিসে যে সে···[সুখে] থাকিবে, তাহার জন্য সে সমস্ত সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিতে পারে। পুরুষের ভালবাসা উন্নত ও মহান্ বলিয়া সে এ-ফুলে ও-ফুলে চরিয়া বেড়ায়, তাহা নহে, তাহার গভীরতা কম। মেয়েদের ভালবাসা গভীর, তাই তারা এক স্থানেই বদ্ধ থাকে। হ'তে পারে পুরুষের ভালবাসা বিস্তৃত বেশী—কিন্তু গভীরতা কিছু মাত্র নাই।—শরৎকুমারী ২৬।১১।১২৮৯ (জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' হইতে শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও ১৩৫৩ সালের শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত)।

---

* রবীন্দ্রনাথ-লিখিত "স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব।"

পরিষৎ-প্রকাশিত কয়েকখানি
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, ৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ	...	৬০৲
দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী	...	১৮৲
ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী	...	১০৲
মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী	...	১৮৲
হুতোম প্যাঁচার নক্শা	...	৪॥০
আলালের ঘরের দুলাল	...	৩॥০